সিন্ধুর এক বিন্দু

গোলাম সামদানী কোরায়শী

সিন্ধুর এক বিন্দু

আত্মজৈবনিক রচনা

সূচীপত্র
ঢাকা

সূচীপত্র

প্রকাশক সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী. সূচীপত্র
৩৮/২/ক. বাংলাবাজার (৩য় তল) ঢাকা ১১০০. ফোন : ৭১১৩৮৭১.
বইয়ের নাম সিন্ধুর এক বিন্দু
লেখক গোলাম সামদানী কোরায়শী
সূচীপত্র প্রকাশনা ১২৯
স্বত্ব সায়িদা কোরায়শী
প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০০
প্রচ্ছদ মাসুদ কবির
কম্পিউটার কম্পোজ সূচনা কম্পিউটার্স ৪০/৪১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মুদ্রক অমি প্রিন্টার্স ১৪৭/এ আরামবাগ ঢাকা ১০০০.
মূল্য ৳ ২৫০.০০ মাত্র

Title SINDHUR EK BINDU
Author Golam Samdani Quraishy
Publisher Saeed Bari
Chief Executive SUCHEEPATRA
38/2/Ka Banglabazar (2nd Floor) Dhaka 1100.
Fax : (880-2)7100873. E-mail : omi@bangla.net
Price Tk. 250.00 only. US$ 10.00. UK £ 5.00. I Rs. 200.00 only

ISBN 984-8106-65-0.

প্রসঙ্গ ঃ গোলাম সামদানী কোরায়শীর আত্মজীবনী

কুলিয়াটিতে আমার কর্তব্য কর্ম আরম্ভ হল। তা আর কিছু নয়, আমি গরুর রাখাল হলাম। প্রায় সারা গাঁয়ের গরু গোপাট বেয়ে তলার হাওরে গিয়ে নামতো, আর আমরা বেশ কয়েকজন রাখাল সেগুলো পাহারা দিয়ে রাখতাম। আবার বিকেল বেলা সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম। হাল বাওয়ার কাজ শুরু হলে হালুইরা খুব ভোরেই গরু নিয়ে ক্ষেতে চলে যেতো এবং হাল বাওয়া শেষ করে মাঠে আমাদের কাছে গরু দিয়ে আসতো। আমরা সেগুলোকে বুঝে নিয়ে পাহারা দিতাম।

ব্যাপারটা যেমন সহজ ছিল না, তেমনি সতর্ক না থাকলে জটিলও হয়ে পড়ত। কুলিয়াটির পর থেকেই বিখ্যাত তলার হাওর আরম্ভ হয়েছে। গ্রামের গোপাট দিয়ে এগিয়ে গেলে দু'পাশের আবাদী জমির পর দেখা যেতো একটি বিরাট মাঠ। তুলনামূলকভাবে আবাদী জমির চেয়েও কিছুটা উঁচু। সেই মাঠ জুড়ে গজাত দুর্ব্বা ঘাস। বিরাট সেই মাঠ দিগন্ত জুড়ে পড়ে আছে। তার পূর্ব সীমায় আছে একটি ছোট্ট নদী। আর বাকি তিন দিকেই বোরো ধানের জমি। এই মাঠে বেশ কয়েকটি গাঁয়ের গরু এসে একত্র হতো। সুতরাং রাখালদের কাজ হতো প্রতিটি গাঁয়ের গরুগুলোকে যথাসম্ভব পৃথক করে রাখা এবং সেগুলো যাতে ধান ক্ষেতে গিয়ে না ঢুকে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা। কাজেই রাখালদের পক্ষে মাঠে গরু দিয়ে বসে থাকার উপায় ছিল না। কারণ কোন প্রকারে দলছুট হয়ে এক গাঁয়ের গরু অন্য গাঁয়ের গরুর দলে ঢুকে গেলে তা খুঁজে বের করা ছিল খুবই কঠিন। তাছাড়া সেই বিরাট মাঠে বসে থাকার জন্য ছায়ারও কোন বন্দোবস্ত ছিল না। একমাত্র ছোট্ট নদীর তীরে কয়েকটি গাছ ছাড়া আর কোথাও ছায়া পাওয়া যেতো না। তাই রাখালরা দায়িত্ব ভাগাভাগি করে পাহারা দেয়া ও জিরিয়ে নেয়ার কাজ করতো। আমি কিছুদিনের মধ্যেই এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

তবে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল এই বিরাট মাঠের উদার বিস্তার। দিগন্ত ছুঁয়ে পড়ে থাকা এই মাঠ আর তার বুকে চড়ে বেড়ানো গরুর দল আমার মনে অনেক কথার ভীড় জমাতো। বিশেষ করে যখন জিরিয়ে নেয়ার পালায় সেই নদীর তীরের গাছের তলায় বসতাম, তখন আমার চোখে এই উদার প্রকৃতি বিস্ময়ের ছোঁয়া দিয়ে যেতো। কখনও তাকিয়ে থাকতাম নদীর ওপাড়ের গাঁ গুলোর দিকে। সেই গাঁগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাছে ছিল গোবিন্দ শ্রী। কয়েক বছর পরে আমি সেই গাঁয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময়তো তার সঙ্গে পরিচয় ছিল না, শুধু তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হতো, ওইতো একটি গাঁও দেখা যায়, এরপরে আরও গাঁও আছে। তারপরে আরও গাঁও—এভাবে পৃথিবী কতদূর চলে গেছে।

(আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের চতুর্থ তরঙ্গ ঃ গোলাম সামদানী কোরায়শী।)

তলার হাওরের সেই রাখাল বালক পরবর্তীতে পৃথিবীর পথে হাঁটতে হাঁটতে সত্যিকারের আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন। এই রাখাল বালক পরবর্তী জীবনে বহু গ্রন্থের লেখক, একজন সফল অধ্যাপক, গবেষক, সমাজসেবক, মুক্তচিন্তার মানুষ, মুক্তবুদ্ধির মানুষ, আলোকিত মানুষ গোলাম সামদানী কোরায়শী।

গোলাম সামদানী কোরায়শী তাঁর আত্মজীবনীতে তলার হাওরের রাখালের ভূমিকায় যে সময়টির কথা বলছিলেন, সেটি ১৯৪২-৪৩-এর সময়। পৃথিবী জুড়ে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ত্রাস। বাংলাদেশে তখন আসছে ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ পঞ্চাশের মন্বন্তর। সে সময়ের পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের সত্যিকারের জীবনচিত্র, গ্রাম সমাজের একটি বাস্তব চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় গোলাম সামদানী কোরায়শীর আত্মজীবনীতে।

গোলাম সামদানী কোরায়শীর জীবনটি বড় বৈচিত্র্যময়। যখন তিনি তলার হাওরে রাখালের কাজ করছেন তখন তাঁর বয়স কমপক্ষে তেরো-চৌদ্দ। আরও বেশিও হতে পারে। কারণ জন্ম তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি আছে।

এ বিষয়ে তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "মায়ের মুখে শুনেছি, আমার জন্ম হয়েছিল মাতুলালয়ে, ময়মনসিংহ জেলা, অধুনা নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত কাওরাট গ্রামে। তখন নাকি রমজান মাস ছিল। আমার এক ফুফাতো ভাইয়ের এক ছেলেও জন্মেছিল সেই দিনে। ফুফাতো ভাই আমাকে সেই তারিখটি দেখিয়েছিলেন, লেখা আছে—'একুশে চৈত্র, তেরশ' ছত্রিশ সন।' তখন ইংরেজি এপ্রিল মাস, উনিশশ' ত্রিশ সাল। বারটা কি ছিল, তা কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার বড় ভাইয়ের একটি কুষ্ঠি ছিল, সেটি আমি দেখেছি। সুতরাং এটা অনুমান করা যায় যে, বাবা তাঁর বড় ছেলের জন্য যদি কুষ্ঠি তৈরি করতে পেরে থাকেন তাহলে তাঁর এই দ্বিতীয় ছেলের জন্ম তারিখটি অন্ততঃ কোথাও লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু তেমন কোন লেখা কোথাও দেখতে পাইনি। হয়তো আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্যই আমার জন্ম তারিখ লেখা কাগজটি হারিয়ে গেছে। যাক, মোটামুটি যেটুকু পাওয়া গেল, তাইতো যথেষ্ট।

আর যথেষ্ট না হয়েই বা উপায় কি? কারণ আমার জন্ম তারিখের জন্য অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই; আসল দোষ আমার নিজের। নিজের কোনো প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিজে স্মরণ না রাখলে অন্যে তা স্মরণ করে দেবার দায় নেবে কেন? এ সংসারে নিজের ঢোল নিজে না পেটালে অন্য লোকে তা খুব কমই পিটিয়ে দেয়। কিন্তু এটাইবা কেমন কথা হল, আমার জন্ম তারিখ আমি স্মরণ রাখবো কী করে? তখন কি আমার এমন কোন বোধশক্তি ছিল, যাতে করে স্মৃতির ভাণ্ডারে কোনো কিছু জমা হতে পারে?"

যাহোক, তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সেও যে ছিলো একজন গরুর রাখাল, পরবর্তী জীবনে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একজন সফল মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, এটা যে কোন মানুষের এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে।

গোলাম সামদানী কোরায়শী তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী *সিন্ধুর এক বিন্দুর* প্রতিটি তরঙ্গে নিজের জীবনের একেকটি সময় পুঙ্খাণুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন তিনটি খণ্ডে। প্রথম খণ্ড শিক্ষাজীবন, দ্বিতীয় খণ্ড কর্মজীবন, তৃতীয় খণ্ড চিন্তাজীবন। নিজের গোটা গোটা হাতের লেখায় তিনশত পৃষ্ঠার পরিসরে চৌদ্দটি অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড শেষ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ড কর্মজীবনের মাত্র দু'টি অধ্যায় শেষ করতে পেরেছেন। তৃতীয় খণ্ড চিন্তাজীবন শুরুই করতে পারেন নি। বাঙালি পাঠকের সৌভাগ্য যে, শৈশব-কৈশোর-যৌবনের শিক্ষাজীবন তিনি লিখে যেতে পেরেছেন। তা না হলে ত্রিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবনের সাধারণ মানুষের জীবন যাপন, মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক জীবন, জীবন সংগ্রামসহ সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান দলিল আমরা হারিয়ে ফেলতাম। কর্মজীবন অধ্যায়ে, বাংলা একাডেমীর চাকরিতে প্রবেশ, সে সময়ের বাংলা একডেমীর পরিবেশ, নিজের অনুবাদ কর্ম ও সাহিত্যকর্ম, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ সহকর্মীদের অন্তরঙ্গ পরিচয় লিখে রেখে যেতে পেরেছেন। কর্মজীবনের বেশির ভাগ বিষয়ই লিখে রেখে যেতে পারেননি। তবে গোলাম সামদানী কোরায়শী সম্পর্কে অন্যদের লেখায় হয়তো এর অনেক কিছুই পেয়ে যাবো। গোলাম সামদানী কোরায়শী নিজে তাঁর চিন্তাজীবন লিখে রেখে যেতে পারলে হয়তো বা একটি মূল্যবান কর্ম হিসেবে বিবেচিত হতো। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত একজন টাইটেল পাস মৌলানা থেকে পরবর্তী জীবনে কিভাবে

একজন প্রগতিশীল মানুষে, একজন মুক্তচিন্তার মানুষে রূপান্তর ঘটল, কিভাবে পেলেন তিনি আলোর সন্ধান, তার ব্যাখ্যা তিনি নিজে প্রদান করতে পারলে তা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা হতে পারতো। তবে তাঁর চিন্তাজীবনের বিভিন্ন উপাদানতো তাঁর লেখাগুলোতেও ছড়িয়ে আছে, যা গোলাম সামদানী কোরায়শী গবেষকরা হয়তো পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গোলাম সামদানী কোরায়শী তাঁর আত্মজীবনী শুরু করেছেন বেলাভূমি শিরোনামে একটি ভূমিকার মাধ্যমে। বেলাভূমিতে তিনি আত্মজীবনী লেখার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন, "যে জীবন সমুদ্রের মধ্যে আমি নিমজ্জিত হয়ে আছি, যার মধ্যে ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে স্রোতের টানে এতদূর এগিয়ে এসেছি, কিছু সময়ের জন্য বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই সমুদ্রকে, তার মধ্যে আমার অবস্থানকে আর স্রোতের আবর্তে আমার উত্থান-পতনকে খতিয়ে দেখার একটা ইচ্ছাই আমাকে এমন এক অসম্ভব কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে।"

এরপর প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ .... এভাবে চতুর্দশ তরঙ্গ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন শৈশব, কৈশোর যৌবনের দীর্ঘ শিক্ষাজীবন। গোলাম সামদানী কেরায়শীর পিতা আবদুল করিম কোরায়শী ছিলেন নেত্রকোণা শহরে একজন স্কুল শিক্ষক। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ ঘটায় পরিবারটি এক চরম দুরাবস্থায় পতিত হয়। ছোট ছোট এতিম ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে তাঁর মা প্রথমে আশ্রয় নেন স্বামী আবদুল করিম কোরায়শীর গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর থানার বীর আহমদপুর গ্রামে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে এখানে টিকে থাকতে পারেনি পরিবারটি। সামান্য জমিজমা যা ছিল সেগুলো বিক্রয় করে মাতুলালয় নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানার কাওরাট গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে পরিবারটি। কিন্তু প্রতারিত হয়ে জমিজমা বিক্রির অর্থ হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যান তাঁরা। মায়ের বাড়ির লোকজন জোর করে মাকে অন্যত্র বিয়ে দেন। গোলাম সামদানী কোরায়শী ও অন্য ভাই-বোনেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় পান। ফলে জীবনের একটা দীর্ঘসময় গোলাম সামদানী কোরায়শী পড়াশুনাই শুরু করতে পারেননি। গরুর রাখাল হিসেবে এবং চাষাবাদ করেই কেটে যাচ্ছিল জীবন। এ সময়ে তাঁদের গ্রামে একটি বিয়ে উপলক্ষ্যে বেড়াতে আসেন সামদানী কোরায়শীর এক পিতৃবন্ধু কাজী সাহেব। তিনি তখন নেত্রকোণা জেলার মদন থানার বিবাহ রেজিস্টার। তিনি গোলাম সামদানী কোরায়শীকে তাঁর পিতার শিক্ষার কথা মনে করিয়ে পড়াশুনা করার পরামর্শ দেন। এরপর গোলাম সামদানী পড়াশুনার সিদ্ধান্ত নিয়ে মদন এসে তার সাথে দেখা করলে তিনি গোলাম সামদানীকে বাস্তা সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি এবং সেখানে এক বাড়িতে লজিং থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর পড়াশুনা করেন ময়মনসিংহে কাতলাসেন সিনিয়র মাদ্রাসা ও ঢাকায় আলীয়া মাদ্রাসায়। বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে লজিং থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী টাইটেল পাস করেন। এরপর আবার নতুন করে পড়াশুনা শুরু করেন আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণের জন্য। ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স ও এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক ঘটনাবলীসহ অনেক বিষয় চলে এসেছে। তবে তাঁর দেখার চোখ সব সময়েই যেন সাধারণের বাইরে। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বাংলা বিভাগ থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো শিক্ষা সফরে দিল্লী, লাহোরসহ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। এই শিক্ষা সফর শেষে তাঁর অনুভূতি হচ্ছে, "ধুত্তুরী, কি পণ্ডশ্রমই না এই চারটি সপ্তাহ ধরে করে এসেছি! কী দেখে এলাম, কী শিখে এলাম! প্রাকৃতিক দৃশ্যেতো বৈচিত্র্য আছেই। কিন্তু তাতে তো মন ভরে না। মন চায় মানুষের কীর্তি। কিন্তু ভারত পাকিস্তানের বিশাল ভূ-ভাগ জুড়ে যা দেখে এলাম, সবইতো স্মৃতিসৌধ, মৃত মানুষের সমাধি। জীবিতের উত্তরাধিকার বহন করতে পারে, এমন একটি প্রতিষ্ঠানও তো চোখে পড়লো না। মুসলমান নরপতিরা সাতশ' বছর ধরে এই ভারত উপমহাদেশ শাসন ও শোষণ করেছে, তাঁরা কি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে পারলো না। এদেশের যা ছিল, তাও তারা বিধর্মীর আস্তানা বলে ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে এই বিরাট দেশের মানুষ ক্রমান্বয়ে অজ্ঞানতার আর কুসংস্কারের তিমিরে তলিয়ে গেছে। আর বিলাসী সম্রাটরা এরই সুযোগে নিজেদের কবরের উপর গড়ে তুলেছে বিরাট বিরাট স্মৃতিসৌধ। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা এসব স্মৃতিসৌধ তথা মৃতের মাজার জিয়ারত করে কী ফল লাভ করবে?"

গোলাম সামদানী কোরায়শী চাকরি জীবন শুরু করেন বাংলা একাডেমীতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধানের সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তিনি বাংলা একাডেমীতে চাকরি প্রাপ্তির ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বয়স তখন পঁচাত্তর বছর। বাংলা একাডেমীতে তিনি আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান প্রণয়নের কাজ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে একজন পরীক্ষক হিসেবে তিনি গোলাম সামদানী কোরায়শীকে মূল্যায়ন করেছেন। এম.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পাস করার পর গোলাম সামদানী কোরায়শী চলে গেছেন গ্রামে। এ সময় ঢাকা থেকে বন্ধুর চিঠি পেলেন, শহীদুল্লাহ সাহেব দেখা করতে বলেছেন। তিনি ঢাকায় এসে শহীদুল্লা সাহেবের বাসায় দেখা করলে, শহীদুল্লাহ সাহেব জানালেন একটি শব্দের অর্থ জানার জন্য তিনি গোলাম সামদানী কোরায়শীকে দেখা করতে বলেছিলেন। শহীদুল্লাহ সাহেব জানতেন তাঁর মতো গোলাম সামদানী কোরায়শীরও অনেকগুলো ভাষার উপর দখল আছে। যশোর অঞ্চলে প্রচলিত একটি শব্দের উৎপত্তি জানার জন্য গোলাম সামদানী কোরায়শীর মতামত জানতে চেয়েছেন, শব্দটি কোন ভাষার হতে পারে এবং এর অর্থ কি? সামদানী কোরায়শী বিনা দ্বিধায় জানালেন, শব্দটি ফারসি এবং এর অর্থ আনয়নকারী। শহীদুল্লাহ সাহেব ফারসি অভিধান ঘেটে বের করলেন উত্তর সঠিক হয়েছে। যশোর অঞ্চলে শব্দটি বিয়ের ঘটক অর্থে ব্যবহৃত হয়। গোলাম সামদানী কোরায়শীর ভাষা জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁকে পরদিন বাংলা একাডেমীতে দেখা করতে বললেন। সেখানে দেখা করার পর শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁকে একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথে কাজ করার জন্য আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধানের সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিয়োগপত্র দিতে বললেন। সৈয়দ আলী আহসান সাহেব প্রথমে রাজি হননি। তিনি জানালেন উক্ত পদে প্রেষণে কোনো অধ্যাপককে নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে লেখা হয়েছে। শহীদুল্লাহ সাহেব একাডেমীকে জানালেন তাঁর কথামত নিয়োগপত্র না দিলে তিনি পদত্যাগ করবেন। শেষ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীতে নিয়োগ পেলেন গোলাম সামদানী কোরায়শী। বাংলা একাডেমীতে চাকরিকালীন সময় আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা থেকে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন, যার ফলে গোলাম সামদানী

কোরায়শীর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের মধ্যে অনুবাদ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে গোলাম সামদানী কোরায়শী লিখেছেন, "এ সময়েই কোনো এক ফাঁকে তিনি [ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ] আমাকে অবসর সময়ে কিছু অনুবাদের কাজ করতে বলেছিলেন। এর ফলে আমি ইকবালের 'আরজুগানে হিজাজ' নামের ফারসি কাব্যটি অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। ইতিপূর্বে 'আনোয়ারে সুহায়লী' নামের অন্য একটি ফারসি গদ্য গ্রন্থ অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছিলাম। সেটি তখনও শেষ হয়নি। তবু এই নতুন আবাসে আরজুগানে হিজাজের কাব্যানুবাদই আমার অবসর সময়ের কাজ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে সৈয়দ আলী আহসান সাহেব আমাকে হাতের লেখা একটি উর্দু পাণ্ডুলিপি এনে দিয়েছিলেন। এতে তাঁদের বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিল। আমি এর পাঠোদ্ধার করে অনুবাদ করে ফেললাম এবং 'ফতেহাবাদের আউলিয়া কাহিনী' নামে সেটি বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। বস্তুতঃ এই অনুবাদের মাধ্যমে সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের সাথে আমার পরিচয় অনেকখানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। চাকরি দেবার বেলায় যে বিতৃষ্ণা তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম, এই পরিচয়ের মাধ্যমে তা দূর হয়ে গেছে বলেই মনে হলো। এরপর যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আমি প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধারে পারদর্শী এবং হিন্দী ভাষাও জানি, তখন শহীদুল্লাহ সাহেবের চেয়েও বেশি করে তিনি আমাকে স্নেহ করতে আরম্ভ করলেন। এরই ফলশ্রুতি আলাওলের 'তোহফা' কাব্যের সম্পাদনা। .... এ সময়ে আমি অনুবাদের আরও একটি কাজ করে ফেললাম। ভাষাতত্ত্বের উপর লেখা একটি ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ 'আইন আদালতের ভাষা' নামে তখনকার বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।"

গোলাম সামদানী কোরায়শীর আত্মজীবনীতে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনার পটভূমি এবং গ্রন্থগুলো সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে। ফলে সুখপাঠ্যতার পাশাপাশি তথ্যসমৃদ্ধির কারণে আত্মজীবনীটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন–বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'কালিলা ও দিমনা' শিরোনামের অনুবাদ গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "আনোয়ারে সুহায়লীর অনুবাদ কর্মটি এবার শেষ হল। আমি নাম দিয়েছিলাম, 'অনেক তারার হাতছানি।' কিন্তু সৈয়দ আলী আহসান সাহেব কাব্যিক নামটি পছন্দ করলেন না। গদ্য পুস্তকের একটি গদ্য নাম হলেই ভালো হয়। শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে অনুবাদটির নাম রাখা হলো 'কালিলা ও দিমনা।' এ নামে আরবি ভাষায় একটি গ্রন্থ আছে। মূলতঃ আমার অনূদিত ফারসি গ্রন্থটির গল্পগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে নেয়া। এটি প্রথম পাহলবি ভাষায় রূপান্তরিত করেন পারস্য সম্রাট নওশেরোয়াঁর সময় 'বরজস মেহের'। সেখান থেকে অষ্টম শতাব্দীতে ইবনে মুকাফফা আরবিতে ভাষান্তরিত করেন। পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে হাসান ওয়াজেজ নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি এই গল্পগুলো অবলম্বন করে ফারসি ভাষায় 'আনোয়ারে সুহায়লী' গ্রন্থটি রচনা করেন। এর প্রথমেই 'কালিলা' ও 'দিমনা' নামের দু'টি শৃগালের গল্প আছে। সুতরাং এই বাংলা অনুবাদটি এই নামেই বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছিল।"

গোলাম সামদানী কোরায়শী তাঁর আত্মজীবনীতে বাংলা একাডেমীতে চাকরিকালীন সময় পর্যন্ত ঘটনাবলী লিখে যেতে পেরেছেন। এরপর তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে ময়মনসিংহে নাসিরাবাদ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে। জীবনের এ অংশের ঘটনাবলী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে যেতে পারেননি।

গোলাম সামদানী কোরায়শীর মৃত্যু পাঠককে বঞ্চিত করেছে পরবর্তী সময়ের মূল্যবান ঘটনাবলী থেকে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১১ অক্টোবর, ১৯৯১। তাঁর অধিকাংশ মূল্যবান বইগুলো বেরিয়েছে আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ সময়ের পরে। পরবর্তী সময়ের তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমা। ইবনে খলদুন চতুর্দশ শতকের লেখক। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন স্পেনীয় মুসলমান। তাঁর পিতা আফ্রিকায় রাজকীয় চাকরিতে নিয়োজিত থাকার সময় তিনি তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সমাজ বিজ্ঞানের জনক ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমার অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার পরিসরে দুই খণ্ডে অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমী।

গোলাম সামদানী কোরায়শীর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, মুক্তধারা প্রকাশিত *সাহিত্য ও ঐতিহ্য*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী প্রকাশিত *ইসলাম ও আমেরিকা*, প্রবন্ধ সংকলন *ঐতিহ্য অন্বেষা*, *পিতৃভাষা*, *আসামীর কাঠগড়ায়*, *আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম* প্রভৃতি।

তিনি এক সময় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত শিশুসাহিত্য পত্রিকা *টাপুর-টুপুরে* নিয়মিত লিখতেন। *গোবদা সাধুর কোর্তা*, *ওলোট পালট* ও *আগডুম-বাগডুম* তাঁর তিনটি ছড়ার বই। শিশু একাডেমী প্রকাশ করেছে দু'টি জীবনীগ্রন্থ *ছোটদের দুদুমিয়া* এবং *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*।

গোলাম সামদানী কোরায়শী বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন সেমেটিক মিথোলজি অবলম্বনে। সেমেটিক মিথোলজি অবলম্বনে রচিত তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *স্বর্গীয় অশ্রু*, *মহাপ্লাবন*, *পুত্রোৎসর্গ*, *চন্দ্রাতপ* প্রভৃতি।

সমাজসেবক হিসেবেও গোলাম সামদানী কোরায়শীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহে বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবিরের সভাপতি, যা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। পঁচাত্তর-ছিয়াত্তরের দুঃসময়ে তিনি ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ময়মনসিংহে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি হিসেবে ১৯৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

গোলাম সামদানী কোরায়শীর পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপক হিসেবে, লেখক হিসেবে, সংগঠক হিসেবে, সমাজসেবক হিসেবে তাঁর ভূমিকা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁকে একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

গোলাম সামদানী কোরায়শীর আত্মজীবনী পড়লে বিস্মিত হতে হয়—তলার হাওরের এক রাখাল বালক কিভাবে জীবনের দুর্যোগপূর্ণ সময়গুলো নিজের আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অতিক্রম করে পরবর্তীতে জাতির বিবেকের কণ্ঠস্বর হতে পেরেছিলেন।

গোলাম সামদানী কোরায়শীর আত্মজীবনী নিঃসন্দেহে আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল।

— আতাউল করিম

প্রথম প্রবাহ ঃ শিক্ষাজীবন

তরঙ্গ সূচী

বেলাভূমি/১৩
প্রথম তরঙ্গ/১৬
দ্বিতীয় তরঙ্গ/৩৭
তৃতীয় তরঙ্গ/৫৬
চতুর্থ তরঙ্গ/৭৬
পঞ্চম তরঙ্গ/৯৬
ষষ্ঠ তরঙ্গ/১১৫
সপ্তম তরঙ্গ/১৩৬
অষ্টম তরঙ্গ/১৫৯
নবম তরঙ্গ/১৮৩
দশম তরঙ্গ/২০৮
একাদশ তরঙ্গ/২৩৩
দ্বাদশ তরঙ্গ/২৬০
ত্রয়োদশ তরঙ্গ/২৮৮
চতুর্দশ তরঙ্গ/৩১৫

বেলাভূমি ॥

মানুষ আত্মকাহিনী লিখে কেন? কোন্ উদ্দেশ্যে? এর মধ্যে সে এমন কী বক্তব্য তুলে ধরতে চায়, যা না তুলে ধরলেই নয়?

এ সব প্রশ্ন বিবেচনা করলে আমার জীবন কাহিনী লেখার কোনো সার্থকতা থাকে না। কারণ আমার দিক থেকে আমি এসব প্রশ্নের কোনোটিরই কোনো সুষ্ঠু উত্তর দিতে পারবো না। কেননা অন্য যারা তাঁদের আত্মজীবনী লিখে গেছেন, তাঁদের তুলনায় আমি নেহাৎই নগণ্য। আমার জীবন কথা থেকে গ্রহণ করার মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এ আমার বিনয় নয়; একান্ত সত্য কথা।

তবু যে এই অপকর্ম(!) আমি করতে যাচ্ছি, তার কারণ আমার একটি অদ্ভুত খেয়াল। যে জীবন সমুদ্রের মধ্যে আমি নিমজ্জিত হয়ে আছি, যার মধ্যে ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে স্রোতের টানে এতোদূর এগিয়ে এসেছি; কিছু সময়ের জন্য বেলা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই সমুদ্রকে, তার মধ্যে আমার অবস্থানকে আর স্রোতের আবর্তে আমার উত্থান-পতনকে খতিয়ে দেখার একটা ইচ্ছাই আমাকে এমন এক অসম্ভব কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। সুতরাং একে এক অদ্ভুত খেয়াল ছাড়া আর কী বলতে পারি! কারণ জীবন প্রবাহের মধ্যে এমনি উভচরবৃত্তির অবকাশ আছে কি?

তাই আমার ভয় অপরের গালাগালির জন্য নয়, ভয় আমার নিজের অক্ষমতার জন্য। আমার জীবনতো সিন্ধুর মধ্যে এক বিন্দু; সেই বিন্দুকে নিরাবেগ বাস্তবতার মধ্যে আমি কি দেখতে পারবো? যদি কষ্টে-শিষ্টে দেখেও ফেলি, তা হলেও তা কি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো? কারণ এমন অনেক কিছুইতো আছে, যা নিজে দেখা যায়, ভাবা যায়, উপলব্ধি করা যায়; কিন্তু তা কি জনসমক্ষে প্রকাশ করা যায়? তখন খেয়ালের সামনে লোক লজ্জার দেয়াল এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিছুতেই মনের কথা মুখে আসে না, কলমের ডগায় বের হতে চায় না! কথায় বলে, 'লজ্জা নারীর ভূষণ'। কিন্তু আমি বলবো, নারীর নয়, নরের নয়, লজ্জা মানুষের ভূষণ। কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই যা মনে আসে, তাই মুখে বলা সম্ভব নয়; আর যা মুখে বলা সম্ভব নয়, তা কলমের আঁচড়ে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। এই কৃত্রিমতার নামই সভ্যতা।

অবস্থা যদি তাই হয়, তা হলে আমার জীবন বর্ণনা কি অসম্পূর্ণ হবে না? আমার জীবন দর্শন কি আবছা আঁধারে ছেয়ে থাকবে না? থাকলেই বা কী করতে পারি। তাই বলে সভ্যতার উত্তরাধিকারতো ত্যাগ করতে পারি না। কারণ এতো আমার ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার নয়, এযে সমাজের উত্তরাধিকার। আমি যদি পৃথিবীতে একা থাকতাম,

তা হলে লজ্জাবোধ আর মাত্রা জ্ঞানের এই বাধ্যবাধকতা আমার মোটেও থাকতো না। আমি যা ইচ্ছা বলতে পারতাম, যা ইচ্ছা করতে পারতাম। কিন্তু সমাজের উত্তরাধিকার বহন করে তার আবেষ্টনীতে আমি কেন্. স্বয়ং বিধাতা পুরুষের পক্ষেও যা ইচ্ছা বলা বা যা ইচ্ছা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজের উত্তরাধিকারের নির্দেশ পালন করেই আমাকে আমার জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে হবে। সাহিত্যের নামে হোক, বাস্তবতার নামে হোক, অনুভূতির বল্গাহীন উদ্দাম প্রকাশ কখনোই শিল্প সৌধ সৌষ্ঠব মণ্ডিত হয় না। নর্দমার পাঁকে বাস্তবতা আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকর।

এ কারণেই জীবন কাহিনী লিখা মানেই জীবনকে নতুন করে রচনা করা। সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর আবর্তনকে নতুন মর্যাদায় বিভূষিত করা। যা অশোভন, তাকে ত্যাগ করে শোভন ও শালীন বক্তব্য দিয়ে তাকে পূর্ণ করে তোলা। 'তাই সত্য, যা রচিবে তুমি'— একথা শুধু শিল্পের ক্ষেত্রে নয়, অন্যের জীবন কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়, নিজের জীবন বর্ণনার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। খাঁটি সোনা দিয়ে আর যাই হোক, অলংকার তৈরি করা যায় না; কিছুটা খাদ মিলাতেই হয়। তাহলে কি জীবন কাহিনীকে মিথ্যা দিয়ে সাজাতে হবে?

না, মিথ্যা নয়; বাস্তব সত্যকেই সম্ভাব্য সত্য দিয়ে সাজিয়ে তুলতে হবে। কারণ এ যে বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্ত বিথারী সমুদ্রকে অবলোকন করা; সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর লীলায়িত জীবন বিলাসকে প্রত্যক্ষ করা। স্মৃতির আধারে এর সব কিছুই কি অটুট অক্ষয় হয়ে আছে? তরঙ্গের আকুল ঝাপটায় অনেক কিছুই তো তলিয়ে গেছে। তাই সেই অনেক কিছুর জন্য নিপুণ ডুবুরীর মতো এই বর্তমান জীবন সমুদ্রে ডুব দিতে হবে। বর্তমানের দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হবে অতীতের জীবন পরিবেশ ও তার আনন্দ-বেদনা। এছাড়া গত্যন্তর নেই।

হ্যাঁ, এভাবেই শুধু নিজের অতীত নয়, অতীতের কোটি কোটি মানুষের অলিখিত জীবন লীলা অকথিত আনন্দ বেদনা আমরা উপলব্ধি করে থাকি। কারণ পৃথিবীতো এক প্রকাণ্ড যাদুঘর; এখানে কথা আর কাজের ফসিল থরে থরে সাজানো রয়েছে। বর্তমানের আলো ফেলতেই ফসিলের কংকালগুলি রক্তে মাংসে সজীব হয়ে উঠে; কথা বলতে থাকে, কাজ করতে থাকে। আমি তাই দেখে আমার স্মৃতির সঞ্চয়কে সাজিয়ে নিই।

কারণ শুধু স্মৃতি অনেক সময় প্রতারণা করে, শুধু শ্রুতি অনেক সময় ভুল শোনায় আর শুধু দৃষ্টি অনেক সময় বিভ্রমের সৃষ্টি করে। তাই আমার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কেও সম্ভাব্য বাস্তবের নিরিখে যাচাই করে নিতে হয়। এখানে ব্যক্তির চাইতে সমাজ বড়ো হয়ে উঠে আর সমাজের চাইতে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় মানব সমাজের সাধারণ ঐতিহ্য। দেশ-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করে সে আমাকে স্পর্শ করে, বিকশিত করে এবং পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।

এ যেন গাছের ডালে ফুল ফোটানো, ফল ফলানো। নিচের নিশ্চল মাটি যোগায় তার জীবনরস, বৃষ্টির ধারা দেয় তার মধ্যে সজীবতা, দূর-দূরান্ত থেকে বয়ে আসা বায়ু

ছড়ায় তার গন্ধ আর নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূর থেকে আলো এসে তার মধ্যে বর্ণ ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এমনি করেইতো ফুল ফোটে, ফল ফলে; জীবনের সঞ্চয় প্রসারিত হয় ভবিষ্যতের দিকে। মানুষওতো এর ব্যতিক্রম নয়; সেওতো কেবল জন্মভূমি দিয়েই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

আমিও যেহেতু মানুষ, তাই মানুষের সাধারণ উত্তরাধিকার আমাকে বহন করতেই হবে। আমার দেশ, আমার মাটি, আমার ভাষা, আমার বৃষ্টির জল, আমার ধর্ম, আমার বায়ু আর আমার মানবিক উত্তরাধিকার, আমার সূর্যের আলো, এর সব কটিই আমার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। এ শুধু আমার স্বীকৃতি নয়, সম্ভাব্য সত্যের বর্ণনা নয়; বরং এই-ই হলো বাস্তব সত্য। আমি স্বীকার করি বা না করি, এর মধ্যেই আমার অস্তিত্ব বিকশিত হয়ে উঠেছে; এই সিন্ধুতে অবগাহন করেই আমার বিন্দুত্বের সম্ভাবনা পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানেই সীমার মাঝে আমি অসীম আর অসীমের মাঝে আমি সীমার ঐশ্বর্যে অস্তিত্ববান!

এই উপলব্ধি কি শুধু আমার একার? সকলের মাঝেই কি এর পরশ অনুভূত হয় না? তবে অন্যের ব্যাপারে যাই হোক, আমিতো জানি কোন্ বিন্দু থেকে আমি যাত্রা শুরু করেছি আর আজ কোন্ সিন্ধুতে এসে উপনীত হয়েছি! সকলকে বেষ্টন করে আমার অস্তিত্বের এই যে অবারণ আকুতি, এর আনন্দ বেদনা কী অদ্ভুত ভাবেই না আমাকে আকর্ষণ করে। আমি সকলের হয়ে সকলের মাঝে নিজকে ছড়িয়ে দিতে চাই; সকলের গৌরব আমার গৌরব হয়ে উঠে, সকলের লজ্জা আমার লজ্জা হয়ে দাঁড়ায়।

কারণ এই পৃথিবীতে আমি এর আগে আর কখনও আসিনি; আবার আসবো কিনা, তাও আমার জানা নেই। সুতরাং মেনে নিতে হয় যে, এই-ই আমার প্রথম আসা আর এই-ই আমার শেষ আসা। কাজেই এই দুর্লভ মানব জীবনকে কি শুধু সংকীর্ণতা দিয়ে সংকুচিত করে রাখবো? সকলকে আপন ভেবে সকলের সাথে একাত্ম হয়ে—আমার অস্তিত্বের পূর্ণতা বিধান কি আমি করবো না? শুধু আমার স্বার্থকে ভালোবাসবো আর সব কিছুর দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে মারবো?

কিন্তু এ কী করছি! বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সিন্ধুর সর্বগ্রাসী আবর্তণকে এভাবে প্রশ্রয় দিলে আমার বিন্দুর লীলা বিলাসতো প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে না! ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, স্বদেশ, পৃথিবী, এর সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থাকা আমার সেই সীমাবদ্ধতাকেই তো ভাষা দিতে হবে! সুতরাং সংকীর্ণতাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও অস্তিত্বের সাথে সে জড়িয়ে থাকবেই। থাকুক; তবু আমার ঘরের মতোই তাতে দরজা থাকবে, জানালা থাকবে; বাইরের সাথে তার যোগাযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে। মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকলেও আমি দুহাত বাড়িয়ে দেবো আকাশের দিকে। কারণ আমি জানি—

সিন্ধুর এক বিন্দু, হোক্ তবু তার মূল্য ;
তরঙ্গের অভিঘাতে হয় যে সিন্ধুতুল্য!

প্রথম তরঙ্গ ॥

মায়ের মুখে শুনেছি, আমার জন্ম হয়েছিলো মাতুলালয়ে; ময়মনসিংহ জেলা, অধুনা নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত কাউরাট গ্রামে। তখন নাকি রমজান মাস ছিলো। আমার এক ফুফাতো ভাইয়ের এক ছেলেও জন্মেছিলো সেই দিনে। ফুফাতো ভাই আমাকে সেই তারিখটি দেখিয়েছিলেন, লিখা আছে—'একুশে চৈত্র, তেরোশ' ছত্রিশ সন। তখন ইংরেজি এপ্রিল মাস, উনিশ শ' ত্রিশ সাল। বারটা কী ছিলো, তা কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার বড়ো ভাইয়ের একটি 'কুষ্ঠি' ছিলো, সেটি আমি দেখেছি। সুতরাং এটা অনুমান করা যায় যে, বাবা তাঁর বড়ো ছেলের জন্য যদি কুষ্ঠি তৈরি করাতে পেরে থাকেন, তাহলে তাঁর এই দ্বিতীয় ছেলের জন্ম তারিখটি অন্তত কোথাও লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু তেমন কোনো লিখা কোথাও দেখতে পাইনি। হয়তো আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্যই আমার জন্ম তারিখ লেখা কাগজটি হারিয়ে গেছে। যাক্,—মোটামুটি যেটুক পাওয়া গেলো, তাইতো যথেষ্ট!

আর যথেষ্ট না হয়েই বা উপায় কী! কারণ আমার জন্ম তারিখের জন্য অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই; আসল দোষ আমার নিজের। নিজের কোনো প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিজে স্মরণ না রাখলে, অন্যে তা স্মরণ করিয়ে দেবার দায় নেবে কেন! এ সংসারে নিজের ঢোল নিজে না পিটালে অন্য লোকে তা খুব কমই পিটিয়ে দেয়। কিন্তু এটাই বা কেমন কথা হলো, আমার জন্ম তারিখ আমি স্মরণ রাখবো কী করে! তখন কি আমার এমন কোনো বোধ শক্তি ছিলো, যাতে করে স্মৃতির ভাণ্ডারে কোনো কিছু জমা হতে পারে?

আমরা সাধারণভাবে এমন অনেক কথা বলি আর বিশ্বাসও করি, যা নিয়ে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। আমরা বলি, আল্লাহ্ মানব জাতিকে সৃষ্টি করার আগে তাদের সকলের আত্মা সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর সকল আত্মাকে একত্র করে ডেকে বলেছিলেন,'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?'

তারা এ প্রশ্নের উত্তরে সমস্বরে বলেছিলো, 'হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু!'

এখন কথা হলো, সেই সব আত্মার মধ্যে নিশ্চয় আমার আত্মাও ছিলো। প্রভু কাকে বলে, কেনইবা সেই প্রভুর প্রভুত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন, এমনি সব রীতিমতো দার্শনিক ব্যাপার বুঝার ক্ষমতা অবশ্যি তার হয়েছিলো। তা না হলে সে এমন ইতিবাচক উত্তর দিতে পারতো না। সুতরাং এই বুঝার ক্ষমতাটি যদি স্বীকার করে নিই, তা হলে বলতে হয়, তখন তার মধ্যে ভাষাজ্ঞান আর তত্ত্বজ্ঞান দুটোই জন্মেছিলো। অথচ মুশকিল

হয়েছে এই যে, সেই আত্মাই যখন দেহ ধারণ করে পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করছে, তখন সে একান্তই নির্বোধ; নিজের জন্ম লগ্নের কিছুই সে তার স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেনি। আগের সেই ভাষাজ্ঞান আর তত্ত্বজ্ঞান কোনোটাই তার কোনো কাজে লাগেনি। আমার বিপদ হয়েছে এখানেই; কাজেই অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কী!

জানি, অনেকেই রেগে মেগে বলবেন, 'বিপদ বানিয়ে নিলেই হলো; এ আবার একটা বিপদ নাকি!'

'কেন বলুনতো?'

কারণ আত্মার সেই জ্ঞান ছিলো একান্তই আত্মিক আর পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত তার এই জ্ঞান হলো দৈহিক। এ কারণেই বিসদৃশ অনুভূতির পীড়নে জন্ম লগ্নে শিশু কেঁদে উঠে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের এটিই প্রথম প্রতিক্রিয়া।

ভালো কথা। তা হলে বলতে হয়, আত্মা পুরোপুরি দেহের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ও অভিজ্ঞতার বাইরে তার আর কোনো জ্ঞান থাকে না। কিন্তু একথা কি নির্বিবাদে সবাই স্বীকার করে নেবেন? কারণ একথা স্বীকার করলে আমাদের অনেক অলৌকিকত্বই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আর অস্বীকার করলে শুধু জন্ম লগ্নে নয়, আরও অনেক ব্যাপারেই আত্মার আত্মিক জ্ঞানের অভাব দেখা দেবে। সুতরাং ব্যাপারটি নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না।

কারণ আমি নিজেই জন্ম লগ্নের কোনো স্মৃতিই পাঠককে উপহার দিতে পারবো না; এমন কি আমি কেঁদেছিলাম কিনা, তাও আমার মনে নেই। তবু মেনে নেয়া ভালো যে, আমি কেঁদেছিলাম। কারণ জন্মের পর অনেক শিশুরই এমনি কান্না আমি শুনেছি। সুতরাং আমিও যেহেতু তাদের মতো একটি শিশুই ছিলাম, কাজেই কান্নার ব্যাপারটি বিনাদ্বিধায় স্বীকার করে নেয়া যায়। এমন কি যিনি মায়ের পেটে থাকতেই আঠারো পারা কোরান শরীফ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন, তিনিও জন্মের পর কেঁদেছিলেন বলে আমি মনে করি। কারণ জন্মের পর কেউ হেসেছিলো, এমন ঘটনার কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি।

মাতৃ জঠরের কবোষ্ণ পরিবেশ ছেড়ে যখন শিশু পৃথিবীর এই উন্মুক্ত আলো বাতাসে এসে পড়ে, তখন সে যে পীড়ন অনুভব করে, কান্না হলো তারই বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ। পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা মুখে নিয়েই সে পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করে; সে পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায়, সাহায্যের প্রত্যাশী হয়। এ জন্যই বলতে হয়, প্রতিটি মানব শিশুই আজন্ম বিদ্রোহী।

কিন্তু এ তত্ত্ব আলোচনায় আমার কী লাভ! পৃথিবীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়ের সব কিছুইতো বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। সেই বিদ্রোহ তলিয়ে গেছে, ঘৃণার উন্মেষ তলিয়ে গেছে, স্নেহের পরশ তলিয়ে গেছে। পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলো ছাড়া এর কোনো কিছুই তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সেই আলো ফেলেই সেই ভীরু দৃষ্টির বিবরণকে খুঁজতে হয়, শ্রুতির সেই মৃদু শিহরণকে বুঝতে হয়। তবু সেই খোঁজা আর

বুঝার মধ্যে কি সব কিছু পাওয়া যায়! কীভাবে সেই ছবি আর ধ্বনি একত্র হয়েছে, কীভাবে তারা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্মৃতির সঞ্চয় গড়ে তুলেছে, তা কি তার পরিপূর্ণ বাস্তবতায় উদ্ধার করা সম্ভব? কিন্তু সম্ভব না হলেই বা কী করা যাবে; এক্ষেত্রে দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মিটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এমনিভাবে শুধু কি আমার জন্ম, আমার মধ্যে আমার মাতৃভাষার জন্ম আর নানাবিধ তাত্ত্বিক চেতনার উন্মেষের কথাওতো সবিস্তারে বলা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে এগুলি বিশ্লেষণ করা যায়, এগুলির উন্মেষ ও বিকাশের স্তর পরম্পরা অনুধাবন করা যায়; কিন্তু তখন তা ব্যক্তিগত উপলব্ধির সীমা ছাড়িয়ে শাস্ত্র হয়ে উঠে। তখন তাকে কিছুতেই আমার বলা যায় না, তা সকলের—সকল শিশুর সাধারণ সম্পদ।

এমনি করে ঊষার আলো আঁধারির মাঝে আমার জীবনের সহস্র দিবস রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এরপর ধীরে ধীরে উদিত হয়েছে চেতনার সূর্য। আর তার আলোতে আমি পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়েছি। সেই পরিবেশের নাম নেত্রকোণা শহর। উনিশ শ' তেত্রিশের নেত্রকোণা।

নেত্রকোণায় আমার শৈশব নিয়ে সেখানে থেকে প্রকাশিত 'সৃজনী' পত্রিকায় আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেছিলাম। অভিজ্ঞ পাঠকের কাছে তাতে কিছুটা ভুল ত্রুটি ধরা পড়েছে বলে আমি জানতে পেরেছি। এতে অবশ্যি লজ্জিত হবার কিছু নেই; কারণ ভুল হোক শুদ্ধ হোক, এ আমার অভিজ্ঞতার সম্পদ, আমার সঞ্চিত স্মৃতির পুনরুদ্ধার। একে শুদ্ধ করার জন্য আমি কার শরণাপন্ন হবো, কে আমাকে সেই সঠিক সংবাদ দিতে পারবে? অবশ্য ব্যাপারটি যদি ঐতিহাসিক কিছু হয়, তাহলে অবশ্যি শুধরে নিতে হবে। কারণ আমার শিশু সুলভ অভিজ্ঞতার মর্যাদা আমার কাছে যতোই থাকনা কেন, তা দিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করা যাবে না। সুতরাং পাট কোম্পানির কোনো বড়ো সাহেবকে যদি আমি আমার বর্ণনায় ডাক্তার সাহেব বলে উল্লেখ করে থাকি, তাতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়।

এমনি ভুল করার পিছনে একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও কাজ করে থাকতে পারে। কারণ আমার পিতাও একজন ইউনানী ডাক্তার অর্থাৎ হেকিম ছিলেন। সুতরাং তাঁর বন্ধুত্ব অন্য একজন ডাক্তারের সাথেই হবে, শৈশব স্মৃতি গ্রন্থনায় এমনি একটি অনুমান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এমনি করে সাদৃশ্যের অনুমান অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের জীবনে অদ্ভুত সব বিশ্বাস ও আচরণের সৃষ্টি করে থাকে। শৈশবেও সম্ভবত এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু সে কথা থাক্, আমার পিতার কথা বলি।

তিনি যদ্দূর মনে হয়, লোকাল বোর্ডের অধীনে ত্রিশ টাকা বেতনের হেকিম নিযুক্ত হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে তিনি হেকিমী পরীক্ষা পাশ করে আসেন। সনদপত্রে তাঁর একটি দীর্ঘ নাম লিখা রয়েছে,—'মৌলবী শেখ আবুল আছল আবদুল করিম কোরায়শী।' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'আবুল আছল' মূলতঃ তাঁর ডাক নামের

আরবি শব্দ রূপ, যার অর্থ হলো 'মধুর বাপ'। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি 'মধুর বাপ মৌলবী' নামেই পরিচিত ছিলেন।

তিনি মৌলবী তথা জমাতে উলা পাশ করেছিলেন ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা থেকে। এর আগে মঙ্গল বাড়িয়া মাদ্রাসাতেও লেখাপড়া করেছিলেন। শুনেছি, তিনি শূল বেদনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা করানোর জন্যই লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শুধু রোগ মুক্ত হননি, নিজেই রোগ মুক্তি ক্ষমতার সনদ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। এ কারণেই তার নিজের তৈরি যে কয়টি পেটেন্ট ওষুধ ছিলো, তার মধ্যে শূল বেদনার ওষুধটির বেশ প্রসার ছিলো; এর নাম ছিলো 'সর্বশূল গজসিংহ'। অন্যান্য ওষুধের নাম মনে না থাকলেও এ নামটি আমার স্মৃতিতে এখনও অক্ষয় হয়ে আছে।

এর কারণ শব্দটির ধ্বনি সম্পদ। শৈশবে এই ধ্বনির প্রভাব শিশু মনকে অদ্ভুত ভাবে আর্কষণ করে। তাছাড়া 'সফুফে মুরাক্কাব' বা 'মাজুনে আত্রিফল'-এর চাইতে এর মধ্যে একটা ভিন্নতর ধ্বনি মাধুর্য আছে। সম্ভবতঃ মাতৃভাষার সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই এই মাধুর্যকে এমন অবারিত করে তুলেছে। তদুপরি ওষুধের নামটিও মোটেই ইউনানী সুলভ নয়। এর মধ্যে একটা আয়ুর্বেদীয় গন্ধ আছে। এমনি গন্ধের একটা ব্যাপ্তি আমাদের পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেও ছিলো। এ কারণেই পিতাকে আমরা 'বাবা' আর মাকে 'মা' বলেই ডেকেছি। 'আব্বা' 'আম্মা' শব্দ দুটি ব্যবহারের কথা কেউ বলেন নি, আমরাও ব্যবহার করিনি। শব্দের মধ্যে হিন্দুয়ানী মুসলমানীর পার্থক্য সৃষ্টির কোনো উদ্যোগ আমাদের পরিবারে দেখিনি।

এর কারণ আমার বাবা আলেম হলেও গোঁড়া বলতে যা বুঝায়, তা তিনি ছিলেন না। তাঁর বন্ধু স্থানীয়দের মধ্যে অনেক হিন্দু ভদ্রলোকও ছিলেন, এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন ওমর খাইয়ামের দারুণ ভক্ত। আর আমার মা ছিলেন খাঁ পরিবারের মেয়ে। কয়েক পুরুষ আগে তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আমার মায়ের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো উগ্রতা কখনও দেখিনি। তাছাড়া আরও একটি ব্যাপার তাঁর মধ্যে ছিলো, যা দেখে আমরা বিস্ময় অনুভব করেছি। তিনি গরুর মাংস খেতেন না। শুধু আমাদের মা হবার পরে নয়, বরং শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর এই অভ্যাসটি বজায় রেখে গেছেন। অথচ আমাদের জন্য গরুর মাংস রান্না করতে তিনি কখনো অনীহা প্রকাশ করেননি। অনেক সময়ই আমরা এজন্য ঠাট্টা করে বলেছি, 'ইস্, কেঠো বামুনের মেয়ের তেজ কত!' শুনে মা শুধু হেসেছেন।

এমনি মা বাবার স্নেহের নীড়ে আমরা প্রতিপালিত হয়েছি। আর আমরা মানে আমার বড়ো ভাই গোলাম রাব্বানী ও আমি। তিনি আমার চাইতে সাত বছরের বড়ো। নেত্রকোণায় আমার শৈশব স্মৃতি যখন চেতনার সূর্যালোকে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে এসেছে, তখন তিনি আঞ্জুমান হাই স্কুলের ছাত্র। বয়সের ব্যবধান আমাকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। তবু আমার সাথীর অভাব হয়নি। দুষ্ট ছেলের সঙ্গীর অভাব কখনই বা হয়!

আমাদের বাসা তখন মোক্তার পাড়ায়। এক মোক্তার সাহেবের ভাড়াটে আমরা। দক্ষিণমুখী বাসার একটি দোচালা টিনের ঘরের কথাই বেশ স্পষ্টভাবে মনে পড়ছে। কারণ এই ঘরটি ছিলো বাবার বৈঠকখানা। আমার যথেচ্ছ আগমন নির্গমনের পথে এই ঘরটিকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে হতো। কারণ অনেক সময় তার মধ্য থেকে হুঙ্কার বেরিয়ে আসতো আর সঙ্গীদের সাথে আমার বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। কাজেই এই ঘরটি আমার চেতনায় এমন স্থায়ীভাবে তার আসন গেড়ে বসেছে।

কিন্তু ঘরের হুঙ্কার আমার বাইরের আকর্ষনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। সুযোগ পেলেই আমি বেরিয়ে পড়তাম। কখনো নদীর পাড়ে আর কখনও আঞ্জুমান হাই স্কুলের আশে-পাশে ছড়িয়ে থাকা বাদাম গাছগুলির নিচে ঘুরে বেড়াতাম। সেখানে উদার মুক্তির একটা স্পর্শ ছিলো। সেই মুক্তিকে দিগন্ত বিথারী আকাশ ছোঁয়া কী বিরাটই না তখন মনে হয়েছে। গাছপালা নদীনালা পথঘাট দালানকোঠা সব কিছুর মধ্যে যেনো একটা রহস্য লুকিয়ে আছে; ভয়ের চাইতে বিস্ময়ই তখন শিশুমনকে আকর্ষণ করেছে। তাই, যেদিন প্রথম কাজু বাদামের ফল ছেঁচে তার শাঁস মুখে দিলাম, সেদিনের সেই শিহরণ এখনও স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে আছে। তেমনি অক্ষয় হয়ে আছে কাঁচা আম বুক পকেটে রাখার ফলে বুকের মাঝে ফোস্কা পড়ে ঘা হবার একটি ঘটনা।

এমনি সব টুকরো টুকরো স্মৃতিকে একত্র করলে একটি কথাই বেরিয়ে আসে, তা হলো আমি চঞ্চল ছিলাম, দুষ্ট ছিলাম। ঘরের চাইতে বাইরের আকর্ষণই আমার কাছে বড়ো ছিলো। এ কারণেই ঘরের কথা আমার খুব একটা মনে নেই। শুধু বাবার বৈঠক খানার আড্ডা আমি দূর থেকে দেখেছি। এর সাথে একটি লোকের নাম মনে পড়ছে, মদনপুরের মঙ্গলার বাপ। আমাদের ভাড়াটে বাড়ির মালিক মোক্তার সাহেবের তিনি শ্বশুর। দীর্ঘ দেহী কৃষ্ণবর্ণ উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী এই লোকটির একটি স্পষ্ট প্রায় অবয়ব আমার স্মৃতিকে স্পর্শ করেছিলো।

আমাদের বাসার কাছেই তল্লা বাঁশের বেড়া দেয়া একটি টিনের দোচালা ঘরের মধ্যে একটি স্কুলের কথা আমার আবছা মনে পড়ছে। কিন্তু আমি সেই স্কুলে গিয়েছি কিনা তা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। এমন কি বাসায় বর্ণ পরিচয়ের কোনো উদ্যোগের কথাও আমার স্মৃতিতে নেই। এ সময়কার স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে বেড়ালে যে ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তা আমাদের বাসার সম্মুখে বাবার চোখের সামনেই ঘটেছিলো।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও আমি আমার ভোর বেলার ঘুরে বেড়ানোর কাজ শেষ করে বাসায় ফিরে আসছি, এমন সময় আমাদের বাসার সামনে একটা জটলার মতো দেখতে পেলাম। দেখলাম বাবাও সেই জটলার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই হাঁক ছাড়লেন, 'এই যে, এদিকে এসো।'

রীতিমতো শুদ্ধ সম্বোধন, স্বরে গাম্ভীর্য; কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম বৈকি! কিন্তু জটলার দিকেও একটা আকর্ষণ ছিলো, সেটাই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেলো। আর গিয়েই

ধরা পড়ে গেলাম। বাবা আমার হাত ধরে সেই জটলার মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে বসন্তের টিকা দেয়া হচ্ছিলো। এর আগে আমি কখনও টিকা নিইনি, তাই কিছুটা ভয় সংকোচ এসে আমাকে আড়ষ্ট করে তুললো। কিন্তু না নিয়ে উপায় নেই; অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত বাড়িয়ে দিতে হলো। বাম হাতের মাঝখানে চাকুর আগা দিয়ে কেটে তাতে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন টিকাদার ভদ্রলোক। এতো সহজে ব্যাপারটা ঘটে গেলো যে, আমি উচ্চবাচ্য করার সুযোগও পেলাম না। অনেকটা সুবোধ বালকের মতোই এই ব্যাপারটা মেনে নিলাম। কিন্তু রাতের বেলা হাত ফুলে বেশ জ্বর দেখা দিলো এবং বেশ কিছুদিন আমি শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম।

ইতিমধ্যে বাবা বাসা বদল করে গরু-হাটায় চলে এলেন। এখানে তখন একটা মসজিদ তৈরি হচ্ছিলো। সেই মসজিদের কাছেই রাস্তার ধারে টিনের একটি চৌচালা ঘরে আমাদের বাসা। এরই লাগোয়া কয়েকটি ঘরের পরেই ফাঁকা জায়গা। তারই পাশ দিয়ে রাস্তাটি উত্তর দিকে চলে গেছে। কিছুটা দূরে রাস্তার পশ্চিম পাশে একটি ছোট্ট ঘর দাঁড়িয়ে আছে। এরই পিছনে জঙ্গলে ভরা একটি গাঙ্গিনা। আরও কিছুটা দূরে গরু হাটার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক বটগাছ। মোক্তার পাড়ার মাঠের বাদাম গাছ বা নদীর পাড়ের মতো এর কোনোটাই আকর্ষণীয় নয়। কেমন একটা ভয় যেন সবখানে ছড়িয়ে আছে।

প্রথমে এই ভয়ের অনুভূতি নিয়ে এলো শিয়ালের হুক্কা হুয়া রব। আঁধার ঘনিয়ে এলে ওরা যেভাবে সমস্বরে চিৎকার করতে শুরু করতো, তাতে শিশুমন সংকুচিত না হয়ে পারতোনা। এর সাথে যখন জানতে পারলাম যে, রাস্তার পাশের ছোট্ট ঘরটি একটি লাশ কাটা ঘর আর ঐ প্রকাণ্ড বটগাছটি যতো সব ভূতের আড্ডাখানা, তখন মনের সেই সংকোচ ভাব দিনের বেলাও কাটতে চাইতো না। অনেকটা আড়ষ্ট হয়েই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতাম।

আমাদের শিশু মনে এমনি পরিবেশ আর নানা ধরনের উদ্ভট গল্প কথার মাধ্যমেই ভূতের ভয় এসে ঢুকে। মোক্তার-পাড়ায় থাকাকালে এ ধরনের কোনো অনুভূতি ছিলো না; কিন্তু এখানে এসে ভূতের সাথে পরিচিত হলাম। কারা, কীভাবে এই পরিচয়কে সম্ভব করে তুলেছিলো, তা আজ আর মনে নেই। শুধু ঐ সময়ে কারো মুখে এমন একটি গল্প শুনেছিলাম, যা আজ ভুলতে পারিনি।

কয়েকজন বন্ধুর মাঝে সাহস নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। তাদের মধ্যে কার সাহস সব চাইতে বেশি, সেটি পরীক্ষা করার জন্য এক বন্ধু প্রস্তাব করে বসলো যে, তাদের মধ্যে কেউ যদি রাত বারোটার পরে গরু-হাটার বট গাছের নিচে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট বস্তু পুঁতে রেখে আসতে পারে, তাহলে তাকে সবচেয়ে সাহসী বলে সবাই মেনে নেবে। কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া চাওয়ির পর এক বন্ধু সে প্রস্তাব মেনে নিলো।

সময়টা তখন ছিলো শীতকাল আর রাতটিও ছিলো বেশ অন্ধকার। সেই সাহসী বন্ধু গায়ে মাথায় চাদর জড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সেই বট গাছের নিচে পৌঁছে গেলো। সে

আপন মনে গাছের নিচে বসে মাটি খুঁড়তে লাগলো। কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ার গাছের পাতার শব্দ ছাড়া কোনো শব্দই সে শুনতে পেলো না। চারদিক চেয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন তার ছিলো না, সে তা করেওনি; কিন্তু এই উৎকর্ণ হয়ে থাকাকালেই কেমন একটা অস্বস্তি তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এর ফলে এই দারুণ শীতেও তার শরীর গরম হয়ে কপালে ঘাম দেখা দিলো। কিন্তু ইতিমধ্যে সে তার কাজ শেষ করে ফেলেছে। এবার ফিরে আসতে পারলেই হয়।

এমন সময় বটগাছের ওপাশে খ্‌ক খ্‌ক করে একটা শব্দ হলো। এতেই তার শরীরটা শিহরে উঠলো। তবু সে সটান উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করলো। হঠাৎ থেমে পড়তে হলো তাকে, কেউ তার চাদরের কোনা ধরে বুঝি হেঁচকা টান মেরেছে; আরেকটু হলেই পড়ে যেতো সে। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব তাকে ঘিরে ধরতে লাগলো। কিন্তু সে বুঝি মুহূর্তের জন্যই; পরবর্তী মুহূর্তে সে চাদর ফেলে দিয়ে আর্ত চিৎকার করতে করতে দৌড়তে আরম্ভ করলো। কিন্তু বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই লাশ কাটা ঘরের সামনে এসে রাস্তার উপর সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

তার বন্ধুরা তার জন্য অপেক্ষা করছিলো, তারা তার আর্ত চিৎকার শুনতে পেলো এবং এগিয়ে এসে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলো। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেলো না। নাকে মুখে রক্ত উঠে সে রাতেই সে মারা গেলো। সাহসের পরীক্ষা দিতে গিয়ে সে নিজের জীবনটাই দিয়ে বসলো।

পরদিন তার বন্ধুরা খুব ভোরেই সেই বট গাছের নিচে গিয়েছিলো। তারা দেখলো, সে যথার্থই সাহসের সাথে সেই নির্দিষ্ট বস্তুটা যথারীতি পুঁতে ফেলেছিলো। কিন্তু সেই সাথে নিজের চাদরের একটি কোনা যদি পুঁতে না ফেলতো, তা হলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটতো না।

এমনি ধরনের আরও অনেক মুখরোচক গল্পই হয়তো তখন শুনেছিলাম। কিন্তু অন্যগুলির মধ্যে এমন স্বাভাবিকত্বের আমেজ ছিলো না। সেখানে ভূত ভূতই থাকতো, তাকে ধরা, ছোঁয়ার মধ্যে আনা যেতো না। যেমন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নাঁকি সুরে মাছ চাওয়া কিংবা বিরাট আকৃতি নিয়ে রাস্তার দু'পাশে দু'পা ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা। এজন্যই সম্ভবত সেগুলির বিস্তারিত রূপ আর মনে নেই। তবু এ সবের ফলেই অতৃপ্ত আত্মার ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ানো একটি ধারণা মনের কোণে জমে উঠেছে। তাই লাশ কাটা ঘরের দিকে আমার ঔৎসুক্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছিলো। কারণ এখানে এমন সব লোকের লাশ এনে কাটা ছেঁড়া করা হয়, যারা অন্যের হাতে নিহত হয়েছে। তাই তাদের আত্মাও এই লাশ কাটা ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।

এরই টানে একদিন লাশকাটা ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। বাইরে বাধা দেবার কেউ ছিলো না। কিন্তু দরজায় পৌঁছতেই কেউ একজন খেঁকিয়ে উঠলো; তবু সেখানে দাঁড়াবার অনুমতি পেলাম। কারণ ডাক্তার সাহেবের সাথে বাবার পরিচয় ছিলো। তিনি

আমাকে চিনতে পেরে দরজায় দাঁড়াবার অনুমতি দিলেন। সেখান থেকে আমি টেবিলের উপর শোয়ানো লাশটি দেখতে পাচ্ছিলাম; কাটাকাটির ব্যাপারটিও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। এর ফলে মনের মধ্যে সেদিন কোন্ ভাবের উদয় হয়েছিলো তা আজ আর মনে নেই।

যেমন মনে নেই বাসার পাশের সেই নতুন মসজিদটিতে নামাজ পড়ার দৃশ্য দেখার ফলে কোনো চিন্তার কথা। বাবা এই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই মাঝে মধ্যে মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মুসুল্লীদের অজু থেকে আরম্ভ করে নামাজের পর হাত উঁচিয়ে দোয়া করা পর্যন্ত সব কিছু খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখতাম। এর মধ্যে চিন্তার কিছু ছিলো না, শুধু দেখার আনন্দটুকুই ছিলো। অথচ এর তুলনায় ভূতের ভয় কিন্তু মনকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়ে যেতো।

কিন্তু এই ভূতের ভয় বেশি দিন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারলো না। একদিন দেখলাম গরু-হাটার সেই ভূতুড়ে বটগাছ ঘেঁষে এক বিরাট তাবু টানানো হচ্ছে। তারপর সেখানে এমন সব জীবজন্তু এসে উপস্থিত হলো, যাদের কাছে ভূত হেরে গেলো। হারবেই; কারণ তখন সেখানে খাঁচার মধ্যে দুটো বড়ো বাঘ, বাইরে বাঁধা দুটো ছোট হাতী, একটি গরুর পিঠের উপর দুটি অতিরিক্ত পা নড়বড় করছে, কুলার মতো বড়ো একটা ব্যাঙ আর একটা বিরাট আকারের বাঁদর। এগুলির তামাশা দেখতে দেখতে শিশুমন তখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে; আহার নিদ্রার কথা প্রায় ভুলে গেছে।

একটা কথা ভাবতে অবাক লাগে যে, মোক্তার পাড়ায় বা গরু-হাটায় থাকাকালে পারিবারিক কোনো চিত্র আমার স্মৃতিতে স্থান পায়নি। এমন কি বড়ো ভাইয়ের কোনো আদর সোহাগ বা উৎপীড়নের কথাও আমি বেমালুম ভুলে গেছি। সব চাইতে অবাক লাগে যে, শোবার ব্যবস্থা বা রান্না ঘরের অবস্থার কোনো দৃশ্যই আমার মনে পড়ে না। শিশু মনস্তত্ত্বে হয়তো এর একটা কারণ আছে, কিন্তু সেটি আমার জানা নেই। অথচ এ তুলনায় পরবর্তী নলুয়া পাড়ার বাসায় আমার স্মৃতির বলয় অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে। সেখানে শুধু বাইরের ব্যাপার নয়, ঘরের কথাও আমি অনেক কিছু স্মরণ করতে পারি।

হ্যাঁ, বাবা আবার বাসা বদল করেছেন। এবার আমরা চলে এসেছি চন্দ্রনাথ হাই স্কুলের পূর্ব দিকে নদীর পাড়ের একটি চৌচালা টিনের ঘরে। ঘরটি বেশ লম্বা ও বড়ো। এর পশ্চিমের অংশে এসে আমরা ঠাঁই নিয়েছি। ইতিমধ্যে আমার কোনো কিছু মনে নেই। সে যখন আমার চেতনায় এসে ধরা দিয়েছে, তখন সে গুটি গুটি হাঁটতে পারে। আমার পিছু পিছু নদীর পাতে চলে আসে। নদী তখন শুকিয়ে গেছে, তবু তাকে পানিতে নামতে দিই না। নিচ থেকে কাপড় ভিজিয়ে এনে তার মাথায় উপর নিংড়ে তাকে গোছল করাই। এমনি একটি দৃশ্য আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে।

এ সময়ে কিছুটা অসুস্থতার কারণে, কিছুটা নতুন পরিবেশের কারণে কিছুটা চন্দ্রনাথ হাই স্কুলের ভর্তি হবার কারণে আমি ঘরকুনো হয়ে পড়েছিলাম। এর ফলে বাবার ওষুধ তৈরি আর ওষুধের আলমারী এ দুটি সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়ে উঠলাম।

মিষ্টির প্রতি আমার দারুণ লোভ ছিলো। তারই টানে বাবার ওষুধের আলমারীতে একটা মিষ্টি ওষুধ আবিষ্কার করে ফেললাম। তারপর সেটি সাবাড় করতে আমার খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। বাবার কাছে আমার এই চৌর্যবৃত্তি যথা সময়ে ধরা পড়লো; কিন্তু করার কিছু নেই, ওষুধ তখন আমার পেটের ভিতরে। সুতরাং আমাকে শাস্তি দেবার পরিবর্তে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই এর কারণ টের পাওয়া গেলো। আমার পা দুটি হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ফোস্কায় ফোস্কায় ভরে গিয়ে পচতে আরম্ভ করলো। নানা ধরনের ওষুধ লাগিয়ে বাবা সেই পচন রোধ করলেন। এ নাকি ছিলো মন্দের ভালো, তা না হলে সারা শরীরে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারতো। অন্যদিকে এর ফলে আমার স্বাস্থ্য এতোটা ভালো হয়ে গেলো যে, গায়ে কোনো কাপড় রাখা আমার কাছে অস্বস্তিকর মনে হতে লাগলো। সুতরাং জন্মের সাজে ঘুরে বেড়ানোতে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম।

স্বাস্থ্যের এ প্রকার উন্নতির কারণেই হয়তো অঘটন ঘটিয়েও মিষ্টির লোভ আমার দূর হয়নি। সুযোগ পেলেই আমি বাবার সাথে মেছুয়া বাজারের আমানত মিয়ার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হতাম। সেখান থেকেই আমাদের সংসারে সমস্ত জিনিসপত্র আসতো। সেই দোকানের একটা অংশে বাতাসা, গুড়, কদমা ইত্যাদি মিষ্টি দ্রব্য থরে থরে সাজানো থাকতো। আমার দৃষ্টিও থাকতো সেই দিকে এবং আমানত মিয়ার স্নেহের ফলে তার কিছুটা আমি প্রতিবারই পেতাম। কিন্তু আমার তাতে তৃপ্তি হতো না। এমনি অতৃপ্তির প্রকাশ দেখে, আমার মনে পড়ে আমানত মিয়া আমাকে একদিন বাতাসা ভর্তি ঝাঁকার কাছে বসিয়ে দিয়েছিলেন আর আমি সেদিন পেট পুরে বাতাসা খেয়েছিলাম।

আমানত মিয়ার বাড়ি ছিলো সম্ভবত. কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে। বাবার সাথে তাঁর পরিচয়ের ইতিহাস জানি না, কিন্তু তিনি যে বাবার একজন ভক্ত ছিলেন, তা বুঝতে পারি। এ কারণেই শুধু একটি লোভী ছেলের লোভ মেটানো নয়, আমাদের সংসারের অনেক অভাবও তিনি মিটিয়েছিলেন। আমানত মিয়া আজ আর নেই। তাঁর সেই দোকানটিও কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেছে। কিছুদিন পূর্বে সেই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ও কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতেও কেমন সংকোচবোধ করেছি। সেই মিষ্টির অসাধারণ লোভের কথা মনে হওয়াতেই এই সংকোচ; যেন আজও আমি সেই মিষ্টির লোভেই সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আজ ভিন্ন কথা বলতে পারতাম, বলতে পারতাম যে, সেই মিষ্টিলোভী ছেলেটির মিষ্টির লোভ আর নেই। কিন্তু কাকে বলবো, আমানত মিয়া যে নেই!

নেই আরও অনেকেই। সাবান মিয়া নেই, বেগুন মিয়া নেই, কামিনী ফুফু নেই, টুনি নামের সেই চাকরাণী মেয়েটি নেই, গুলজার মিস্ত্রীর বাড়ির আমার সেই শৈশব সহচরী মেয়েটি নেই। সবাই হারিয়ে গেছে; কেউ পরপারে, কেউ জনারণ্যে। শুধু স্মৃতির একটি অস্পষ্ট আবেগ জড়িয়ে আছে আমার চেতনায়।

চন্দ্রনাথ হাইস্কুলে ভর্তি হলেও আমি বড়ো বেশি স্কুল পালাতাম। নলুয়া পাড়ার এই নতুন পরিবেশের সাথে কিছুটা পরিচয় হবার পরই এর সীমাবদ্ধতা আমাকে পীড়া দিতে

লাগলো। এখানে মোক্তার পাড়ার সেই উদার মাঠ নেই, গরু-হাটার সেই ভূতের ভয়ও নেই; এখানে বাসার সামনেই নদী আর সেই নদীর পাড় ঘেষেঁ একটি রাস্তা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলে গেছে। মোক্তার পাড়াতে থাকতেই নদীর সাথে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এখানকার এই নদীতে মোটেও আকর্ষণের কিছু নেই। এটি কূলে কূলে ভরাও নয়, এতে পাল দেয়া নৌকারও আনাগোনা নেই, কেমন যেনো সে ঘুমিয়ে আছে। এ কারণেই শিশুমনকে সে ধরে রাখতে পারেনি।

তাই মোক্তার পাড়ার সেই উদার মাঠ আর বাদাম গাছ, গরুহাটার সেই লাশ কাটা ঘর আর বটগাছ আমার মনে পড়তে লাগলো এবং আমি স্কুল পালিয়ে কাপড় বই বগল দাবা করে জন্মের সাজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দু'চার দিনেই রাস্তাঘাট মোটামুটি রপ্ত হয়ে গেলো। কাজেই আমার সাহসও বাড়লো আর ঘুরে বেড়ানোও নিয়মিত হয়ে উঠলো। এর জন্য বাবার কাছে যেমন শাস্তি পেয়েছি, তেমনি আমাকে খুঁজে আনার জন্য তিনি লোকও পাঠিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই আমার ঘুরে বেড়ানো অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেনি।

মনে পড়ে এমনি ঘুরে বেড়ানোর সময় মেছুয়া বাজারের কাছে জলের কলে পানি খেতে গিয়ে আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। এর ফলে কলের হাতলের সাথে লেগে আমার ডান ভুরুর অনেকটা কেটে যায় এবং রক্তে মুখ ও বুক ভেসে যেতে থাকে। পরিচিতি দু'জন লোক আমাকে ধরাধরি করে বাসায় দিয়ে যায়। মোক্তার-পাড়ার সেই টিকার দাগের মতো এই কাটার দাগটিও আমার ডান ভুরুতে অক্ষয় হয়ে আছে। পাসপোর্ট করার সময় এটি খুব কাজে লাগে। স্মৃতির চাইতে এর স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

কিন্তু বাবার ভর্ৎসনা যে কাজ করতে পারেনি, সে কাজ করলো বর্ষকাল। বৃষ্টির ফলে আমার যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানো অনেকাংশে কমে গেলো। এর বদলে বৃষ্টিতে ভিজা আর কাদা পানিতে গড়াগড়ি দেয়া বেড়ে গেলো। ছোট ছোট শিশি নিয়ে আমি বৃষ্টিতে নামতাম আর শিশিতে পানি ভরতাম ও ঢালতাম। বাবার ওষুধখানার একটা অনুকরণ এভাবে আমার খেলার বিষয় হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সব সময়তো বৃষ্টি থাকতো না, তখন?

তখনো বাইরে ঘুরে বেড়াতে যেতাম না। কারণ এমনিতে কাদা পানিতে গড়াগড়ি, দিলেও রাস্তার কাদা পানি আমার ভালো লাগতো না। নেত্রকোণার রাস্তাঘাট তখন কাঁচা-ই ছিলো। বৃষ্টি পড়তে না পড়তেই তা কাঁদা পানিতে পিচ্ছিল হয়ে উঠতো। তাছাড়া এ সময়ে কি আমার বোধে চেতনার কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিলো? তা না হলে বাসার সামনে রাস্তার ধারের কাঁঠাল গাছটির তলে গিয়ে বসতাম কেন! সেখানে বসে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতাম নদীর ওপাড়ের গাছ গাছড়ার দিকে। তার মধ্যে একটি কদম গাছ আমার সমস্ত দৃষ্টি কেড়ে নিতো!

নদী তখন প্রায় কূলে কূলে ভরে এসেছে। ওপাড়ের গাছপালা যেন সেই টলমলে জলের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের চেহারা ছবি দেখে নিচ্ছে। ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সেই কদম গাছটি একটি বিরাট ছাতার মতো আর তার মাঝে ফুটে আছে অজস্র কদম

ফুল। সমস্ত পরিবেশটা যেন তার সেই গর্বিত ভঙ্গিতে শিওরে উঠছে। আমি এক অবাক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকতাম তার এই বিরাট ঐশ্বর্যের দিকে। মনে তখন কী ভাবের উদয় হতো কে জানে! ভাষার সাথে তখনতো মোটামুটি পরিচয় হয়েছে, তাই কোনো ভাবের স্পর্শে শিশুমন কি তখন কদম ফুলের মতো শিওরে উঠেনি! কে জানে, স্মৃতির ভাণ্ডারে এর কোনো কিছুইতো স্পষ্টভাবে সঞ্চিত হয়নি।

কিন্তু কদম গাছের চাইতেও আকর্ষণীয় ব্যাপার তখন নদীতে এসে জড়ো হয়েছে। নলুয়ারা নল বাঁশের অনেক চালি এনে বেঁধেছে ঘাটে। সেগুলিতে উঠা যায় আর যথেচ্ছ নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। বাধা দেবার কেউ নেই। তেমনি সাঁতার জানি বলে ভয়েরও কিছু নেই। সুতরাং আমরা এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিলাম না। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নদীর জলকে তোলপাড় করে তুললাম। কিন্তু এর মধ্যেই একদিন বিপত্তি ঘটে গেলো। প্রাণান্তকর সেই বিপত্তির স্মৃতি আজো সমস্ত চেতনায় এক অদ্ভুত শীতলতা ছড়িয়ে দেয়।

সেদিনও আমরা কয়েকজন বালক এমনি চালি থেকে ঝাঁপিয়ে নদীতে পড়া আর সাঁতরে এসে আবার চালিতে উঠার কসরত করছি, এরই এক ফাঁকে স্রোতের টানে আমি চলে গেলাম চালির নিচে। চালির সাথে চালি বেঁধে পুরো এলাকাটি ঘেরা। আমি এরই নিচে স্রোতের টানে খাবি খাচ্ছি, ভাসবার কোনো সুযোগই পাচ্ছি না। ক্রমশ শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে, দম ছেড়ে দেয়ার ফলে পেটের মধ্যে পানিও ঢুকছে। সমস্ত চেতনা কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। এমন সময় প্রায় বিনা চেষ্টাতেই আমার মাথাটি একটি ফোঁকর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। আমি প্রাণপণে চালি আঁকড়ে ধরে শ্বাস নিলাম।

আমার সাথীরা আমার অন্তর্ধান দেখে ভয়ে সবাই চালির উপর জড়ো হয়ে হৈ চৈ করছিলো। সহজেই তারা আমার মাথাটি আবিষ্কার করে সেই ফোঁকর দিয়ে অনেক কষ্টে আমাকে টেনে বের করলো। এদের হৈচৈ শুনে পথচারী যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, তাদেরই কেউ একজন এসে আমাকে মাথায় তুলে ঘোরাতে আরম্ভ করলো। এর ফলে কিছু পানি আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো। এরপর সেই লোকটিই আমাকে বাসায় দিয়ে গেলো।

মৃত্যুর সাথে এমনি সাক্ষাত পরিচয়ের ধাক্কা সামলাতে বেশ কয়েক দিন আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হলো। নদীর সাথে যে মিতালী গড়ে উঠেছিলো, বাঁশের চালি এসে তার মধ্যে একটা ছেদ টেনে দিলো। কেমন একটা আড়ষ্টতা আমাকে শুধু বাঁশের চালি নয়, নদীর বুকে নামতেও বাধা দিতো। যদ্দূর মনে হয়, এমনি সময়ে একবার নৌকা করে কাউরাট মাতুলালয়ে যাবার সুযোগ ঘটেছিলো। পথের কথা প্রায় কিছুই মনে নেই, শুধু রাতের বেলা ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছ গাছালি কেটে অতিকষ্টে নৌকার এগিয়ে যাওয়ার কথা মনে আছে। নৌকার সামনে ছইধরে দাঁড়িয়ে হারিকেনের আলোতে আমি সেই দৃশ্য দেখে খুবই অশ্বস্তি অনুভব করেছিলাম।

এভাবে নদী ও নৌকা দুটোর প্রতিই আমার মনে একটা সাময়িক বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিলো। এর ফল অবশ্যি ভালোই হলো, আমি স্কুলে যাওয়া ও লেখাপড়ায় মনোযোগী হলাম। বাবা আমার মনোযোগ দেখে আমার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম কী, বাড়ি কোথায় কিছুই আমি জানি না, তবে তিনি যে শ্যামলা বর্ণের মোটাসোটা ও ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন, তা মনে পড়ছে এবং আমাদের বাসার সামনের বারান্দায় বসে আমি তাঁর নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করছি, এমন একটি দৃশ্যও স্মরণ করতে পারছি।

কিন্তু এতেও আমার পাঠোন্নতি তেমন কিছু হলো না। এর ফলে স্কুল পালানো আবার আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। কারণ চন্দ্রনাথ হাই স্কুলের স্মৃতি মোটেও সুখকর কিছু ছিলো না। এই স্কুলের উত্তর দিকের একটি কক্ষের কথা মনে পড়ছে এবং সেখানে বেঞ্চিতে বসা অপেক্ষা 'নীল ডাউন' হয়ে থাকার সাথেই আমার স্মৃতি অধিকতর সম্পৃক্ত। প্রায়ই এ ব্যাপারটি ঘটতো, পড়া না শেখার জন্য হাটুর নিচে কাঁকর দিয়ে দু'হাতে দু'কান ধরে আমাকে সংসাজতে হতো। এর ফলে যতো না কষ্ট পেতাম, তার চাইতে বেশি পেতাম লজ্জা। তাই আবার স্কুল পালাতে লাগলাম।

সাথীও জুটে গেলো। আমাদের বাসার পূর্ব দিকেই থাকতো গুলজার মিস্ত্রী নামে এক লোক। তার ভাড়াটেও ছিলো অনেক। গুলজার মিস্ত্রী কিংবা ওদেরই কারোর এক মেয়ে আমার খেলার সঙ্গিণী হয়ে উঠলো। আমাদের বাসার পশ্চিম দিকের খালি জায়গাটাতে এক লোক বেগুন ক্ষেত করতো। তার নাম ধাম কিছুই আমরা জানতাম না। আমরাই তার নাম দিয়েছিলাম 'বেগুন মিয়া'। সে তার ক্ষেতের পাশেই একটি খড়ো ঘরে থাকতো। অনেক সময়েই সেটা খালি থাকতো বলে স্কুল পালিয়ে আমরা সেখানে এসে ঠাঁই নিতাম। অনেক দিন ঝাঁকা নিয়ে বেগুন মিয়া এসে উপস্থিত হতো। আর আমরা তা টের পেয়ে ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেগুন ক্ষেতে গিয়ে পালাতাম। সে দেখেও কিছু বলতো না।

এমনি অন্য একটি লুকিয়ে থাকার স্থান ছিলো সাবান মিয়ার কারখানা। গুলজার মিস্ত্রীর পূর্বের বাসাটিতেই এক ভদ্রলোক সাবান তৈরির কারখানা খুলেছিলেন। তারও নাম ধাম আমরা জানতাম না। আমরা তার নামকরণ করে নিয়েছিলাম 'সাবান মিয়া' বলে। কারখানটি তখন কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। দিনরাত তালাবদ্ধই থাকতো। আমরা ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে টিনের সেই চৌচালা ঘরটির মধ্যে ঢুকে পড়তাম। মনে পড়ছে। একদিন বড়ো ভাই সেখানে আমাদেরকে আবিষ্কার করে অনেক কষ্টে বের করে এনেছিলো।

স্কুল পালানোর আর এমনি লুকিয়ে বেড়ানোর জন্য অনেক শাস্তিই আমাকে ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু আজ অবাক হয়ে ভাবি, সেই মেয়েটিও আমার নির্জন বাসের সঙ্গিণী হয়ে আমার সমান বা তার চাইতেও বেশি শাস্তিভোগ করেছে কিসের টানে! সেতো তখন স্কুলে ভর্তি হয়নি, তার স্কুল পালানোর কোনো দরকার ছিলো না, তবু

আমার সাহচর্য সে ত্যাগ করতে পারেনি। অথচ আমি তার নামটি পর্যন্ত মনে রাখতে পারিনি। হয়তো এমনি লুকিয়ে থাকার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ ছিলো, তারই আকর্ষণ সে এড়াতে পারেনি। এমনি আকর্ষণেই হয়তো ছেলেমেয়েরা 'পলাগুঞ্জি' খেলা খেলে থাকে।

কিন্তু আমার লুকিয়ে বেড়ানোর মধ্যে খেলার চাইতে দুষ্টামির পরিমাণ ছিলো অনেকগুণ বেশি। এ কারণেই তজ্জন্য অভিভাবকরা শাস্তি দিয়েছেন। তবু এর আকর্ষণ আমি ত্যাগ করতে পারিনি। হঠাৎ এমনি সময়ে ভিন্নতর একটি আকর্ষণ এসে আমার সেই দুষ্টামি ভুলিয়ে দিলো। সময়টা বোধ হয় উনিশ'শ পঁয়ত্রিশের প্রথমার্ধ হবে। কোনো কারণে তখন দেশ ব্যাপী একটা আন্দোলন চলছিলো। তার ঢেউ এসে লেগেছিলো নেত্রকোণাতেও। একদিন দেখলাম, আমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে অনেক লোক সারি বেঁধে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা কিসের জন্য চিৎকার করছিলো আর চিৎকার করে কীই বা বলছিলো, তা আমার জানা বা বুঝার কথা নয়, তবু তাদের উত্তেজনা আমার মধ্যে সংক্রমিত হলো এবং আমি তাদের সাথে সাথে কিছুদূর এগিয়েও গেলাম। তারপর ফিরে এলাম একটি মাত্র শব্দ নিয়ে—'বন্দে মাতরম'।

শব্দটির কী অর্থ, কী তাৎপর্য কিছুই আমি জানি না; শুধু এর ধ্বনি মাধুর্য আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করেছিলো। এ কারণেই সময় পেলেই আমি হাত পা নেড়ে উচ্চ কণ্ঠে সেই শব্দটি উচ্চারণ করতাম আর তার ধ্বনির অনুরণনের মধ্যে কেমন একটা আস্বাদ লাভ করতাম। এও এক ধরনের খেলা, ধ্বনি নিয়ে খেলা, সেই খেলায় আমি মেতে গেলাম। কিন্তু আমি জানতাম না যে, এ শব্দটি উচ্চারণ করা তখন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটি জানতে পারলাম।

আমাদের বাসায় এক পুলিশ ভদ্রলোক আসতেন। আমাদের সাথে তার পরিচয় কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো; তার নাম ধাম না জানলেও তাকে আমি চিনতাম। একদিন সকালের দিকে তিনি এসে দেখলেন, আমি বাসার সামনে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে সেই নিষিদ্ধ শব্দটি উচ্চারণ করছি। তিনি সস্নেহে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'উহুঁ, এ কথা বলে না!

আমি ঘাড় উল্টিয়ে বললাম, 'কেন, বললে কী হবে?

তিনি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, 'ধরে জেলে নিয়ে যায়!'

আমি ঠোঁট উল্টিয়ে বললাম, 'আমিও জেলেই যাবো।'

আসলে জেল কাকে বলে, আর সেখানে গেলে কী ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়, তার কিছুই আমি জানি না। তাই জেলের ভয় আমার থাকার কথা নয়। ভদ্রলোকও সেটা বুঝেছিলেন। তাই আমাকে বুঝাবার চেষ্টা ত্যাগ করে তিনি বাসার ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন এবং কিছুক্ষণ পড়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'চলো আমি তোমাকে জেলে নিয়ে যাবো'। আমিও তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম।

সেই আমার খেলা খেলা জেলে যাওয়া। ভদ্রলোক সত্যি আমার হাত ধরে মেছুয়া বাজারের পাশের সেই পরিচিত পথ দিয়ে বাঁ দিকে এগিয়ে গিয়ে ডান ধারের একটি দালানের সামনে দাঁড়ালেন। এ পথে আমি বহুবার গিয়েছি, এই দালানটিও দেখেছি, কিন্তু এটিই যে জেলখানা তা এর আগে জানাতাম না। এবার শুধু জানলাম না, সেই পুলিশ ভদ্রলোকের হাত ধরে তার ভিতরেও প্রবেশ করলাম। তিনি এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে আমাকে সব কিছুই দেখালেন, কয়েদীদের কথাও হয়তো আমাকে বললেন। কিন্তু আমার সে সব মূল্যবান কথার কিছুই মনে নেই।

যাহোক, কিছুক্ষণ পরে আমি সেই ভদ্রলোকের হাত ধরেই জেলখানার বাইরে চলে এলাম। সামনের চত্বরে এসে তিনি আমাকে বললেন, 'জেলে যাওয়াতো তোমার হলো; এখন বলো, কী খাবে?

আমি বিনা দ্বিধায় বললাম 'কাঁঠাল'!

তিনি যেন আকাশ থেকে পড়ে বললেন,'এখানে কাঁঠাল কোথায়!'

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে তাঁর হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নদীর পাড়ে দেখিয়ে দিলাম একটি লোক বসে বসে কাঁঠাল বিক্রি করছে। আসবার সময় আমি তা লক্ষ্য করেছিলাম। সুতরাং পুলিশ ভদ্রলোক আমাকে একটি ছোট কাঁঠাল কিনে দিতে বাধ্য হলেন এবং কাঁঠালসহ আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবার জন্য উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু আমি নাছোড়-বান্দা সেখানে বসেই খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। অগত্যা আমাকে তিনি কাঁঠালসহ জেলখানার সামনের চত্বরে বসিয়ে দিয়ে নিজের কোনো কাজে জেলখানার ভিতরে চলে গেলেন। আর এ দিকে আমি কাঁঠাল ভেঙ্গে একটি দুটি কোষ মুখে দিতে না দিতেই কোত্থেকে দুটি কাক এসে জুটলো। আমি এক হাতে কাঁঠালের কোষ মুখে দিচ্ছি আর অন্য হাতে কাক তাড়াচ্ছি—এ দৃশ্যটি আজও ভুলতে পারিনি। অভিনবত্বের জন্যই এটি সম্ভবতঃ মনের মধ্যে দাগ কেটে বসেছে।

সে যাহোক, বন্দে-মাতরম নাম জপ করে জেলে যাওয়ার ফলে কিংবা বড়ো ভাইয়ের কিছুটা সস্নেহ সমাদরের ফলে আমি আবার স্কুলে যাবার ব্যাপারে নিয়মিত হয়ে উঠলাম। সমাদরের ব্যাপারটি বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করছি এ কারণে যে, একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি তার প্রথম পরিচয় পেলাম। স্কুলেরই দু-তিনজন সহপাঠীর সাথে আমি তখন মার্বেল খেলা রপ্ত করছি। একদিন চন্দ্রনাথ হাই স্কুলের দক্ষিণ পূর্ব কোণায় একটি বড়ো কদম গাছের তলায় আমরা মার্বেল খেলছি, হঠাৎ কী নিয়ে এক জনের সাথে ঝগড়া লেগে গেলো। সে আমার মার্বেলগুলি ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে ধাক্কা মারলো। আমি পড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম। বড়ো ভাই হয়তো আশে পাশে কোথাও ছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে সেই ছেলেটিকে তাড়া করলেন। সে ভয় পেয়ে চিৎকার করে দৌঁড়াতে লাগলো। কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই শেষ হলো না, সেই ছেলের বড়ো ভাইয়ের সাথে হাতাহাতি হবার যোগাড় হলো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছুই

লক্ষ্য করলাম এবং ভাইয়ের প্রতি দরদ বস্তুটি যে কী, তা যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

এমনি দরদের সূত্র ধরেই বড়ো ভাই আমাকে একদিন সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। বড়ো পুকুরের পাড়ের এই ঘরটির সামনে দিয়ে আমি অনেক-বারই হেঁটে গিয়েছি, কিন্তু এখানেই যে এমন সব ব্যাপার আছে তা এর আগে জানতে পারিনি। সেদিন যে ছবিটি সেখানে দেখেছিলাম, তার নাম চাঁদ সদাগর, কিন্তু নির্বাক। শিরোনাম দিয়ে তখন ছবির দৃশ্যপট বুঝানো হতো। অন্যসব ঘটনা বা দৃশ্যের কিছুই আমার মনে পড়ছে না, শুধু ঝড়ের কবলে পড়ে চাঁদের পাল তোলা ডিঙ্গা একটির পর একটি ডুবে যাচ্ছে, এ দৃশ্যটি স্মৃতির ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে আমাদের পরিবারে তৃতীয় ভ্রাতার আগমন ঘটেছে। নলুয়া পাড়ার বাসাতে তার জন্ম। মুহূর্তের আবেগ ও আশংকা দুটোই আমার স্মৃতিতে ধরা পড়েছিলো। তার নাম ছিলো গোলাম কিবরিয়া, সে আজ আর নেই। কিন্তু তার জন্মের সময় আমি আমার ছোট বোন রাহেলাকে যেভাবে আগলে বেড়িয়েছি যেভাবে তাকে মায়ের কাছে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছি, তার অনেক কিছুই মনে করতে পারছি। কারণ মা তখন বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন।

এ সময় আমাদের ভাত রাধা ও দেখা শোনার দায়িত্ব নিয়েছিলো যে মেয়েটি, তার নাম টুনি। সে কামিনী ফুফুর ওখানে কাজ করতো। তিনিই আমাদের অসুবিধা দেখে তাকে পাঠিয়েছিলেন। সে ভাত রাধার বেলা নানা রকম গল্প বলতো। তার কাছেই শুনেছিলাম যে, নলুয়া পাড়াতেও নাকি ভূত পেত্নী আছে।

তার হাসি হাসি মুখের গল্প শোনার জন্য আমি তার ভক্ত হয়ে গেলাম। এজন্য সময় পেলেই আমি তার সাথে কামিনী ফুফুর ওখানে গিয়ে উপস্থিত হতাম।

তিনি আমাদের পাতানো ফুফু ছিলেন। বাবাকে তিনি ধর্মের ভাই বলে ডেকে ছিলেন। বাবা ও অন্যান্য সকলে তাকে তারার মা বলে ডাকতেন। কিন্তু কলসির কাণায়, পানের বাটায়, থালা গেলাসে আমি 'কামিনী' নাম লেখা দেখেছি। পাকা মেঝের একটি বারান্দাওয়ালা চৌচালা টিনের ঘরের মাঝে খাট-পালঙ্কের সাথে এসব জিনিসপত্র ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে সাজানো থাকতো। কিন্তু কামিনী ফুফুর ওখানে যে বস্তুটি আমাকে সব চাইতে বেশি আকর্ষণ করতো, তা হলো নানা ধরনের আচার। আম, জলপাই, চোকাই ইত্যাকার টক ফল দিয়ে তিনি বিচিত্র আচার তৈরি করতেন। বিশেষ করে বৈয়ম ভর্তি তেলে ডুবানো তাঁর জলপাইয়ের আচারের স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে।

কামিনী ফুফু এক সময়ে সত্যিই'কামিনী' ছিলেন। হয়তো এটিও তাঁর সঠিক নাম নয়। কারণ যে পাড়ায় তিনি থাকতেন, সেখানে সবাই নতুন নাম ব্যবহার করে, কামিনী হয়তো তার এমনি একটি নাম। তাঁর এই নামে শুধু নয়, তার রূপে ও ব্যবহারে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ছিলো। তারই জালে ধরা পড়েছিলেন বাবার ভক্ত এক কেরাণী। শেষ

পর্যন্ত সেই কেরাণীর সাথে তিনি বেশ্যা পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। শুনেছি, বাবার কাছেই নাকি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কামিনী ফুফু সেই কেরাণী সাহেবকে বিয়ে করেছিলেন। এই সূত্রে বাবাকে ধর্মের ভাইও ডেকেছিলেন। বাবার আশ্রয় না পেলে তাঁর এই নতুন জীবন লাভ হয়তো সম্ভব হতো না। এজন্য তাঁর একটি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতাবোধ ছিলো।

কিন্তু আমার ফুফা কেরাণীটির নাম খুব ভালো করে মনে নেই, খুব সম্ভব ওয়াজেদ আলী। তার বাড়ি বোধ হয় নেত্রকোণা থেকে বেশ কিছুটা দূরে আমাদের বাসার পাশ দিয়ে যে নদীটি বয়ে গেছে, তারই পাড়ে কোথাও ছিলো। কারণ তার বিয়ে উপলক্ষেই আমরা নৌকা করে, যদ্দূর মনে পড়ছে, তাঁর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। অন্য আর কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে, সেই নৌকায় চোঙ্গওয়ালা একটা গ্রামোফোন বাজছিলো। এক সময় সেটার স্প্রিং ছিঁড়ে গিয়ে থেমে যায় আর আমি কৌতূহলী হয়ে সেই স্প্রিংটি নদীতে পড়ে গেলো কিনা জিজ্ঞাসা করায় সবাই হেসে উঠেছিলো। আর আমি সাথে সাথেই আমার বোকামি বুঝতে পেরে গুটিয়ে গিয়েছিলাম।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বোকামির কথা মনে পড়ছে, যা এতো তাড়াতাড়ি আমি তখন বুঝতে পারিনি। তখন শীতকাল এবং রমজান মাস। বাসার সবার সাথে আমি সেহরী খাবার জন্য উঠে পড়লাম। বাবা আদর করে মাদুরের উপর কাঁথা বিছিয়ে আমাকে তাঁর কাছে বসালেন। সবার সামনে থালায় বাটিতে ভাত তরকারী এনে দেয়া হলো, আমার সামনেও তাই। কিন্তু আমি বেঁকে বসলাম আমি এসব খাবো না, আমি সেহরী খাবো। বাবা আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এসব খাওয়াই সেহরী খাওয়া। আমি নাছোড়-বান্দা, নাঁকি সুরে সেহরীর জন্য কাঁদতে আরম্ভ করলাম। শেষ পর্যন্ত মা এসে উদ্ধার করলেন। তিনি একটা চামচে করে কিছু ঠাণ্ডা পানি এনে বললেন, 'নে, সেহরী খা'। আমি সেই ঠাণ্ডা পানি খেয়ে ঠাণ্ডা হলাম। এরপর আর সেহরী খাবার জন্য আবদার জানাইনি। কারণ একবার খেয়েই বুঝেছিলাম যে, ও বস্তুটিতে কোনো স্বাদ নেই।

সে যা হোক, কিন্তু কামিনী কি তারার মা হয়ে সুখী হয়েছিলেন? এ প্রশ্ন অবশ্যি আমার শিশু কালের নয়, পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলো ফেলেই এ প্রশ্নের উদ্ভব সেখানে ঘটতে পারে। এজন্যই তাঁকে দেখেছি—একাকিনী সঙ্গীহীনা। সেই ওয়াজেদ আলী সাহেবকে সেখানে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এমন কি বাবার উপস্থিতিও আমার স্মৃতিতে নেই। সম্ভবতঃ মা, বাবার এই পরোপকারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এজন্য তারার মা ফুফুও আমাদের বাসায় গিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। যখনি গিয়েছি, তাঁকে দেখেছি একা; নিজের কাজ নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত।

আমারতো মনে হয়, আমাদের সামাজিক পরিবেশে পাড়ার (বেশ্যালয়ের) মেয়েদের প্রতি যে ঘৃণা বিরাজ করে, তার মধ্যে অবস্থিত অবজ্ঞার প্রাচীর কামিনী ফুফু অতিক্রম করতে পারেননি। ভাবটাতো এমনি 'বের হয়ে এসেছো, ভালোভাবে থাকো,

ঘর সংসার করো, কিন্তু সমাজে মিশতে এসো না। এমনি একটা অসহায় অবস্থার প্রতি সহানুভূতির কারণেই কিনা জানি না, তখন থেকেই তাঁর স্মৃতি আমার মনকে নাড়া দিয়েছে। এর সাথে মিশে রয়েছে তাঁর অমায়িক স্নেহ ও আচারের স্বাদ।

এরই টানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি তারার মা ফুফুর ব্যাপারটি নিয়ে একটি গল্প লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। একজন বাল্য বিধবার গৃহত্যাগের কাহিনী অত্যন্ত দরদ ভরা ভাষায় আমি আঁকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার প্রচেষ্টা খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। অনভিজ্ঞতার ছোঁয়া আমার সকল বক্তব্যকেই আবেগ সর্বস্ব করে তুলেছিলো। পরবর্তীকালেই সেই খসড়া পাণ্ডুলিপিটিও হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেই আবেগটি এখনও আছে।

এই আবেগের টানেই একবার কাউরাট যাবার সময় নেত্রকোণা পৌঁছে তাঁর খোঁজ করেছিলাম। তখন বর্ষাকাল। লঞ্চ ছাড়ার বেশ কিছুটা দেরী। এই অবকাশে স্মৃতির ঠিকানা হাতড়ে আমি কামিনী ফুফুর খোঁজ করতে গেলাম এবং কিছুটা কষ্ট করে তাঁর দেখাও পেলাম। কিন্তু সাদা থান পরিহিতা কংকালসার সেই মহিলাকে দেখে কিছুতেই কামিনী ফুফু বলে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তিনিও ঠিক আমাকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হলো না। শুধু মনে হলো, কী এক দুর্ভাগ্য তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে দুর্ভাগ্যের কথা জানতেও ইচ্ছা হয়নি। একটা অসহায় বোবা বেদনাবোধ নিয়ে আমি লঞ্চঘাটে ফিরে এসেছিলাম।

কামিনী ফুফুর মতো আরও একটি তরুণের কথা আমার মনে পড়ে। তার মা জননীও কি সেই পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন? তা' না হলে তার মায়ের নাম যে সৌদামিনী, একথা এমনভাবে মনে পড়ছে কেন! অবশ্যি স্মৃতি আমাকে প্রতারণাও করতে পারে, তবু সেই নাম না-জানা তরুণের অবয়ব, তার সুন্দর হস্তাক্ষর সব কিছুই আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা হয়ে আছে। সে আসতো বাবার পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিতে। তখন তিনি ওমর খাইয়ামের বাংলা পদ্যানুবাদ করছিলেন। সুন্দর হস্তাক্ষরে সেই অনুবাদ লিখিয়ে নিয়ে কোথাও পাঠাতেন কিনা, তা আজ আর আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এমন কি তাঁর নিজের হাতের খসড়া পাণ্ডুলিপির সমস্ত কিছুই আমাদের পারিবারিক অবস্থা বিপর্যয়ের সময় হারিয়ে গেছে।

যেমন হারিয়ে গিয়েছিলো আমাদের বাসায় ভীড় করে আসা অনেক আত্মীয়-স্বজনের মুখ। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাদের অধিকাংশকেই আর দেখা যায়নি। অথচ বাবা সামান্য বেতনে চাকরি করলেও নিজের ব্যক্তিগত রোগী ও পেটেন্ট ওষুধ থেকে উপার্জন কম করতেন না। কিন্তু তাঁর সব কিছু ব্যয় হয়ে যেতো মেহমানদারীর পিছনে। নিজ বংশের ও শ্বশুর বংশের লোকজন ছাড়াও পরিচিত জনেরাও কোনো কাজে নেত্রকোণা এলেই এখানে এসে উঠতেন। এ ছাড়াও আমার এক মামা, এক ফুফাতো ভাই, এক চাচা এবং রুই গ্রামের একজন ছাত্রকে একই সময়ে আমাদের

একখানায় বসবাস করতে দেখেছি। সেই সুবাদে নেত্রকোণা থেকে পাঁচ ছয় মাইল পূর্ব দিকে রুই গ্রামে একবার বেড়াতে যাবার কথাও আমার মনে পড়ছে।

কিন্তু বাবা যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন প্রায় কাউকেই দেখা গেলোনা। অনেক সময় আমাকেই বাজার করে আনতে হয়েছে। টুকিটাকি অনেক কাজও আমি করেছি। কিন্তু আমারও তো খেলাধূলা ছিলো, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন ছিলো। এসব করতে গিয়ে অজুহাত হিসেবে গুলমুন্ডি তুলে নিয়ে এসেছি; পাখির ছানা খুঁজতে গিয়ে বাসক পাতা কুড়িয়ে এনেছি এবং নদীতে ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে বাঁশের বাখারিতে পা কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়েছি।

শুধু পা কেটে শয্যাশায়ী হয়ে বাবার দুশ্চিন্তা বাড়ানো নয়, অনেক সময় বাজারের পয়সা থেকে মিষ্টি কিনে এনে তাঁর রাগের কারণও তৈরি করেছি। আজ মনে হয়, কতো ভাবেই না অসুস্থ বাবার অশান্তি বাড়িয়ে তুলেছি। শুধু কি আমি, আমার বড়ো ভাই, তিনিও তাঁর কর্তব্য ভুলে খেলাধূলায় এমনি মেতে উঠেছিলেন যে, প্রয়োজনে তাঁর দেখা পাওয়া খুবই দুষ্কর হয়ে উঠতো।

বাবা প্রকৃতির দিক থেকে খুব জেদী ও মেজাজী মানুষ ছিলেন। তিনি যা ভালো মনে করতেন, সেটি করতে কখনও পিছ পা হতেন না। এ কারণেই চরম অভাবের দিনেও আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে এনে নিজের দুর্দশার কাহিনী শোনাতে পারেননি। তাঁর চিকিৎসার ভার যতোদূর সম্ভব তিনি নিজেই বহন করেছেন। তিনি গরীব হলেও তাঁর রোগটি ছিলো সে কালের রাজরোগ। এর চিকিৎসার জন্য নাকি রাজার ভাণ্ডার শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু আমার বাবা রাজাও ছিলেন না, তাঁর ভাণ্ডারও ছিলো না। সুতরাং তাঁর জন্য রোগটি হয়ে দাঁড়ালো ক্ষয় রোগ এবং নীরবে তাঁকে ক্ষয় করতে লাগলো।

শুধু বাবা নিজেই ক্ষয় হলেন না, আমাদের সংসারের সুখ শান্তিও উবে যেতে আরম্ভ করলো। এর কারণ পারিবারিক কলহ নয়, অভাব। বাবার সঞ্চয় বলতে তেমন কিছু ছিলো না। সুতরাং ভক্ত অনুগত বা বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য আমাদের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারতো না। তদুপরি আমানত মিয়া বা আশু বাবুদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিলো না। আমানত মিয়ার কথা পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি। কিন্তু আশু বাবু পাট কোম্পানির কোনো বড়ো সাহেব ছিলেন, কি ডাক্তার ছিলেন, তা নিশ্চিত করে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। শুধু পক্ককেশ সেই বৃদ্ধের সৌম্যমূর্তি আমার মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে আমার সমবয়সী একটি নাদুস-নুদুস গৌর বর্ণের ছেলের কথা। সেই ছেলেটির চাইতেও আকর্ষণীয় ছিলো তাদের বাসার উঠোনে বিচরণরত একটি ময়ূর। এরই আকর্ষণে প্রায়শঃ আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি এবং বুড়োর সস্নেহ সমাদর লাভ করেছি।

এ সময়ে আমার স্কুলে যাওয়া আবার অনিয়মিত হয়ে উঠেছিল। আমাকে শাসন করারও তখন কেউ ছিলো না। এর কারণেই না বাসার শাসন, না স্কুলের শাসন, কোনোটাই আমার স্মৃতিতে নেই। সেই সাথে চন্দ্রনাথ হাই স্কুলে আমার শিক্ষকদের

কারোর কথাও আমি মনে করতে পারছি না। শুধু মনে পড়ছে পূজা বা অন্য কোনো উপলক্ষে পূর্বদিকের চৌচালা ঘরের বারান্দায় বসে লাবড়া খাওয়ার একটি দৃশ্য। সে সময়েই সম্ভবতঃ একজন ব্যায়ামবীর এসেছিলেন। উত্তরের দিকের ঘরের বারান্দার থামে একটি লোহার শিকের এক মাথা লাগিয়ে অন্য মাথা দাঁত দিয়ে ঠেলে শিকটি বাঁকিয়ে ফেলার দৃশ্যটি আজও ভুলতে পারিনি।

এমনিভাবে বড়ো পুকুরের পূর্ব দিকের অন্য একটি পুকুর সেঁচে ফেলার ঘটনাও আমার মনে পড়ছে। যে কোনো কারণেই হোক, দমকল লাগিয়ে সেই পুকুরটি সেঁচে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। দমকলের শব্দ আর পানি পড়ার দৃশ্য আমার আহার নিদ্রা প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছিলো। সকাল থেকে দুপুর আর দুপুর থেকে বিকাল আমি সেখানে হাজিরা দিতে লাগলাম। মনে পড়ে, সেই পুকুরের পাড়ে বেশ কিছু মাথা উঁচু খেজুর গাছ ছিলো। তার পাতার ডগা আমার মাথায় বিঁধে ফুলে গিয়ে জ্বরের মতো হয়েছিলো। কিন্তু আগ্রহের আতিশয্যে আমি সে জ্বরকেও উপেক্ষা করেছিলাম। কারণ শেষ দুদিন সেখানে প্রচুর লোকের ভীড় হয়েছিলো। সবারই ধারণা, পুকুরে না জানি কতো মাছ পাওয়া যাবে! কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাত্র দুটি মাছ ধরা পড়লো। এর একটি বোয়াল আর অন্যটি চিতল। কিন্তু দুটির আকৃতিই এতো বিরাট যে,এর পূর্বে কিংবা পরে আমি এতো বড়ো মাছ আর কোথাও দেখিনি। বোয়ালটি গরুর গাড়িতে করে মেছুয়া বাজারে নিয়ে যাবার দৃশ্যটিও ছিলো দেখার মতো। এমনকি সেই মাছ কেটে বিক্রি করার সময়ও প্রচুর লোকের ভীড় হয়েছিলো। আমি এ সকল দৃশ্যের আগ্রহী দর্শক হিসেবে সর্বত্র উপস্থিত ছিলাম।

কিন্তু এদিকে নেত্রকোণায় আমাদের বসবাসের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিলো। ক্রমশঃ বাবার স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি এখানকার বাস উঠিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিছুদিনের মধ্যে সে ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

যদ্দূর মনে পড়ছে, সময়টা উনিশ'শ ছত্রিশের প্রথম দিক। আমার বয়স তখন সাত বছরে পড়েছে। চন্দ্রনাথ হাই স্কুলের আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। আমার স্মৃতিতে এই সময়কার অনেক ঘটনাই বেশ স্পষ্ট। অবশ্য সেসব ঘটনা আমার নিজস্ব পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে নেত্রকোণার নিজস্ব বিষয়াদির উপলব্ধি বা পর্যালোচনা কোনোটাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি বাবা ও আমাদের পারিবারিক দূরবস্থা সম্পর্কে যে বক্তব্য আমি উপস্থিত করেছি, তা-ও অনেকাংশে পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা থেকেই আমাকে বলতে হয়েছে। এজন্যই আমার নেত্রকোণার স্মৃতি নদী-মাঠ-গাছ-মাছ-ইত্যাকার বিষয় বস্তু নিয়েই অধিকতরভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

এ কারণেই নেত্রকোণা ছেড়ে আসতে আমাকে চোখের জল ফেলতে হয়নি, কোনো পিছুটান আমি অনুভব করিনি। এজন্যই বাবা ও মা যখন দু'টি পালকিতে উঠে বসলেন এবং আমাদের আসবাবপত্র দু'টি গরুর গাড়িতে বোঝাই করা হলো, তখন আমি নতুন

গানের আনন্দে বিভোর। আমি হেঁটে হেঁটেই এগিয়ে যাচ্ছি। বাবার সাথে অনেকেই দেখা করতে এসেছেন, পথেও এ কারণে দেরী হচ্ছে, কিন্তু আমার যেন আর তর সইছে না। আমি লাফিয়ে লাফিয়ে সেই নদী-মাঠ-গাছ-মাছকে পিছনে ফেলে এক নতুন জগতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি; যে সীমার মধ্যে এতোদিন আবদ্ধ হয়েছিলাম, তাকে আজ দলবলে অতিক্রম করে যাচ্ছি।

কিন্তু আজ শৈশব স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে কেবলি মনে হচ্ছে, এদেরকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদি হতো, তা'হলে এরা এভাবে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকতো না। শুধু কি সঞ্চয়, এদের প্রভাব কি আমার জীবন চর্চার উপর পড়েনি! তখনকার অনেক অভ্যাস কি পরবর্তীকালেও আমাকে অনুসরণ করেনি! যেমন এই নেত্রকোণারই একটি অভ্যাস আমি এখনও ত্যাগ করতে পারিনি।

আমার যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ানোর সময়ই একদিন মেছুয়া বাজারের কাছে দেখালাম ঘোড়ারগাড়ি দিয়ে বিড়ির প্রচার করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে মুঠো মুঠো বিড়ি ছড়িয়েও দেয়া হচ্ছে আর ছেলে বুড়ো সবাই সেগুলি কুড়িয়েও নিচ্ছে। আমিও নিলাম, তারপর তাতে অগ্নিসংযোগ করে মিষ্টি ধোঁয়ার স্বাদও গ্রহণ করলাম। এরপর কতো বার যে এই ধোঁয়ার নেশা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। সেই মিষ্টি ধোঁয়া সৃষ্টিছাড়ার মতো আজও আমাকে ঘিরে রেখেছে। এ ব্যাপারে বাবার সদুপদেশ যেমন আমার কাজে লাগেনি, তেমনি ডাক্তারদের হিতোপদেশও আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। বলতে গেলে এ-ও আমার পৈতৃক উত্তরাধিকার। বাবা তামাক খেতেন; তাঁর আম্বুরী তামাকের একটা অদ্ভুত মিটি গন্ধ ছিলো।সেই গন্ধ পরিবেশকে এক মধুর আমেজে আচ্ছন্ন করে রাখতো। আমিও সারা জীবন সেই আমেজেই আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। কিন্তু আমার ধোঁয়ার মধ্যে সেই মিষ্টি গন্ধ কোথায়?

থাক্ সে কথা। এজন্যই বলছিলাম, নেত্রকোণাকে আমি পিছনে ফেলে এগিয়ে এলে কী হবে, সে ধোঁয়া হয়েই আমাকে অনুসরণ করেছে। তার প্রায় সমস্ত স্মৃতিই তো এমনি ধোঁয়াধোঁয়া আবছা আঁধারে ঢাকা। আমি তার যতোটুকু স্পষ্ট করতে পেরেছি, তার চাইতে বহুগুণ বেশিই তো আড়ালে রয়ে গেছে। পৃথিবীর সাথে আমার প্রথম পরিচয়ের সেই দিনগুলির মতো নেত্রকোণাও আমার অতৃপ্তির ঈন্ধন হয়েই রইলো। স্মৃতির পসরা দিয়ে আমার মনকে ভরিয়ে দিতে পারলো না। যতোবার সেই শৈশবের কথা মনে হয়, একটা আবেগ কেবলি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। বারবার মনে হয়—

ঊষার আকাশ তুমি, নেত্রকোণা, আলো আঁধারিতে
দিয়েছো মুখের ভাষা, ধ্বনি ও ছবির ঐকতান;
চেতনার সূর্য তুমি জাগিয়েছো মোর শিশু চিতে,
দিয়েছো মাটির প্রীতি, শুনিয়েছো আকাশের গান।

তোমার উদার মাঠে বাদামের গাছ সারি সারি
সবুজ ফলের শাঁস শিশুদের হৃদয় ভোলায়;
তোমার নদীর বুকে উদাসী বাউল জারি সারি,
দু'পাড়ে কদম কেয়া ফুলে ফুলে শুধু শিহরায়।

তোমার পথের পাশে পড়ে থাকে লাশকাটা ঘর,
তোমার রাতের ঝোপে শিয়ালেরা বাজায় বিষাণ,
তোমার বটের ডালে ভূত-প্রেত জমায় আসর,
তোমার পুকুর জলে বোয়ালের নিত্য অধিষ্ঠান।

তোমার স্মৃতির মাঝে কতো মধু! হে মধুর বাপ,
জন্মদাতা জন্মভূমি অফুরন্ত তোমার প্রতাপ!

দ্বিতীয় তরঙ্গ ॥

ময়মনসিংহ জেলার পূর্বতন ঈশ্বরগঞ্জ থানা অধুনা গৌরীপুর উপজেলার অধীন বীর আহমদপুর গ্রাম আমার পৈতৃক নিবাস। আমার দাদা এই গ্রামের নয়/ দশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত আঙ্গাউড়া বাঁশাটি থেকে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন। শুনেছি, সেখানে এখনও আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির অনেকেই বসবাস করছেন এবং পীর মুরিদীর ব্যবসাও অনেকে করে থাকেন। কিন্তু আমার সাথে তাঁদের সাক্ষাত পরিচয় নাই বললেও চলে। এমন কি নেত্রকোণা থাকা কালেও আমাদের এই জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

মায়ের মুখে শুনেছি, আমাদের এই জ্ঞাতিদের একজন নেত্রকোণার আশে পাশে কোথাও বেদে বা গাইনদের পীর সেজেছিলেন বলে বাবা তাঁকে আমাদের বাসায় আসতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কারণ বাবা এই ব্যাপারটি মোটেও পছন্দ করতেন না। যদ্দূর মনে হয়, দাদা-ই এই খোনকারি পেশার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন এবং নামের পূর্বে শেখ উপাধিটি পর্যন্ত বর্জন করেন। কারণ আমি আমাদের জমি-জমার কাগজপত্রে তাঁর একটি নামই দেখেছি; সে হলো 'ইছব মড়োল'। তিনি তৎকালীন জমিদার শাসিত সমাজে মোড়ল ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর একটি সনদপত্র ও ছিলো। সে সনদ আমি না দেখলেও তার কথা একাধিকবার শুনেছি।

কিন্তু তাঁর ছেলে অর্থাৎ আমার বাবা শুধু নামের পূর্বে শেখ নয়, নামের শেষে কোরায়শী শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। তিনি এই উপাধি কোত্থেকে পেলেন, কীভাবে ব্যবহার করলেন, তার কোনো কৈফিয়তই আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠির মধ্যে কোথাও এই উপাধির ব্যবহার নেই। এমনকি আমার বড়ো ভাই পর্যন্ত এটি ব্যবহার করেন না। শুধু আমি পিতার এই উত্তরাধিকারকে আঁকড়ে ধরে আছি এবং আমার ছেলে-মেয়েদের নামের শেষেও এটিকে ব্যবহার করছি। কারণ আমি মনে করি, এটি ত্যাগ করলে পিতার প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাবে। হয়তো আমার পিতা আমাদের বংশে এই উপাধি ব্যবহারের সূত্রটি জানতেন, হয়তো শেখ লিখলে কোরায়শী লিখতে অসুবিধা নেই, এমনি কোনো যুক্তি তাঁকে এ ব্যপারে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। কিন্তু আমার কাছে এই 'হয়তো', 'হতে পারে' ছাড়া অন্য কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

তাছাড়া আমি শুধু কোরায়শী উপাধিটিই লিখি, শেখ লিখা ত্যাগ করেছি। অবশ্যি এই ত্যাগের ব্যাপারটি সচেতন কোনো প্রয়াস নয়, এমনিতেই বাদ পড়ে গেছে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিক কোনো নামের তালিকা আমার কাছে নেই, এমনি কি তাঁরা সুদূর আরব থেকে এদেশে এসেছিলেন কিনা, তা-ও আমি বলতে

পারবো না। যদি আমি আমাদের বংশের খোনকারি পেশা গ্রহণ করতে পারতাম, তা'হলে এ ধরনের একটি তালিকা বানিয়ে নেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হতো না। কারণ এ ব্যাপারটি এমনি যে, এ ক্ষেত্রে যথেচ্ছ নাম বসিয়ে একটি জুতসই ধারাবাহিকতা তৈরি করা এমন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। অন্য লোক এটিকে অবিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু অপ্রমাণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমিতো সে-পথে যাইনি, বরং উল্টো পথ ধরেছি। আমার কাছে আরব আর বাংলাদেশে কোনো তফাৎ নেই।

সে কথা থাক্, আমার দাদার কথা বলি। তিনি যৌবনকালেই এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি আমাদের পাশের বাড়িতেই বিয়ে করেন। এর ফলে এ গ্রামে তাঁর একটা সহায়ক শক্তি গড়ে উঠে। এ ছাড়া তাঁর নিজেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি কমছিলো বলে মনে হয় না। তা' না হলে এই ভিন গাঁয়ে তিনি মোড়ল সেজে বসতে পারতেন না। এক্ষেত্রে তিনি একটা ইহ জাগতিকতার ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন। এর কারণ তিনি পীর সেজে মানুষের পরকালের বিপদ দূর করার ভার না নিয়ে ইহকালেই বিপদ দূর করার চেষ্টা করেছেন। বাবার মধ্যে সেই ঐতিহ্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করেছি এবং আমিও সে উত্তরাধিকার বহন করার চেষ্টা করছি। স্বেচ্ছায় নয়, অনেকটা অনিচ্ছায়।

দাদার প্রথমা স্ত্রী কোনো সন্তান না রেখেই অকালে মারা যান। এরপর বেশ কিছুদিন তিনি অকৃতদার ছিলেন। পরে আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে শেখের কড়েয়া গ্রামে বিয়ে নয়, নিকে করেন। শুনেছি সেখানে কোনো কাজে বেড়াতে গিয়ে তিনি আমার দাদীকে নৌকা করে বিলে শাপলার ফুল কুড়াতে দেখেছিলেন। তখনি খোঁজ নিয়ে তিনি সম্বন্ধের প্রস্তাব দেন এবং নিকে করে ঘরে নিয়ে আসেন। আমার দাদী নাকি বেশ সুন্দরীও সাহসিনী ছিলেন। অনেক দূরে সিলেটের সোনাই গ্রামে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। কিন্তু একটি ছেলে হবার পরই তিনি বিধবা হয়ে বাপের ভিটায় ফিরে আসেন। সেই ছেলেটিও তাঁর সাথে চলে আসে। আমার দাদী হবার পর সেই ছেলেটিকেও তিনি সাথে নিয়ে এসেছিলেন।

আমার দাদার ঘরে এসে তাঁর আরও এক ছেলে ও দুটি মেয়ে হয়। ছেলের নাম মধুরবাপ অর্থাৎ আমার বাপ, কিন্তু মেয়েদের নাম? ঠিক মনে পড়ছে না। একজনের বিয়ে হয়েছিলো—ধারাকান্দি, তাই তাঁকে ধারাকান্দির ফুফু এবং অন্যজনের বিয়ে হয়েছিলো দইলা, তাই তাকে দইলার ফুফু বলে ডাকতাম। নামের খোঁজ করিনি। তা'ছাড়া ধারাকান্দির ফুফুকে আমি দেখিও নি। এমনিভাবে দাদা-দাদীর কাউকেই আমি দেখতে পাইনি। আমার জন্মের আগেও পরে সবাই পরপারে চলে গেছেন।

মধুরবাপ ছিলেন আমার দাদীর আলালের ঘরের দুলাল। সে তুলনায় তাঁর আগের ছেলেকে তিনি প্রায় দেখতে পারতেন না। অনেকটা উড়ে এসে জুড়ে বসার দিক থেকেই তিনি তাঁকে তাচ্ছিল্য করতেন। দাদা তাঁকে আলাদা বাড়ি, জমি সবই দিয়ে গিয়েছিলেন, এমন কি তাঁর নামও হয়েছিলো কলম শেখ। গৃহস্থির সব কিছুই তিনি দেখতেন, আর আমার বাবা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

এর ফলে একদিন অঘটন ঘটলো। চাচা তাঁকে জোর করে হাল বাইতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর বাবুগিরি দূর করার জন্য মইয়ের সাথে বেঁধে সারা ক্ষেত জুড়ে টানা-হেঁচড়া করলেন। এর ফল হলো মারাত্মক, বাবা বাড়ি ছেড়ে পালালেন। আর বুড়ির সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বড়ো ছেলের উপর। এর ফলে গৃহস্থিতো গেলোই, এমনকি দাদীর ঘরে-দোরে আসাও চাচার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেলো।

আর মধুর বাপ, ভীষণ জেদী তরুণ, মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে পড়তে লাগলেন। অদ্ভুত মেধা, তর তর করে সব ক'টি পরীক্ষা পাশ করলেন, ফারসিতে কাব্য চর্চা করে সহপাঠীদেরকে চমকে দিলেন, ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় পড়ার বেলা নবাব বাড়িতে লজিং থেকে নবাব নয়, বাবু মৌলবী আবদুল করিম হয়ে দেশে ফিরলেন। তখন কি আদরের দুলালের এই রূপ দেখে দাদী তাঁর বড়ো ছেলেকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন? না, অবশ্যি তার কারণ ছিলো ভিন্ন। সে কথা যথাসময়ে বলবো। এখানে শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, বাবা যখন রোগাক্রান্ত হয়ে দেশের বাড়িতে ফিরছেন, তখন তাঁদের কেউই জীবিত নেই।

আমার জন্মের পরই নাকি দাদী মারা গিয়েছিলেন, তারও আগে বড় চাচা। সুতরাং আমাদের বাড়িঘর জমি-জমা সমস্তই চাচাতো ভাইদের দখলে ছিলো। তারাই ভোগ তছরূপ করতো। বাবা এ নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য করতেন না। এমন কি জমির খাজনা দেয়া হলো কিনা, তা-ও তিনি দেখতেন না। এ ব্যাপারে কেউ কিছু বললেও তিনি এড়িয়ে যেতেন। অবশ্যি তিনি যেটুকু সচ্ছলতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তার বাইরে অধিক কিছুর জন্য কারু উপর চড়াও হওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। এদিক থেকে দেখতে গেলে আমার বাবা মোটেও বিষয়বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন না।

সে যা হোক, এসবের অনেক কিছুই আমি পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি এবং আমাদের অবস্থা বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনুভব করেছি। তবু আমার কাহিনী যেহেতু আমার পরিবারেরও কাহিনী, সেজন্যই তাঁদের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ভূমিকা ফেঁদে রাখলাম। পরবর্তী ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে এসব বিবরণ নানা দিক থেকেই কাজে লাগবে। এবার আমাকে আমার স্মৃতির জগতে ফিরে যেতে হবে। সাত বছরের একটি বালকের শহর ছেড়ে গ্রামে আসার স্মৃতি।

বড়ো রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে বাবা মার পালকি এগিয়ে চলেছে, আর আমি কখনও, হেঁটে, আবার কখনও কারো কাঁধে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছি। গরুর গাড়ি দু'টি বড়ো রাস্তা দিয়ে রামপুর হয়ে ঘুরে আসবে, আমরা চলেছি কোণাকুণি। দুপুরের পর বাবা মার পালকি কিছুক্ষণের জন্য কোথাও থেমেছিলো। সেখানে অনেকগুলি আমগাছ জড়াজড়ি করে বেশ ছায়া তৈরি করেছে, সেই ছায়ার মধ্যে বাবা পালকিতে শুয়ে আছেন আর অনেকেই তাঁর সাথে এসে দেখা করছেন। কোথায় সেটি, মহিষহাটী না শেখের কড়েয়া, আমি এর কোনটাই সঠিক করে বলতে পারছি না। তবে মহিষহাটী হবার সম্ভাবনাই বেশি সেখানে বাবার এক খালাতো ভাই ছিলেন, যিনি তৎকালের দেওবন্দ পাশ করা

মস্ত বড়ো আলেম। সম্ভবতঃ সেখানে নেমেই বাবা তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন।

কিন্তু পালকির তো বেশিক্ষণ থেমে থাকার উপায় নেই। বেলা পড়ে আসছে, যে করেই হোক সন্ধ্যার পূর্বে বাড়িতে পৌঁছতে হবে। আমার বেশ মনে আছে, ঠিক সন্ধ্যার পরেই আমরা বাড়িতে পৌঁছেছিলাম। তখন অন্ধকারে সব ছেয়ে গেছে। তারও চাইতে বেশি অন্ধকার জমেছে ঘরের কোণে। কুপি বাতির মিটমিটে আলো সে অন্ধকার দূর করতে পারছে না। সেই আলো-আঁধারির মধ্যে বাবার বিছানার পাশে এসে ভীড় করেছেন অনেক লোক। আমি তাঁদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে আর তাঁদের আনাগোনা দেখতে দেখতে কখন বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জেগে দেখলাম ভোর হয়ে গেছে। দরজা খোলাই ছিলো, বাইরে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়ালাম। তখনই ঘরটির আকৃতি চোখে পড়লো। এক নতুন বিস্ময় নিয়ে এলো আমার চেতনায়। এই জুইতের ঘর এর আগে আমি আর কোথাও দেখিনি। এর টুঁই দু'পাশে বেঁকে ধনুর মতো নেমে গেছে আর দু'চালের চারটি কোণা প্রায় মাটির কাছাকাছি চলে এসেছে। একটি উঁচু ভিটির উপর দাঁড়িয়ে আছে ঘরটি। এখানেই রাত্রে আমি ঘুমিয়েছি। এরই মাঝে একটি চৌকির উপর আমার অসুস্থ বাবা শুয়ে আছেন। কিন্তু ঘরের আকৃতি যতো অদ্ভুতই হোক্ না কেন, তা বেশিক্ষণ আমাকে ধরে রাখতে পারলো না। আমি একাকীই বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু বাড়ির আশেপাশে যতোদূর সম্ভব ঘোরাফেরা করেও কোনো ফাঁকা মাঠের খোঁজ পেলাম না। চারদিকেই জঙ্গলে ভরা, গাছের চাইতে বাঁশঝাড়ই বেশি। তা-ও রাস্তার উপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, এই ভোর বেলাও সেখানে অন্ধকার জমে রয়েছে। কোথাও কোনো নদী নেই, এমন কি একটা বড়ো পুকুরও চোখে পড়লো না। নেত্রকোণায় আমার পরিচিত পরিবেশের সাথে এর পার্থক্য কেন জানি আমার শিশু মনকে পীড়া দিতে লাগলো। সুতরাং খুব তাড়াতাড়িই বাড়িতে ফিরে এলাম। এ দিকে সবাই আমাকে খোঁজ করছে। বিশেষ করে পক্ষীবুজি আমাকে দেখতে পেয়ে আমার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পক্ষীবুজি আমার চাচাতো বোন। বয়সে আমার চাইতে দশ/বার বছরের বড়ো। তাই বিষণ্ন মুখে তাঁর হাতেই নিজেকে সঁপে দিলাম। সে আমার মুখ ধোয়ালো এবং একা একা যেখানে সেখানে ঘোরা ফেরা করতে আমাকে মানা করলো। তার কথার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো ভূত, বেরিয়ে এলো সাপ; মনে হলো, এদেরই এখানে রাজত্ব। কথায় কথায় জানতে পারলাম, এই ঘরেই আমার দাদী থাকতেন, এ ঘরেরই বারান্দায় রাখা খড়ির মধ্যে তাঁকে গোখরো সাপে কামড়ায় এবং তিনি মারা যান। আরও কতো কথা বলছিলো পক্ষী বুজি; কিন্তু সব শুনে আমার কেমন কান্না পাচ্ছিলো।

সেই কাঁদো কাঁদো মুখেই পক্ষীবুজির কোলে বসে আমি খেতে আরম্ভ করলাম। সে ভাত মাখিয়ে লোক্‌মা করে আমার মুখে তুলে দিচ্ছিলো। কিন্তু প্রথম লোক্‌মাটির স্বাদ গ্রহণ করেই আমার কান্না থেমে গেলো। একটা অপূর্ব শিহরণে আমার সমস্ত চেতনা রী-

ঝাঁ করে উঠলো। ঝাল এর পূর্বেও আমি খেয়েছি, কিন্তু এই ঝালের সাথে পূর্বের কোনো তুলনাই হয় না। এর ফলে শুধু চোখে দিয়ে নয়, এবার জিভ দিয়েও পানি পড়তে লাগলো।

যে ব্যঞ্জন দিয়ে পক্ষীবুজি আমার খাবার ভাত মাখিয়েছিলো, তার নাম 'হিদলভর্তা'। লাল মরিচের সাথে হিদল বা চ্যাপা পাটায় বেটে এই ভর্তা তৈরি করা হয়েছে। এ দিয়ে ভাত মাখলে ভাত গুলিও লালচে হয়ে উঠে। সেই লালচে ভাতের কয়েক লোক্‌মা খেয়েই আমি হাল ছেড়ে দিলাম। আমার চোখ নাক জিভের পানি একাকার হয়ে গেলো।

এই খাবারের স্মৃতি আমার শিশু মনে এমনভাবে দাগ কেটেছিলো যে, এরপরও বহুদিন হিদলভর্তার নাম শুনলেই আমার খাবার রুচি উবে যেতো। অথচ পাড়া গাঁয়ে আমাদের অবস্থায় ব্যঞ্জন হিসেবে এই বস্তুটি তখন খুবই সাধারণ আর এর সাথে ঝালের সম্পর্কও খুব গভীর। সুতরাং আমি না চাইলেও তা অহরহ আমার সম্মুখে এসে দেখা দিতো।

অবশ্যি এর ব্যতিক্রম যে ছিলোনা, তানয়। এর কয়েক দিন পরেই এই ব্যতিক্রমের স্বাদ পেলাম। মাওইর সাথে পরিচিত হলে তিনি আমাকে একটি আম খেতে দিয়েছিলেন। আমার মনে হলো, এর চাইতে মিষ্টি আম ইতিপূর্বে আমি আর খাইনি। আর কি শুধু আমের মিষ্টি; মাওইর ব্যবহারের মধ্যে বুঝি তার চাইতেও বেশি মিষ্টত্ব ছিলো। আমার এ জীবনে যে কয়জন রমণীর কথা আমি আবেগ মিশ্রিত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে পারি, তাঁদের মধ্যে মাওই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

কারণ আমাদের তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। জলের মাছকে ডাঙায় তুললে যা হয়, তার সাথেও বুঝি এ বিপর্যয়ের তুলনা করা চলে না। একটিমাত্র ঘর, সেখানে আমার চাচাতো ভাই-বোন ও আমরা ঠাঁই নিয়েছি। আর এর মাঝখানে বিপর্যয়ের প্রতিমূর্তি হয়ে শুয়ে আছেন মৃত্যু পথযাত্রী আমার বাবা। তাঁর দুরবস্থা সকলের সকল চিন্তা কেড়ে নিয়েছে। তাঁর চিকিৎসা পথ্যের কোনো ব্যবস্থা নেই, তেমনি নেই আমাদের সুখ সাচ্ছন্দ্যের কোনো আয়োজন। আমার শিশুমন তখন বাবার অবস্থার চাইতে এই সাচ্ছন্দ্যের অভাবেই বেশি পীড়িত। তাই এর খোঁজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে নিতেও খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। তারপর খালের ধারে, বিলের পাড়ে আর বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে নানান ব্যাপারে পরিচিত হতে লাগলাম। আর সময় পেলেই মাওইর কাছে গিয়ে কিছুটা সাচ্ছন্দ্যের স্বাদ অনুভব করতে আরম্ভ করলাম। সুতরাং বাবা যখন ঘরের কোণে শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন, আমি তখন বিলের পাড়ে ফড়িং ধরে বেড়াচ্ছি।

তখন বিকাল। পক্ষীবুজি গিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে এলো। বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম এক হৈ চৈ কাণ্ড। বাবা আগের মতোই ঘরের মাঝখানে শুয়ে আছেন। তাঁর আপাদমস্তক একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আর তাঁর চারপাশে ভীড় করে সবাই

কাঁদছে। আমাকে চাদর তুলে বাবার মুখখানি দেখানো হলো। একটি নির্বিকার চোখ বোঁজা শুকনো মুখ। প্রায় প্রতিদিনই তো এই মুখ দেখেছি। তাই এই মুখ দেখে আমার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হয়েছিলো কি না, আমি হাউমাউ করে কেঁদেছিলাম কি না, তা আজ আর মনে করতে পারছিনা। যদ্দূর মনে হয়, বাপ থাকলে কী হয় আর না থাকলেই বা কী হয়, এ ধরনের সংসারী চিন্তা তখনও মনের কোণে ঠাঁই পায়নি। কাজেই অভাবের বেদনা তখন বড়ো হয়ে না বাজারই কথা।

শুনেছি, আমি নাকি বাবার খুব আদরের ছিলাম। কিন্তু তিনি কীভাবে আমাকে আদর করতেন, তার স্মৃতি খুব একটা আমার সঞ্চয়ে ছিলো না। স্মৃতির বলয় যখন কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করেছে, তখন থেকে তাঁর অসুস্থ বিক্ষুব্ধ মূর্তিই দেখেছি। শেষ দিকে অভাব অনটনে সে বিক্ষোভ একটা উদাসীনতায় এসে ঠেকেছিলো। নিজের অস্তিত্ব যেখানে বিপন্ন, সেখানে অপত্য স্নেহের স্বাভাবিক প্রকাশ ব্যাহত হবেই। সুতরাং একটা বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আমার শিশুমন তার নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলো। সেখানে আত্ম স্বার্থই ছিলো প্রবল।

তবু আমার স্মৃতি যাই বলুক, আমি বলবো, আমি কেঁদেছিলাম। কারণ এই কান্নার ব্যাপারটি অনেকটাই সংক্রামক। অনেককে কাঁদতে দেখলে আপনা থেকেই চোখের কোণে জল জমে উঠে। অভাবের টানে না হোক, অন্তত এই স্বভাবের টানে আমি কেঁদেছিলাম। বাবার মৃত্যুতে আমি কাঁদিনি, এ কথা বলায় আমার গৌরবের কিছু নেই। বরং আমার বাবার মতো লোকের মৃত্যুতে কেঁদে বুক ভাসানোর মধ্যেই গৌরব ছিলো। অবশ্যি এ কথা আজ যতোটুকু বুঝতে পারি সেদিন সেই মুহূর্তে তার কোনো চেতনাই আমার মধ্যে ছিলো না। তবে সে চেতনার শুরু হয়েছিলো পরদিন থেকেই।

বাবা যেদিন মারা গেলেন, যদ্দূর মনে হয়, সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। বৈকুর হাটীর বাজারের দিন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ বাজারে গিয়ে পৌঁছায়, তা এমনভাবে আশেপাশে ও দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, পরের দিন তাঁর জানাজার নামাজে অভূতপূর্ব লোক সমাগম হয়। মধুর বাপ মৌলবীকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য আবাল-বৃদ্ধ এবং কতকাংশে বণিতার ভীড় জমে। আর সেই ভীড় দেখেই আমার শিশুমন প্রথম সচেতন হয় যে, আমার বাবা খুব সাধারণ লোক ছিলেন না। জানাজার নামাজ ইতিপূর্বে আমি দেখিনি, তা নয়। তবে কাউকে শেষ দেখা দেখতে আর জানাজায় শরীক হতে এত লোকের ভীড় যে শুধু আমি দেখিনি তা নয়; বরং উপস্থিত লোকেরাও দেখেনি। তাঁদের আলোচনা শুনেই আমি এই সংবাদটি সংগ্রহ করেছিলাম।

বাবা মারা গিয়েছিলেন ইংরেজি ছত্রিশ সালের এপ্রিল এবং বাংলা তেতাল্লিশ সনের বোশেখ মাসে। কারণ যে ক্ষেতটিতে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, তার পাট গাছ তখন এক বিঘৎ উঁচু হয়ে গিয়েছিলো। স্থান সংকুলান না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়ির পিছনের এই বিরাট পাট ক্ষেতটিকেই নামাজের জন্য বেছে নেয়া হয়। আর সেই ক্ষেতেরই পশ্চিম ধারে জঙ্গলের কাছে আমার দাদা-দাদীর কবরের পাশে তাঁর

কবর দেয়া হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, মুসুল্লীদের আনাগোনায় পায়ের চাপে সেই ক্ষেতের সম্পূর্ণ পাটগাছই মাটির সাথে মিশে গিয়েছিলো।

বাবার জানাজার নামাজের এই দৃশ্যটি আমার স্মৃতিতে এমনভাবে অক্ষয় হয়ে আছে যে, চোখ বুঁজলে সেই সারিবদ্ধ লোকের ভীড় আমার চোখে পড়ে। সকাল থেকেই এই ভীড় আমার চেতনাকে উন্মুখ করে তুলেছিলো, এরপর তার সারিবদ্ধ সুবিন্যস্ত রূপের মধ্যে তা এমন একটি শিহরণ লাভ করেছে, যার মাঝে উপ্ত হয়েছে আমার বাবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার বীজ। সে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে কীভাবে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে, সে কাহিনী এখানে বলবার নয়। যথাসময়ে তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে।

আপাততঃ আমার শিশুমন বাবার অভাবকে বুঝতে পারলো মাত্র। এর ফলে আমরা কী ব্যাপক ভাবে নিঃস্ব হয়ে গেলাম, বলতে গেলে প্রায় পরের দিন থেকেই তার সূচনা হলো আমাদের পারিবারিক জীবনে। তবু এর মধ্যেই কিছু আশার আলো নিয়ে এলো একটি মানি অর্ডার। সেটি এসেছিলো বাবার নামে। টাকার অংক খুব বেশি নয়, দশ কি পনেরো হবে। পাঠিয়েছেন বাবারই এক ভক্ত ছাত্র, কাউরাটের হাফিজুর রহমান। তখন তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু প্রাপকের অভাবে মানি অর্ডারটি ফেরৎ গিয়েছিলো। শুধু আমার শিশুমন এই ঘটনার এমন একটা আশ্বাস পেয়েছিলো যে, তা হলে আমরা একেবারে সহায়হীন নই। যদিও সে সহায়তা বাস্তবে তখন খুব সহজ লভ্য ছিলো না; মানি অর্ডারের মতোই তা নিজকে গুটিয়ে নিয়েছিলো।

বাবা প্রায় দু'বছর রোগভোগ করার পর মারা গিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব যা কিছু সম্বল ছিলো, তা অনেক আগেই উবে গেছে। এরপরও যা কিছু ছিলো, তা-ও এই বাড়িতে এসে শেষ হয়ে হয়ে গেছে। সহায়-সম্পত্তি হয়তো আছে, কিন্তু তার কোনোটিই আমাদের আয়ত্তে নয়। সুতরাং আমাদের অবস্থা হলো, অনেক কিছু থেকেও পথের ভিখারী। অথচ আমরা ভিখারীও নই। এর ফলে পাড়া-পড়শীর চাইতেও বেশি করে আমরা চাচাতো ভাই-বোনদের সহানুভূতি হারালাম। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, আমার সর্বংসহা মা পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন।

কিন্তু সংসারের এই অস্থিরতা তখন তেমনভাবে আমাকে স্পর্শ করেনি। শুধু খাবার বেলায় যখন হাঁড়িতে ভাত থাকতো না, তখন নিজে যেমন হৈচৈ করতাম, তেমনি মা'র অসহায় অবস্থাও কিছুটা বুঝতে পারতাম। তা-ও সামান্য সময়ের জন্যই; তারপর সেই খালের ধারে বিলের পাড়ে আর বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই মজে থাকতাম। এর মধ্য দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা যেমন হতো, তেমনি খেলার আয়োজনও জমে উঠতো। এসময়ে আমি অনেকটা বুনো হয়ে গিয়েছিলোম। আর তা হবার সুযোগও ছিলো। আমাদের বাড়ির চারদিকেই প্রায় জঙ্গলে ভরা। সেই জঙ্গলে ঘর বানিয়ে খেলার ব্যাপারটা ছিলো বেশ আকর্ষণীয় তবে সব জঙ্গলে নয়। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের জঙ্গলটিতে যেতে আমরা ভয় পেতাম, এর কারণ একটি বিরাট তেঁতুল গাছ।

বিরাট গাছে যে ভূতের বাসা, এ ধারণা আমার ইতিপূর্বেই হয়েছিলো। এই গাছটি আমার সেই ধারণাকে আরও পাকাপোক্ত করে তুললো। বাঁশঝাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই গাছটি। আর সেটি আমাদের মতো শিশুদের কাছে এতো বিরাট যে, আমরা চার পাঁচজন মিলেও তার কাণ্ডটা বেড় দিতে পারতাম না।। সেই সাথে সেই গাছের কাণ্ডে পোঁতা ছিলো একটি বিরাট লোহার পেরেক। পেরেক কেন? আরে! এই পেরেক মেরেই তো ভূতটিকে গাছের সাথে গেঁথে দেয়া হয়েছে! সে যেখানেই যাক, ঘুরে ফিরে এই গাছেই তাকে ফিরে আসতে হবে। আর সে ভূতও কি যে সে ভূত নাকি! একেবারে স্কন্ধকাটা। ধড়ের উপর মাথা বলতে কিছু নেই। চোখ দুটি বুকের মাঝে ধক্ ধক্ করে জ্বলে। যে একবার সে ভূত দেখেছে, সে আর বাঁচেনি।

সুতরাং এই বিরাট তেঁতুল গাছের ত্রিসীমানাতেও আমরা ঘেঁষতাম না। তাছাড়া ব্যাপারটা অবিশ্বাস করারই বা কী আছে। তদুপরি রাতের বেলা ভূতের ডাকতো আমি নিজের কানেই শুনেছি। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিলো একটি বিরাট ও খুব উঁচু বাঁশঝাড়। রাত একটু গভীর হলেই তার আগায় এসে বসতো 'মেকুর দেও'। অনেকটা বেড়ালের মতো শব্দ করতো। সেই শব্দ শুনে অনেক রাতেই আমি শিউরে উঠেছি। কাজেই বিরাট তেঁতুল গাছে স্কন্ধকাটার বাসা থাকাটা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু ভূতকে এভাবে গাছের সাথে বেঁধে দিলো কে? লোয়াই মুনশী। বড়ো বাড়ির লোয়াই মুনশী সম্পর্কে আমাদের চাচা। কিন্তু আমি তাঁকে দেখিনি। শুনেছি, তিনি খুব প্রতাপশালী ছিলেন। শুধু ভূত নয়, জিনও তিনি পালতেন। আর এদের সাহায্য নিয়ে প্রচুর সম্পত্তিও করেছিলেন তিনি। বিশেষ করে বিধবাদের সম্পত্তি খুব সহজেই তিনি হাতিয়ে নিতে পারতেন। শুনেছি, আমার দাদীকেও তিনি ভয় দেখিয়ে গাঁ ছাড়া করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। কারণ দাদী ছিলেন দারুণ সাহসী আর জেদী।

অবশ্যি এসবই পরের মুখে শোনা কথা। আর শুনেছিও নানা উপলক্ষে। কারণ আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন লোয়াই মুনশী আর দাদী, কেউই জীবিত নেই। কিন্তু তাঁরা জীবিত না থাকলেও, জিন ভূততো সহজে মরেনা, তাই ওরা জীবিত আছে। তবে জিনটি বড়ো-বাড়ির পিছনের জঙ্গলে থাকে। আমি এক সন্ধ্যা বেলা সেটিকে দেখেও ফেলেছিলাম!

গাঁয়ে আমাদের পাড়াটির নাম চকপাড়া। আমাদের পাড়ার বামদিকের সামনের পাড়াটি হলো বাইদপাড়া। সেই বাইদপাড়ায় যাত্রা গানের আসর হবে। পালাটির নাম রাজা হরিশচন্দ্র। দিনের বেলা গিয়ে আসরের মঞ্চ ইত্যাদি বাঁধার কাজ দেখে এসেছি। বেলা ডুবতে না ডুবতেই খেয়ে দেয়ে সেই আসরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সাথী কেউ নেই। কারণ অন্য সবাই জানে, এই সন্ধ্যা বেলা গানের আসর বসবে না। কিন্তু আমার তর সইছে না। পাছে গান শুরু হয়ে যায়, সেই আশংকায় একাকীই পথে পা বাড়ালাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘন হয়ে এসেছে। বাঁশঝাড়ের মাঝখান দিয়ে যাবার পথে যে অন্ধকার তখন রাত্রি। তবু এরই মধ্য দিয়ে চোখ বুজে টিপ্‌টিপে বুক নিয়ে এগিয়ে

পেলাম। লোয়াই মুনশী চাচার বাড়ির পিছনে রাস্তার ধারে ছিলো একটি জামগাছ। মাঝে মাঝে চোখ খোলার ফাঁকেই দেখলাম, একটি কালো মোটা লোক সেই গাছ বেয়ে উপরে উঠছে। কিন্তু আমি তাতে ভয় পেলাম না। কারণ ভয় পাবার মতো মনের অবস্থা তখন নেই। কারণ আমাকে যে করেই হোক্ এখন গানের আসরে পৌছতে হবে। এজন্যই এই কালো মোটা লোকটি যদি গাছে না উঠে আমার সামনে এসে দাঁড়াতো, তাহলেও তাকে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে আমি চলে যেতাম।

এ কারণেই বড়ো বাড়ির সামনের পাগাড়ের পাশ দিয়ে বাইদ পাড়ার মাথার আরেকটি বিরাট তেঁতুলগাছ তলা দিয়ে সে সন্ধ্যায় আমি এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম। কারণ ও দুটি স্থানও ছিলো ভয়াবহ। পাগাড়ের পাড়ে ছিলো সাপের ভয়। এখানে সন্ধ্যা না হতেই সাপে 'লাল' ছাড়তো। অনেক সময় ব্যাঙ ও লাল ছেড়ে বসে থাকতো। তার পাশ দিয়ে গেলে আর বাঁচোয়া নেই। আর সেই তেঁতুল গাছটিও ছিলো ভূতের বাসা। কিন্তু গান শোনার আগ্রহ সাপ-ভূত-জিন সবাইকে হারিয়ে দিলো।

হারিয়ে দেবারই কথা। কারণ এই প্রথম আমার যাত্রার পালা দেখা। ইতিপূর্বে আমি নির্বাক ছায়াছবি দেখেছি, কিন্তু মঞ্চে জীবিত মানুষের অভিনয় এই প্রথম দেখলাম। প্রায় রাত দুপুরে পালা শুরু হলেও বিপুল আগ্রহে আমি জেগে রইলাম। ভোরের দিকে সেই পালা শেষ হলো। এই পালার অন্য সব দৃশ্যের কথা আমার তেমন মনে নেই, কিন্তু রাণী শৈব্যা যখন সাপে কাটা সন্তান নিয়ে শ্মশানে এসে ডোমরূপী রাজার সাথে পরিচিত হচ্ছে, তখনকার সেই করুণ দৃশ্যটি এখনও আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

কেন জানি না, যে কোনো করুণ দৃশ্য বা ঘটনা সেই শিশু কালেও আমার স্মৃতিকে প্রবলভাবে নাড়া দিতো। এর মধ্যে আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের কোনো পরোক্ষ প্রভাবও থাকতে পারে। সত্যিই আমাদের অবস্থা তখন খুবই করুণ হয়ে উঠেছে। কারণ যে সহায়-সম্পত্তি আছে বলে আমরা ভিখারিও নই বলে মন্তব্য করেছিলাম, একদিন শোনা গেলো, তা নীলাম হয়ে গেছে। আমার চাচা, চাচাতো ভাইয়েরাই সে সম্পত্তি এতোদিন ভোগ দখল করেছে। কিন্তু তারা দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে এক পয়সাও খাজনা দেয়নি। বাবার কথা আগেই বলেছি, তিনি এ সব ব্যাপার ফিরেও দেখতেন না। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরে খাজনা বাকি পড়লেও বাবার সম্মানের জন্যই তাঁর জীবদ্দশায় এ সম্পত্তি নীলাম করা হয়নি। আজ বাবা নেই, তাই সম্পত্তি নীলাম করায় আর কোনো বাধা নেই।

সম্পত্তি নীলামের এ কাহিনীই তখন শুনেছি। কিন্তু পরে বুঝেছি এর পিছনে ছিলো এক গভীর ষড়যন্ত্র। সেটি এখানে খুলে বলা দরকার।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, আমার দাদা আমার দাদীকে নিকে করে আনার সময় তাঁর সাথে এসেছিলো একটি ছেলে। তাঁর নাম ছিলো কলম শেখ। পরে দাদার ঔরসে দাদীর এক ছেলে ও দুই মেয়ে জন্মায়। এ কারণেই আমার চাচা আমার দাদার সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী ছিলেন না। কিন্তু সেটেলমেন্ট জরিপের সময় আমার বাবা বিদেশ থাকায় আমার চাচা নিজেকে তাঁর সহোদর ভাই হিসেবে সেটেলমেন্ট পরচায় নিজের নাম দাখিল করিয়ে নেন। এর ফলে সম্পত্তি নীলাম হয়ে গেলে অংশীদার হিসেবে আমার চাচা সেই সম্পত্তি ডেকে আনতে পারতেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, তাঁর এবং বাবার জীবদ্দশায় সম্পত্তি নীলাম হয়নি।

এখন এমন এক সময়ে সম্পত্তি নীলাম হলো, যখন সম্পত্তির অংশীদারিত্বের যথার্থতা বিচার করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আমার চাচাতো বড়ো ভাই গোলাম রসুল, যিনি বাবার খুব আদরের ছিলেন এবং এ ব্যাপারে ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারতেন। তিনিও মৃত। আমার বড়ো ভাই গোলাম রাব্বানী, তিনিও সংসারের প্রতি উদাসীন। অন্তত এ সময়ে তাঁকে বাড়িতে খুব কমই দেখা গেছে। যে দিন নীলামের এই সংবাদ এলো, সেদিন আমি তাঁকে খুঁজতে গিয়েছিলাম আমাদের গ্রামের গোয়ালকান্দি পাড়ায়। সেখানে তিনি 'মা' নামের একটি যাত্রা পালার মহড়া দিচ্ছিলেন। শুধু নিজের মা ও ভাই বোনের দিকে ফিরে তাকাবার তাঁর কোনো ফুরসৎ ছিলো না।

অগত্যা মা আমাদের ফুফাতো ভাইদেরকে খবর পাঠালেন। আমার ফুফু ছিলেন দু'জন। তাঁদের বিয়ে হয়েছিলো ধারাকান্দি ও দইলা। তবে তুলনামূলকভাবে ধারাকান্দির ফুফাতো ভাইরাই আমাদের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। এর কারণও ছিলো। ধারাকান্দির ফুফু এক সময়ে আমাদের বাড়ি অর্থাৎ তাঁর বাপের বাড়িতেই থাকতেন। সেই সুবাদে আমাদের চাচাতো ভাই-বোনদের সাথে যেমন তাদের কিছুটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, তেমনি মামা অর্থাৎ আমার বাবার সাথে তাদের যোগাযোগও অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। নেত্রকোণার বাসায় আমার এক ফুফাতো ভাই শমসের আলীকে থাকতে দেখেছি। কিন্তু আলোচ্য সময়ে তিনি বিদেশে; সিলেটের শাহজালালের দরগার অন্যতম খাদেম। সুতরাং মা-র ডাকে আমার অন্য ফুফাতো ভাই আবদুল খালেক এগিয়ে এলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের জুইতের ঘরে রাতের বেলা এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যা আমার চেতনাকে এক নতুন প্রতিক্রিয়ায় জাগ্রত করে তুললো। সেদিন আমার শরীরটা খুব ভালো ছিলো না। আমি কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমি চিৎকার করে লাফিয়ে চৌকী থেকে নিচে পড়ি গেলাম। আমার মনে হলো, আমার ডান হাতটা কেউ যেন কেটে ফেলেছে, আমার চিৎকারে সবাই জেগে উঠলেন। বাতি জ্বালিয়ে আমার চিৎকারের কারণ আবিষ্কার করা হলো। সে আর কিছু নয়, আমার ডান হাতের বগলের কাছে অনেকটা জায়গা পুড়ে গেছে। কী করে পুড়লো? আগুন এলো কোত্থেকে? তাছাড়া শুধু আমার হাত নয়, কাঁথাটাও পুড়েছে।

নানা প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণে তারা যা আবিষ্কার করলেন, তা হলো তামাক খাওয়ার পরিণাম। সে রাতে আমার পাশে শুয়েছিলেন আমার এক ফুফু। তার নাম শবজান।

দাদী তাঁকে ছোট বেলা থেকে কাজ কর্মের জন্য পুষেছিলেন। বড়ো হলে তাঁকে পাশের বাড়িতে বিয়ে দেন। আলোচ্য সময়ে তিনি থুথুড়ে বুড়ী। কিন্তু তা হলেও তামাক খাবার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেননি। রাতের বেলা তিনি তামাক খেয়েছিলেন। তাঁর কাঁপা হাত থেকে কখন যে কল্‌কের আগুন আমার কাঁথার উপর পড়েছে, তা তিনি বুঝতে পারেন নি।

কিন্তু আমার চিৎকার তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন। কারণ সেই চিৎকার শুধু আর্ত চিৎকার ছিলো না। তার মধ্যে ফুফুর চৌদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধারের হুঙ্কারও ছিলো। অবশ্য অনেক কষ্টে হাত-পা ধরে ফুফু আমাকে বাগ মানালেন। কিন্তু আমি এই ঘরে আর শুতে চাইলাম না। তার চাইতেও বেশি করে আমার চেতনায় হুক্কার স্মৃতি প্রখর হয়ে উঠলো। নেত্রকোণার মিষ্টি ধোঁয়ার নেশা আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের ফলে আমি প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। কিন্তু কল্‌কের আগুন আমার সেই নেশার চেতনা নতুনভাবে জাগ্রত করে তুললো।

আর ঘরে না শোয়ার ব্যাপারটিও আমাদের পারিবারিক অবস্থানে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিলো। পরদিন খালেক ভাই এসে পৌঁছলে এ ব্যাপারটি প্রধান হয়ে উঠলো যে আমাদের একটি পৃথক, ঘরের প্রয়োজন। অথচ ন্যায়তঃ দাদীর ঘরের আমারই ছিলাম প্রধান অংশীদার। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার চাচাতো ভাই-বোনদেরই অন্যত্র সরে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার বহু দিন ধরে এ ঘরে আছে, তাই তারা এ ঘর ছাড়তে নারাজ। বরং আমরাই যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। সুতরাং আমাদেরকে সরে যেতে হবে। এর সঙ্গে সরে যাবার আরও একটি কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, সেটেলমেন্ট পরচায় আমার চাচা বাবার সহোদর হিসেবে ঠাঁই পেয়েছিলেন। এবার জমি নীলাম হবার পর আমার চাচাতো ভাইরা গোপনে সেই জমির নীলাম ডেকে এনে আমাদেরকে পথে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। এ ব্যাপারে যে সবচেয়ে বেশি তৎপর, তার নাম আবু সামা। আমার এই চাচাতো ভাইটির নাম যেমন ছিলো ঐতিহ্যবাহী, তেমনি দেখতেও সে ছিলো সুপুরুষ। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে সে ছিলো হজরত উমরের পুত্র আবু সামারই সমতুল্য। পরিণামও তাদের প্রায় একই রকম হয়েছে। হজরত উমর নিজের পুত্র আবু সামাকে চাবুক মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিলেন। আর আমার চাচাতো ভাই আবু সামার মৃত্যু বসন্ত রোগে। শুনেছি, তার অবস্থা এমন বিকট হয়ে উঠেছিলো যে মৃত্যুর সময় তার কাছে কেউই ছিলো না।

কিন্তু সে কথা থাক। আপাততঃ এরই প্রতিক্রিয়ায় সেই ঘরে আমাদের অবস্থান প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো। তাছাড়া এই চক্রান্তকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি নেবার জন্যও মা'র দূরে থাকা প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং খালেক ভাইয়ের প্রস্তাবে আমরা ফুফুর বাড়ি ধারাকান্দি বেড়াতে গেলাম। আমরা সেখানে থাকা কালেই খালেক ভাই আমাদের গাঁয়ের অনেকের সহায়তায় একটা প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। আমার প্রথম নিঃসন্তান

দাদীর ভাইয়ের নাতি ইয়াদ আলী ভাই এ ব্যাপারে খালেক ভাইয়ের সক্রিয় সহযোগী হয়ে উঠলেন। আমাদেরকে এক ভয়াবহ অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করা জন্য এঁদের প্রচেষ্টা সত্যিই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য।

আমি কিন্তু ধারাকান্দিতে গিয়ে একটি নতুন পরিবেশ পেলাম। এর মধ্যে সব চাইতে আকর্ষণীয় ছিলো একটি ছোট্ট নদী। তার নাম ফুড়িয়া। কেল্লা তাজপুরের পাশ ঘেঁষে ধারাকান্দিকে বেড় দিয়ে সে নদী বেরিয়ে গেছে। এর উপর ছিলো 'কাণার পুল' নামে একটি বিরাট বাঁশের সাঁকো। সেটি তখন আমার কাছে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মতোই একটি ব্যাপার। কারণ এই বিরাট উঁচু পুলটি যে তৈরি করতো, সে ছিলো অন্ধ। লোকে তাকে 'নসরকাণা' বলে ডাকতো। সুতরাং এমনি পরিবেশ আমাকে আবার সেই নেত্রকোণার নদী জড়ানো স্মৃতির জগতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। আমি নদীর পাড়ে পাড়ে তার জলে কাদায় অবাধে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

আমি আগেই বলেছি, ধারাকান্দির ফুফুকে আমি দেখিনি। তার স্থানে আমি পেয়ে ছিলাম খালেক ভাইয়ের বৌ-ভাবীকে। তিনি আমাকে খুব আদর করতেন। আমার ফুফাতো ভাইরা চার ভাই হলেও অন্যরা তখনও বিয়ে থা করেননি। ছোট দুইভাই— পণ্ডিত ভাই ও রুস্তম ভাই তখন বলশালী যুবক। তারাই গৃহস্থির সব কিছু দেখেন। এজন্যই খালেক ভাই অবাধে নানা কাজে সময় দিতে পারেন। এর ফলেই তিনি অল্পদিনের মধ্যে জমির নীলাম ডাকার বন্দোবস্ত করে ফেললেন।

আমরা ধারাকান্দিতে খুব সম্ভব মাস খানেক ছিলাম। এর মধ্যেই জানতে পারলাম, বাবার খরিদা সাতকাঠা জমির বিনিময়ে মার নামে সমস্ত সম্পত্তি নীলাম ডেকে আনার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এদিকে আমাদের ঘরের চাল বাঁধার কাজও এই ধারাকান্দিতেই আরম্ভ হয়েছে। আকালী ভাই নামে এক লোক সেই চাল বাঁধছে। অবশ্য আমার তখন এসব ব্যাপারে সময় দেবার অবসর খুব কমই হয়েছে। কারণ আমি তখন এমন আরও কিছু বিষয় আবিষ্কার করে ফেলেছি, যার কাছে এই জমির নীলাম আর ঘরের চাল তুচ্ছ হয়ে গেছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও একটি ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে যে তুলনামূলকভাবে এই ধারাকান্দিতে ভূত-সাপের প্রভাব বুঝি অনেকটা কম। অন্ততঃ নদীর পাড়ে বা বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর বেলায় সঙ্গী-সাথীরা এ ধরনের কোনো গল্প বলেনি। তা' না হলে ফুফুদের বাড়ির পিছনের জঙ্গলে যে দিন ইয়া মোটা বাঁশ দেখতে গেলাম, সেদিন একটা জুতসই ভূতের গল্প শোনা উচিত ছিলো। কিন্তু তেমন কিছুই শুনতে পেলাম না। তবু এতো মোটা বাঁশ, আমার ছোট দু'হাত দিয়ে তা বেড় দেয়া যায়, তার কিছু একটা গল্প থাকবে না!

আসলে এমনি একটি ধারণা আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিলো নানা ধরণের গল্প শুনেই। তাই শিশু মন বুঝে নিয়েছিলো যে বড়ো যা কিছু তার সাথে অন্য একটা শক্তির

যোগাযোগ আছেই। এ ধারণা দূর হতে বহুদিন লেগেছে আর ভূতুড়ে পরিবেশ সম্পর্কেও মোহ ভেঙেছে অনেক দিন পরে।

আপাততঃ সে কথা থাক। আমার না হয় শিশু সুলভ অস্থিরতার জন্য সময় ছিলো না. কিন্তু আমার বড়ো ভাই? না, তাঁকে এসব উদ্যোগের কোথাও দেখা যায়নি। অন্ততঃ আমার স্মৃতিতে তা ধরা পড়েনি। তাই আমার ফুপাত ভাই আর পাড়া পড়শীরাই আমাদের ঘর তোলার ব্যবস্থা করলেন। আমরা আমাদের বাড়িতে ফিরে এসে এই নতুন ঘরে প্রবেশ করলাম। এতে আমার চাচাতো ভাইবোন ছাড়া আর সবাই খুশি হলো।

তাদের নাখোশ হবার খুবই স্বাভাবিক কারণ ছিলো। কেননা ইতিমধ্যে নীলাম ডাকার খেলায় তারা হেরে গেছে। আমার দাদা আমার চাচাকে আলাদা বাড়ি জমি করে দিয়েছিলেন। সেই বাড়ি ও জমি আমার চাচাতো ভাইয়েরা নীলাম ডাকার জন্য বেচে ফেলে সব টাকা জমা দিয়েছিলো ম্যানেজারের কাছে। পরিণামে জমি যেমন তারা পায়নি, তেমনি টাকাও তারা ফেরৎ আনতে পারেনি। সুতরাং তারা যে আমাদের নতুন ঘরদোরের জন্য আনন্দ প্রকাশ করবে না, এই-ইতো স্বাভাবিক।

এই নতুন ঘরে কিছুদিন আমাদের ভালোই কাটলো। বড়ো ভাইকেও এসময় মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসতে দেখলাম। আর আমিও ভর্তি হলাম আমাদের গাঁয়ের ফ্রি প্রাইমারী স্কুলে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। রাতের বেলা ঘরের বেড়ায় ধাপুড়-ধুপুড় বাড়ি, ঘরের চালে ধুপ্-ধাপ ঢিল ইত্যাকার ভূতুড়ে কাণ্ড শুরু হয়ে গেলো। কারা এসব করছে, কেন করছে, তা বোঝা গেলো কিছু দিনের মধ্যেই। আমাদের ঘরে ইয়া বড়ো এক সিঁদ কেটে বাক্স-পেঁটরা আর কাপড়-চোপড় নিয়ে গেলো। জঙ্গলের ধারে সেই বাক্স পেটরা হাতড়িয়ে জমির যে নতুন বন্দোবস্তী দলিল পত্র ছিলো, তা চোরেরা নিয়ে অন্যান্য জিনিস ছত্রখান করে ফেলে রেখে গেলো। সমস্ত ব্যাপার মিলে এই একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে আমাদেরকে উত্যক্ত করে তাড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। মা একান্তই নিরীহ সরল মানুষ। এসব ব্যাপার দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। আমার চাচাতো ভাইরাই যে এর পিছনে রয়েছে, একথা সবাই বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু উপায় কী?

উপায় হলো। আমাদের পাড়া পড়শীরাই সে উপায় বের করলেন। যেমন মাথা তেমন কাঁকই না হলে চলে না। তাই বৈকুরহাটীর আমজাদ ভাইকে তারা খবর দিলেন। পরে শুনেছি, আমার বড়ো ভাইও সে সময় নাকি এই আমজাদ ভাইদের বাড়িতেই থাকতেন। আমজাদ ভাই নামকরা ডাকাত। আমাদের আত্মীয় না হলেও তার বাপ ছিলেন আমার বাবার খুব ভক্ত। সেই সুবাদে আমরা তাঁকে চাচা বলতাম।

আমরা নেত্রকোণা থেকে বাড়িতে আসার পর আমজাদ ভাই নাকি অনেকবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন। কিন্তু তখন এতোটা লক্ষ্য করিনি। এবার তার আগমন সত্যি লক্ষ্যগোচর হয়ে উঠলো। তিনি আমাদের তিন ভাই বোনের জন্য নতুন কাপড় নিয়ে এলেন। সাদা কাপড়ের তৈরি আমার সেই পাজামা পাঞ্জাবী এখনও যেন আমার চোখে লেগে আছে।

আমি তখন অবলীলায় বলেছিলাম, 'আপনার কাছে থাকবো।' বস্তুতঃ মাওইর কাছে আমি কতোখানি আদর পেয়েছিলাম, এই একটি কথাই তার সাক্ষ্য হয়ে আছে। কারণ আমাদের অভাব অনটনের সংসারে যখনই খাবার থাকতো না, আমি মাওইর কাছে গিয়ে উপস্থিত হতাম। নিজে খেয়ে আসতাম আর সঙ্গে কিছু নিয়েও আসতাম। তার চাইতে বেশি করে মায়ের তাড়া খেয়ে মাওইর ওখানে গিয়েই নির্ভয়ে আশ্রয় নিতাম।

আমি ইতিপূর্বে বড়ো বাড়ির লোয়াই মুনশীর কথা বলেছি। তাঁরই চাচাতো ভাই ছিলেন নুরবক্স তালুকদার। তাঁর একমাত্র পুত্র মৌলবী আব্দুল জব্বারের সাথে ছিলো আমার বড়ো ভাই গোলাম রাব্বানীর দোস্তি। সেই সুবাদে তাঁর মাকে আমরা মাওই বলতাম। সেই মাওইর নিকট থেকে এসব কথা শুনেও যে আমি খুব ভালো ছেলে হয়ে উঠিনি, তার কারণ আমার ওই উত্তরের মধ্যেই ফুটে উঠেছিলো। কারণ পারিবারিক চিন্তা তখন বড়ো হয়ে না উঠারই কথা। আর যে মা মাওইর মতো সচ্ছল নয়, যখন তখন যা-তা দিতে পারেনা, সে মায়ের চাইতে মাওইর দরদ যে বেশি হবে, সেতো সর্বকালের জানা কথা!

কিন্তু আমার মা, আমার গর্ভধারিণী জননী; তাঁর ঋণের কি কোনো তুলনা আছে! তাঁকে আমি ইতিপূর্বে বলেছি সর্বংসহা; সত্যি তিনি সর্বংসহা ছিলেন। তা না হলে এই শত্রুতার মাঝে আমাদের মতো কয়টি অপোগণ্ড শিশু নিয়ে স্বামীর ভিটে আঁকড়ে ধরে তিনি বাঁচতে চেষ্টা করতেন না। সচ্ছলতার ডাক তো তাঁর কাছে এসেছিলো। সেই ডাকে তিনি সাড়া দিলে বাকি জীবন প্রাচুর্যের মধ্যেই কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর এই তিনটি অপোগণ্ড-সন্তানের কী হবে, সে কথা ভেবেই তিনি সেই সুখের প্রস্তাব ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখানেই তো মা অন্য সকলকে ছাড়িয়ে যান, সকলের সকল দাবীকে হারিয়ে দেন।

তাইতো প্রবচন বলে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—জননী আর জন্মভূমি স্বর্গের চাইতেও মর্যাদাবান। ধর্ম বলে, 'আলজান্নাতু তাহ্‌তা আক্‌দামে উম্মেহাতে কুম'—বেহেস্ত তোমাদের মায়ের পায়ের নিচে অবস্থিত।

থাক সে কথা। কারণ সে কথা আজ যতোটা বুঝতে পারি, তখন কি বুঝেছি। বুঝলে মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে সংসারের কাজ ফেলে সর্বোপরি লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিনে রাতে এমন ঘুরে বেড়াতাম না। কোথায় ঘাটুগানের আসর, কোথায় ষাঁড়ের নাড়াই, কোথায় বিড়ি খেলার জুয়া, এসব নিয়ে মেতে থাকতাম না। তখন কী আবেগ নিয়েই না এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি!

আমাদের পাড়ার পশ্চিমে আছে একটি বিল। সেই বিলের পাড়ে মর্তুজ আলী ভাইদের বাড়ি। সেখানেই রাতের বেলা ঘাটু গানের আসর বসেছে। আমি অনেক আগেই সেখানে গিয়ে হা করে বসে আছি। শেষে সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঘরের মাঝখানে আসরে নামলো একটি কিশোরী। সে গাইছে, নাচছে আর গোল হয়ে বসা

দর্শক শ্রোতারা মাঝে মাঝে হা হা করে উঠছে। ঢোলক, হারমুনি আর খুঞ্জুরীর বাজনার তালে তালে লম্বা লয়ের সে এক প্রকার গান; শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচের মধ্য দিয়ে তার কলি ফিরে ফিরে আসে।

পরদিন সকাল বেলা দেখলাম আমাদের পশ্চিমের বাড়ির বৈঠকখানায় সেই মেয়েটি শুয়ে আছে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম, মেয়ে মানুষ এমন খোলা মেলা বৈঠক খানায় শুয়ে আছে! ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম কাছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওরতো পরণে লুঙ্গি আর সার্ট—নির্বিকার ঘুমিয়ে আছে।

বিকাল বেলা দেখলাম, বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি মেয়ে?'

আমার প্রশ্ন শুনে সে খেঁকিয়ে উঠলো। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা—'মেয়ে না হলে মাথায় লম্বা চুল রেখেছো কেন?'

এবার সে আমাকে তেড়ে মারতে এলো। কিন্তু আমার নাগাল পাওয়া তো সহজ নয়। আমি তিন লাফে পিছিয়ে এসে মাটিতে পড়ে থাকা বাঁশের একটা বাখারি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলাম তার দিকে। সেই বাখারি গিয়ে আঘাত করলো তার পায়ে। আর যায় কোথায় সে চেঁচামেচি আর গালাগালি করে মানুষ জমিয়ে ফেললো। অবশ্য কেউ কিছু বলবার আগেই আমি পালিয়ে গেলাম।

পরে শুনেছিলাম যে, এই ঘাটু ছোকরাগুলি আসলে খুব দেমাগী হয়। এরা মাথায় লম্বা চুল রাখে আর মেয়ে লোকের মতো সাজগোজ করে গান গায়। এজন্য এরা যেমন মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়, তেমনি সবাই এদেরকে খুব আদর করে। এছাড়া আরও এমন সব কথা, যা গোপন ব্যাপার বলে গোপনে থাকাই ভালো।

অবশ্যি আমাদের গ্রামীণ জীবনে ঘাটুগানের প্রচলন এখন আর নেই। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, গ্রামের মানুষ ধার্মিক হয়ে উঠেছে; বরং যে সচ্ছলতা এক সময়ে এই সব গানের আসর জমিয়ে তুলতো,তারই অভাব ঘটেছে। এর উপর রেডিও ট্রানজিস্টর এসে গ্রামীণ চিত্তবিনোদনের ধারাটাই বদলে দিয়েছে। এজন্যই কবি গানের আসরও এখন আর বসে না।

বৈকুরহাটীর বাজারের পশ্চিম দিকের রাস্তার পাশের ধান ক্ষেতগুলিতে প্রায় প্রতি বছর ষাঁড়ের নাড়াইর আড়ঙ্গ বা কবি গানের আসর বসতো। সারারাত, এমনকি সারাদিনও চলতো এই আসর। মাথার উপর বড়ো আকারের চাঁদোয়া টানিয়ে মাটির উপরেই আসরের ব্যবস্থা হতো। একাধিক কবি তাদের দলবল নিয়ে এই আসরে এসে উপস্থিত হতেন। কবির লড়াই ছিলো সব চাইতে আকর্ষণীয়। এ সময়ে মধু সরকারের নাম শুনেছি বলে মনে পড়ছে।

কিন্তু কবির লড়াইর চাইতে ষাঁড়ের লড়াই ছিলো অধিকতর আকর্ষণীয়। এতে লোক ও জমতো প্রচুর। শুধু বৈকুরহাটী নয়, বীর আহমদপুর, এমন কি বারহাট্টার কাছে আলমপুরেও ষাঁড়ের নাড়াইর দেখতে গিয়েছি। নাড়াই দিনে সারা গাঁয়ে সাজ সাজ রব

পড়ে গেছে। যার বাড়িতে ষাঁড় আছে, সেখানেতো বিরাট হৈচৈ। ষাঁড়কে সাজানো হচ্ছে, পড়া তেল দিয়ে শরীর মেজে দেয়া হচ্ছে, কাঁচ ভাঙ্গা দিয়ে শিং দুটি ধার করা হচ্ছে। আর আমরা শত তাড়া খেয়েও সেগুলি দেখার জন্য ভীড় করে দাঁড়াচ্ছি। তারপর সময় হয়ে এলে সেই সাজানো ষাঁড় নিয়ে দল বেঁধে আড়ঙ্গের দিকে যাওয়া। এই যাওয়ার মধ্যেও আকর্ষণ আছে; দ্যাখো, আমাদের পাড়ার, আমাদের গাঁয়ের ষাঁড় যাচ্ছে—এমনি একটাভাব মনের মধ্যে নিয়ে বাজনার তালে তালে পথ চলতে বেশ আনন্দ। দূরের পথে কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করলো, 'কার ষাঁড় যায় গো?'

অমনি চিৎকার করে উত্তর দিলো কয়েকজন, 'মজিদ তালুকদারের!

বস্তুতঃ ষাঁড় পালাটাই তখন ছিলো গর্বের ব্যাপার। জমিদারের যেমন হাতী, গৃহস্থের তেমনি ষাঁড়। আমাদের পাড়ার বড়ো বাড়িতেও এমনি একটি ষাঁড় ছিলো। কালো কুচকুচে তার গায়ের রং আর শিং দুটি বেশ বড়োসড়ো। সেই ষাঁড়ের ছবি এখনও আমার চোখে লেগে আছে। কিন্তু সব চাইতে বেশি মনে পড়ছে তেঁতুলিয়ার একটি ষাঁড়ের কথা। কাজলা রংয়ের বিরাট আকারের সেই ষাঁড়টির মাথায় ছিলো বাঁকানো শিং। সেটি যেদিন আলমপুরের আড়ঙ্গে বৈকুর হাটীর একটি ছোট ষাঁড়ের সাথে হেরে গেলো, সে দিন তো আমি প্রায় হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলাম!

তখন সবকিছু দেখবার, সব কিছু জানবার এমন একটা আকর্ষণ ছিলো, যার টানে বাড়ির কথা ভুলে গিয়ে আমি এমনি সব আসরে আর আড়ঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর মা রাগ করে করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তখন শাসনের কোনো উদ্যোগ নেয়া মাত্রই আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছি; রাতের বেলাও ফিরিনি। হয়তো মাওইর কাছে, নয়তো অন্য কোথাও স্থান করে নিতে খুব বেগ পেতে হয়নি।

এমনি পালিয়ে বেড়ানোর সুবাদে আরো একটি ব্যাপারের সাথে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেটি হলো বিড়ির জুয়া খেলা। বিড়ি খাওয়ার অভ্যাসতো এর পূর্ব থেকেই ছিলো। কিন্তু বিড়ি কেনার পয়সা খুব সহজে জুটতো না। তাই এভাবে বিড়ি পাওয়ার একটি সহজ পথ বেরিয়ে আসায় আমি তাতেই মত্ত হয়ে গেলাম। অনেকদিন যা সাথে থাকতো সবই হেরে বসতাম; আবার অনেক দিন জেতা বিড়ির বোঝা বিলিয়ে দিয়েও শেষ করতে পারতাম না।

এসময়ে আমি তাস খেলাও শিখে ফেলি এবং নানা প্রকার দুষ্টামিতে উস্তাদ হয়ে উঠি। এ ধরনের দুষ্টামির একটি ঘটনা বেশ মনে পড়ছে। শবজান ফুফুর কথা এর আগে বলেছি। সেই যে যার কল্‌কের আগুনে আমার হাত পুড়ে গিয়েছিলো। তাদের বাড়ির সামনে ছিলো একটি বিরাট কাঁঠাল গাছ। তার কোঠরে হুতুম প্যাচা বাচ্চা তুলেছিলো। বিরাট দুটি কুৎকুতে বাচ্চা। আমি একদিন গাছে উঠে সেই বাচ্চা দুটিকে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম। চারদিকে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা এসে জড়ো হলো; অনেকে এসে এসব না করার উপদেশও দিলো, কিন্তু আমি সব কিছু উপেক্ষা করে অসহায় বাচ্চা দুটিকে আরও বেশি করে ঝুলাতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমার ফুফাতো বোন লাঠি নিয়ে এলো

আমাকে মারার জন্য। কিন্তু আমার কাছে পৌছার আগেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে আমি পালিয়ে গেলাম। পরে অবশ্যি রাতের বেলা ফুফুদের বেশ কয়টি চারা গাছ কেটে ফেলে এর শোধ নিয়েছিলাম। এমনি ধরণের দুষ্টামির আরও বিচিত্র উদাহরণ জড়ো হয়ে উঠেছিলো।

স্কুলে যাই না, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই, জুয়া-তাস খেলি, দুষ্টামি করি, কেউ বারণ করলে তার ক্ষতি করি; সুতরাং আমি যে বখে গেছি, একথা তখন প্রায় সবার মুখ থেকেই শুনতে হয়েছে। কিন্তু এসব কথায় আমার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। কারণ যে সচ্ছলতা ও শাসন একত্র থাকলে আমাকে একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে ধরে রাখতে পারতো, সেটাই ছিলো না। অভাবের তাড়নাই আমার স্বভাবকে এমন বেপরোয়া করে তুলেছিলো।

এমনি অবস্থায় আমার নিরুপায় মা শেষ পর্যন্ত আমার চাচাতো ভাইদের সাথে একটা সন্ধির ব্যবস্থা করেন। কারা, কীভাবে মধ্যস্থতা করেছিলো জানি না, মা তাদেরকে। চার কাঠা জমি লিখে দিলেন। সেই জমি রেজেস্ট্রী করার দিন মায়ের পালকির সাথে সাথে আমিও গৌরীপুর এসেছিলাম। বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম একটি নতুন চেতনা নিয়ে।

তৃতীয় তরঙ্গ ।।

ইতিপূর্বে আমার জন্মের কথা বলার সময় আমার মাতুল বাড়ির কথা উল্লেখ করেছি। নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানার কাউরাট গ্রামের আগপাড়ায় সেই মাতুল বাড়ি। আমার মাতুলরা খাঁ বংশ। তাঁদের পূর্ব পুরুষের কে, কখন, কীভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তার কিছুই আমি জানি না। শুধু এই বংশেরই তিনটি নাম আমার স্মরণে আছে—আমধর খাঁ, কামধর খাঁ ও জমধর খাঁ। তাঁরা তিন ভাই, তাঁদের মধ্যে কামধর খাঁ-ই ছিলেন বেশ প্রতিপত্তিশালী। তাঁর ছেলে মাফিজ খাঁ পরবর্তীকালে এই প্রতিপত্তির অনেকখানি পেয়েছিলেন। মাফিজ খাঁয়ের ছেলে কফিল উদ্দিন খাঁ এখন কিশোরগঞ্জ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা।

আমার নানার নাম মিয়াফর খাঁ। তিনি আমধর খাঁর একমাত্র পুত্র। তিনি মাফিজ খাঁর বোন অর্থাৎ চাচাতো বোনকে বিয়ে করেন। তাঁর তিনটি মাত্র মেয়ে, কোনো পুত্র সন্তান ছিলো না। আমার মা ছিলেন এই তিন মেয়ের সকলের বড়ো। তাঁর ডাক নাম ছিলো 'তামশার মা', আর পোশাকি নাম 'আলতাফুন্নেসা'। আমার বড়ো খালার নাম 'ফিরোজের মা', আর ছোট খালার নাম 'আঙ্গুরের মা'। তাঁদের পোশাকি নাম ছিল, আমার জানা নেই ছিলো বড় খালা—রাহাতুন্নিসা (মেজো বোন), ছোটখালা—আমিনা আক্তার খাতুন (জন্ম : ১৯১৯)।

শুনেছি, বাবা তখন কাউরাটের পাশেই নওপাড়া হাইস্কুলে মাস্টারি করেন। লজিং থাকেন কাউরাটের মুনশী বাড়ির পাশের বাড়িতে। মুনশী বাড়ির জয়নাল আবেদীন মুনশী ছিলেন বেশ নামকরা ধার্মিক লোক। তাঁকে আমি দেখেছি। তাঁর মুখে এবং আরও অনেকের মুখেই শুনেছি যে তখন মুনশী বাড়ির চাইতে পাশের ছবিল উদ্দিন মাস্টারের বাড়ি ছিলো বেশ সচ্ছল। সেখানেই বাবা লজিং থাকতেন। পরে অবশ্য মুনশী সাহেবের ছেলেরা নানা দিকে সুনাম ও সচ্ছলতার অধিকারী হন। তাঁর বড়ো ছেলে হাফিজুর রহমান এক সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। এই হাফিজুর রহমান বাবার খুব ভক্ত ছাত্র ছিলেন।

নওপাড়া তখন বর্ধিষ্ণু হিন্দু জমিদার প্রধান গ্রাম। এই জমিদাররা আকৃতিতে ছোট হলেও প্রকৃতিতে কম দাপটী ছিলেন না। তাই তাঁদের কাছে মর্যাদা লাভ করাটা ছিলো দর্শনীয় ব্যাপার। বাবা তাঁর চাল-চলন ও আদব-কায়দা দিয়ে সেই দর্শনীয় ব্যাপারটিই সম্ভব করে তুলেছিলেন। এর একটি কারণ সম্ভবতঃ বাবা ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় পড়ার সময় ঢাকার নবাব বাড়িতে লজিং থেকেছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে এই গ্রাম্য জমিদারদের মনোরঞ্জন খুব সহজ হয়ে উঠেছিলো। এ ছাড়া তিনি ছিলেন বৈঠকী মেজাজের মানুষ। কোনো বৈঠকে তাঁর কণ্ঠস্বর শুধু নয়, তাঁর বক্তব্যও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বাগ্মী হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাছাড়া বন্ধু বৎসল হিসেবেও তিনি ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। একারণেই তিনি শুধু নওপাড়া নয়, কাউরাটেও একটি অনুরাগী বান্ধবের পরিবেশ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

কাউরাটে তাঁর এমনি এক বন্ধু ছিলেন মনসুর উদ্দিন বেপারী। পরে তিনি আমার বড়ো খালাকে বিয়ে করেন। সম্ভবতঃ তিনিই সর্ব প্রথম অকৃতদার আমার বাবার বিয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু খাঁ বাড়ি তখন সচ্ছলতায় দাপটে অনেকটা উন্নাসিক। তাই বিয়ের প্রস্তাব তাঁরা খুব সানন্দে গ্রহণ করেননি। এরপর এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাতে আমার নানা এই বিয়ের ব্যাপারে রাজি হয়ে যান।

ঘটনাটি হলো, আমার নানা একদিন কোনো কাজে নওপাড়ার এক জমিদার বাড়িতে এসেছিলেন। নানা তখন সেখানে সম্মানিত আসনে চেয়ারে বসে আছেন। সাথে জমিদার ভবনের আরও অনেকেই বসা। হয়তো কোনো বিষয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছিলো। এমন সময় বাবা আমার নানাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাথীরা তাঁকে বসতে বলছেন, কিন্তু বাবা না বসে বললেন, 'তিনি আমার মুরুব্বী, তাঁর সামনে আমি চেয়ারে বসতে পারি না।'

অগত্যা বাবার মর্যাদা রক্ষার জন্যই জমিদারের প্রজা আমার নানার জন্য আসনের ব্যবস্থা করতে হলো। কারণ প্রজা যতো সচ্ছল আর মর্যাদাবান হোক না কেন, সেতো প্রজাই; জমিদার বাড়িতে তার নির্দিষ্ট আসনেই তাকে বসতে হতো এবং সে আসন অবশ্যি মর্যাদার ছিলো না। তাই আমার প্রায় নিরক্ষর শান্ত শিষ্ট নানা এই ঘটনায় খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। এর ফলে ছোট চাচাতো ভাই শ্যালক মাফিজ খাঁর উন্নসিকতাকে এড়িয়ে তিনি নিজেই বিয়ে দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন।

একদিন তিনি কাউকে কিছু না বলে একাকীই চলে আসেন আমাদের বাড়ি বীর আহমদপুরে। বাড়িতে তখন আমার দাদী বলতে গেলে একা, কিন্তু খোঁজ পেয়ে হাঁক ডাকে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যে, আমার নানা খুশি না হয়ে পারেননি। ফলে খুব তাড়াতাড়িই বিয়ের দিন তারিখ ধার্য হয়ে যায়। আর আমার বাবাও খাঁ বাড়ির মর্যাদা রক্ষা করে পৈতৃক বারো কাঠা জমি বিকিয়ে দিয়ে বেশ ধুম-ধামের সাথেই বিয়ে করেন। বাংলা ১৩২০ সনে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর বাবা শ্বশুর বাড়িতে থেকেই নওপাড়া হাইস্কুলের মাস্টারির কাজ করতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে শূল বেদনায় এমনভাবে আক্রান্ত হন যে, চিকিৎসার জন্য তাঁকে সুদূর লক্ষ্ণৌ যেতে হয়। সেখান থেকে শুধু রোগের চিকিৎসা নয়, তিনি নিজেও চিকিৎসক হয়ে ফিরে আসেন। সেই সুবাদে নেত্রকোণায় আমার শৈশবের কাহিনী আমি শুরুতেই বলতে চেষ্টা করেছি। সেখানে আমি এ কথাও বলেছি যে, আমার বাবার আয় সীমিত হলেও তাঁর পোষ্যের সংখ্যা কম ছিলো না। আমার মামা কফিল উদ্দিন খাঁ সেখানে থেকেই আঞ্জুমান হাইস্কুলে লেখাপড়া করেছেন। এছাড়াও কাউরাটের আত্মীয় স্বজনদের ভীড় আমাদের বাসায় লেগেই থাকতো। কিন্তু অবস্থা

বিপর্যয়ে আমরা যখন দেশের বাড়ি আমুদপুরে এসে পৌছলাম, তখন এই মাতুলালয়ের কারোর উপস্থিতি কোথাও লক্ষ্য করিনি। তারা আমাদের খোঁজ খবর নিতেন কি-না, তেমন কোনো তথ্য আমার স্মৃতিতে ধরা পড়েনি। আমার দুই খালুর বাড়িই কাউরাটে । বড়ো খালুর কথা তো পূর্বেই বলেছি। ছোট খালুর নাম গওহর আলী মাস্টার। কিন্তু তাঁদের কাউকেই দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মার মুখেও এ নিয়ে কোনো অভিযোগ শুনিনি।

সুতরাং এ ধারণা করা যায় যে, মা তাদের দিক থেকে নিরাশ হয়েই আমার চাচাতো ভাইদের সাথে একটা আপোষ রফা করে নিয়েছিলেন। এরপর পারিবারিক পরিবেশে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। কিন্তু এর সবটাই ছিলো মানসিক। অন্তত মার জন্য কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটানোর ভাব এসেছিলো। আর এ কারণেই আমার উপরও এর কিছুটা প্রভাব পড়েছিলো। আমার চাচাতো বোনেরা এ সময়ে বেশ কাছে এসেছিলো। এ সময়েই পক্ষীবুজির বিয়ে হয়ে যায়। চাচাতো বড়ো বোন মোগলীবুজি বরাবরই আমাদের দিকে ছিলেন, এবার তাকে আরও ঘনিষ্ঠ হতে দেখি। সুতরাং এসব প্রভাবের ফলে আমি আবার ঘাটুরকোণা প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হই। সেই স্কুলে কতোদিন গিয়েছিলাম, ঠিক মনে নেই। তবে স্কুলের কোনো এক বার্ষিক প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে আমি এমন কান্নাই কেঁদেছিলাম যে, কর্তৃপক্ষেকে সান্ত্বনা পুরষ্কার দিয়ে সে কান্না থামাতে হয়েছিলো।

ইতিমধ্যে মহামারী আকারে দেখা দিলো ম্যালেরিয়া জ্বর। সেটা ১৯৪০-এর প্রথম দিক, কাঁঠাল পাকার সময়। সে বছর গাছের কাঁঠাল খাবার লোক ছিলো না। প্রত্যেক বাড়িতে সার বেঁধে লোকজন জ্বরের চোটে হি হি করছে আর যে দু'এক জন বাইরে আছে, তারাও ভয়ের চোটে আধমরা। একমাত্র আমিই দিগ্বিজয়ী বীরের মতো ঘুরে বেড়াই আর এগাছ ওগাছ থেকে ইচ্ছা মত কাঁঠাল খাই। আশ্চর্যের ব্যাপার, পাড়ার প্রায় সবাইকে ম্যালেরিয়া অল্প বিস্তর ছুঁয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত আমাকে স্পর্শ করতে সাহস পায়নি।

এ সময়েই সাবুদ আলী ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। এই সাবুদ আলী মুনশী আমার আরবি অক্ষর জ্ঞানের প্রথম শিক্ষক। আমার প্রথম দাদীর চাচাতো ভাইয়ের নাতি সে। তাই তাঁর সাথে পরিচয় আগেই হয়েছিলো। হঠাৎ একদিন তাঁদের বাড়ির কাছে এমন একটি ঘটনা ঘটলো, যার মধ্য দিয়ে সাবুদ আলী ভাইয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে গেলো।

ম্যালেরিয়া প্রকোপ তখনও কমেনি। কিন্তু ইতিমধ্যেই পাটগাছ মাথা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছে। সাবুদ আলী ভাইদের বাড়ির পাশেই ছিলো এক বিরাট পাটক্ষেত। একদিন ভোরবেলা সেই পাট ক্ষেতের পাশে হৈচৈ কাণ্ড। দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বেশ কিছু লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে পড়ে আছে এক বিরাট সাপ।

এতো বিরাট যে, এর আগে শুধু আমি নই, অনেকেই এমন বিরাট সাপ দেখেনি। সাবুদ আলী ভাই একাই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে এই সাপটিকে।

অবশ্য সব ঘটনা শোনার পর এই বিস্ময়ের ভাব অনেকটাই কেটে গিয়েছিলো। কারণ সাবুদ আলী ভাই যখন সাপটার খোঁজ পেয়েছে, তখন সে আধ মরা। সন্ধ্যার পরে বরাবরের মতো আহারের খোঁজে বেরিয়েছে সাপটি। সামনে পড়েছে একটি চিকা বা ছুঁছো। খপ করে তাকে মুখের ভিতর টেনে নিয়েছে ক্ষুধার্ত এই দাঁড়াস সাপ। কিন্তু ছুঁছোর গন্ধতো বিকট, তারপর মুহূর্তেই তাকে উগলে ফেলে দিতে গিয়ে ঠেকে গেছে বেচারা। মুখের দাঁতের সাথে বেধে গিয়ে ছুঁছো তার মুখের মধ্যে স্থায়ী হয়ে উঠেছে। আর সাপটি এই আপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সারারাত পাট ক্ষেত্রের মধ্যে দৌড়ে বেড়িয়েছে।

সাবুদ আলী ভাই বললো, 'আমিতো ভেবেছি কার গরু বুঝি পাট ক্ষেতে ঢুকে তছনছ করছে। হৈ হৈ করে তাড়াবারও চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়নি। তারপর নিরুপায় হয়ে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। সকাল বেলা পাটক্ষেত্রের অবস্থা দেখতে গিয়ে দেখি, সারা রাত যে হুড়মুড় করেছে, সে তো গরু নয়, সাক্ষাত আজরাইল। বাড়ির পিছনের বড়ো তেঁতুল গাছটার গোড়াতেই থাকতো বেচারা। এর আগে অনেকেই তাকে দেখেছে, কিন্তু মারতে সাহস পায়নি। এবার বেঘোরে মারা গেছে।'

সত্যিই এতো বড়ো একটা সাপকে এমনিতে মারা খুবই কঠিন হতো। কিছুদিন পরেই এমনি একটি অভিজ্ঞতা হলো। তখন পাট কাটা শেষ হয়ে গেছে। আমরা কয়েকজন ভূটিয়ারকোণার বাজার থেকে ফিরছি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। রাত যে খুব বেশি হয়েছে, তা নয়; কিন্তু চারদিক নীরব। পথে একটা খাল পেরিয়ে একটি বাড়ির সামনে বিরাট পাটখড়ির একটি পালা, সেটি পেরিয়ে আসতেই দেখি রাস্তার উপর একটি বিরাট সোনার হার পড়ে আছে; চাঁদের আলো পড়ে সেটি চিক্ চিক্ করছে। আমিতো দেখেই 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। পিছনে যে ছিলো, সে আমাকে টেনে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সেই হারটি ধীরে ধীরে নিচের ক্ষেতে নেমে যাচ্ছে। সেখানে তখন আট-দশজনের একটি ভীড়। কিন্তু কেউই এই বিরাট সাপটি মারার জন্য এগিয়ে গেলো না। এটিও নাকি একটি দাঁড়াস সাপই ছিলো।

এমনি একটি বিরাট আকারের শঙ্খিনী সাপ দেখেছিলাম আমাদের গাঁয়ের পশ্চিম পাড়ায়। কলাগাছ ফেলে সেটিকে মারা হয়েছিলো। শুধু কি সাপ, সাপে কাটা মানুষও ছিলো দর্শনীয় ব্যাপার। এমনি কোনো ব্যাপারের কথা শুনতে পেলে আমি নাওয়া-খাওয়া ফেলে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতাম। এ সময়ে পাশের গাঁও ঝল্মলায় একটি সাপে কাটা মানুষকে সাতদিন ধরে ঝাড়া হয়েছিলো। সরিষাহাটীতেও এমন এক কাণ্ড ঘটেছিলো। পশ্চিমপাড়ায় কড়ি চেলে সাপ আনার কথাশুনে সে কী লোকজনের ভীড়। সেইসব ভীড়ের আমিও একজন।

সুতরাং স্কুলে ভর্তি হলেইবা কী, আমার সময় কোথায়! এর উপর আছে ফুটবল খেলা। আশে পাশে সব খেলাতেই আমার উপস্থিত থাকা চাই তাছাড়া নিজেও তখন খেলা শিখে ফেলেছি। জাম্বুরাকে গরম জলে কিছুটা নরম করে তাই নিয়ে চলছে আমাদের খেলা। পাড়ায় পড়ায় টীমে টীমে সে কী উত্তেজনা!

এর মাঝে একদিন সকাল বেলা সাবুদ আলী ভাই এসে উপস্থিত। সে আমাকে অজু করালো এবং উঠানের এক পাশে মুসলার (জায়নামাজ) উপর আরবি কায়দা সামনে রেখে আলেফ, বে, তে, ছের সবক দিলো। আমি বেশ শান্ত সুবোধ ছেলের মতোই সেই সবক বা পাঠদান গ্রহণ করলাম। পরপর বেশ কয়েকদিন আরবি অক্ষর শেখা আর জের জবর পেশ বা ইকার, আকার, উকার মিলিয়ে সুর করে পড়া আমাকে মাতিয়ে রাখলো। কিন্তু কায়দা শেষ করা আমার হয়ে উঠেনি। কারণ সাবুদ আলী ভাই যেমন নিয়মিত আসতো না, তেমনি আমাকেও তা বেশি দিন আটকে রাখতে পারলো না। আমি আবার নিজের জগতে ফিরে গেলাম।

আসলে পরে বুঝেছিলাম, আমাকে আরবি পড়ানো ছিলো সাবুদ আলী ভাইয়ের একটি উপলক্ষ মাত্র। সে আমাদের বাড়িতে আসতো মার কাছে জোলা টাকা ও সখের কাপড় রাখতে। টাকার চেহারা না দেখলেও কাপড়গুলি আমি দেখেছিলাম। একটি সুন্দর তবন ও পাঞ্জাবী। তবনটির দাম পাঁচসিকা আর পাঞ্জাবীটির দাম পৌনে দুই টাকা—এই তিন টাকার কাপড়। কিন্তু এই কাপড়ই সে লুকিয়ে রাখতো অন্য বাড়িতে। কারণ বাড়ির অন্য ভাইয়েরা এই বাবু গিরির কথা জানতে পারলে মহা অনর্থ ঘটাবে। তাই আমাকে পড়ানোর ছুতো তৈরি করে সে আমাদের বাড়িতে আসতো, যাতে কেউ কোনো সন্দেহ করতে না পারে।

ঝগড়া লাগারই কথা। কারণ ধানের মন সাত আট টাকা, চালের মন দশ বারো টাকা। ছ'আনা হলে একটি ভালো লুঙ্গি পাওয়া যায়, বারো আনা দিয়ে একটি সার্ট অথবা পাঞ্জাবী অনায়াসে বানানো চলে। তাছাড়া দু'আনায় পাওয়া যায় চারহাতী বিরাট গামছা, যা তবনের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। এমন অবস্থায় এই তিন টাকার কাপড় যে গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে, তাতো বলাই বাহুল্য। কারণ তখন তাদের চার ভাই একত্রে গৃহস্থির কাজ করে।

এভাবে আমার আরবি পড়ার অবস্থা যাই হোক্ না কেন, সাবুদ আলী ভাইয়ের পোশাকি কাপড়ের প্রভাব আমার উপর ঠিকই পড়েছিলো এবং কিছুদিন পরে এক টাকা দিয়ে আমিও একটি লুঙ্গি কিনেছিলাম। সিঙ্গাপুরী সেই বাচকোনা লুঙ্গীতে পানি বেঁধে আনা যেতো। আর তার মাড়ের গন্ধ পচা ডিমের মত এমন বিকট ছিলো যে, তা এখনও আমার নাকে লেগে আছে।

এই লুঙ্গী কেনার টাকাটি যে কারণে আমার হাতে এসেছে, সেই কারণটি এখানে উল্লেখ করা দরকার। কারণ এটি আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের অন্য একটি দিক। ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, চাচাতো ভাইদেরকে জমি লিখে দেবার ফলে আমাদের

পরিবারে কিছুটা মানসিক স্বস্তি দেখা দেয়; কিন্তু তাতে আর্থিক অসঙ্গতির কোনো সুরাহা-ই হয়নি। এ সময়ে মা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুকে একটা দুম্বলের মতো হয়ে বেশ কিছু দিন তাঁকে শয্যাশায়ী করে রাখে এবং শারীরিক দিক থেকে তিনি দুর্বল হয়ে যান। তাছাড়া অনবরত বিশুদ্ধ পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করতে করতে কিছুটা ক্লান্তিও তাঁকে ঘিরে ধরতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অনেকটা নিরুপায় হয়েই তিনি জমি বিক্রি করতে আরম্ভ করেন। এছাড়া অন্য কোনো পথ তার সামনে খোলাও ছিলো না। সুতরাং এবার বাজার সওদার দায়িত্বে নিয়োজিত আমার হাতে নগদ টাকা পয়সার আমদানি ঘটে এবং এরই ফলে আমার সেই সিঙ্গাপুরী লুঙ্গী কেনা সম্ভব হয়।

এমনি ভাবে জমি বিক্রি করে কিছুটা সচ্ছলতা দেখা দিলেও মা বেশি ধান চাল কিনে বাড়িতে জমিয়ে রাখতেন না। তার কারণও সুস্পষ্ট। তাই আমাদের খোরাকীর অধিকাংশ ধান চাল কেনা হতো ধারাকান্দিতে। আমি সপ্তাহে সপ্তাহে গিয়ে সেই ধান চাল নিয়ে আসতাম। এমনি একদিন চালের বোঝা নিয়ে আসার সময় আমাদের বাড়ির পিছনের দিকের খালের পাড়ে বাঁধের উপর পা পিছলে সেই বোঝা আমার মাথা থেকে পড়ে যায়। আশে পাশে কেউ নেই যে বোঝাটি তুলে দেবে। আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেও বোঝাটি মাথায় তুলতে পারছি না। সে যে কী অসহায় করুন অবস্থা, তার স্মৃতি মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে আছে। শেষে টেনে হেঁচড়ে জলে কাদায় মাখামাখি করে সেই বোঝা শেষ পর্যন্ত বাড়িতে নিয়ে আসি।

আমার এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম দেখে অবশ্যি মনে হবে যে, পারিবারিক প্রয়োজনে আমি আগের চাইতে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছি। আসলেও তাই; এ সময়ে আগের সেই মাতাল বুনো স্বভাবের অনেকটাই উবে গিয়েছিলো। এমন কি যখন তখন মাওইর কাছে গিয়ে হাত পাততেও কেমন একটা লজ্জা করতো। এর মূলে বয়সের প্রভাব অবশ্যি আছে, তবে তার চাইতে বেশি আছে জমি বিক্রি করার ফলে সৃষ্ট সচ্ছলতার একটি আমেজ। ভাবটি যেন, জমিই যখন বিক্রি করছি, তখন আর হাত পাতা কেন!

এর মাঝেই একদিন আমার মাফিজ খাঁ নানা এসে উপস্থিত। দীর্ঘ চার বছর পর তিনি তাঁর স্নেহের ভাগিনেয়ী আমার মাকে দেখতে এসেছেন। আর মা তাঁর এই এক কালের মহাপ্রতাপশালী মামাকে সব কিছু ভুলে গিয়ে মহাসমাদরে বরণ করে নিয়েছেন। এমন কি পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের পরিবারের ভাগ্য নির্ণয়ের ভার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। জমি বিক্রির ফলে মা তখন কিছুটা সচ্ছল সেই সচ্ছলতাই এই বৃদ্ধকে আকর্ষণ করে এনেছে কি-না কে জানে!

আমাদের বৈঠকখানাটি তখনো আছে। সেখানে আমার স্বনামধন্য নানা আসর জমিয়ে বসেছেন। বড়ো বাড়ি থেকে ফরসী হুকাটি আনা হয়েছে, তার নল মুখে তুলে গুরুক গুরুক টানতে টানতে তিনি পাড়া পড়শীদের সাথে আলাপ করছেন, এ দৃশ্যটি এখনও চোখে ভাসছে।

কিন্তু আমি নানাজীর খেদমতে খুব বেশি উপস্থিত থাকতে পারিনি। সাবুদ আলী ভাইদের বাড়িতে গাজীর গীত হবে, তারি আশায় সন্ধ্যার পূর্বে গিয়ে সেখানে হাজির হয়েছি। সন্ধ্যার পরেই একটা বড়ো কুপিবাতি জ্বালানো হলো। গায়েন উঠানের মাঝখানে একটি লোহার দণ্ড গাড়লেন। এটিই নাকি গাজীর আসা বা লাঠি। তার মাথায় লম্বা চুলের একটি ঝালর টানিয়ে দেয়া হলো। গোলাকার সেই ঝালরের মাঝখানটা ময়ূরের পালক দিয়ে সাজানো। এই লাঠি সামনে নিয়ে দাঁড়ায় মূল গায়েন তার পিছনে বসে দোহার আর বাজনাদার। মূল গায়েনের সাজ সজ্জাও কিছুটা অদ্ভুত ধরনের। ঢোলা কালো জামা, মাথায় লাল পট্টি বাঁধা আর পায়ে ঘুঙ্গুর। ঘুরে ঘুরে অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে সে তার গীত গায় আর দোহাররা মাঝে মাঝে সমস্বরে ধুয়া ধরে। এ ভাবেই এগিয়ে চলে গাজীকালু চাম্পাবতীর অতি পরিচিত কাহিনী।

বেশ গভীর রাত পর্যন্ত উঠান ভর্তি লোক এই কাহিনী শুনলো। এই ভীড়ের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা নগণ্য ছিলো না। তাই মেয়েদের উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে নানা প্রকার মেয়েলোকের স্বভাব চরিত্র আর আচার-আচরণ যখন গায়েন বর্ণনা করতো, তখন চারদিকে হাসির হুল্লোড় পড়ে যেতো। আর আমরা ছেলে মানুষ, যাদের দুচোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে আসছে, তারা নতুন উত্তেজনায় সজাগ হয়ে বসতো।

এমনি উৎসাহ দেখেছি 'তিল্লাক' পীরের সিন্নিতে। সেখানে গান নয়, কেচ্ছা। সেখানে লাঠি সোঁটা কিছু নেই, তবে প্রতীক হিসেবে থাকতো গাঁজার কল্‌কে। যে কেচ্ছাটি বলবে, সেই কথক এক ছিলিম গাঁজা খেয়ে তার সামনে কল্‌কেটি উপুড় করে রেখে তার কেচ্ছা আরম্ভ করতো। বড়ো বাড়ির মজিদ ভাইদের ভিতর বাড়ির উঠানে এমনি এক আসর সেখানে বসলো। কেচ্ছার মধ্যে কিছু একটা হাসি পাওয়ার ব্যাপার ছিলো, কিন্তু তার সব কথা আজ আর মনে নেই।

কিছু একটা মানৎ থেকেই এ সব গান আর সিন্নির ব্যবস্থা করা হতো। এরই একটা ছিলো 'সুবোচানাই'র সিন্নি। আতপ চাল ভিজিয়ে তার সাথে চিনি দুধ মিশিয়ে কাঠাল পাতায় করে এই সিন্নি খেতে দেয়া হতো। বড়ো বাড়িতেই এই সিন্নি একদিন খেয়েছিলাম। কিন্তু সবচাইতে বেশি মনে পড়ছে মাওইদের বাড়িতে মাদারের সিন্নির কথা। মাথায় লাল কাপড় বেঁধে বেশ কয়েকজন লোক লাল ফিতা বেঁধে একটি দু'মাথাওয়ালা বাঁশ নিয়ে এসে হাজির। এটিই নাকি মাদারের বাঁশ। সেই বাঁশ নিয়ে তারা বাড়ির চারদিকে ঘুরছে আর 'দম মাদার' বলে মাঝে মাঝে চিৎকার করছে। ওদিকে বাড়ির উঠানে চালের গুড়ার সাথে মুরগির বাচ্চা, পেঁয়াজ, মরিচ, নুন সহ কুটে বিরাট বিরাট পিঠে তৈরি করে নাড়ার আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। চারদিকে সেই পোড়া-পিঠার একটা খুশবাই ছড়িয়ে পড়ছে। মাদারীদের ঘোরা শেষ হলে সেই পোড়া পিঠা সিন্নি হিসেবে উপস্থিত সকলের মধ্যে বাঁটা হচ্ছে।

এছাড়াও ছিলো খোয়াজের সিন্নি। বর্ষাকালে ছোট কলাগাছের ভেলায় বাতি জ্বালিয়ে এই সিন্নি ভাসিয়ে দেয়া হতো। তাতে থাকতো অনেকগুলি রুটি আর একটা

খাও মোরগের তরকারি। নেত্রকোণায়, ধারাকান্দিতে, এমনকি আমুদপুরেও এই সিন্নি খেতে দেখেছি। ছেলেদের মধ্যে এসব সিন্নি ধরে ধরে খাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো।

গাজীর গীতের কথা বলতে গিয়ে আরও অনেক কিছুর কথাই বলে ফেলেছি। তবে এসব যে ধারাবাহিকভাবে একই সময়ে দেখেছি, তা নয়। এরই সাথে নওহাটাতে আরিনা সুন্দরী ও ভুটিয়ারকোণার বাজারে শোনা গুনাই বিবির গানের কথাও মনে পড়ছে। আর এরই সাথে তখন আমার মানস-জগতে ভূতের ভয় ও সাপের ভয় খুব একটা না কমলেও তার সেই আগেকার ভয়াবহতা যেন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। একটা প্রতিরোধের ভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

এর মূলে আমার মাফিক খাঁ নানারও কিছুটা অবদান আছে। তিনি এমন সব ভূতের গল্প বলতেন, যা ভূতের গল্প শুনিয়েই তিনি আমাকে বশ করলেন। তা-ও তাঁর দাদীর গল্প। তিনি ছিলেন খুবই সাহসিনী। তাঁদের বাড়িটিও ছিলো জঙ্গলে ভরা। রাতে রান্না ঘরে মাছ ভাজা শুরু করলেই রাজ্যের ভূতপেত্নী এসে জড়ো হতো, আর নাকি সুরে বলতো, 'একটা ভাঁজা মাছ দেঁবে!'

অমনি তাঁর দাদী বলতেন, হাত বাড়া, হাত বাড়া।'

ওরা মাছের লোভে হাত বাড়াতেই তিনি ভাজা মাছ উল্টানোর পিতলের হাতা দিয়ে ওদের হাতে ছ্যাকা দিতেন। ছ্যাক্ করে একটা শব্দ হতো আর ওরা চিৎকার করতে করতে দৌড়ে পালাতো।

কাউরাটের পালের গ্রাম কোণাপাড়া, মাঝখানে নদী। সেই কোণাপাড়ায় কলেরা লেগেছে। এক গুনী কলেরার মলে ভেজানো একটি ন্যাকড়ায় এমন মন্ত্র পড়ে দিয়েছে যে, এই ন্যাকড়াটি শনি, মঙ্গল বারের রাতে ভিনগাঁয়ের মাটিতে পুঁতে রেখে আসতে পারলেই কলেরা সেই গাঁয়ে চালান হয়ে যাবে। কাউরাটের একজন তাদের এই মন্ত্রণা শুনে এসে মাফিজ খাঁ নানাকে জানিয়েছে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন ব্যাপারটি সত্যি এবং সামনের শনিবার রাতেই তা ঘটবে। তিনি ধান মাপার একটি বড়ো কাঠা আর দুটি বড়ো সাদা চাদর সাথে নিয়ে মাঠের পাশের নদীর চরের এক মাথায় ঝোপের ধারে গিয়ে বসে রইলেন। তাঁর ধারণাই ঠিক হলো, দেখলেন দু'তিন জন লোক নদী পার হয়ে চরের দিকে এগিয়ে আসছে। অমনি তিনি চাদর জড়ানো কাঠার মধ্যে দুহাত ঢুকিয়ে সেটাকে মাথার উপর তুলে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন আর মুখ থেকে বের করলেন বিকট এক শব্দ। সেই শব্দ শুনে লোকগুলি থমকে দাঁড়ালো, তারপর দেখলো এক বিরাট সাদা মূর্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা চিৎকার করে দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

এমনি সব ভূতুড়ে গল্প তিনি বলতেন। এসব গল্পের মধ্যে ভয়কে জয় করার একটা সাহসিকতা জড়িয়ে থাকতো। আমিতো তাঁর ভূতের গল্পশুনেই খুশি, কিন্তু মা যে কোন্ খুশিতে আমাদের ভবিষ্যতের ভার তাঁর হাতে তুলে দিলেন, সেটা তখন কেন, তার

পরেও আমি বুঝতে পারিনি। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই নানা সিদ্ধান্ত নিলেন যে. আমাদের আর আমুদপুর থাকা চলবে না। কারণ এভাবে জমি বিক্রি করলে কয়েক বছরের মধ্যেই ফতুর হয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার চাইতে এখনও যা আছে. তা এক সাথে বিক্রি করে কাউরাটে এমন একটা ব্যবস্থা করা যাবে. যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা স্বস্থির হয়ে উঠবে। মাও এই পরামর্শে সায় দিলেন। সম্ভবতঃ তিনি আর কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষি পাড়া পড়শি, ফুফাতো ভাই, অন্য যারা ছিলেন, তারাও এতে বাধা দেননি। কারণ আমাদের বিপর্যয় ঠেকানোর মতো কোনো উপায়ই তাদের হাতে ছিলো না। তাই দূরে কোথাও যদি আমরা চলে যাই, তা হলেই বুঝি তারা অনেকটা স্বস্তি পান। অন্ততঃ তাঁদের চোখের সামনে আমাদের দুরবস্থা দেখে হা-হুতাশ করতে হয় না।

তাদের মনোভাব সম্পর্কে আমার এই ধারণা একেবারে অমূলক ছিলো না। কারণ যেভাবে জমির নীলাম ডেকে এনে, ঘর বেঁধে দিয়ে, নানান সময়ে নানানভাবে তারা সাহায্য করেছিলো, তা তখনই উবে যাবার কথা নয়। তবে সেই যে কথায় বলে, 'নিত মড়া গাড়ে কে আর নিত উপাসীরে দেয়কে!' আমাদের অবস্থা তো এখন তেমনি। তাই একমাত্র আমাদের চাচাতো ভাইরা ছাড়া আর কেউ আমাদের এই বাস্তুত্যাগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তারাই মাকে বুঝিয়ে ফেরার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু মা তাদের আশ্বাসে আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। কারণ তাদের এই বাধার মধ্যেও তাদের স্বার্থটাই ছিলো বড়ো। তারা যদি নিজেরা আমাদের জমিজমা কিনে রাখতে পারতো, তাহলে নিশ্চয়ই এভাবে বাধা-দিতো না। তাদের পূর্বেকার আচরণ এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।

সুতরাং স্থির হলো যে, জমিজমা বিক্রির কাজটা যাতে নিরুপদ্রবে শেষ হতে পারে, সেজন্য মা আমার ছোট বোন আর ভাইকে নিয়ে চলে যাবেন ধারাকান্দি আর আমি নানার সাথে চলে যাবো কাউরাট। অবশ্যি ইতিমধ্যেই গোপনে জমির বায়নাপত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। গোয়াইল কান্দির একজন দলিল লেখকই তখন আমাদের এসব দলিল লেখার কাজ করতেন। তার নামটি এখন আর খুব একটা মনে নেই, খুব সম্ভব আফতাব উদ্দিন, তবে তার মুখের হাসিটি এখনও চোখে ভাসছে। সেই সাথে গোয়াইল কান্দির আরও একটি হাসির কথা মনে পড়ছে। অবশ্যি সেই হাসিটি আগুনের। এর পূর্বে এতোবড়ো আগুনে হাসি আমি আর দেখিনি।

গোয়াইল কান্দি আমাদের গ্রামেরই একটি পাড়া। সেখানে বেশ কয়েক ঘর হিন্দুও ছিলো। তাদেরই কোনো বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে। তখন চৈত মাস। বাড়ির সামনে নাড়ার বোঝা এনে স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছিলো। কোনো দুষ্ট ছেলে সেই স্তূপের আড়ালে বসে বিড়ি খেয়েছিলো। সেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত। এরপর চৈতালী বাতাসে সেটি এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, অনেকগুলি বাড়ি গ্রাস করে সে ক্ষান্ত হয়। সন্ধ্যার পরেই আমরা দৌড়ে গিয়ে সেই ভয়াবহ আগুনের দৃশ্য দেখেছিলাম।

কিন্তু দলিল লেখকের হাসির সাথে এই আগুনের কথা মনে পড়লো কেন? দলিল লেখার সাথে আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ অবশ্যি আছে, তাই সেই দলিলের কথা এমনভাবে আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমাদের পরিবারেরও বুঝি সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। মাত্র ত্রিশ টাকা কাঠা দরে আমাদের চৌদ্দ কাঠার বড়ো ক্ষেতটি বিক্রি হয়। বায়নার কিছু টাকা নিয়ে আমি নানার সাথে কাউরাট চলে যাই। মাও চলে যান ধারাকান্দি। আমাদের বাড়িঘর আবার চাচাতো ভাইদের কবলে চলে যায়। আর এখনো তারাই সেখানে বাস করছে।

আমি কাউরাট যাবার আগেই স্থির হয় যে, আমি এবার কাঁঠালিয়া মাইনর স্কুলে ভর্তি হবো। সেখানে আমার মামা কফিলউদ্দিন খাঁ তখন মাস্টারি করেন। কাউরাটেরই রূপ হুসেন মাস্টার তখন এই স্কুলের হেডমাস্টার। সুতরাং বিনা বেতনেই আমি সেখানে পড়তে পারবো। এর ফলে কাউরাট যাবার কয়েকদিন পরেই আমি মামার সাথে কাঁঠালিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হই।

সেটা খুব সম্ভব ১৯৪১-সালের কথা। সন্ধ্যার কিছুপূর্বেই আমি মামার লজিং বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। বাড়িটি বেশ বড়ো। তারই সামনে দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে সোহাগী বাজারে। এই রাস্তাটির পূর্ব পাশেই পূর্বে পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে সেই মাইনর স্কুল ঘরটি। যাবার সময় স্কুলটি বেশ ভালো করে দেখে গিয়েছি। কিন্তু পথ হাঁটার ক্লান্তি আর ক্ষিধের চোটে কিছুই ভালো লাগছে না। সামনে কল থেকে হাত মুখ ধুয়ে বৈঠক খানার একটি চৌকির উপর বসে রয়েছি আমি। ঘুমে দু'চোখ বারবার মুদে আসছে। মামা আমাকে বসিয়ে রেখে কোথাও বেরিয়ে গেছেন। অন্য কেউ কাছে নেই ; আর থাকলেই বা কী, ক্ষিধের কথা কার কাছে বলবো! তাই সন্ধ্যা লাগার সাথে সাথে আমি শুয়ে পড়েছি। ভয় পাচ্ছি, কি জানি 'ভুখাছানি' যদি লাগে। আমাদের গাঁয়ের পশ্চিম পাড়ায় একবার মেজবানী খেতে গিয়ে এমনি অবস্থা হয়েছিলো। ক্ষিধের চোটে সেদিন আমি অচেতন হয়ে গিয়েছিলাম। আজও তেমনি একটা কিছুর আশংকা করতে লাগলাম। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে দিলো একটি মেয়ের আর্তচিৎকার। আমি যখন ঘুমের মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি, তখনি সেই আর্ত চিৎকারটি শুনলাম। কী কারণ, কী বিষণ্ন সেই চিৎকার! আমার দুচোখের ঘুমকে সে একটা প্রচণ্ড থাবড়া মেরে তাড়িয়ে দিলো।

বৈঠকখানার অদূরেই বাড়ির ভিতরের কোনো ঘরে কারও প্রসব বেদনা দেখা দিয়েছে। কোথাও কোনো হৈ চৈ নেই ; কেমন নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ। কিন্তু পরেই সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আর চোখের ঘুম একটা আহত পাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে। এভাবে আমার ক্ষিধার আচ্ছন্ন ভাব কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে এক অসহায় অসাড়তা। এমনি দুঃসহ অবস্থায় কতক্ষণ কাটিয়ে ছিলাম, জানি না ; এক সময় আমাকে ডেকে জাগানো হলো এবং কিছুটা ঘুমের মধ্যেই আমি ভাতের লোকমা মুখে তুলে পানি খেলাম।

এই বাড়ির সামনেই স্কুল। আমি সেই স্কুলে এক বছর পড়েছি। কিন্তু বাড়িটি কার, কী পরিচয়, তার কোনো কিছুই আমার জানার সৌভাগ্য হয়নি। শুধু একটি প্রচণ্ড ক্ষিধা, তারও চাইতে বেশি একটি করুণ আর্তচিৎকার সেই বাড়ির স্মৃতিকে আমার চেতনার সাথে চিরকালের জন্য জড়িয়ে রেখেছে।

যাহোক, পরদিনই আমি কাঁঠালিয়া স্কুলে ভর্তি হলাম। ছত্রিশে নেত্রকোণা ছাড়ার সময় আমি চন্দ্রনাথ হাইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। সাইত্রিশে বীর আহমদপুর প্রাইমারী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই ; উনচল্লিশে ঘাটুর কোণা প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই এবার একচল্লিশে কাঁঠালিয়ায় চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। এর মূলে মামার আনুকূল্যের চাইতে আমার আগ্রহই ছিলো প্রবল। তাছাড়া বয়সতো আমার তখন কম নয়। নিয়মিত লেখাপড়া করলে তখন আমার সপ্তম শ্রেণীতে থাকার কথা। কিন্তু অনিয়মিত হলেই লেখাপড়ার সাথে আমার তো কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তবু একটা প্রবল আগ্রহ তখন জেগেছিলো। তা না হলে নাজিরপুরে লজিং থেকে প্রত্যহ তিন মাইল হেঁটে কাঁঠালিয়া স্কুলে আমি লেখাপড়া করতে পারতাম না।

আমাদের বাড়ি থেকে সাহাগঞ্জ বাজার তিন মাইল পশ্চিমে। সেই সাহাগঞ্জ থেকে নাজিরপুর দেড় মাইল দক্ষিণে। যে বাড়িতে আমি লজিং থাকতাম, তার নাম পরিচয় কিছুই আমার মনে নেই। শুধু সেই বাড়ির আমার চাইতে বয়সে ছোট একটি ছেলের নাম ছিলো হান্নান আর সে বাড়ির মধ্যের হিস্যায় একটি দোতলা টিনের বৈঠকখানা ছিলো। কিন্তু কীভাবে আমার এই লজিং ঠিক হয়, তারও কিছু আর মনে নেই। শুধু সে বাড়িতে যতোদিন ছিলাম, সুখেই ছিলাম, এটুকুই মনে পড়ছে।

কিন্তু লজিং বাড়ির কথা আমার স্মৃতিতে এতোটা অস্পষ্ট হয়ে গেলো কেন? এর কারণ সম্ভবত ; 'বুরুঙ্গার কুড়'। এই জলজ দামে ভর্তি কালো পানির বিরাট জলাশয়টি আমার চেতনাকে অধিকতর আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। প্রতিদিন এই জলাশয়টি খেয়া নৌকায় পার হয়ে আমি স্কুলে যেতাম আর অবাক দৃষ্টি মেলে তার কালো পানির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কোনদিন দেখতাম, ঘাটের পাশেই পানির উপর ভাসছে লাল টকটকে জবাফুল, বেলপাতা আরও কতো কি। আবার কোনদিন দেখতাম, হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে কেউ দুধ ঢেলে দিচ্ছে সেইকালো পানিতে আর তা নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। শুনতাম, এর গভীরতার নাকি কোনো শেষ নেই।

এই গভীর জলাশয়টিই পূর্ব দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে নদীর মতো এঁকেবেঁকে অনেকদূর এগিয়ে গেছে আর পশ্চিম দিকে রসুলপুরের সীমা পর্যন্ত সেটি বিস্তৃত হয়ে আছে। সে দিকে তাকালে ঢেউ খেলানো জলের উপর রোদ লেগে কেবলই চিক্‌চিক করতো। সব শেষে আমাদের বাংলা পড়াতেন যে মাস্টার মশায়, তাঁর কাছে শুনেছিলাম, এই জলকুণ্ডটি কোনো এক ভূমিকম্পের সময় সৃষ্টি হয়। সুতরাং এর সম্পর্কে এখানে সেখানে যতো কথা ছড়িয়ে আছে, তার সবই মানুষের খেয়ালী কল্পনা! এখন মনে হয়, মাস্টার মশায়ের এসব কথার অর্থ কি তখন বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু না বুঝলেও

ভালো লেগেছিলো। এও যেন সেই ভূতের ভয় তাড়ানো ভূতের গল্প। শুধু মুখের বর্ণনায় নয়, পুঁথির পাতাতেও এমনি গল্পের সন্ধান তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁর আগ্রহেই আমি ছোটদের রামায়ণ মহাভারত গ্রন্থ দুটি পড়ি। সেই আমার প্রথম আগ্রহ করে গল্পের বই পড়া। এর আগে আমার গল্পের বই ছিলো প্রকৃতি আর পরিবেশ। যেখানে যা কিছু পেয়েছি, দু'চোখ ভরে দেখেছি, দু'কান ভরে শুনেছি। এবার অক্ষরের বেড়াজালে যে, এর চাইতেও বিরাট গল্পের জগৎ লুকিয়ে আছে, তারই সন্ধান জানিয়ে দিলেন আমার নাম না জানা মাস্টার মশায়। আজ কোথায় তিনি আছেন, আমি জানি না; তিনি জীবিত আছেন কি-না, তাও বলা সম্ভব নয়। তবু যদি আমার এই স্মৃতিচারণ তাঁর চোখের সামনে পড়ে, তবে তিনি যেন আমার সবিনয় শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করেন।

বস্তুতঃ এর মাধ্যমে তিনি আমাকে এমন একটি নিষিদ্ধ জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন, যা সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের অনধিগম্যই থেকে গেছে। কিছু পরে আমার শিক্ষার ধারা সেই অনধিগম্যতাকেই বাড়িয়ে তুলতো; কিন্তু তা হয়নি। অন্যদিকে অপাঠ্য পুস্তক পাঠের একটি আগ্রহ এসময় থেকেই আমার মধ্যে জেগে উঠে। সুতরাং পাঠ্য অপাঠ্য নির্বিশেষে এই যে পুস্তক পাঠের আনন্দ, সেটি এই দুই মহাগ্রন্থ পাঠের আগে আমি এমনভাবে অনুভব করিনি; অন্ততঃ গল্পপাঠের আনন্দতো বটেই।

এ সকল কারণে কাঁঠালিয়ার স্কুল জীবনের স্মৃতি লজিং বাড়ি বা অন্য দিকে বিস্তার লাভ করার সুযোগ পায়নি। তবু এর মাঝে কুড়ের পাড়ের সেই মুচি বাড়িটির কথা মনে পড়ছে। একদিন ক্লাসরুম থেকে বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। চিৎকারটা সেই মুচিবাড়ি থেকেই আসছে। দৌড়ে এগিয়ে গেলাম আমরা উৎসাহী ক'জন। গিয়ে দেখি একটা বিরাট আকারের শূকরকে লোহার শলা বিঁধিয়ে মারা হচ্ছে। পা বাঁধা সেই পশুটির করুণ চিৎকারে চারদিক যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমার স্মৃতি কাঁঠালিয়ার সেই প্রথম রাতের আর্তচিৎকারের সাথে এটিকে মিলিয়ে কেমন একটা তন্ময়তার ভাব সৃষ্টি করেছে। সুতরাং সাথীরা একে একে চলে গেলেও আমি দাঁড়িয়ে থেকেও মাছ ধরার কোনো দৃশ্য দেখতে পেলাম না। জন্তুটা দেখতে অনেকটা বিড়ালের মতো হলেও আকারে কিছুটা বড়ো। এরা মাছ খেকো, পোষ মানালে মাছ ধরে ডাঙাতেও নিয়ে আসে। কিন্তু এর কতোটা সত্যি সেদিন আর পরখ করার সুযোগ হয়নি।

এর মধ্যে কয়েকদিন ধারকান্দি গিয়ে বেড়িয়ে এসেছি। মা ও আমার ছোট ভাই বোন তখনো সেখানেই আছে। নানা যে টাকা নিয়ে গিয়েছেন, তা দিয়ে কাউরাটে আমাদের জন্য একটি ঘর বাঁধা হবে। তারপর মা কাউরাট যাবেন। কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার তখন খুব কম। কারণ আমি তখন নিয়মিত ছাত্র। সেন্টার পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। যে করেই হোক পরীক্ষা দিতে হবে।

আমার এই পরিবর্তন দেখে সবাই তখন অবাক হয়েছে। অবাক হবারই কথা, কোথায় গেলো সেই বনে বাদাড়ে আড়ঙ্গে আসরে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস, কোথায় গেলো সেই দুষ্টামি করে জ্বালাতন আর স্কুল থেকে পলায়ন! কিন্তু আসলে অবাক হবার

কিছু ছিলো না। আমার সেই ঔৎসুক্য তো তখনও ছিলো; যা আমাকে প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়িয়েছে, তা-ই এখনও আমাকে বইয়ের পাতায় পাতায় টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু পরিবেশ আর উপকরণের পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে এক সময় আমি বুনো হয়ে গিয়েছিলাম আর এখন ঘরকুনো হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমার দুষ্টামি মোটেও কমেনি। এই দুষ্টামির অপর নামই ঔৎসুক্য—আগ্রহ। এই আগ্রহ না থাকলে পৃথিবীতে কিছুই অর্জন করা যায় না।

তবু ধারাকান্দি গেলে আমার শৈশব স্মৃতি ভীষণভাবে নাড়া খেয়েছে। সেই নেত্রকোণার নদীর পাড়ের স্মৃতি। তাই যতোক্ষণ যেখানে থেকেছি ফুড়িয়া নদীতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আমার সময় কেটেছে। কিন্তু এ কাজকে তখন আর কেউ দুষ্টামি বলে ভাবেনি। কারণ এ-তো খুবই স্বাভাবিক। একজন ছাত্র অবসর সময়ে খেলবে বেড়াবে, এতে নিন্দার কিছু নেই। লেখাপড়া ছেড়ে এসব কাজ করে বেড়ালেই নিন্দা।

খুব সম্ভব, এ সময়েই ধারাকান্দিতে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিলো। তখন আমার ফুফাতো ভাইদের বর্ধিষ্ণু অবস্থা। গৃহস্থির আয় থেকেই তাদের জমি জমা ঘরবাড়ির আকার বাড়ছে। তাদের এক বোন ছিলো খুবই সুন্দরী। আমি অবাক হতাম তার সুন্দর হস্তাক্ষর দেখে আর আমার চাইতে বয়সে অনেক বড়ো সেই বোন আমাকে খুব স্নেহ করতো। তার বিয়ে ঠিক হলো গাঁয়েরই আবাল হুসেন তালুকদারের সাথে। তালুকদারও দেখতে সুপুরুষ। সুতরাং সবাই খুশি। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পূর্বে রোগে পড়লো আমার সেই সুন্দরী ফুফাতো বোন। দেখতে দেখতে তার সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেলো। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যেই সে মারা গেলো। এ দুর্ঘটনায় সবাই হতবাক। সম্ভাব্য চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি।, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে বাঁচানো গেলো না। অভিজ্ঞ অনেকেই বলতে লাগলো, এটা বাণ মারার কাজ। বাণ মেরেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। ওঝার কাছে যাওয়া হলো। সে বললো, খুব শক্ত বাণ আর সেই বাণ মারার মাধ্যমটি আছে বাড়ির পিছনের গোবর গাদায় পোঁতা। কাঁটায় কাঁটায় বিদ্ধ একটি কলার থোড়।

সেদিন আমি ধারাকান্দিতে। রাতেই ওঝার কাছ থেকে লোক ফিরে এসেছে। সকাল বেলা উঠেই গোবর গাদায় খোঁজখুঁজি চললো। অনেকক্ষণ খোঁজার পর সেই থোড়টি পাওয়া গেলো, সত্যি কাঁটায় কাঁটায় বিদ্ধ সেই থোড়টি। এই থোড়টি হলো যাকে বান মারা হয়েছে, তার হৃদপিণ্ডের প্রতীক। কাঁটা বিদ্ধ থোড়ের মতো তার হৃদ্‌পিণ্ডটিও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। কিন্তু যেটি গোবর গাদায় পুঁতে রাখলো কেন? কারণ তা হলেই এটি যেমন পচে উঠতে থাকবে, তেমনি রোগিনীর অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া সেই থোড়টিতো ছিলো তরতাজা! কি জানি, এর কী ব্যাখ্যা হবে! কারণ এর দুদিন আগেই আমার সেই সুন্দরী বোন মারা গেছে। কে তাকে বাণ মারলো? নিশ্চয় এমন কেউ, যে এই সুন্দরীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। কে সে? বলা মুশকিল। অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো।

সে যাই হোক, এই দুর্ঘটনাটি আমার মনে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। তবু বাণ মারার এই কাহিনীটি আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারিনি। এর মধ্যে এমন একটি ফাঁক ছিলো, যেখানে সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারতো। বুরুঙ্গার কুড়ে কুলপাতা আর দুধ দেখার ঘটনার মধ্যেও প্রতিক্রিয়া ছিলো, কিন্তু এমন কোনো ফাঁক বেরিয়ে পড়েনি। তাই সেখানে সন্দেহও এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে সাহস পায়নি। কিন্তু অবিশ্বাস করার মতো যোগ্যতাও তো এখনও হয়নি। কারণ এখনও পৃথিবীকে জানবার বুঝবার অনেক কিছুই বাকি। এতে শুধু একটি বালকের মনে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটলো মাত্র।

আমার সেই নাম না জানা মাস্টার মশায়ের কথাবার্তার মধ্যেও এমনি সন্দেহের রেশ ছিলো। বালক মন তাতে অবশ্যি আন্দোলিত হয়েছে, কিন্তু সে আন্দোলন স্থায়ী হয়নি। তবু বোধ হয়, তখন থেকেই সহজ বিশ্বাসের ভাবটি নাড়া খেয়েছে। যা দেখা যায়, যা শোনা যায়, যা বুঝা যায়, তার সবটাই বুঝি সহজ নয়, সাবলীল নয়।

ইতিমধ্যে কাঁঠালিয়া স্কুলে আমার ছাত্র জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিলো। এ সময়ে সেন্টার পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কোচিং ক্লাস করার ব্যাপারে কিছুদিন আমাকে কাঁঠালিয়ার কোনো এক বাড়িতে লজিং থাকতে হয়। কিন্তু সে বাড়ির নাম পরিচয় কিছুই আজ আর মনে পড়ছে না। যেমন মনে পড়ছে না স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকের কথা। আমার মামা, রূপ হুসেন মাস্টার ও আমার নাম না-জানা মাস্টার মশাই ছাড়া আরও মাস্টার অবশ্যি ছিলেন। কিন্তু কারো নাম তো দূরের কথা, চেহারা পর্যন্ত স্মরণ করতে পারছি না।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এসময়ে আমার বাল্য স্মৃতি অদ্ভুতভাবে ভূত-প্রেত সাপ-খোপের প্রভাব মুক্ত। এমন কি গানের আসর আড়ঙ্গের কথাও সেখানে স্থান পায়নি। আমার লজিং বাড়ি নাজিরপুর থেকে সাহাগঞ্জ বাজার খুব দূরে নয়। সেখানে স্কুলের মাঠে খুবই ফুটবল খেলা হতো, কিন্তু আমার স্মৃতিতে তার কোনো সঞ্চয় নেই। আমি নিজেও বুঝি এ সময়ে ফুটবল খেলিনি!

শুধু আমার লজিং বাড়ির পশ্চিমের দিকের একটি সুসজ্জিত বাড়ি আমার স্মৃতিতে উঁকি ঝুঁকি মারে। সুপারী গাছের সারির পাশ দিয়ে সে বাড়িতে ঢোকার পথ। সেই পথ দিয়ে আমি সে বাড়িতে গিয়েছি। কিন্তু কেন? কিছুই স্মরণ নেই। শুধু আবছা আলোতে সেই বাড়ির একটি আভাস উঁকি মারছে।

স্মৃতির ভাণ্ডারের এমনি সঞ্চয়গুলি বড়ো অদ্ভুত। এ যেন অজানা রহস্যের হাতছানি। এ যেন হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যেতে চায় না। কৈ আমার শৈশবের, আমার সেই বুনো বাল্যের স্মৃতিতে তো এমন অস্পষ্ট হাতছানি নেই। সেখানে যা আছে, উজ্জ্বল হয়েই আছে; যা হারিয়ে গেছে, একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আমার এই ঘরকুনো বাল্যে এমন অস্পষ্ট হাতছানি জমে উঠলো কেন?

এঁকি বয়সের ধর্ম! একচল্লিশে আমার বয়সতো তেরো। তা হলে একি কল্পনাময় কৈশোরের হাতছানি! হবেও বা। তাইতো সে কিছুটা গম্ভীর, কিছুটা ধ্যানস্থ। প্রকৃতিও পরিবেশের মধ্যে যে সহজে প্রাপ্তি এতোদিন তাকে আকর্ষণ করেছে, আজ তা থেকে তাই সে বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীর পরিচয় আজ আর তার কাছে ততোটা সহজ নয়। তাছাড়া পুথির পাতা এসে যার ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সেখানে কল্পনার রং তুলি বড়ো বেশি সক্রিয়। তাই উপলব্ধির অনেক মাধুর্য, অনেক তিক্ততা হারিয়ে গিয়েও ফিরে ফিরে আসে; কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে নয়, কখনও আধেক, কখনও সিকি, কখনো বা আভাস মাত্র।

তাই আমার এই কাঁঠালিয়ার স্মৃতি এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন। সেখানে আছে রামায়ণ মহাভারতের মতো নিষিদ্ধ গল্পের আমন্ত্রণ, আছে সহজ বিশ্বাসে সন্দেহের ছায়াপাত, আছে কল্পনার অস্পষ্ট হাতছানি। কিন্তু এই দিগন্ত তো খুব বেশি দিন আলো ঝল্‌মল্‌ থাকতে পারেনি। আবার তা পারিবারিক বিপর্যয়ের কালো মেঘে ছেয়ে গেছে; এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এসে তার সকল সম্ভাবনাকে লেপে মুছে একাকার করে দিয়েছে। অবশ্য তা এখনো কিছুটা দূরে।

আপাততঃ আমি সেন্টার পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। একচল্লিশের শেষ দিকে ঈশ্বরগঞ্জে হলো সেই পরীক্ষা। যদ্দূর মনে পড়ে, দুদিনে চারটি বিষয় পরীক্ষা দিয়েছিলাম। মাঝখানের রাতটি কোথায় কীভাবে কাটিয়েছিলাম, তার কিছুই আর মনে পড়ছে না। সে পরীক্ষায় কোনো বৃত্তি আমি পাইনি। অবশ্যি তখন এই প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি ছিলো কি-না, তাও বলা সম্ভব নয়।

সে যাহোক, পরীক্ষা শেষে আমি আবার ফিরে এলাম ধারাকান্দিতে। সেখানেই আছি। কোনো দিন ফুফাতো ভাইদের সাথে নদীতে মাছ মারি, কোনো দিন গুলাল দিয়ে পাখি শিকার করতে যাই। বেশ আনন্দেই কেটে গেলো কিছু দিন। কিন্তু আর কতো দিন আমরা এইভাবে ফুফুর বাড়িতে থাকবো? এ প্রশ্ন, আমার মনে দেখা না দিলেও আমার মার মনে, আমার ফুফাতো ভাইদের মনে দেখা দিয়েছে। তাই মা বার-বার তাগাদা করছেন কাউরাট যাবার জন্য; সেখানে আমাদের ঘর বাঁধার কদ্দূর কী হয়েছে, তা দেখে আশার জন্য। কিন্তু আমার কোথাও যাবার ইচ্ছা হচ্ছে না। কারণ ধারাকান্দির পরিবেশটাই এমন যে, তা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছা না হবারই কথা। মাছ আর পাখি শিকারের কথাতো আগেই বলেছি। এছাড়াও ছিলো পুবের বাড়ির রুস্তম ভাইদের এখানে আড্ডা দেবার সুযোগ, ছিলো রমেশ ভাইদের এখানে গালগল্প শোনার আকর্ষণ তদুপরি নসর কানার এখানে লুকিয়ে ছিলো রাজ্যের বিস্ময়। তখন সে তার অন্ধ চোখ নিয়ে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে পুলের বাঁশ জোড়া দিচ্ছে। বসে বসে তার কাজ দেখা আর নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তরে তার ভাঙা গলার গান শোনা, শিলুক শোনা ছিলো খুবই মজার ব্যাপার। যখন সে বলতো, "এট্টুখানি পুকুরডা কইয়ে উড় উড় করে, রাজা আইয়ে বাশ্‌শা আইয়ে তুইল্যা সেলাম করে'—কওতো এইডা কী?

তখন আমি উত্তর দিতে পারতাম না। সে আমার নীরবতা লক্ষ্য করে বলতো, 'কি পারলানা তো! এইডা অইলো গিয়া ফরশী উক্কা'। এমনি আরও কতো শিলুক যে সে বলতো, তার সব কিছু আজ আর মনে করাও সম্ভব নয়।

সুতরাং এমনি পরিবেশের মায়া কাটানো বেশ কষ্টকর। একারণেই এ সময় আমাদের নিজ বাড়িতে যেতেও আমার ইচ্ছা হতো না। সেখানে আমার খেলার সাথী জায়দার বাপ তখনও আছে, যে আমার কথায় প্রায় উঠতো বসতো, নির্দ্বিধায় আমার ফুটফরমাশ খাটতো। আছে সাবুদ আলী ভাই, যে আমাকে শুধু আরবি অক্ষর শিখায়নি, পোশাকি কাপড়ের সৌন্দর্যও শিখিয়েছিলো। আছে আশক আলী ভাই, যে আমাকে দেখলেই উপদেশ দেবার চেষ্টা করতো। সর্বোপরি আছেন আমার সেই মাতৃতুল্যা মাওই, যার স্নেহের কথা আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না। তবু আমুদপুর আমাকে আকর্ষণ করতো না।

কারণ সে বাড়ি ত্যাগ করেই তো আমরা কাউরাট যাবো বলে বেরিয়ে এসেছি। ইতিমধ্যে যে জমিটার বায়না পত্র হয়েছিলো, তার কাওলাও হয়ে গেছে। কাজেই সেই বিক্রি করে দেয়া আমুদপুরে আর যাই কেন! অন্য কোথাও তো যাবার কোনো টান নেই। আমার আরো এক ফুফুর বাড়ি আছে দইলা। আমাদের বাড়ি থেকে মাইল দুয়েকের পথ। কিন্তু তাদের সাথে পরিচয়ের অভাব। সেখানে আমার ফুফু তখনও জীবিত। ফুফাতো ভাই বোনরাও আছে। কিন্তু তাদের সাথে দেখাশোনা হয়েছে খুবই কম। আবার সেই দেখাশোনাও ভালো কোনো পরিচয়ের সৃষ্টি করেনি। এক মাত্র ফুফাতো বোন আশু বুজির দিকে একটা টান ছিলো; যেমন ছিলো আমার চাচাতো বোন মোগল বুজির দিকে। তার বিয়ে হয়েছিলো আমাদের বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে গিধাউষায়। তারা দুজনেই নিজেদের ব্যবহার দিয়ে এই টানের সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু তা-ও তাদের কাছে ছুটে যাবার মতো কিছু নয়।

আর কাউরাট। সেখানে মাতুল বাড়ি হলেও আমার মায়ের সহোদর ভাই তো নেই। তবে খালারা আছেন। কিন্তু কারোর সাথেই তেমন কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়নি। কিংবা তাঁরা আমাকে আকর্ষণ করার মতো তেমন কিছু করেননি, যাতে মা বলুন আর নাই বলুন, আমি ইচ্ছা করে তাঁদের কাছে এগিয়ে যেতে পারি। তাই কোথাও আমার যাওয়া হয় না।

আসলে এ সংসারে আত্মীয়তাই যথেষ্ট নয়, রক্তের সম্পর্কও কোনো কাজে লাগে না; যদি না বিপদের সময় পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, যথাসম্ভব সাহায্য করতে পারি, অন্ততঃ সমবেদনা জানাতে পারি। এজন্যই দেখা যায়, যারা অনাত্মীয় অসম্পর্কীয়, তারাও এই কল্যাণে একান্ত আপনজন হয়ে উঠে। আমার জীবনে এমনি ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আত্মীয় স্বজনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন এমন সব মানুষ, যাঁদেরকে আমি চিনতাম না, জানতাম না। বস্তুত; তাঁদের জন্যই আমার স্মৃতির ভাণ্ডার আবেগে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

কিন্তু সে কথা এখন থাক। এখন ধারাকান্দির কথাই বলি। আমার এই ফুফাতো ভাইরা তুলনামূলকভাবে আমাদের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। সেই নীলাম ডেকে জমি আনার সময় থেকে এ পর্যন্ত তাঁদের সহায়তা সমাদর আমাদেরকে আকর্ষণই করেছে। মামা, মামী ও মামাতো ভাইদের প্রতি তাঁদের যে দরদ ছিলো, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নানাভাবেই। তবুও এর মধ্যে হয়তো কোথাও একটা সীমাবদ্ধতা ছিলো, সেটিই তাঁরা দূর করতে চেয়েছিলেন নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু মায়ের অসম্মতির জন্যই তা সম্ভবপর হয়নি।

আমার বোনের নাম রাহেলা। সে আমার তিন বছরের ছোট। বত্রিশে তার জন্ম। বিয়াল্লিশে তার বয়স দশ বছর। আমার ফুফাতো ভাই পণ্ডিতের বাপের বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। তাই মা আমার এই বালিকা বোনকে তার চারগুণ বয়সী একজন যুবকের সাথে বিয়ে দিতে রাজি হননি। এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য মায়ের উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করা হয়। তাইতে আমার সরল সোজা মা আরও বেঁকে বসেন। এর ফলে আমাদের কাউরাট গমন ত্বরান্বিত হয়ে উঠে। তখন ১৯৪২ সালের প্রথম দিক।

কিন্তু আমার মা কি এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে ভালো করতেন—এ প্রশ্ন নিয়ে পরবর্তীকালে অনেকবার ভেবেছি এবং আত্মীয়দের অনেকের মুখে এর আলোচনাও শুনেছি। আমার মনে হয়েছে, মা রাজি না হয়ে ভালোই করেছেন। কারণ ফুফাতো ভাইরা আমাদের জন্য কতদূর কী করতে পারতেন! এক সময় আমাদের এই দুর্ভর বোঝা এই নতুন সম্পর্কটিকেও বিষিয়ে তুলতো। ভালোই হয়েছে যে, মা মানে মানে সরে পড়েছেন। না, আমার দুঃখিনী মা তাঁর দুর্ভাগ্যের বোঝা অন্যের কাঁধে তুলে দিয়ে করুণার পাত্র হতে চাননি। যতোদিন পেরেছেন, নিজেই তা বহন করেছেন। যখন আর কুলাতে পারেননি, তখন তা ছাড়িয়ে দিয়েছেন সারা দুনিয়া জুড়ে। এছাড়া আর কীই বা করতে পারতেন তিনি!

আমার মায়ের সব চাইতে ভরোসার স্থলতো ছিলো তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সেই যখন ফিরে তাকালো না, এখন আর কার ভরোসা তিনি করবেন। সত্যি আমার বড়ো ভাই আমার চেয়ে সাত বছরের বড়। আমরা যে বছর দেশের বাড়িতে আসি, সে বছর তিনি নেত্রকোণার আঞ্জুমান হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। শুধু ছাত্র নন, সেরা ছাত্রদের একজন। কিন্তু সেই সম্ভাবনাময় তরুণের কী করুণ পরিণতি। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, মা ভাই-বোনদের প্রতি উদাসীন, অসৎ সঙ্গে ডাকাতি মামলার আসামী হয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেনাবাহিনীতে যোগদান!

এখনতো এই বিয়াল্লিশে সেই যুদ্ধই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও হচ্ছে। কিন্তু কোথায় আছে তাঁর পুত্র! মায়ের সাথে তার কোনো যোগাযোগই নেই!

আরও এক অবাক কাণ্ড! এই যে এতো বড়ো যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, যার কথা পরবর্তী কালে বই পুস্তকে পড়ে আমি অবাক হয়েছি, তেতাল্লিশের আগে এর কোনো আলোচনাই কোথাও শুনতে পাইনি। এমন কি কাঁঠালিয়া স্কুলেও এ নিয়ে কোনো

কথাবার্তা আমার স্মৃতিতে সঞ্চিত নেই। শুধু শুনতে পেয়েছিলাম যে, আমার বড়ো ভাই নেত্রকোণা গিয়ে সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছেন। এর চাইতে বেশি কিছু সংবাদ পাড়া গাঁয়ে পৌঁছেনি। আর পৌঁছলেও তা এমন ব্যাপক ছিলো না, যা আমাদের মতো বালকদেরকে আকর্ষণ করতে পারতো। সুতরাং এখানকার মানুষ তখন তাদের আবহমানকালের জীবন যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত। সেই যুদ্ধের কোনো শেষ নেই!

কাজেই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য মাকে আমি কোনো দোষ দিই না। আমার ফুফাতো ভাইদেরও কোনো দোষ ছিলো না; এমন কি আমার চাচাতো ভাইরাও কোনো দোষ করেনি। আসলে আমরা সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেছি। সেই কর্তব্যের সাথে সর্বদাই স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। কোথাও তা দেখা যায়, আর কোথাও তা দেখা যায় না। এই পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ বলে কোনো কিছু নেই। আমরা সবাই অল্প-বেশি স্বার্থপর।

সুতরাং ধারাকান্দি থেকে আমাদের বিদায়ের পালা ঘনিয়ে এলো। গ্রীষ্মকাল তখন শেষ হয়। কিন্তু নদীতে পানির দেখা নেই। তবু এই নদী পথই আমাদের যাওয়ার জন্য সহজ পথ। ধারাকান্দির সামনে এই ফুড়িয়া নদীর মদনপুরের কাছে সাইডুলী নদীতে পড়েছে আর এই সাইডুলী এঁকে বেঁকে অনেক গলি গাঁও পেরিয়ে কাউরাটের সম্মুখ দিয়ে চলে গেছে। সুতরাং নৌকা হলে ভাটির টানে কাউরাটে পৌঁছালো খুব সহজ। কিন্তু নৌকা কোথায়।

বর্ষাকাল হলে ভাড়াটে নৌকা পাওয়া যেতো। কিন্তু এখন তো বর্ষা আসতে বেশ দেরী। ওদিকে খবর নিয়ে জানা গেলো কাউরাটে আমাদের জন্য যে ঘর বাঁধার কথা ছিলো, তা এখনও বাঁধা হয়নি। তবুও মা চলে যাবার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। অগত্যা পণ্ডিত ভাই অনেক খুঁজে পেতে একটি ডিঙ্গি নৌকা যোগাড় করলেন। নৌকাটি যেমন ছোট, তেমনি তার অবস্থাও শোচনীয়। অনেক দিন জলের তলায় পড়ে থেকে তার তক্তাগুলিতে শ্যাওলা জমেছে। যাকে বলা যায় ভাঙা নৌকা, এটি সেই পর্যায়ের। ধরাধরি করে সেটিকে নদীর পাড়ে উঠানো হলো। যথাসম্ভব মেরামত করার পরও তার দুরবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হলো না। তির তির করে পানি উঠা কিছুতেই বন্ধ করা গেলো না।

কিন্তু উপায় কী! এই ভাঙা নৌকাতেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। তবে আশার কথা এই যে, নদীতে খুব বেশি পানি নেই। ডুবে যেতে আরম্ভ করলে পাড়ে ভিড়িয়ে ফেলা খুব কষ্টকর হবে না। তাছাড়া পণ্ডিত ভাইতো জানেনই, আমিও ভালো সাঁতার জানি। কাজেই ভাঙা নৌকায় ভয়ের কিছু নেই।

আমরা যাত্রার তোড়জোড় শুরু করলাম। প্রথমেই দু'আঁটি পাটখড়ি এনে পাটাতনে বিছিয়ে দেয়া হলো। যাতে পা রাখার কোনো অসুবিধা না হয়। এর পর একটি ধারি বা চাটাই বাঁকিয়ে ছৈ করা হলো। পাটখড়ি বিছানো পাটাতনের উপর রাখা হলো একটি বড়ো জল চৌকি। নৌকা বাওয়ার জন্য নেয়া হলো একটি বৈঠা ও একটি বাঁশের লগি।

পানি সেঁচার জন্য একটি টিনের থালা। নৌকা বেয়ে নিয়ে যাবেন পণ্ডিত ভাই আর আমি পানি সেঁচবো। এভাবে আয়োজন সমাপ্ত হলো। এবার নৌকায় উঠার পালা।

মা কিছুটা রাগ করেই ধারাকান্দি থেকে চলে যাচ্ছেন। সে কারণ কিছুটা আমি জানি। কিন্তু বিদায় নিতে গিয়ে মা যখন কাঁদতে আরম্ভ করলেন, তখন কিছুটা অবাকই হলাম। কারণ রাগের সাথে এই কান্নার ব্যাপারটি ঠিক মিলাতে পারছিলাম না। পরে তো বুঝেছি, এই কান্নার কারণ ছিলো। স্বামীর ভিটা ছেড়ে এসেছেন, এখানে যা হোক কিছুটা শান্তিতেই কিছুদিন ছিলেন। এবার বাপের ভিটার দিকে যাত্রা করতে হবে। কিন্তু সে কী আছে, কে জানে! এক অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যৎ। সুতরাং চোখের পানি বাধা মানতে চায় না, কেবলই ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। তবু এক সময় আমার দুঃখিনী মা নৌকায় গিয়ে উঠে বসেন। সাথে তিনটি অপোগণ্ড শিশু আর একটি কাপড়ের পোটলা। বিক্রি করে আর নষ্ট হয়ে সংসারের আসবাবপত্র তখনও যা বাকি ছিলো, তা এই ধারাকান্দিতেই পড়ে রইলো। এগুলি সাথে নেবার উপায় নেই, প্রয়োজনও বোধ হয় নেই। কারণ এই সংসারওতো একটি ভাঙা নৌকার মতোই শোচনীয়। কখন ডুবে যাবে তার স্থিরতা নেই। কাজেই বোঝা যতো হালকা হয়, ততোই ভালো। তাই সব ছেড়ে কাপড় সম্বল করেই আমাদের যাত্রা শুরু হলো,—ভাঙা নৌকার নিরুদ্দেশ যাত্রা!

পণ্ডিত ভাই লগি ঠেলে নৌকা বাইছেন, আমি নিয়মিত পানি সিঁচছি আর আমার ছোট ভাইবোন দুটি চুপ করে মায়ের কোলে বসে আছে। ছোট ছেলে মেয়েরা নৌকায় উঠলে যে আনন্দ চঞ্চলতা তাদেরকে অস্থির করে তোলে, তার কিছুই বুঝি এদের মধ্যে নেই। আর শুধু এ নৌকায় কেন, আমার স্মৃতিচারণের কোথাও তো এদের কথা আমি তেমন ভাবে উল্লেখ করতে পারিনি। আমার ছোট বোন রাহেলা, তার ছোট ভাই কিবরিয়া, এরাও এই দুঃখের সংসারে বেড়ে উঠেছে, এদেরও তো খেলাধুলা ছিলো, আনন্দ আবদার ছিলো; কিন্তু আমার স্মৃতি তার কোনো নির্দশনই ধরে রাখতে পারেনি। এর কারণ সম্ভবতঃ আমার বুনো স্বভাব, আমার বিচ্ছিন্নতা, আমার নিজস্ব জগতের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা। তাই ঘরের কথা আমার স্মৃতির নাগাল পায়নি। কিন্তু এখন এই নৌকার মধ্যে, এখানে তো সেই বিচ্ছিন্নতা নেই; তবু তাদের কোনো চঞ্চলতা আমার স্মৃতির মধ্যে নেই। এর অন্য একটি কারণ হয়তো নৌকার দুরবস্থা আর ক্ষুদ্রত্ব। এর মাঝে বসে বিপন্ন অস্তিত্বের জন্যই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়, কোনো চঞ্চলতা প্রকাশ করা যায় না। কারণ চঞ্চলতাকে ধারণ করার মতো প্রশস্ত এটি নয়। এরই চাপে শুধু এই দুটি শিশুই নয়, আমরাও নিশ্চুপ হয়ে আছি।

অবশ্য একদিক থেকে নৌকাটি ছোট হয়ে ভালোই হয়েছে। কারণ ফুড়িয়া নদীতে পানি তখন খুবই কম, কোথাও তা হাটুরও নিচে। সেখানে পণ্ডিত ভাই নৌকা থেকে নেমে ঠেলে ঠেলে নৌকা চালাচ্ছেন। এভাবে বেশ কয়টি বাঁক পার হবার পর দেখা দিলো নতুন বিপদ। দু'পাড়ের লোকেরা মাছ মারার জন্য নদীতে বাঁধ দিয়েছে। বাঁশের শলার তৈরি 'বানা' ফেলে নদী পথকে এমনভাবে আটকে দিয়েছে, যাতে শুধু পানি টুকু

বানার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। এমনি বাঁধের উপর দিয়ে নৌকা পার করতে হলে বেশ কসরৎ করতে হয়। বানাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য তার পাশে দেয়া বিরাট আকারের বাঁশ অন্ততঃ দু'জন লোক দু'দিক ধরে দাবিয়ে দিতে হয়। এর ফলে নুয়ে পড়া বানার উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে নৌকা পার করতে হয়। এর অন্যথা হলে নৌকা উল্টে যাবার সম্ভাবনা।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, দিনের বেলা এ সকল বাঁধের ধারে লোকজন খুব একটা থাকে না। তাছাড়া এই শুকনো ছোট নদীতে নৌকা চলাচলও নেই বললেই চলে। তাই নৌকা থামিয়ে লোকজনের খোঁজ করে ডেকে এনে নৌকা পার করার ব্যবস্থা—করতে হয়েছে। এতে বেশ সময় লেগেছে। এভাবে এগিয়ে গিয়ে মদনপুরে আমরা যখন পৌঁছেছি, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

মদনপুরের ঘাটে নৌকা লাগালেন পণ্ডিত ভাই। একটু জিরিয়ে নেয়ার ফাঁকে কিছু খেয়ে নেয়া দরকার। বাজারের দিকে গেলেন তিনি, আমিও গেলাম সাথে। কিন্তু কী পাওয়া যাবে সেখানে! মদনপুর মাজারের কাছেই সেই বাজার। হাটবারে হয়তো অনেক কিছুই পাওয়া যায়। কিন্তু আজ একটি মাত্র দোকান খোলা। টিনের চৌচালা সেই দোকানটিতে বিস্কুট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। তাই খেয়ে পানি খেলাম আমরা। কিছু বিস্কুট নিয়ে এলাম। আমার ছোট ভাইবোন দুটি সেই বিস্কুট খেলো। কিন্তু মা কিছুই খেলেন না। নৌকায়–উঠলে এমনিতেই তাঁর মাথা ঘুরতে থাকে, এর উপর কিছু খেলে বমি হয়ে যাবে ; তিনি আরও কাতর হয়ে পড়বেন।

আবার নৌকা এগিয়ে চললো? এবার বড় নদী, প্রশস্ত পথ; কিন্তু এখানেও বাধা আছে। মাছ মারার জন্য গাছের ডাল পালা ফেলে 'কাঠাম' দিয়েছে লোকেরা। সেগুলিতে কচুরীপানা আটকিয়ে এমন বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে যে, সেই বাধা পেরুতে হলে নদীর মাঝখান দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। তাছাড়া আছে মাছ মারার বিরাট বিরাট 'খরা' জাল। বিরাট দুই বাঁশের মধ্যে বেঁধে সেই জাল পাতা হয়েছে নদীর এক পাশে। সেই জালের বেড় এড়িয়ে ঘুরে যেতে হয়।

এমনিভাবে নানা বাধা এড়িয়ে নদীর পাড় ঘেঁষে বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। বর্ষা আসেনি, নদীতে খুব পানি নেই ; তবু স্রোত আছে। সেই স্রোতের টানে কাউরাট পৌঁছতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেল।

নদীর ঘাটেই নৌকা রাখতে হলো। বর্ষাকাল হলে গোপাট দিয়ে বাড়ির ঘাটেই নৌকা পৌঁছে যেতো। তাই ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে পায়ে হেঁটেই মা তাঁর সন্তানদেরকে নিয়ে বাপের ভিটায় প্রবেশ করলেন।

চতুর্থ তরঙ্গ ॥

কাউরাট গ্রামটি ময়মনসিংহ জেলা অধুনা নেত্রকোণা জেলার ভাটি এলাকার অন্তর্গত। এ গ্রামের তিন দিকেই নদী। নেত্রকোণার দিক থেকে আসা সাইডুলী নদী এ গ্রামের পূর্বদিক দিয়ে বয়ে গেছে। আর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক বেড় দিয়ে রেখেছে বৈকুরহাটির দিক থেকে আসা একটি মরা নদী। গোগ বাজারের কাছে এ নদী সাইডুলীতে পড়েছে। এ কারণেই কাউরাটের অধিকাংশ এলাকাই নামা। বিশেষ করে আমার নানার বাড়ি আগপাড়া সবচেয়ে বেশি নামা। এ বাড়ির সামনে একটি পুকুরের মত জলাশয় থাকলেও তা বাড়ির সাথে যুক্ত নয়। মাঝখানে একটি ছোট্ট গোপাট মানে গরু চলাচলের রাস্তা। শুকনার সময় এগুলি দিয়ে গরু চলাচল করে ঠিকই ; কিন্তু বর্ষাকালে এগুলিই হয়ে উঠে নৌকা চলাচলের পথ। তখন নৌকা ছাড়া কোথাও যাওয়া যায় না।

তাছাড়া আরও একটি ব্যাপার, পুরো গাঁও-ই জঙ্গলে ভরা। বিশেষ করে আগপাড়া-তো জঙ্গলে পাড়াই। এক কালে হয়তো এই পাড়াটি জমজমাট ছিলো। কিন্তু আমরা গিয়ে যখন আমাদের নানার বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছি, তখন তার বেশির ভাগই জঙ্গল। এর কারণ অনেকেই এই পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। যারা আছে, তাদেরও হতশ্রী অবস্থা। আমার নানার বাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। কামধর খাঁ কেন, এই মফিজ খাঁর সময়ের প্রথম দিকেও যে দবদবা অবস্থা ছিলো, তার প্রায় কিছুই তখন অবশিষ্ট নেই। শৈশবের আবছা স্মৃতি এখনও সে বাড়ির যে দৃশ্য ধরে রেখেছে, এ সময়ে তার সিকি ভাগও আমি দেখতে পাইনি।

সুতরাং সেই ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার দুঃখিনী মা যখন সেই বাপের ভিটায় গিয়ে পৌঁছলেন, তখন কিভাবে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, কোথায় তিনি তাঁর অপোগণ্ড তিনটি সন্তান নিয়ে উঠেছিলেন, পণ্ডিত ভাই সেই সন্ধ্যাবেলা, না পরের দিন ফিরে গিয়েছিলেন ; তার কোনো কিছুই আমার স্মৃতিতে নেই। এর কারণ, আমাদের পরবর্তী বিপর্যয়ের আঘাত এ সময়কার অনেক স্মৃতিকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এ কারণেই এই খাঁ বাড়িতে আমার স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়িয়ে আমি আমার মাকে প্রথম আবিষ্কার করি এক পরিত্যক্ত ভাঙা ঘরে। এই ঘরটি জমধর খাঁর একপুত্রের। তিনি পুত্র পরিজনসহ এ বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি গোপালপুরে চলে গিয়েছেন। পরিত্যক্ত এই ঘরটির চাল অক্ষত থাকলেও বেড়াগুলি ভাঙা। সেই ঘরে একটি চাটাইর উপর শুয়ে আছেন আমার অসুস্থ দুঃখিনী মা। আমার ছোট দুটি ভাইবোন তাঁর পাশে বসে আছে। সন্ধ্যার অন্ধকার এসে প্রবেশ করেছে সেই ঘরে। বাতি জ্বালানোর কোন উদ্যোগ নেই। আমি দৌড়ে এসে দাঁড়িয়েছি সেই ঘরের দরজায়। থমকে পড়া একটা বিষাদের অদ্ভুত অনুভূতি আমার চেতনায় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। এইজন্যই এই করুণ দৃশ্য আমি

ভুলতে পারিনি। পরবর্তী আঘাতের তীব্রতাকে অতিক্রম করে তাই এই দৃশ্য আমার চেতনাকে এখনও অবশিষ্ট করে রেখেছে!

কিন্তু কেন এই পরিত্যক্ত ভাঙা ঘরে আমার দুঃখিনী অসুস্থা মা! এর কারণে আমাদের জমি বিক্রির টাকা দিয়ে যে ঘর বাঁধার কথা ছিলো, এক বছর পেরিয়ে গেলেও সে ঘর বাঁধা হয়নি। কেন হয়নি, তার জবাবদিহি কে আদায় করবে! আমি তার জন্য উপযুক্ত নই। আমার খালারাও হয়তো সে যোগ্যতা রাখেন না। তবু বড় খালা এ নিয়ে তাঁর মামার সাথে ঝগড়া করেছেন। কিন্তু আমার মাফিজ খাঁ নানার অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। সম্ভবত তাঁর অভাবের গহ্বরেই আমাদের এই টাকা তলিয়ে গেছে। এই সময়ে তিনি পয়সার বিনিময়ে ছেলেকে বিয়ে করাতে গিয়েছিলেন, সে বিয়ে টিকেনি। পয়সার বিনিময়ে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন, সে বিয়ে সুখের হয়নি। কুলীনের ঘরে অভাব ঢুকলে যা হয়, তাই হয়েছে!

তবু আমার নানার দাপট কমেনি। নওপাড়া বাজারের মালিকদের সাথে কি নিয়ে জানি ঝগড়া হয়েছে, তাই তিনি উদ্যোগী হয়ে গোগ বাজারের কাছে নদীর এপাড়ে কাউরাটের একটি বাজার জমিয়ে ফেলেছেন। সেই বাজারে তাঁর একটি ঘরও আছে। টিনের সেই দু'চালা ঘরটিতে নানা ধরনের জিনিসপত্র বিক্রি হয়। অবশ্যি খাঁরা পুরানো ব্যবসায়ী। কামধর খাঁ পাটের ব্যবসা করেই ধনসম্পত্তি করেছিলেন। মাফিজ খাঁ সেই ধারা অনুসরণ করলে সেই ঠাট বজায় রাখতে পারতেন। কিন্তু অনেকটা আমিরী ঠাঁটে চলাফেরা করে এখন শেষ বয়সে অভাবের ঠেলায় পড়ে এই দোকানে এসে বসেছেন কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, তাঁর এই অভাবের সাথে তাঁর দুঃখিনী ভাগিনেয়ীর অভাবকেও মিশিয়ে ফেলেছেন।

তাই অভাবের মাঝে কষ্টে সৃষ্টে আমাদের দিনরাতও কাটতে লাগলো। আর বর্ষাকাল এসে আমার অবাধ বিচরণকে দর্শনীয় করে তুললো। কাক ডাকা ভোরে উঠে আমি কারও না কারও ঘাসী নৌকায় উঠে বসতাম। সেই নৌকা সাইডুলী নদী পেরিয়ে জালিয়ার হাওরের অবাধ বিস্তারের মধ্যে হারিয়ে যেতো। যেখানে সতেজ কচুরীপানা জমে আছে, যেখানে ফুটিঘাস বেড়ে উঠেছে, যেখানে নানা ধরনের জলজ আগাছা ছেয়ে আছে, সেখানে নৌকা ভিড়িয়ে ঘাসী দাওয়ের আঘাতে কেটে কেটে তা নৌকায় ভরা হতো। কখনো রোদ, কখনও বৃষ্টির মাঝে দূর থেকে ভেসে আসতো ভাটিয়ালি গানের সুর। তারপর ঘাস বোঝাই নৌকা ফিরে আসতো ঘরে।

কারণ বর্ষাকালে এসব অঞ্চলে গরু চরাণোর মতো কোনো ডাঙা থাকে না। গরুকে খাওয়ানোর মতো ঘাস বা খড়েরও বড়ো অভাব ঘটে। তাই অনেক গৃহস্থই বর্ষা লাগার আগেই একান্ত সাধের গরু ছাড়া অন্যসব গরু বিক্রি করে দেয়। এর পর যেগুলি থাকে ওদের জন্য এমনিভাবে ঘাসের ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ চার পাঁচ হাত পানিতে যে ধান জন্মে সেই 'খামা' ধানের নাড়া গরুকে খাওয়ানো যায় না। অনেকে সেই চার পাঁচ

হাত লম্বা নাড়া তুলে এনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে, অনেকে ক্ষেতেই পুড়িয়ে দেয় এতে ভালো সার হয়।

আমার মাফিজ খাঁ নানার তখনও দুয়েকটি গাই গরু ছিলো ; ঘাটে একটি ঘাসি নৌকাও ছিলো। রম্মত মামা এই গাই গরুর দেখা শোনা করতেন, ওদের জন্য ঘাস কেটে আনতেন। অবশ্য রম্মত মামাকে আমরা কখনোই 'আপনি' বলতাম না। কারণ সে ছিলো আমার নানার বাঁদীর তরফের ছেলে। সম্ভবত এ কারণেই রম্মত মামাকে আমরা যতোটা কাছে পেতাম, বিবির তরফের ছেলে কফিল উদ্দিন খাঁকে তেমনভাবে পাইনি। তখন বোধ হয় তিনি বাড়িতেও থাকতেন না। অথচ এই মামাই আমার মা বাবার স্নেহ পেয়েছেন সব চাইতে বেশি। নেত্রকোণা থেকে তিনি আঞ্জুমান হাইস্কুলে লেখাপড়া করেছেন।

এ সময় আমার এই মামা সম্ভবত মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। শ্বশুর লেখা পড়ার খরচ দেবেন। কিন্তু কী কারণে জানি না, তা আর হয়নি এবং তাঁরা সেই মেয়েকেও আর ঘরে আনেনি। আমি একবার তাঁর শ্বশুড় বাড়িতে গিয়েছিলাম মনে পড়ছে। একটা বিলের পাড়ে সেই বাড়ি, কিন্তু গ্রামের নামটি এখন আর সঠিক মনে পড়ছে না, খুব সম্ভব আলীপুর। কেন্দুয়া থানার অন্তর্গতই সেই গ্রাম।

এমনি আমার এই মামার ছোটবোন ফেরদৌস খালার বিয়ের ব্যাপারটিও তখন বেশ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিলো। এই খালারাও তিনবোন। বড়জনের বিয়ে হয়েছে রাজাইল, তাঁর ছোট জনের বরাটি। উভয়ের ঘর-বর বিরাট ধনি আর দেখতেও সুপুরুষ। কিন্তু ছোট খালার সময় সব কিছু সেই নিয়মে মিললো না। নওপাড়া গ্রামের এরা অবস্থার দিক থেকে বিরাটই ছিলো ; আগের দুজনের চাইতেও বিরাট অবস্থার অধিকারী। কিন্তু বর হলো না মনের মতো। রূপের অভাব হয়তো ধন দিয়ে পুষিয়ে নেয়া যেতো, কিন্তু বিয়ের আগের দিন বর পাগল হয়ে গিয়ে সব কিছু গোলমাল করে দিলো।

সেই ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে। এটাই আমার মাফিজ খাঁ নানার শেষ কাজ। তাই আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিলেন, প্রায় সবাইকে এনে বাড়িতে জড়ো করেছেন। আগের রাত থেকেই আমরা ঘরদোর সাজানোর কাজে লেগে গেছি। দশ এগারোটা নাগাদ বর যাত্রীরা এসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু দুপুর পেরিয়ে বিকাল হয়ে এলো তবু কোন খবর নেই। শেষে সন্ধ্যার খবর এসে পৌঁছিলো যে, জামাইকে 'কুন্দা' দিয়ে রাখা হয়েছে।

সারা বাড়ি জুড়ে সে কী কান্না আর হা-হুতাশের ঢেউ। কিন্তু করার কিছু নেই। বিয়ের কাবিন তো আগেই রেজেস্ট্রী হয়ে গেছে। সুতরাং এ বিয়ে ভেঙে দেয়া যায় কী করে। কন্যাপক্ষ এমন কিছু করতে গেলে বর পক্ষের দেয়া সাকুল্য টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। সে টাকার পরিমাণ আমি জানি না; কিন্তু আমার কুলীন নানা সেই টাকা এনেই ঘরবাড়ি সাজিয়েছেন, বিয়ের আয়োজন করেছেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত ফেরদৌস খালার

বরের বাড়িতে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো। ঠিক কতোদিন পরে মনে নেই, তবে তাঁর সাথে চিরাংয়ের কাছে নওপাড়ার সেই বিরাট বাড়িটিতে আমি গিয়েছিলাম। সত্যিই বিরাট বাড়ি। বাড়িতে ২৫/২৬টি টিনের বিরাট চৌচালা ঘর। এর দুটি ধানের গোলা আর একটি পাটের। একটি বিরাট গোয়াল ঘরে সাতটি হাল আর এক মন দুধের গাইগরু। বাড়ির সামনে বিরাট পুকুর। জামাইরা সাতভাই তখনও একত্রে। জামাই ছেলের দিক থেকে ছয় নম্বর, বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত, ম্যাট্রিকুলেট। আগের পাঁচ ভাই বিয়ে করেছে আর তাদের বাচ্চা কাচ্চাও হয়েছে অনেক। সারা বাড়ি লোকে ভরা, যাকে বলে গমগম করে।

আমার সবচেয়ে অবাক লেগেছিলো, এই সাত ভাইয়ের মা তখনও জীবিত এবং তিনিই সংসারের কর্ত্রী। আমার সামনেই একদিন তাঁর এক বুড়ো ছেলেকে যেভাবে তিনি চড় মারলেন আর সেই ছেলে যেভাবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো, তা দেখলে অবাক হবারই কথা! আরও অবাক হলাম ছেলে মেয়েদের খাবার দেবার ধারা দেখে। একটি বিরাট থালায় একসাথে খাবার দেয়া হয়েছে আর দশ পনেরটি ছোট ছেলে মেয়ে চারদিক বেড় দিয়ে সে খাবার খাচ্ছে। সে এক দেখবার মতো ব্যাপার। আমি বেশ কয়েকবারই সে বাড়িতে গিয়েছি আর এই দৃশ্য দেখেছি। একবার গেলে দু, চার, পাঁচ দিন না থেকে আসিনি।

কেন্দুয়ার পর ছিলুমপুর হয়ে সেই গ্রামে যেতে হয়। মাঝখানে রাস্তার ডানপাশে বটগাছের ছায়ায় বৈষ্ণবদের এক বিরাট আখড়া। যাওয়া আসার বেলায় এই আখড়ার পাশে গাছের ছায়ায় আমার অনেকটা সময় কেটেছে। শুধু জিরিয়ে নেয়া নয়, একটা আকুল আগ্রহ নিয়ে সেই আখড়ার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। সাজানো গুছানো বাড়িঘর, পাশেই ফুলের বাগান আর শান্তশিষ্ট লোকজনের আনাগোনা মনে অনেক কল্পনার খোরাক যুগিয়েছে।

অবশ্য বছর খানেক পরেই আমার সেই পাগলা খালু আবার পাগল হয়ে যান। এর ফলে বিয়ে ভেঙে দেবার একটা চেষ্টা হয়। কিন্তু বেশ কয়েক বছরেও এর কোন সুরাহা হয়নি। তবে আমার নানা জীবিত থাকাকালে ফেরদৌস খালা আর সেখানে যাননি। পরে আমার এই পাগলা খালু আরেকটি বিয়ে করেন এবং শেষ পর্যন্ত আমার খালাও সেখানে যেতে বাধ্য হন।

যাহোক, এই ফেরদৌস খালার বিয়ের সুবাদে দুটি ঘটনা ঘটে। একটি আমাদের সেই বহু প্রতীক্ষিত ঘরটি বাঁধা হয়ে যায়। অবশ্য ঘরটি এমন কিছু নয়, মায়ের বাপের ভিটায় খড়ের ছাওয়া দোচালা একটি ঘর। তবু এটি আমাদের জন্য তখন অনেক; যাই হোক-যেমনই হোক, নিজের ঘরতো!

অন্য ব্যাপারটি কুলিয়াটির সাথে পরিচয়। সেখানে আমার মাফিজ খাঁ নানার কোন বোনের বিয়ে হয়েছিলো। এই বিয়ের সময় কুলিয়াটির সেই নানা শ্বশুড় বাড়িতে আসেন এবং আমাদের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখেন। খুব সম্ভব তখনই স্থির হয় যে, আমি শীতকালে

কুলিয়াটি গিয়ে থাকবো। এর বিনিময়ে আমাদেরকে কিছুটা সাহায্য করা যায় কিনা, তারই চেষ্টা করবেন নানা।

এদিকে মা-তো তাঁর তিন সন্তান নিয়ে বাপের ভিটায় নতুন ঘরে উঠলেন, কিন্তু খাবেন কী? এর কোন বন্দোবস্ত তখন ছিলো না। আমুদপুরের জমি বিক্রির টাকা আর কতোদিন থাকবে? মাফিজখাঁ নানা সেই টাকা দিয়ে কি বন্দোবস্ত করে দেবেন বলেছিলেন, তাও আমি জানতে পারিনি। কিন্তু এক বছর পরে এই ঘর ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি। আর এই ঘরও তো খুব সহজে হয়নি। সুতরাং আমার বাপের জমির টাকা তখন আর থাকার কথা নয়। তবে আমুদপুরে তখনও বিক্রি করার মতো জমি ছিলো। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, মা সেই জমিতে আর হাত দেননি। সেই জমি বাড়ি তখন আমার চাচাতো ভাইদের দখলে। এর একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, সেই জমির উপর আমার দাদা দাদী ও বাবার কবর, তাই মা সেগুলি বিক্রি করে দিতে চাননি। আবার এমনও হতে পারে যে, আগের জমি বিক্রির টাকার অবস্থা দেখে তিনি আর সে পথে পা বাড়াননি। কারণ এক অতল গহ্বরে তখন সবই তলিয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া মা কি তাঁর বাপের সম্পত্তি কিছু পেতেন না। তাঁর বাপ তো ছিলেন এই বংশের তিন অংশের এক অংশের মালিক। তাঁর সেই সম্পত্তির অংশীদার তো মেয়েরাও ছিলো! কিন্তু বাস্তবে এর কোনো হদীসই পাওয়া গেলো না। মনে হচ্ছে, আমাদের নতুন ঘরের পিছনে গোপাটের ধারে একটি কাঁঠাল গাছ ছিলো। সেই গাছ থেকে আমি দু'তিনটি কাঁঠাল পেড়েছিলাম। তাই নিয়ে নানান কথা হয় এবং তা নিয়ে মা-খালারা ঝগড়া পর্যন্ত করেন। সুতরাং কাঁঠাল নিয়েই যদি কথা হয়, ঝগড়া হয় ; তা হলে জমা জমি নিয়ে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই আমাদের খোরাকীর কোনো উৎস বেরিয়ে আসেনি। শুধু পরিবেশ আরো তিক্ত হয়েছে।

এ সময়ের আরো একটি ব্যাপার মনে পড়ছে—মা একটি ছাগল কিনেছিলেন। এই ছাগল মুরগি পোষণ করলে সংসারের কিছুটা আয় বাড়বে,—এই ধারণা থেকেই সম্ভবতঃ এই ছাগল কেনা। কারণ ইতিপূর্বে এমন কোনো প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে না। তবে সর্বত্রই অসহায় বিধবারা এ কাজটি করে থাকেন। আমার মাও তখন সেই পর্যায়ের। এরপর এমনি বিধবারা পরের ঘর দোরে কাজও করেন। কিন্তু খাঁ বাড়ির মেয়ে তখনও সে পর্যায়ে নামতে পারেননি। সম্ভবত এজন্যই আমার কুলিয়াটি যাওয়া অবধারিত হয়ে উঠে।

বর্ষাকাল তখনও শেষ হয়নি। আমি কুলিয়াটির এক মামার সাথে সেখানে গিয়ে পৌঁছাই। হাঁটা পথে কোণাপাড়া, পাহাড়, বারুইর, কাইটাইল, জাহাঙ্গীরপুর, মদন হয়ে সেই গ্রামে যেতে হয়। পথে তিনটি নদী পার হয়ে কুলিয়াটি পৌঁছতে পৌঁছতে আমি দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাতে খাবার খেয়েও তা পেটে ধরে রাখতে পারিনি ; বমি করে ফেলতে হয়। আমি অসুস্থ হয়ে বেশ কয়েকদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকি। এর পরও পেটের অসুখে আমাকে ভুগতে হয়। কারণ কুলিয়াটিতে ঝালের মাত্রাটা ছিলো

বেশি, যা আমার পেট কখনও সহ্য করতে পারেনি। পেটের এই দুর্বলতা পরবর্তী পর্যায়েও আমাকে যথেষ্ট ভুগিয়েছে।

যাহোক, কিছুদিনের মধ্যেই কুলিয়াটিতে আমার কর্তব্যকর্ম আরম্ভ হলো। তা আর কিছু নয়, আমি গরুর রাখাল হলাম। প্রায় সারা গাঁয়ের গরু গোপাট বেয়ে তলার হাওরে গিয়ে নামতো আর আমরা বেশ কয়েকজন রাখাল সেগুলি পাহাড়া দিয়ে রাখতাম। আবার বিকাল বেলা সেগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম। হাল বাওয়ার কাজ শুরু হলে হালুইরা খুব ভোরেই নিয়ে ক্ষেতে চলে যেতো এবং হাল বাওয়া শেষ করে মাঠে আমাদের কাছে গরু দিয়ে আসতো। আমরা সেগুলি বুঝে নিয়ে পাহারা দিতাম।

ব্যাপারটা যেমন সহজ ছিলো, তেমনি সতর্ক না থাকলে জটিলও হয়ে পড়তো। কুলিয়াটির পর থেকেই বিখ্যাত তলার হাওড় আরম্ভ হয়েছে। গ্রামের গোপাট দিয়ে এগিয়ে গেলে দু-পাশের আবাদী জমির পর দেখা যেতো একটি বিরাট মাঠ। তুলনামূলকভাবে আবাদী জমির চাইতে কিছুটা উঁচু। সেই মাঠ জুড়ে গজাতো দুব্বা ঘাস। বিরাট সেই মাঠ দিগন্ত জুড়ে পড়ে আছে। তার পূর্ব সীমায় আছে একটি ছোট্ট নদী। আর বাকী তিন দিকেই বোরো ধানের জমি। এই মাঠে বেশ কয়েকটি গাঁয়ের গরু এসে একত্র হতো। সুতরাং রাখালের কাজ হতো প্রতিটি গাঁয়ের গরুগুলিকে যথা সম্ভব পৃথক করে রাখা এবং সেগুলি যাতে ধান ক্ষেতে গিয়ে না ঢুকে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা। কাজেই রাখালদের পক্ষে মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকার উপায় ছিলো না। কারণ কোনো প্রকারে দলছুট হয়ে একগাঁয়ের গরু অন্য গাঁয়ের গরুর মধ্যে ঢুকে গেলে, তা খুঁজে বের করা ছিলো খুবই কঠিন। তাছাড়া সেই বিরাট মাঠে বসে থাকার জন্য তারা কোন বন্দোবস্ত ছিলো না। একমাত্র সেই ছোট্ট নদীর তীরে কয়েকটি গাছ ছাড়া আর কোথাও ছায়া পাওয়া যেতো না। তাই রাখালরা দায়িত্ব ভাগাভাগি করে পাহারা দেয়া ও জিরিয়ে নেয়ার কাজ করতো। আমি কিছুদিনের মধ্যেই এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

তবে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিলো এই বিরাট মাঠের উদার বিস্তার। দিগন্ত ছুঁয়ে পড়ে থাকা এই মাঠ আর তার বুকে চরে বেড়ানো গরুর দল আমার মনে অনেক কথার ভীড় জমাতো। বিশেষ করে যখন জিরিয়ে নেয়ার পালায় সেই নদীর তীরের গাছের তলায় বসতাম, তখন আমার চোখে এই উদার প্রকৃতির বিস্ময়ের ছোঁয়া দিয়ে যেতো। কখনো তাকিয়ে থাকতাম নদীর ওপারের গাঁগুলির দিকে। সেই গাঁগুলির মধ্যে সব চাইতে কাছে ছিলো গোবিন্দশ্রী। কয়েক বছর পরে আমি সেই গ্রামে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময় তো তার সাথে পরিচয় ছিলো না। শুধু তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হতো, ওইতো একটি গাঁও দেখা যায়, এরপরে আরও গাঁও আছে, তারপরে আরও গাঁও—এভাবে পৃথিবী কতোদূর চলে গেছে!

এ সময়ে রাখালদের সাথে কোন প্রকার খেলা বা অন্যবিধ কোন আচার ব্যবহারের কথা আমার স্মৃতিতে নেই। শুধু বাঁশীর একটা ধ্বনি ছাড়া রাখালদের অন্য আচরণ

আমার স্মৃতির সঞ্চয় ধরে রাখতে পারেনি ; এর কারণ যদ্দূর মনে হয়, একটি দুর্ঘটনা, যা আমার চেতনাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিলো। এর ফলে তৎকালের অনেক সাধারণ স্মৃতিই বিস্মরণের অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

এ দুর্ঘটনাটি একটি গরুর অপঘাত মৃত্যু। গরুটি ছিলো আমার নানাদের গোয়ালের। সারা কুলিয়াটি জুড়ে এই বলদটির কোন তুলনা ছিলো না। কালো রংয়ের এই বলদটির পালের মধ্যে দূর থেকেই নজরে পড়তো। আমি এর নাম দিয়েছিলাম 'কালা পাহাড়'। বলা বাহুল্য যে, ইতিহাসখ্যাত কালাপাহাড়ের নামের সাথে আমার এখনও পরিচয় হয়নি। এ ছিলো কিশোর মনের কল্পনা বিলাস। বিরাটত্বের জন্যই এই কল্পনা পাহাড়কে টেনে এনেছে। এ কারণেই প্রথমটায় ভয় ভয় করলেও ক্রমান্বয়ে এর সাথে আমার বেশ খাতির হয়ে যায়। অনেক সময় বেশি রোদ লাগলে গা থেকে মাছি তাড়ানোর জন্য আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। সে ঘাস খাওয়া ছেড়ে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকতো আর আমি তার নিচে বসে জিরিয়ে নিতাম। পালের সেরা এই গরুটির জন্য আমার মধ্যে একটি গর্বের ভাবও ছিলো।

সেদিনও কিছুক্ষণ আগে আমি তার গলায় পিঠে হাতিয়ে দিয়েছি এবং তার গলায় বাঁধা ঘণ্টাটি নাড়িয়ে বাজনা বাজিয়েছি। এরপর সে কিছুক্ষণ জাবর কাটবে বলে শুয়ে পড়েছে। গরুর পাল তখন কিছুটা দূরে চলে গেছে, অন্য রাখালরা সেগুলি দেখছে। এই ফাঁকে আমি চলে এসেছি নদীর পাড়ে। হঠাৎ একটা বিরাট হাম্বা রব শুনতে পেলাম। পিছন ফিরে দেখি দক্ষিণ দিক থেকে আরেকটি বিরাট আকারের গরু এগিয়ে আসছে। যে গরুটিকে এর আগেও আমি দেখেছি। তার শিং দুটি বেশ বড়ো বড়ো বাঁকানো। নাড়াই লাগলে এই শিং দিয়ে সে যে কোন গরুকে ঘায়েল করে দিতে পারে। সেজন্য এ দুটি গরুর মধ্যে যাতে সাক্ষাৎ না হয়, সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রাখতাম। কিন্তু আজ কীভাবে জানি সকলকে ফাঁকি দিয়ে এরা দুটি একত্র হয়ে গেছে। আমি দৌড়ে এদের কাছে পৌঁছার আগেই নাড়াই শুরু হয়ে গেলো। আমার চিৎকারে বেশ কয়েকজন রাখাল এসে একত্র হলো। কিন্তু কারোর পক্ষেই কিছু করা সম্ভব হলো না।

বিরাট আকারের দুটি গরু মরিয়া হয়ে লড়ছে। আর আমরা দূরে দাঁড়িয়ে সেই লড়াই দেখছি। হঠাৎ কীভাবে কী হলো জানি না, দুটি গরুই ঘুরতে আরম্ভ করলো। এবার হতভম্ব আমরা এর কারণ অনুসন্ধান করতে কাছে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি লম্বা শিং ওয়ালা গরুটির একটি শিং কালাপাহাড়ের গলায় বাঁধা ঘণ্টার দড়ির সাথে পেঁচিয়ে গেছে। আর সেই জন্য প্যাঁচে আটকা পড়ে একটি গরু তার শিং ভেঙ্গে যাবার ভয়ে আর অন্যটি গলার ফাঁস এড়াবার জন্য অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু এগিয়ে গেলেও আমরা ভয়ে কাছে ঘেঁষতে পারছি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি গরুই মাটিতে পড়ে গেলো। এবার আমরা কাছে গেলাম, কিন্তু প্যাঁচানো দড়ি কেটে দেবার মতো কোন কিছুই আমাদের সাথে ছিলো না। সুতরাং আমরা যে যার বুদ্ধি অনুসারে একটা দা কাঁচি যোগাড় করার জন্য দৌড়তে আরম্ভ করলাম।

আমার তখন ভীষণ কান্না পেয়েছে। আমি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে যে দিকে ধানক্ষেত, সেদিকেই দৌড়তে লাগলাম। অনেকক্ষণ দৌড়ার পর একজন লোককে পেলাম, যার হাতে কাঁচি আছে ; সে গাঁয়ের দিকে ফিরছিলো। আমার কথাশুনে সে আমার সাথে দৌড়ে একইস্থানে পৌছলো। কিন্তু ততোক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। কাঁচি দিয়ে অনেক কষ্টে দড়িটি কাটা হলেও কালা পাহাড় আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না। এর আগেই গলার দড়িতে ফাঁস আটকে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। অন্য গরুটি ছাড়া পেয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলো। আর আমরা দুজন হতবাক হয়ে সেই মৃত গরুর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ক্রমে সেখানে লোকের ভীড় জমলো। নানাধরনের কথাবার্তা হলো। কিন্তু আমার ফুঁপিয়ে কান্না থামলো না। সন্ধ্যার সময় এক মামার সাথে অনেক কষ্টে আমি বাড়িতে ফিরলাম। রাতে কিছুই খেতে পারলাম না। এই দুর্ঘটনায় আমি এতোটাই অভিভূত হয়েছিলাম যে, পরবর্তী কয়েকদিন আমি আর গরুর রাখালির কাজে যেতে চাইনি। শেষ পর্যন্ত আমাকে এই রাখালির বদলে অন্য কাজ দেয়া হলো ; ধান কাটার কামলাদের জন্য ভাত নেয়ার কাজ।

এবার আমি দুপুর বেলা হলেই একজন চাকরের মাথায় ভাতের চাঙাড়ি তুলে দিয়ে আমার মাথায় ডালের হাঁড়ি নিয়ে সেই নদীর পাড়ে এগিয়ে যাই সেখানে মামারা তিন ভাই ছাড়াও আরও কয়েকজন কামলা কাজ করে। ধান অবশ্যি ভাগালুরাই কাটে। এরা আসে কুমিল্লা বা আরও দূর-থেকে নৌকা করে। বিরাট আকারের সব নৌকা। নদীতেই এরা থাকে ; তবে দল বেঁধে। একেকটি দলে বিশ থেকে পঞ্চাশ জন ভাগালু কাজ করে। ভাগে ধান কাটে বলেই এদেরকে বলা হয় ভাগালু। এইভাগের হার শতকরা বারো থেকে পনেরো মুড়ি। অর্থাৎ যতো মুড়ি বা গোছা ধান কাটা হয়, তার শতকরা একভাগ ওরা পাবে।

এই ভাগানুসারে দল বেঁধে ক্ষেতের পর ক্ষেত ধান কাটতে থাকে। এ সময়ে গৃহস্থ এদের সাথে থেকে ধান কাটা আর মুড়ি বাঁধার দিকে লক্ষ্য রাখে। বেলা কিছুটা পড়ে এলেই ধানকাটা বন্ধ করে মুড়ি জমানো, গোনা আর ভাগ করার কাজ চলে। তারপর মাথায় করে সব ধান চলে যায় নদীর পাড়ের খোলায়। সেখানে গৃহস্থ আর ভাগালুদের আলাদা আলাদা খোলা বা ধান মাড়াইর উঠান তৈরি করা হয়। ডেরা বেঁধে গৃহস্থরা সেই ধান পাহারা দেয় ও মাড়াই করে। ভাগালুরাও একাজে সাহায্য করে গৃহস্থের গরু দিয়েই তাদের মাড়াইয়ের কাজ শেষ করে নেয়।

এভাবে ভাত নিয়ে যাবার সুবাদে আমি জীবনের আরও একটি রূপকে দেখার সুযোগ পেলাম। সেবার ধানের ফলন খুব ভালো হয়নি, কারণ চৈত্র মাসের শেষে বৃষ্টির বদলা শিলা ঝড়ের ফলে বেশ ক্ষতি হয়। তবু ভাগালুরা ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটছে আর দল বেঁধে গান গাইছে। আমি দূরে বসে সেইগান শুনতাম। এক সময় যে পথে গিয়েছিলাম, সেই পথেই আবার বাড়ি ফিরে আসতাম।

সেই পথও তো সহজ পথ নয়। এঁকে বেঁকে সেই পথের ধারে ধারে ছড়িয়ে আছে বন তুলসীর গাছ। সাদা সবুজের মিশেল দেয়া রংয়ের ফুল ফুটছে থোকায় থোকায়। কেমন একটা কটুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এখানে সেখানে দুর্গা টুনটুনি টিলিপ্ টিলিপ্ শব্দ করছে। এই গন্ধ আর শব্দের মাঝখান দিয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ কখনও থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হতো। এতো লম্বা দুব্বা ঘাস হয়ে আছে যে মেপে দেখতে ইচ্ছা হতো। মাপতাম, একহাত, দু'হাত তো সাধারণ। একদিন একটা নিচু জায়গার দুর্ব্বা মেপে দেখলাম পাঁচ হাত। এছাড়া 'চালিয়া' নামের আরও একটি শক্ত ডাঁটার ঘাস। আর ঘাস মাপতে মাপতেই 'কালা পাহাড়ে'র কথা মনে পড়তো। মনটা কেমন উদাস হয়ে যেতো।

এভাবেই আমার তলার হাওরের জীবন ফুরিয়ে আসতে লাগলো। ক্রমে ধান কাটার পালা শেষ হলো। এগিয়ে এলো বর্ষাকাল। যে পথে এতোদিন গিয়েছি, সে পথ এমন দুর্গম। নৌকা করে যেতে হয় সেই নদীর পাড়ের খোলায়। নৌকা বোঝাই করে ধান আসে, খড় আসে। ভাগালুরাও তাদের ধান খড় বোঝাই করে নৌকায়। তারপর একদিন সেই নদীর পাড়ের খোলা শূন্য হয়ে পড়ে।

তবু গৃহস্থের কাজ শেষ হয় না। এবার চালিয়া ঘাস তোলার পালা, 'উজিয়া'র মাছ মারার উত্তেজনা। এসবের মধ্যেও আমি যোগ দিয়েছি, যতোটা সম্ভব দর্শক হয়ে এর উত্তেজনা অনুভব করেছি। এরপর একদিন নৌকা করে কিছু ধান নিয়ে ফিরে এসেছি কাউরাট। আমার পথে নদীর পাড়ে দেখেছি গো মড়কের দৃশ্য। লাইন বেঁধে গরু মরে পড়ে গেছে।

১৯৪৩ সালের তখন প্রথমদিক। এর কয়েক মাস পরে অবশ্য মানুষের মড়কও দেখা দিয়েছিলো। কারণ বাংলা সন তখন ১৩৫০। পঞ্চাশের সেই ভয়াবহ মন্বন্তর।

আমি আপাততঃ কাউরাট ফিরে এসে নতুন করে আবার সংসারের দৈন্যকে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলাম। আমি কুলিয়াটি থেকে যে ধান এনেছিলাম, তার পরিমাণ খুব বেশি না হলেও তাতে কিছুদিন আমরা সচ্ছল হয়ে হয়ে চলতে পারতাম। কিন্তু মা আগেই এমন সব কর্জ করে রেখেছিলেন, যা শোধ করতে গিয়ে খুব বেশি কিছু হাতে রইলো না। আমাদের চারজনের সংসারের দাবী ছিলো অতি সামান্যই, কিন্তু সে দাবি মেটাবারও নিশ্চিত কোনো উপায় ছিলো না। এজন্য কাউকে দোষ দেয়া যায় না। তবে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে, যা শুধু স্মৃতিকেই ভারাক্রান্ত করে রাখে, কিছুতেই তা ঝেড়ে ফেলা যায় না।

ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, ধারাকান্দি থেকে আসার সময় কাপড় চোপড় ছাড়া আমরা আর কিছুই আনতে পারিনি। কারণ সেই ছোট্ট ভাঙা নৌকায় অন্য কিছু বোঝাই করা সম্ভব ছিলো না। এরপর বর্ষাকালে যখন আমার ফুফাতো ভাইরা বাঁশের চালান নিয়ে ভাটি এলাকায় আসেন, তখন তাঁরা বেশ কিছু আসবাবপত্র আমাদের জন্য নিয়ে আসেন। তার মধ্যে বাবার কিছু সখের জিনিসও ছিলো। যেমন একটা পানের

বাটা, একটি পিকদানী, একটা গোলাপ-পাশ, একটা সেলাম দান: এমনি সব মুরাদাবাদী নক্‌শাদার কাঁসার জিনিস। আমাদের তখন যা অবস্থা, তাতে এসব জিনিসের কোনো পরিবেশই আমাদের সংসারে ছিলো না। কিন্তু মা, যদ্দূর মনে হয়, বাবার স্মৃতি হিসাবেই এ সকল জিনিস তখনও ধরে রেখেছিলেন। তাই ফুফাতো ভাইদের কাছে বারবার এসব জিনিসের কথা বলে এসেছিলেন। তাঁরা প্রায় প্রত্যেক বছরই বাঁশ বিক্রি করতেন। বর্ষায় যখন ফুড়িয়া নদী জলে ভরে যেতো, তখন বাঁশ কেটে নদীর জলে 'চালি' বাঁধা হতো। সেই চালি স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলতো ভাটির দিকে। কাউরাটের সম্মুখ দিয়ে যাবার বেলায় এইসব জিনিসপত্র তাঁরা দিয়ে গিয়েছিলেন।

একদিন আমার নিরূপায় মা আমার হাতে একটি কোরমাদানী দিয়ে বললেন, 'তোর ছোট খালার কাছে এটি রেখে দশটি টাকা নিয়ে আয়।' আমি কাপড়ের নিচে লুকিয়ে ছোট খালার কাছে তা পৌছালাম এবং অতি সন্তর্পণে দশটি টাকা এনে মার হাতে দিলাম। ব্যাপারটি এমন অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না, কিন্তু আমার মনে কেন জানি এই ঘটনাটি একটা কাঁটার মতো বিঁধে গেলো। টাকা যে কতো বড় বস্তু, এর আগে তা আমার কাছে এমনভাবে ধরা পড়েনি। এই টাকা বুঝি আত্মীয়তার চাইতেও বড়ো ; রক্তের সম্পর্কও এর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তা না হলে এমনিভাবে টাকা আনতে হবে কেন।

এরই প্রতিক্রিয়ায় কিনা জানি না, তখন আমি ভীষণভাবে টাকার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। আহা, হঠাৎ যদি একটা গুপ্তধনের মতো কিছু পেয়ে যেতাম, তাহলে সংসারের অভাব মিটিয়ে ফেলতাম না শুধু, অন্যদেরকেও তা দিয়ে সাহায্য করতাম। ইতিপূর্বে গুপ্তধনের যে সকল কাহিনী শুনেছিলাম, তাই এবার আমার কল্পনাকে আশ্রয় করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আর আমি এখানে সেখানে সম্ভাব্যস্থানে সেই গুপ্তধন প্রাপ্তির আশা করতে লাগলাম।

তখন আমার কল্পনায় একটা বিরাট বাড়ি স্থান পেয়েছিলো। সেটি এমন বাস্তব হয়ে উঠেছিলো যে, খোলা চোখেই আমি সেটি দেখতে পেতাম। দুই খণ্ডে তৈরি সেই বাড়ির পিছনে তিনতলা একটি পাকা দালান, মাঝখানে দোতলা একটি দালান আর সামনে একতলা একটি দালান। এইসব দালানের মধ্যকার সাজসজ্জা খুব একটা চোখে ভাসত না ; কিন্তু চোখ খুললেই চক্‌চকে সাদা দালানগুলি দেখা যেতো। গুপ্তধন দিয়ে আমি এই বাড়িটি তৈরি করেছিলাম।

কিন্তু বাস্তবে আমাদের সংসার তখন খুবই অচল হয়ে পড়েছে। দুবেলা দুমুঠো খাবারও সব সময় জুটতো না। দেশের অবস্থাও তখন খারাপ হয়ে পড়েছিলো। অনাবৃষ্টির দরুণ আউশের ফলন ভালো হয়নি। এরপর যখন বৃষ্টি শুরু হলো, তখন তা এমনি বন্যার সৃষ্টি করলো যে, কষ্টেসৃষ্টে বোনা ও রোপা আমন ধান তল করে চারদিক ভাসিয়ে দিলো। প্রবল ঝড়ো বাতাসে জালিয়ার হাওর বেয়ে ভেসে আসতে লাগলো দলে দলে কচুরীপানা। পানি কমলে যে সব ক্ষেতে কিছু ধান হতে পারতো, সেখানে জেঁকে বসলো এই কচুরী পানার ঝাক।

ভাটি অঞ্চলে এই কচুরীপানার তখন একটি নতুন নামকরণ হয়। লোকে একে বলতো 'জারমুনি'। এখনও এই নামটি বিরাজ করছে। এমনি নামকরণের পিছনে যে কারণটি বিদ্যমান, তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বাস্তবতা থেকেই উদ্ভুত। জারমুনি শব্দটি জার্মানি শব্দেরই বিকৃতরূপ। এই যুদ্ধে জার্মানি ছিলো ব্রিটিশের বিরোধী পক্ষ। সুতরাং তারাই এই বৃটিশ রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য এই কচুরীপানা পাঠিয়ে দিয়েছে। আর এজন্য কচুরী পানাই জার্মানির প্রতীক হয়ে জারমুনি হয়ে গেছে।

এছাড়া যুদ্ধের আলোচনাও তখন গ্রামীণ জীবনে নেমে এসেছে। কারণ এরই প্রভাবে ধান-চালের দাম বাড়তে আরম্ভ করেছে। এর উপর খরা ও বন্যায় ফসলহানি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মতোই সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। এমনি অবস্থায় আমাদের সংসার যে ভেঙে পড়বে, তা আর বিচিত্র কী! কিন্তু সংসারের এই হাহাকার সচেতনভাবে আমাকে শুনতে হয়নি। কারণ গুপ্তধনের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতেই আমি টাইফয়েড বা মেয়াদী জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, গোপাটের পানি তখন অর্ধেক কমে গেছে। আমি 'মিষ্টি গোটা' নামে এক ধরনের বুনোফল খোঁজার জন্য গোপাট পেরিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকেছি। হঠাৎ আমার পায়ে ঠেকলো একটা হাঁড়ির কান্দা। আমি নুয়ে পড়ে দেখলাম সেটি মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। গাছের একটা ডাল ভেঙে সেই কান্দার চারপাশ খুঁড়তে লাগলাম। অনেক কষ্টে খুঁড়ে বের করলাম একটি মাটির হাঁড়ি। তার ভিতরেও কিছুটা মাটি ছাড়া আর কিছু নেই। কে জানে এই মাটির হাঁড়ি এখানে কে পুঁতেছিলো! তার মধ্যে কী রেখেছিলো, তাই বা কে জানে! কিন্তু আমি অভাগার জন্য মাটি ছাড়া আর কিছুই জুটলো না। গুপ্তধন প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় যে উত্তেজনা এতোক্ষণ আমাকে দিয়ে পরিশ্রম করিয়ে ছিলো, এখন দারুণ হতাশা হয়ে আমার সারাদেহে ছড়িয়ে পড়লো। সকাল থেকে কিছু খাইনি। ক্ষুধার তাড়াতেই মিষ্টি গোটার লোভে এই জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। কিন্তু গুপ্তধনের এই হাঁড়ি এতোক্ষণ আমাকে দিয়ে খুঁড়িয়ে সেই ক্ষুধা দ্বিগুন করে তুলেছে। এর বিনিময়ে না পাওয়ার যে হতাশা আমার মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছে, তা আমাকে মিষ্টি গোটা খুঁজতেও দিলো না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হতভাগা আমি পা টেনে টেনে দক্ষিণের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

দক্ষিণের বাড়ি মানে আমার নানার বাড়ির দক্ষিণ পাশে গোপাটের ও পাড়ের বাড়ি। সে বাড়িতেও আমার অনেক নানা আছেন। গিয়ে দেখলাম, রূপাদাস নানার ঘরে নারকেল কাটা হচ্ছে। আমি খাবার জন্য পানি চাইলাম। কিন্তু নানী আমাকে শুধু পানি খেতে দিলেন না। দুটি নারকেলের টুকরা হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলি খেয়ে পানি খা।' আমি সেই দু'টুকরা নারকেল চিবিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে একগ্লাস পানি খেলাম। তারপর বাঁশের সাকো দিয়ে গোপাট পেরিয়ে বাড়িতে চলে এলাম। আমার তখন বেশ ঘুম পেয়েছে। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এরপর আর কিছু মনে নেই।

শুনেছি, বিকালেই আমার দারুণ জ্বর আসে আর সেই জ্বর একমাস দশদিন পরে আমাকে চুষে খেয়ে ছোবড়া করে ফেলে যায়। আজরাইল আমাকে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট টানাটানি করেছে, কিন্তু কীভাবে যে আমার দুঃখিনী মা তার সবল কবজা থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন, তার কোন খোঁজই আমি রাখতে পারিনি। যেদিন আবার নতুন করে আমি পৃথিবীকে দেখতে পেলাম, সেদিন শুধু দেহ নয়, আমার মায়ের শক্তি সমর্থও নিঃশেষ হয়ে গেছে। দেশের অবস্থাও আমার মতোই কংকালসার। ১৩৫০ এর মন্বন্তর তখন পুরো দমে শুরু হয়ে গেছে।

গ্রামের অধিকাংশ লোকের ঘরে ধান নেই, পাট নেই। খরা আর বন্যার কবল এড়িয়ে যারা কিছু ধান পেয়েছিলো, তাতে একমাসও কুলায়নি। বাজার থেকে ধান চাল বলতে গেলে উধাও। যাও আছে, তার দাম আট দশ গুন বেশি। আট টাকার ধান হয়েছে আশি টাকা, কেনে কার সাধ্য! আমাদেরতো কথাই উঠে না। মার যা কিছু সামর্থ ছিলো, আমার রোগের সময়ই তা উবে গেছে। কাজেই এখন আমাদের অনাহার অর্ধাহারই হয়ে উঠেছে সাধারণ ব্যাপার। তবু এর মাঝে আমি একদিন উঠে দাঁড়ালাম। যে বাঁচবে, তাকে মারে এমন সাধ্য কার!

এ কারণেই এখনও অনেক সময় অবাক হয়ে ভাবি, এমনি পরিবেশে, এমনি অবস্থায় আমারতো বেঁচে থাকার কথা নয়। যেখানে সুস্থ সবল মানুষই শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, সেখানে এই মরা কাঠে আবার পাতা গজালো কী করে! সত্যি আমার জীবনী শক্তি কী অপরিসীম। শকুনকেও আমি হার মানিয়েছি! আরও অবাক হই এই ভেবে যে, টাইফয়েড শুনেছি, একটা না একটা দৈহিক খুঁত দেখা দেয়, কিন্তু আমি এই মারাত্মক রোগের মরণ ছোবল থেকে নিখুঁত হয়েই বেঁচে গেছি। সুতরাং স্বয়ং আজরাইল যার কিছু করতে পারেনি, দুর্ভিক্ষ তার আর কী করবে! না, জীবনের শক্তি বড়ো সাংঘাতিক। যতোক্ষণ বাধাকে সে জয় করতে পারে, ততোক্ষণ তাকে কোনো কিছুই পরাজিত করতে পারে না।

কিন্তু দেহে জীবনের লক্ষণ থাকাটাই তো বেঁচে থাকা নয়। এর জন্য আহার্যের প্রয়োজন। তারই খোঁজে এই কংকালসার দেহ নিয়েও আমাকে কন্ট্রোলের ধান কেনার লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হলো। সেই ধান বিক্রি হয় কেন্দুয়া হাই স্কুলের সামনে। কাউরাট থেকে এর দূরত্ব তিন মাইল। সেখানে আমি কার সাথে কীভাবে গিয়েছিলাম, তার কিছুই মনে নেই। শুধু সেই লাইনে দাঁড়ানোর দৃশ্যটিই মনে পড়ছে। দুদিক থেকে শক্ত বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি সরু পথের সৃষ্টি করা হয়েছে; সে পথ দিয়ে একটি মাত্র লোকেরই যাওয়া সম্ভব। তাই লাইনে দাঁড়িয়ে ধান পাওয়া খুব একটা হাঙ্গামা নেই। কিন্তু লাইনে দাঁড়ানোই একটা ভাগ্যের ব্যাপার। আমার দেহের অবস্থার জন্যই সম্ভবতঃ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছিলো। অন্যেরা আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা করুণা করেছিলো।

অবশ্য পরবর্তী কালে পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে বিবরণ পাঠ করেছি, কংকালসার মানুষের মিছিল আর মৃত্যুর বিভীষিকা, তা আমার স্মৃতিতে নেই। শুধু এই কেন্দুয়ারই কাছের একটি গ্রামে একটি লঙ্গড়খানার দৃশ্য চোখে ভাসছে। সেখানে ভীড় ছিলো এবং সারি বেঁধে মানুষের বসে থাকার ব্যাপারটিও স্মরণ করতে পারছি; কিন্তু আমি নিজে সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলাম কিনা, তা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

অন্যদিক থেকেও এসময়ে আমার স্মৃতির বলয় খুবই সংকুচিত ও দুর্বল। এর কারণ আমার দৈহিক অক্ষমতা। আর সেই অক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে আমার দুটি বিরাট হাঁটুর কথা মনে পড়ছে। সম্ভবতঃ যে কারণে দুটি হাঁটুকে বিরাট বলে মনে হয়েছে, সেই কারণেই তৎকালে আমার চেতনা চারদিকের দৃশ্যাবলীকে ধারণ করতে পারেনি। এমনকি ঘরের কথাও খুব একটা মনে নেই। শুধু সাঁতার পানিতে তলিয়ে যাওয়া পাটক্ষেতে পাটকাটার একটি দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে। আমি নৌকায় বসে আছি আর পাটগাছের ডগায় জড়িয়ে জড়িয়ে থাকা হলদে রংয়ের মাকড়সা দিয়ে ছোট বড়শীতে এলংমাছ ধরার চেষ্টা করছি। তেমনি শালুক তোলার একটি দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছি। এমনি মনে পড়ছে আরো একটি ঘটনার কথা। সেখানে একটা নতুন শিহরণও ছিলো।

আমার মাফিজ খাঁ নানার কথা ইতিপূর্বে বলেছি। তিনি নওপাড়ার সাথে ঝগড়া করে একটি বাজার জমিয়েছিলেন, সে কথাও উল্লেখ করেছি। গোগ বাজারের কাছে নদীর এপারে সেই বাজারের অবস্থা তখন খুব ভালো নয়। নানার দোকান অনেক আগেই গেছে, অন্যান্য দোকানেরও যায় যায় অবস্থা। শুধু শেষ মাথার দক্ষিণের দিকে একটি বড়ো দোকান তখনো আছে। সে দোকানটি কার, কিছুই মনে নেই। শুধু বাজারে গেলে যে সেই দোকানে বসতাম, তার একটা ঝাপ্‌সা স্মৃতি মনে পড়ছে। একদিন সেই দোকান থেকে পরিচিত কারোর সাথে ফিরছি, এমন সময় আমার প্রবল হিক্কা বা হেঁচকি দেখা দিলো। একটু পরে পরেই বিকট শব্দে এক একটি উদ্‌গার উঠছে আর আমি কাহিল অনুভব করছি। শেষ পর্যন্ত নদীর পাড়ের একটি গাছতলায় বসে পড়লাম আমি। তখনই সাথের সেই লোক আমাকে বললো, 'কিছু মনে করো না, তুমি কি অমুকের দোকান থেকে একটি লবণের পোটলা সরিয়ে ফেলেছো? সে তোমাকে বসিয়ে রেখে বাইরে গিয়েছিলো, ফিরে এসে দেখে একসের লবনের সেই পোটলাটা আর নেই। তোমাকে সে সন্দেহ করছে।'

আমি তার কথা শুনে থ মেরে গেলাম। রাগে আমার সারা শরীর কাঁপছে। আমি চিৎকার করে বললাম, 'মিথ্যা কথা। চলো এখনই তার কাছে যাই। তার দোকানে বসি বলেই যা তা বলবে।'

আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই সে বললো, তোমার হেঁচকিতো আর নাই, তাই ও নিয়ে আর চিন্তা না করলেও চলবে।'

'তার মানে?'

'তার মানে তোমার হেঁচকি থামাবার জন্যই এমন একটা মিথ্যা কথা বলে তোমাকে চমকে দিয়েছিলাম'—এই বলে সে হাসতে লাগলো।

আমি জানি না, এভাবে হেঁচকি থামে কিনা। তবে সেদিন আমার প্রবল হিক্কা সত্যি থেমে গিয়েছিলো।

এমনিভাবে আরও একটি ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছি, যা আমার ভূতের ভয়কে অনেকাংশেই দূর করে দিয়েছে। এখনও হয়তো তেমন স্থানে তেমনকালে গা ছমছম করে উঠে, কিন্তু আগের মতো আর বিভ্রান্ত হই না। কারণ দৃষ্টি বিভ্রম কাকে বলে আর তা কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে সেই ঘটনা।

তখন আমি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছি। কেন্দুয়ার বাজারে যাবো, পাশের বাড়িতে আমার এক নানি এক সের তামাকের গুড়া দিলেন বিক্রি করতে। সেই গুড়া বিক্রি করে তাঁর জন্য পান সুপারী আনতে হবে। কিন্তু হাটে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকেও আমি সেই গুড়া বিক্রি করতে পারলাম না। আমার নিজের কাজও হলো না। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেলো। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে, বাজারও খালি হয়ে গেছে। অগত্যা একা একাই বাড়ির পথ ধরলাম। কিন্তু বড়ো রাস্তায় নেমেই থেমে পড়তে হলো। কারণ এই অন্ধকারে আমি একা একা এতোটা পথ যাবো কী করে! তাছাড়া আজকে তো শনিবারের অমাবশ্যার রাত। মা এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকাল সকাল ফিরতে বলেছিলেন। আমিওতো জানি, এ রাতে যতো ভূতপ্রেত সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এর উপর রাস্তার পাশেই আছে একটা শ্মশান। যেখানে এক বিরাট শিমুল গাছ। তার তলা দিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই রাস্তা থেকে নেমে আবার বাজারের দিকে ফিরে এলাম। আর তখনই চোখে পড়লো, এই পথেই একটা বাতি এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখলাম একজন দোকানদার কুপিবাতি জ্বালিয়ে বাজার থেকে ফিরছে। কাউরাটের পাশের গ্রামেই তার বাড়ি। সুতরাং তার সাথী হয়ে আমি বেঁচে গেলাম।

এভাবে তার পিছু পিছু গোগে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু আমার তখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। গোগের পিছনেই একটা মরা নদী, সেটি পার হয়ে একটি ছোটখাটো বন্দ বা ময়দান পেরুলেই কাউরাট। দোকানদার লোকটি আমি একা এইপথ যেতে পারবো কিনা জিজ্ঞাসা করলো। কারণ ইতিমধ্যেই আকাশে মেঘ জমে এলোমেলো বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমি সাহস দেখিয়ে যেতে পারবো বলায় সে এক মুঠা পাটখড়ির একটি আলো আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমাকে মরা গাঙে নামিয়ে দিলো।

গাঙ্গে পানি নেই। মাঝখান দিয়ে একটি ছোট নালার মতো আছে। তার দুপাশে বোরো ধান ক্ষেত। তবে সাপের ভয় আছে। আমি বোরো ক্ষেতের আল দিয়ে খুব সতর্ক হয়ে নদীর পাড়ে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু পাড়ে উঠার সাথে সাথেই বাতাসের প্রবল ঝাপটায় আমার হাতের আলোটা নিভে গেলো। আমি জ্বালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সুতরাং পাট খড়ির মুঠা ফেলে দিয়ে আমি এগুনোর জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

কিন্তু কী অবাক কাণ্ড! সারাটা বন্দ জুড়ে এতো আলো জ্বলছে কেন! যেদিকে তাকাই, একই ধরনের অগনিত আলো মাটির খানিকটা উপরে জ্বলছে আর হেলছে দুলছে। আমার চেতনায় আলেয়ার আলোর স্মৃতিজাগ্রত হয়ে আমাকে বিমূঢ় করে দিলো। আমি অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু এভাবে হাল ছেড়ে দিলেতো চলবে না। তাছাড়া আলেয়ার আলো আমার চোখের সামনে থাকলেও আমার গায়ে এসেতো পড়েনি। এসব ভেবে আমার মনে একটা অদ্ভুত সাহস ফিরে এলো। শুধু একটা ভয় তখনও ছিলো, যাতে কোনোক্রমেই আমি নদীতে গিয়ে না পড়ি। কারণ আলেয়া এই নদীতে নিয়ে গিয়েই মানুষকে মেরে ফেলে!

আমি এখনও ভেবে অবাক হয়ে যাই যে, এমনি এক বিভীষিকাময় মুহূর্তে আমার মনে এতোটা সাহস এলো কী করে! এর কারণ সম্ভবতঃ ভয়ভীতি যখন অস্তিত্বকে বিপন্ন করে শেষ সীমায় পৌঁছে, তখন প্রাণী মাত্রেই মরিয়া হয়ে তাকে অতিক্রম করার সাহস দেখায়। আমার ক্ষেত্রেও সেই ধরনের কিছু ঘটেছিলো। সুতরাং আমি এই অগণিত আলোর মধ্যে একটির আলো লক্ষ্য করতে পারলাম এবং সেটি যে গ্রামের কোন ঘরেই জ্বলছে, এও আমি বুঝতে পারলাম। তারপর সেই স্থির আলোটি লক্ষ্য করে চোখ মুছে আমি দিলাম দৌড়। আমার ইচ্ছা, আমাকে পথে বাধা না দিলে আমি অবশ্যি সেই আলোর কাছে পৌঁছে যাবো।

কিন্তু মাঠতো আর পথ নয়, এবড়ো থেবড়ো জমি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট আলের বাধা। কিন্তু আমার পায়ের নিচে সব সমান হয়ে গেছে। দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ কিসের ধাক্কা লেগে আমি উল্টে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। কিন্তু শরীরের কোথাও কোনো আঘাত লাগলো না বা কোনো চাপও আমি অনুভব করলাম না। আমি ধীরে ধীরে উঠে বসে চোখ খুলে তাকালাম। দেখলাম, যার সাথে ধাক্কা খেয়েছি, সেটি একটি বাঁশ আর আমি গ্রামের কাছে পৌঁছে গেছি। কিন্তু আলেয়ার আলো! না সারা মাঠ জুড়ে সেই অগনিত আলো একটিও নেই। অবাক কাণ্ড।

অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে। তবে সেই যে কথায় বলে, তেমনি আমার একটি ফাঁড়াও কেটে গেলো বুঝি। কারণ যে বাঁশটির সাথে আমি ধাক্কা খেয়েছিলাম, সেটি তামাক ক্ষেতের-পাশে বাঁধা একটি বাঁশ। সেটি ছাঁচা ছুলা নায়ের মাস্তুল ছিলো বলেই আমি বেঁচে গেছি। তা না হলে আলেয়ার ফাঁকি এড়াতে পারলেও বাঁশের কঞ্চির আঘাত এড়ানো যেতো না। সে সোজা আমার পেটের মধ্যে ঢুকে আমাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যেতো।

কিন্তু সেই অগুনিত আলেয়ার, আলো সেগুলি গেল কোথায়! বাঁশের এই আচমকা ধাক্কা না খেলে ওরা আমার দৃষ্টি থেকে এতো সহজে পালাতো না। আসলে সেগুলিতো আলেয়া নয়, আমারই হাতে ধরা পাটখড়ির আলো। বাতাসের আঘাতে হঠাৎ নিভে গিয়ে আমার ভীত দৃষ্টির মাধ্যমে সে ছড়িয়ে গিয়েছিলো সারা বন্দ জুড়ে। বাঁশ আমাকে ধাক্কা মেরে আমার বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের চেতনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত না করলে সে আমার

দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখতোই। স্নায়ুর দুর্বলতা যে কী করে দৃষ্টির বিভ্রম আর চেতনার বিভ্রান্তি ঘটায়, তার বহু উদাহরণ পরেও দেখেছি।

যা হোক্, এতো সব কথা কি তখন বুঝতে পেরেছিলাম? না, এর এক সিকিও তখন এমনি যুক্তি তর্ক নিয়ে দেখা দেয়নি। শুধু একটা চেতনাই জন্মেছিলো যে, চোখে দেখলেই সব দৃশ্য সত্য হয় না। এর ফলে অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমার স্নায়ুকে কতকাংশে অবিচল রাখার একটা সাহস পেয়েছিলাম বৈকি!

কিন্তু হঠাৎ কেন জানি মনে হচ্ছে, আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের যে চূড়ান্ত রূপটি এখানে বর্ণনা করার কথা, তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই আমি এই সব স্মৃতির টুকরা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। হতেও পারে। কারণ এই চূড়ান্ত রূপটি কীভাবে ঘনীভূত হয়েছে, তার কোনো কিছুই আমি জানতে পারিনি। বরং বলা যায়, আমাকে জানতে দেয়া হয়নি। তবে পরবর্তী কালে এইটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, এছাড়া আর উপায়ও ছিলো না।

আমার নানার কথা ইতিপুর্বে বলেছি, তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁর তিন মেয়ের মধ্যে আমার মা-ই ছিলেন সকলের বড়। কাজেই নানার উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁদেরও দাবী ছিলো। কিন্তু সে দাবী গিয়েছিলো, এ খবরটি পরবর্তী কালে জানতে পেরেছিলাম। আর আমার পৈতৃক সম্পত্তির কথাতো আগেই বলেছি, আমার মাফিজ খাঁ নানার হাত দিয়েই তার অনেকটা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। বাদ বাকী যা ছিলো, তাতে দাদা-দাদী ও বাবার কবর ছড়িয়ে ছিলো বলে মা সেগুলিতে আর হাত দেননি। আর দিলেই বা কী হতো, শেষ রক্ষাতো আর হতো না। কাজেই আমাদের পারিবারিক জীবনের ভাঙন চূড়ান্ত হয়ে উঠলো। আমরা ভাই বোনেরা মায়ের আঁচল ছেড়ে এখানে সেখানে ছিটকে পড়লাম। এতোদিন অনাথ ছিলাম, এবার অনিকেত হয়ে গেলাম।

অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই ক্রান্তিকালে ঘরের কথা আমার কিছুই মনে পড়ছে না। উপরে যে আলেয়ার আলো দর্শনের ঘটনাটি বলেছি, তা যদ্দূর মনে হয়, পঞ্চাশের শেষ চৈত্র মাসের। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তখন আর নেই। ভাটি অঞ্চলে বোরো ধান হয়েছে প্রচুর। আর তা বিক্রিও হয়েছে বেশি দামে। সুতরাং তখন এমন একটা কথা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে শুনেছি যে, ভাটি এলাকার লোকেরা নাকি ধান বিক্রির টাকার নোট দিয়ে সে বছর ঘরের চাল ছেয়েছে!

ভাটির কথা আসাতেই বরাটির কতা মনে পড়লো। সেখানে মাফিজ খাঁ নানার মেজো মেয়ের বিয়ে হয়েছিলো। মদন থানার অন্তর্গত এই বরাটি গ্রামে আমি বহুবার গিয়েছি আমাদের অভাবের সংসারে এই বরাটি থেকেও কিছুটা সাহায্য এসেছে। এমনি একবার মিষ্টি আলুর কথা মনে পড়ছে। আমি বরাটি থেকে একটি ছোট ছালা ভর্তি মিষ্টি আলু নিয়ে আসছি কাইটাইলের কাছে একটা জঙ্গলে রাস্তা পার হবার সময় হঠাৎ সামনে পড়লো একটি সাপ। রাস্তার মাঝখানে শুয়ে আছে। আমি থতমতো খেয়ে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই আলুর বোঝাটি আমার মাথা থেকে পড়ে গেলো। সেই শব্দে সাপটি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো এবং একটি মাঠের ঝড়া পাতা উড়িয়ে সে মাঠের ওপারে

একটি গাছে গিয়ে উঠে গেলো। হতভম্ব আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার এই প্রচণ্ড গতির দৃশ্য দেখলাম। পরে শুনেছিলাম, এই সাপটির নাম 'চিলাবাখা'। বিষাক্ত সাপ; গাছের কোঠরেই বাস করে।

এটিও এই চৈত্রের ঘটনা কিনা, জানি না; তবে এসময়ে একটি বিদ্যুৎ পাতের ঘটনা আমার অনুভূতিকে খুব আলোড়িত করেছিলো। সেটি ঘটেছিলো কাউরাটের পাশের গ্রাম জালালপুরে। সকাল বেলা খুব এক চোট ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি আরও কয়েকটি ছেলের সাথে গোগ বাজারের কাছে গেছি ব্যাঙ ধরতে। বৃষ্টির পানি জমার ফলে ক্ষেতের ফাটল থেকে ছোট ছোট ব্যাঙ বেরিয়ে আসে আর সেগুলি খুব সহজেই ধরা যায়। এ সব ব্যাঙ পোষা বকের খুব প্রিয় খাদ্য। তাছাড়া হাঁস মুরগীও এগুলি খেতে ভালো বাসে। যাহোক্ আমরাতো দৌড়ে দৌড়ে ব্যাঙ ধরছি, এমন সময় খবর এলো, জালালপুরে এক ভীষণ কাণ্ড হয়েছে; 'ঠাডা' পড়ে মানুষ গরু মরে সাফ হয়ে গেছে। শোনা মাত্র দে দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে আমরা গিয়ে পৌছলাম অকুস্থলে।

এখানে জালালপুর সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা দরকার। কাউরাট ও আশে পাশের গাঁয়ের লোকেরা জালালপুরের লোকজনকে বোকা বলে খ্যাপাতো। এই গাঁয়ের কাউকে পথে ঘাটে দেখতে পেলেই ছেলে ছোকরারা 'এ্যা কাউয়া কীৎ' বলে চেঁচিয়ে উঠতো। আর ঐ লোকটি, ছেলে বুড়ো যাই হোকনা কেন, ভীষণ রেগে যেতো। আমি নিজেও এধরনের কথা বলে এদেরকে রাগিয়েছি এবং গালি শুনেছি।

এই ঠাট্টাটির মূলে একটি ঘটনা আছে। সেটি ঘটেছিলো নওপাড়ার বাজারে। এই বাজারের পাশেই তিলু চান নামে এক মুচির বাড়ি ছিলো। তার প্রচুর টাকা পয়সা ছিলো। টাকা-পয়সার অসারতা প্রমাণ করার জন্য মানুষ বলতো, 'আরে রাখ্ তোর টাকা পয়সা; টাকাতো তিলু চান মুচারেরও আছে।' সেই মুচি বাড়ির সামনে একটি বাঘ ধরার ফাঁদ তৈরি হয়েছিলো। কারণ তখন ঐ এলাকায় কেঁদো বাঘের উৎপাত দেখা দিয়েছিলো।

আগেকার দিনে এই সব ভাটি এলাকায় প্রায়শই বাঘের উৎপাত দেখা দিতো। এই কাউরাটেই একবার এক বিরাট বাঘের উৎপাত হয়। সেই বাঘের ভয় আর মানুষ গরু মারা নিয়ে আমি নিজেও অনেকের মুখে অনেক কথা শুনেছি। সুতরাং বাঘ ধরার ফাঁদ ঐ এলাকায় একটি পরিচিত ব্যাপার ছিলো। একটি গর্তের চারদিকে শক্ত বাঁশের বেড়া আর তাতে ঢোকবার ছোট্ট একটি দরজা। দরজার বেড়াটি দড়ি দিয়ে এমন ভাবে ঝোলানো থাকতো যে, কোনো কিছু ঢুকতে গেলেই দড়িতে টান লেগে দরজার বেড়াটি পড়ে যেতো। এর ফলে সে আর বেরুতে পারতো না। দিনের বেলা ফাঁদটি এমনিই পড়ে থাকতো। শুধু রাতের বেলা একটি বাঁধা ছাগল নিয়ে সে সজীব হয়ে উঠতো। কাজেই এ ব্যাপারে কারোর তেমন কোনো ঔৎসুক্য ছিলো না। আর ছেলে মেয়ে যারা দেখতে যেতো, তারা বাইরে থেকে দেখেই তৃপ্ত থাকতো।

• কিন্তু জালালপুরের একজন বয়স্ক লোক সেই ধৈর্যটুকও দেখাতে পারলো না। সে এক ভাঁড় গাওয়া ঘি নিয়ে বাজারে গিয়েছিলো। মানুষ তখনও খুব একটা আসেনি। কাজেই এই অবসরে সে বাঘের ফাঁদটি ভালো করে দেখার জন্য ঘিয়ের ভাঁড়টি ফাঁদের বেড়ার সাথে লটকিয়ে রেখে তার ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। অমনি দরজার বেড়াটি পড়ে গিয়ে তাকে ফাঁদের মধ্যে আটকে দিলো। সে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছে, আর ওদিকে কয়েকটা কাক এসে ঠোঁট ডুবিয়ে তার ভাঁড়ের ঘি খেয়ে ফেলছে। বেচারা ফাঁদের মধ্যে থেকে কাক তাড়াবার জন্য বারবার বলছে, 'এ্যা কাউয়া কীৎ'।

এই হলো সেই ঘটনা! এই শব্দ কয়টি বলে সেই ঘটনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো। কাজেই জালালপুরের মানুষকে এসব বলে খেপিয়ে দেয়াটা একটা আমুদের ব্যাপার ছিলো। এমনি আরও একটি ঘটনা ছিলো 'গরুর বিচার'। সেটি উল্লেখ করলেও তারা খেপে যেতো।

জালালপুরের পশ্চিম দিকে একটি বিল আছে। তার পাড়ে ঐ গাঁয়ের লোকেরা মরিচ চাষ করতো, মরিচও হতো প্রচুর। কিন্তু গরু ছাগলের উৎপাতও ছিলো তেমনি বেশি। বেড়া দিয়েও কূল পাওয়া যেতো না। একদিন হয়েছে কি, এক বাড়ির বৌ গিয়েছে মরিচ ক্ষেত দেখতে। গিয়ে দেখে বেড়া ভেঙে একটা ডেকাবাছুর মরিচ ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে। সে আর কী করবে, সাথে তো দড়ি কাছি নিয়ে যায়নি, তাই নিজের পরণের শাড়ির আচঁল দিয়েই সেই ডেকা তথা ষাঁড় বাছুরের গলা বেঁধে ফেলেছে। বাছুর প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, মনে হয়েছিলো কেউ বুঝি আদর করছে। কিন্তু যখন বুঝতে পারলো যে সে বাঁধা পড়েছে, তখন এক পাক্কুর মেরেই দৌড়। বৌ কিছুতেই তাকে ফেরাতে পারেনি। কাজেই গলায় বাঁধা আঁচল শুধু নয়, বাছুর বৌয়ের পুরো কাপড়টা নিয়েই চলে গেছে। আর নিরুপায় বৌ বিবস্ত্র হয়ে সেই ক্ষেতের মধ্যেই বসে পড়েছে। কি লজ্জা! কাউকে ডাকতেও পারে না, চিৎকারও করতে পারে না।

ওদিকে বাড়িতে বৌয়ের খোঁজ পড়েছে। এবাড়ি ওবাড়ি খুঁজে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকাল, শেষে নেহাৎই কেউ একজন মরিচ ক্ষেতের ধারে এসেছিলো, সেই আবিষ্কার করেছে বৌকে। তারপর তাকে উদ্ধার করা আর ডেকা বাছুরের বিচার জমানো। সে এক হৈচৈ কাণ্ড! আর সেই কাণ্ডের কথা যখন তখন স্মরণ করিয়ে দিলে রাগ হবারই কথা।

এমনি আরও বহু কথা জড়ো হয়েছিলো জালালপুরকে ঘিরে। যেমন গা ডুবিয়ে পোনা মাছ মারা, গাইল দিয়ে মাগুর মাছ ধরা ; কাজেই সেই জালালপুরে যে ঠাঁঠা পড়ার ব্যাপারটাও অদ্ভুত হবে তা আর বিচিত্র কি! কিন্তু গিয়ে দেখলাম অদ্ভুত না হলেও মর্মান্তিক।

আসলে বজ্রপাত হয়েছিলো একটি বিরাট কাঁঠাল গাছে। সেটি দু'ফাঁক হয়ে গেছে। তারই পাশে একটি টিনের চৌচালা ঘর। তার বারান্দায় ছিলো এক বুড়ী। সে সেখানেই শেষ। কিন্তু ঘরের মাঝে ছিলো যে বৌটি, সে অচেতন হয়ে গেলেও মরেনি। তবে

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো বেশ কিছুটা দূরে টিনের দোচালা গোয়াল ঘরে দুটি গরু মরে পড়ে আছে।

বজ্রপাতের আরও অনেক দুর্ঘটনার কথা এখানে সেখানে শুনেছি, কিন্তু তার শক্তির প্রচণ্ডতা এমনভাবে আর কোথাও অনুভব করিনি। কাজেই আমার স্মৃতিতে জালালপুরের এই দৃশ্যটি এখনও জ্বলজ্বল করছে।

বিপর্যয় যখন আসে, তখন এভাবেই বুঝি আসে। আমাদের পারিবারিক জীবনেও তেমনি বিপর্যয় নেমে এলো।

আমাদের পৈতৃক নিবাস আমুদপুরে অবস্থানের সময় আমার বিধবা মা একবার এমনি এক নিকার সম্বন্ধকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ; সে কথা আমি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। এবার সেই ধরণের একটি প্রস্তাবই মায়ের সামনে এলো। কিন্তু এবার তিনি নিরূপায়। কারণ যাদের ভরোসাতে তিনি স্বামীর ভিটা ছেড়ে এই পৈতৃক ভিটায় এসেছিলেন, তাঁরাই এই প্রস্তাব তাঁর সামনে তুলে ধরেছেন। কারণ খাঁ বাড়ির মেয়েতো আর পরের বাড়ি কাজ করতে যেতে পারে না!

হ্যাঁ, খাঁদের কৌলিণ্যের কথা তো স্বীকার করতেই হয়। আমি নিজেও তাঁদের সেই জাঁকজমকের শেষ দৃশ্যটি দেখেছি এবং ইতিপূর্বে তা উল্লেখও করেছি। কিন্তু আলোচ্য সময়ে তার শেষ রশ্মিটুকুও নিভে গেছে। তবু সেই যে কথায় বলে, ভেঙে গেলেও মচকাবে না। হায়রে কুলীন, ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, তবু মচকে মাথা নত করবে না। পরে জেনেছি, আমার মা অন্যের বাড়িতে কাজকর্ম করে হলেও আমাদের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ দেয়া হয়নি।

কিন্তু আমি? কৈ আমাকে তো এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হলো না। এমন কি আমাকে এ কথাও বলা হলো না যে, আমি যদি কাজকর্ম করে কিছু রোজগার না করি, তাহলে আমাদের পারিবানিক জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে আমি কি কুলিয়াটি গিয়ে কাজ করিনি! কিন্তু তখনতো আমাকে কুলীনার তনয় বলে নিষেধ করা হয়নি! এর পরেও তো আমি খালাদের বাড়িতে গৃহস্থির কাজ করেছি, তাতে তো কৌলিন্যের অপঘাত দেখা দেয়নি! মাও কি খালাদের কাজকর্ম করে এমনিভাবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন না!

কী জানি, কী হতে পারতো আর কী হতে পারতো না। আর সেই অনুযোগ এখন তুলেই বা কী লাভ! যা হবার তাতো হয়েই গেছে। মার বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে নতুন সংসারের দায়িত্ব নেবার আগ্রহ তাঁর নিশ্চয়ই ছিলো না। কিন্তু নিরূপায় হলে সবই সম্ভব। তাই একরাতে মায়ের নিকের কাজ শেষ করা হলো। আমি তখন কোথায় ছিলাম, মনে পড়ে না। তবে এই অনুষ্ঠানের আশে পাশে যে কোথাও ছিলাম না, সে কথা ঠিক! থাকলে কী হতো, সে কথা ভেবেও এখন আর কোন ফল নেই। তবে জানার পরও তো এ নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য করেছি—বলে মনে পড়ে না। অবধারিত বলেই মেনে নিয়েছি।

অবশ্য এর কারণ অনেকটাই আমার বিপিতার অমায়িক ব্যবহার। তিনি প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধ হলেও মন মেজাজে সত্যি রাশভারী ছিলেন। এজন্যই গোগের আব্দুল লতিফ তালুকদারকে শুধু তাঁর গাঁয়ের লোকেরাই মানতো না, আশপাশের অন্য গাঁয়ের লোকেরাও সমীহ করতো। কারণ বহু গাঁয়ের বহু জনের বংশধারা আর আচার ব্যবহার ছিলো তাঁর নখদর্পণে। সুতরাং তিনি খুব সহানুভূতি দিয়েই আমাদের দুঃখের দিকটাকে বুঝতে পেরেছিলেন। সেজন্যই তাঁর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। তাছাড়া আর কী-ই বা করার ছিলো।

শুনেছি আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিণতির কিছু দিন পরেই আমার বড়ো ভাই যুদ্ধের ময়দান থেকে কাউরাটে ফিরে এসেছিলেন। আর মায়ের এমনি করুণ পরিণতির কথা শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যান। এমন কি ছুরি নিয়ে আমার মামাকে মারতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সাথে তাঁর দেখা হয়নি, এমন কি মাকেও তিনি দেখতে যাননি। এক প্রচণ্ড লজ্জা তাঁকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যুদ্ধের লাইনে। সেখানে ফিরেও এই লজ্জায় তিনি একান্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেন এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

এসবই পরবর্তীকালে আমার বড়ো ভাইয়ের মুখে শোনা কথা। তবে মিথ্যা নয়, যে আমি নিজের দুঃখ দিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। এক সময়ে তিনি অবশ্যি পরিবার পরিজনের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু যখন নির্বান্ধব যুদ্ধের ময়দানে তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলো, তখনই পারিবারিক বিপর্যয়কে ঠেকানোর উপকরণ নিয়ে তিনি দৌড়ে এসেছিলেন। কিন্তু ততোদিনে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে! তাই আমার চাইতেও তাঁর আঘাত লেগেছিলো বেশি।

অবশ্যি দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে অপরিহার্য অংশ। কিন্তু যোগ্য পুত্র থাকতেও যে মা বৃদ্ধ বয়সে বাধ্য হয়ে পরের ঘর করতে যান, তিনি যে কতোখানি নিরূপায় আর তাঁর এই ঘটনাটি যে কী পরিমাণ মর্মান্তিক, সেটি আমার বড়ো ভাই যথার্থ গভীরতাসহ উপলব্ধি করতে চাননি। তাই নিতান্ত বিনা কারণে শুধু মায়ের প্রতি নয়, নিজের ছোট অসহায় ভাইবোনগুলির প্রতিও তিনি নির্মম হয়ে গেলেন। এই পৃথিবীতে তাঁর আর কিছু করণীয় রইলো না। ছোট ভাই বোনেরা বড়ো ভাইয়ের নিকট যা প্রত্যাশা করে আমরা যে তার কিছুই পাইনি! কিন্তু কেন?

না, সে কথা এখন থাক। আপাততঃ বলতে গেলে, সবদিক থেকেই আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আমি ও আমার ছোট বোন রাহেলা বড়ো খালার এখানে এবং সবার ছোটভাই গোলাম কিবরিয়া মায়ের সাথে চলে গেলো। ঘর ছাড়া আমাদের এই ঘরটিও শূন্য হয়ে গেলো।

পঞ্চম তরঙ্গ ॥

আমার আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই কাউরাটের অধিবাসী। মাতুল বাড়ির কথাতো আগেই বলেছি। এছাড়া আমার মায়ের ছোট দু'বোনেরই বিয়ে হয়েছিলো এই কাউরাটে। পরবর্তীকালে আমার ছোট বোন রাহেলারও বিয়ে হয় এই কাউরাটে। সুতরাং কাউরাট আমার আনন্দ বেদনার অনেকখানি অংশ দখল করে আছে। এরই ফলে এক সময়ে আমার গাঁয়ের নাম জিজ্ঞাসা করলে আমি কাউরাট বলে জবাব দিতাম।

আমাদের পারিবারিক জীবনের চরম বিপর্যয়ের পর আমি ও আমার ছোট বোন রাহেলা এই কাউরাটে বড়োখালার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সে সময় বড়োখালাদের অবস্থা যে খুব একটা সচ্ছল তা নয় ; তবু অনন্যগতি, এছাড়া অন্য কোনো পথও খোলা ছিলো না। ছোট খালার বাড়ি কাউরাট পাছপাড়ায়। তাঁদের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ভালো হলেও তখন আমরা কেউ সেখানে ঠাঁই পাইনি। এর কারণ কী, আমার ঠিক জানা নেই।

যাহোক, আমার বড়ো খালুর নাম ছিলো মনসুর উদ্দিন আহম্মদ। তিনি বাবার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাঁর এই নাম এবং বন্ধুত্বের পরিচয় আমি একটি বিয়ের উপহার পত্র থেকে উদ্ধার করেছি। সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে বিয়ে উপলক্ষে পদ্যে লিখা যেসব উপহার পত্র ছাপানো হয়, এটিও তেমনি। আমার বাবার বিয়ে উপলক্ষে এটি ছাপিয়ে বিলি করেছিলেন এই মনসুর উদ্দিন আহম্মদ। পরে তিনি আমার বড়ো খালাকে বিয়ে করেন। তবে সাধারণভাবে তিনি মনসুর উদ্দিন বেপারী নামেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন। এর কারণ, এক সময়ে তিনি পাটের ব্যবসা করে বেশ কিছুটা ধনসম্পদ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য সময়ে সেই সম্পদের কিছু কিছু নিদর্শন অবশিষ্ট থাকলেও সেই ব্যবসা আর ছিলো না। এর বদলে তিনি চাকর দিয়ে গৃহস্থি করাতেন। এতেই সারা বছরের খোরাক ও খয়খরচা কোনো প্রকারে চলে যেতো।

আমার এই বড়ো খালু বেশ রাশভারী ও অমায়িক লোক ছিলেন। সেই দিক থেকে আমার বড়োখালা ছিলেন প্রায় উল্টো স্বভাবের মানুষ। ভালো লাগলে মাথায় তুলতে যেমন তাঁর দেরী হতো না, তেমনি ভালো না লাগলে আছাড় মারতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। এজন্য ছেলে-মেয়ে বুড়ো-জোয়ান সবাই তাঁকে ভয় করতো ও সমীহ করে চলতো। আমার মাকেও দেখেছি, তাঁর এই ছোট বোনকে তিনি ভয় পেতেন। সুতরাং আমার মনে হয়, মায়ের এই দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে, সম্ভবতঃ আমার বড় খালার উদ্যোগ ছিলো বেশি। কারণ তখন আমার মাফিজ খাঁ নানা, বোধা হয়, জীবিত ছিলেন না। কাজেই আমাদের বোঝা তিনি একারণেই, যদ্দূর মনে হয়, গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর আমরা তাঁর শাসন ও স্নেহ, দুটোই লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমার বড়োখালার নাম ফিরোজের মা। এটি তাঁর ডাক নাম ; কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েদের কারও নাম দিয়ে এটি তৈরি হয়নি। বরং ছোটবেলা থেকে এই নামেই তাঁকে ডাকা হতো। আর আমরা তাঁকে বলতাম নয়া বাড়ির খালা। এর কারণ, তাঁদের বাড়িটিকে নয়াবাড়ি বলা হতো। আমার বড়োখালুই কিছুটা পিছন দিক থেকে সরে এসে এখানে নতুন বাড়ি করেন।

যাহোক, আমার মায়ের যেমন চার সন্তান, তেমনি আমার বড় খালারও চারটি সন্তান। তবে আমরা তিন ভাই এক বোন হলেও আমার খালাতো ভাই বোনেরা তিন বোন একভাই। সবার বড় বোনের নাম আনোয়ারা ; তাঁর ছোট ভাই, নাম নুরুল ইসলাম ; তাঁর ছোটবোন, নাম জুবেদা এবং সবার ছোট বোনের নাম সালেহা। আমরা যখন নয়াবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি, তার আগেই আনোয়ারা বুজির বিয়ে হয়ে গেছে। কেন্দুয়া থেকে মাইল দু'এক পশ্চিমে—পিছান্তি গ্রামে তাঁর স্বামীর বাড়ি। আমি অনেকবারই সে বাড়িতে গিয়েছি। আমার আনু বুজি দেখতে কিছুটা শ্যামলা হলেও আমার দুলা ভাই ছিলেন গোরা। দেখতে যেমন, তেমনি—ব্যবহারে অমায়িক। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। কিন্তু আমি আজ তাঁর নামটিও ঠিকমতো মনে করতে পারছি না ; খুব সম্ভব শামসুদ্দিন ভূঞা। তবু গ্রামের পশ্চিমের মাথায় অবস্থিত সেই বাড়িটির দৃশ্য আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

যাহোক, আমার বড়োখালার পোষ্য তখন আমরা দুজনকে নিয়ে নয়জন। দুর্ভিক্ষের ধকল কাটিয়ে উঠে চুয়াল্লিশের প্রথম দিকে একমাত্র গৃহস্থির উপর নির্ভর করে এই নয়জন লোকের আহার যোগানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবু আমার বড়োখালা আমাদেরকে দূরে ঠেলে দেননি বা অনাহারে রাখেননি। তাঁর কঠোর স্বভাবের অন্তরালে যে একটি স্নেহের ফল্গুধারা ছিলো, এর মধ্য দিয়েই তার পরিচয় বেরিয়ে এসেছে। আমরা অনেক সময় সেই ধারায় সিক্তও হয়েছি। কিন্তু তার পরিমাণ কম ছিলো বলেই তৃপ্তি পাইনি। কিন্তু আজ বুঝতে পারি, এছাড়া তাঁর পক্ষে বেশি দেবার উপায়ও ছিলো না। মায়ের চাইতে মাসীর দরদ কোনো কালেই বেশি হয় না। যেখানে বেশি হয়, সেখানে তাই রাক্ষসীর অপবাদও জুটে। না, আমার খালা তথা মাসী রাক্ষসী ছিলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই ; বরং তাঁর নিকট থেকে যেটুকু পেয়েছি, তাইতে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে আছে।

বড়োখালার বাড়িতে আশ্রয় নেবার প্রথম দিকটা আমার স্মৃতিতে কেমন ঝাপসা হয়ে আছে। মা হারানোর বেদনা একজন পনেরো বছরের কিশোরকে উদ্‌ভ্রান্ত করারই কথা। এ কারণেই সম্ভবত গৃহস্থির কোনো কাজে আমি তখন অংশগ্রহণ করেছি বলে মনে পড়ে না। বরং সেই বুনো শৈশবের মতো নদীর পাড়ে বিলের ধারে ঘুরে বেড়ানোর কথাই মনে পড়ছে। এ সময়ে আমার মাফিজ খাঁ নানার ছোট ভাই ওয়াফিজ খাঁ নানা, যিনি মরা নদীর পাড়ে ছনকান্দায় বাড়ি বানিয়েছিলেন, তাঁর ওখানে প্রায়ই যেতাম। আর এই মরা নদীর পাড়ে ঘুরতে ঘুরতেই এ সময়ে একদিন চন্দ্রাশালিকের আট দশ জোড়া

বাচ্চা যোগাড় করেছিলাম। নদীর পাড়ের গাছগুলি থেকে সেই বাচ্চা যোগাড় করা আর খালার এখানে নিয়ে আসার কথা মনে পড়ছে। এরপর সেগুলির কী হয়েছিলো, তা আর মনে নেই।

তার চাইতে বরং এ সময়ে হারাধন ভাইয়ের চেহারাটাই বড়ো বেশি চোখে ভাসছে। কুচ্‌কুচে কালো মোটাসোটা এক যুবক। কাউরাটেরই পশ্চিম পাড়ায় তার বাড়ি। সে ছিলো বড়োখালাদের গৃহস্থির বছুরে কামলা। সে বেশ আমুদে ছিলো। নানা ধরনের গালগল্প বলে আমাদেরকে মাতিয়ে রাখতো। তার কাছে বসলে কিছুক্ষণের জন্য নিজের শূন্যতাকে আমি ভুলে যেতাম বলেই হয়তো তার সাথে স্বেচ্ছায় নানান কাজে এগিয়ে গিয়েছি। এভাবেই হারাধন ভাইদের বাড়িতে যাবার কথাও আমার মনে পড়ছে। সেখানে থাকা ও খাওয়ার একটা আবছা স্মৃতিও রয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। তবে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে জারীগান শোনার কথা।

কাউরাটের পশ্চিমের গাঁওটি নওপাড়া। তারও পশ্চিমে বেজগাতি, বলাই শিমুল হয়ে আশুজিয়ার কাছে গেলাম জারী গান শুনতে। সেখানে বিলের পাড়ে মহরমের এক বিরাট আখড়া তৈরি হয়েছে এবং দিনে রাতে জারী গান চলছে। কাউরাটেরও একটি দল গেলো সেখানে গান গাইতে। হারাধন ভাই আছে সেই দলে। সুতরাং আমিও চলে গেলাম তার সাথে। তখন বিকাল বেলা। বিলের পাড়ে খোলা মাঠে জারী গান হচ্ছে আর চারদিক থেকে অগণিত দর্শক শ্রোতা দাঁড়িয়ে বসে সেই গান শুনছে। একজন বয়াতী দরাজ গলায় সুর করে শহীদে কারবালা বা জঙ্গনামা পুঁথির বয়ান আউড়ে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে—'কান্দে জয়নাল বন্দীশালা ঘরেরে'—বলে ধুয়ার কাছে ফিরে আসছে। অমনি পায়ে ঘুঙ্গুর, মাথায় কালো পট্টি ও হাতে রুমাল নিয়ে গোল হয়ে যে দশ বারোজন দোহার এতোক্ষণ ঘুরে ঘুরে নাচছিলো, তারা সমস্বরে গেয়ে উঠছে,—'হায় দুক্‌খু যায় না ভোলারে'। বার কয়েক ধুয়ার কথা আউড়াতে দিয়ে বয়াতী জিরিয়ে নিয়ে আবার বয়ানের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। ওভাবে এগিয়ে যাচ্ছে জারী গান।

এই জারী গান পরে আরও অনেকখানেই শুনেছি। কিন্তু এই প্রথম শোনার শিহরণ সহ স্মৃতিটি যতো সজীব, তেমনটি অন্যত্র দুর্লভ। এভাবে গান শুনতে শুনতে রাত হয়ে গেলো। এর পর যদ্দূর মনে হয়, বলাই শিমুলের নদীর পাড়ের কাছে কোথাও একটা বড়ো বাড়িতে আমরা রাত কাটালাম। পরদিন ভোরে উঠে বেজগাতির মধ্যদিয়ে এগিয়ে এসে নদী পার হয়ে দু'আনি বাড়ির পুকুরের পাড় দিয়ে নওপাড়ার বাজার হয়ে আমরা ফিরে এলাম।

এই দু'আনী বাড়ির পুকুরটিও ছিলো তখন আমার কাছে এক বিস্ময়। এতো বড় পুকুর এর আগে আমি আর দেখিনি। কাজেই ওদিকে যাবার কোনো সুযোগ এলেই আমি দু'আনী বাড়ির পুকুরটির পাড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেখতাম। কারণ জলজ দামে ভর্তি এই বিশাল পুকুরের পানি কখনও দেখা যেতো না। এর কারণ ঐ বাড়ির জমিদাররা তখন আর নেই। উত্তরের পাড়ে অবস্থিত তাদের ভাঙ্গাচুরা দরদালান

তখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কাজেই সংস্কারের অভাবে এই বিরাট পুকুরটি তখন নিতান্তই হাজামজা ও শ্রীহীন। তবু বিরাট কিছু দেখার বিস্ময় নিয়ে এই পুকুরটির স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে।

এমনি বিরাটত্বের একটি পরিচয় আছে নওপাড়ার সাতপাই বাড়ির পুকুরটিতেও। তবে সেটি দু'আনী বাড়ির পুকুরের চাইতে ছোট বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে। কিন্তু কতো ছোট? দু'আনিতো চব্বিশ পাই আর এখানে হলো মোটে সাত পাই। না, এতোটা বেশ কম নিশ্চয়ই হবে না। তাছাড়া ছোট হলেও এই পুকুরটি তখনও সজীব। জলজ দাম নেই বললেও চলে, টলটলে সাদা পানি ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। তদুপরি এর পূর্ব পাড়েই নওপাড়া হাইস্কুলটি অবস্থিত। কাজেই সেখানে গেলে এই পুকুরের পাড়ে এই স্কুলের ধারে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। এই স্কুলেইতো আমার পিতা শিক্ষকতা করতেন। এই পথে এই পুকুরের জলে তাঁর দৃষ্টি কি বিচরণ করেনি!

কিন্তু অবাক কাণ্ড! আমার শিক্ষক পিতার কথা মনে হলেও এ সময়ে আমার নিজের শিক্ষার কথা কিছুতেই মনে হয়নি। একচল্লিশে আমি প্রাইমারীর সেন্টার পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তারপর পারিবারিক বিপর্যয়ে শুধু বাস্তুহারা নয়, শিক্ষালাভের সেই চেতনাও বুঝি আমি হারিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু আমার আগ্রহ যে একেবারে ছিলোনা, তা-তো নয়। এ সময়ে আমি আবু সাইদ মামার মা আমার এক নানীর কাছে সিলেটী নগরী পুঁথি পড়তে শিখেছিলাম। আমার এই নানীর পৈতৃক বাড়ি ছিলো সিলেটের সুনামগঞ্জে। তাঁরই কাছে আমি হালাতুন্নবী ও মহব্বতনামা পুঁথি দুটি প্রথম দেখি। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের আকর্ষণে কিছুদিনের মধ্যে আমিও সুর করে পুঁথি পড়া শিখে ফেলি। সুতরাং বলা যায় যে, কোনো কিছু শেখার আগ্রহ তখনও আমার ছিলো। কিন্তু সেই আগ্রহকে কাজে লাগাবার কোনো সুযোগ ছিলো না। কৈ, আমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউতো আমাকে লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করেনি!

সুতরাং বাস্তুহারা আমি পরের গলগ্রহ হয়ে ভাসতে লাগলাম। আর শুধু আমি কেন, আমার ছোট ভাইবোনগুলিরও একই অবস্থা। কিন্তু একটি কথা বেশ লজ্জার সাথেই আমাকে স্বীকার করতে হয় যে, আমার এই ছোট দুটি ভাইবোন সম্পর্কে আমি কোথাও কিছু তেমন অন্তরঙ্গভাবে লিখতে পারিনি। এদের সুখ দুঃখের প্রতি আমি উদাসীন ছিলাম, আমি নিজেকে নিয়েই বড়ো বেশি ব্যাপৃত ছিলাম—এমনি কিছু কথা বলে কি আমার এই লজ্জাকর দৈন্যকে বিশ্লেষণ করা যায়? বোধ হয় পুরোপুরি যায় না। এর পিছনে আরও একটা কিছু ছিলো। সেটি বাস্তুহারার উদ্‌ভ্রান্ত চেতনা। যার নিজের ঘর নেই, তার ঘরের জন্য কোনো মায়াও নেই। বস্তুতঃ তার ঘর তখন তার দেহটি, সেটি নিয়েই সে ব্যস্ত।

এজন্যই অতীতে যাই হোক, এ সময়েও একই বাড়িতে থেকেও আমি ছোট বোনটির সুখ দুঃখের কোন কথাই মনে করতে পারছি না। ছোট ভাইটি তো মায়ের

সাথে আছে, আমার চোখের আড়ালে। কিন্তু বোনটিও আমার চোখের আড়ালেই রয়ে গেলো।

তবু এই সময়ে আমি আমার মা হারা অনাথ ছোট বোনটির ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই চিন্তার বিষয়টি আমার এক নানীই আমার কাছে তুলে ধরেছিলেন। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আমার খালাতো ভাইয়ের সাথে আমার বোনের বিয়ে দিলে কেমন হয়। কিন্তু আমি কী বলবো, এর সবটাইতো বড়ো খালার উপর নির্ভর করছে। তাঁর কাছে এ ধরনের কোন কথা বলার সাহস আমার নেই। তবু এই বিয়ে শব্দটিই আমার বোনের বয়স সম্পর্কে আমাকে সচেতন করে তুলেছিলো।

কিন্তু এ নিয়ে কোনো কিছু করার আগেই আমার খালাতো বোন জুবেদা বুজির বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো। বরের বাড়ি কাউরাট থেকে মাইল দু'এক দূরে 'মলি'। বর দেখতে তেমন সুপুরুষ না হলেও জমি-জিরাত ভালোই আছে আর তিনি একাই সবটার মালিক ; অন্য কোনো ভাই নেই। সুতরাং সংসারের সচ্ছলতা দেখেই এ বিয়েতে বড় খালা রাজি হয়েছিলেন। তানা হলে জুবেদা বুজির রূপের দিকে লক্ষ্য করলে বরকে তার যোগ্য বলা সম্ভব ছিলো না। এ কারণেই আমার এক নানী, ফটিকের মার সেই আক্ষেপের কথাটি এখনও মনে পড়ছে। তিনি তখন এই নয়া বাড়িতেই ঘর-দোরের কাজ করতেন। বর দেখে তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'হায়রে হায়, টুক্‌টকা পাকনা আম দাঁড় কাকে খায়'। আর এ কারণেই এই বিয়ের সময় বছুরে কামলা হারাধন ভাইকে এ বাড়িতে দেখিনি। পরে শুনেছিলাম,—সে এই বিয়ে ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিলো, তাই বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু কেন এই চেষ্টা? সে কি নিজে বিয়ে করার আশা পোষণ করতো? তা-না হলে তার তো এমন দরদ দেখাবার কোন কারণ দেখি না। আত্মীয়-স্বজন যেখানে মেনে নিতে পারছে, সেখানে তার মেনে নিতে কোনো অসুবিধাই ছিলো না। আসলে 'মলির' বর নয়, এই হারাধননার সাথে বুজির বিয়ে হলে ফটিকের মার আক্ষেপের তুলনাটা সত্যি বাস্তব হয়ে দেখা দিতো!

সে যাই হোক ; তবে এখানে আরও একটি বাস্তবতার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। কুলীনের ঘরে দারিদ্র্য ঢুকলে কী হয়, তা আমার মাফিজ খাঁ নানার বেলায় উল্লেখ করেছি। এখানেও তেমনি একটা অভাব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিলো। আর তখনকার দিনে বর পক্ষের টাকা পয়সা দেয়ার ব্যাপারটাই অধিকতর মাত্রায় চালু ছিলো। এই বিয়েতেও তেমনি একটা কিছু হয়েছিলো বলে আমার ধারণা। কারণ পূর্বেই বলেছি, বড়ো খালার অবস্থা তখন তেমন সচ্ছল ছিলো না।

কিন্তু এই বিয়েতে তেমন কোনো ঘটাপটার কথা আমার মনে পড়ে না। শুধু বিয়ের আগের দিন রাতে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিলো, যা তুচ্ছ হলেও আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি। বিয়ের জন্য খাবার তেল কেনা হয়েছিলো দু'তিনটি ভাণ্ড ভরে। এর একটি ছিলো একটি পিতলের জগ। চৌকির নিচে সেই জগ রেখে দেয়া হয়েছে। আরও সব সওদাপত্রও সেখানে আছে। আমার খালাতো ভাই নুরুল ইসলাম ওরফে নুরুভাই

হাতের ময়লা ধোয়ার জন্য সেই তেল ভর্তি জগ টেনে নিয়ে বাইরে উঠানে চলে গেছেন। তার একবারও মনে হয়নি যে ওতে তেল থাকতে পারে। সুতরাং অন্ধকার উঠানে তিনি সেই তেল দিয়ে হাত ধুতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কিছুতেই হাত ধোয়া হয় না. শেষটায় একটা বাতি নিয়ে যাবার জন্য চিৎকার জুড়ে দিলেন। আমিই একটি কুপি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর সারা উঠান জুড়ে ছড়িয়ে পড়া তেলের অবস্থা দেখে আমার নুরু ভাইয়ের মুখমণ্ডল যে অবস্থা ধারণ করলো, তা দেখে আমি দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। না, ভয়ে নয়, হাসি চাপতে পারছিলাম না বলেই দূরে সরে যেতে হলো। কারণ তার সামনে হাসা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। তেমন কিছু হলে তেলের শোধ আমার পিঠের উপর দিয়েই যেতো। কিছুটা পরে অবশ্য এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে হাসি কান্না উভয়েরই যোগ হয়েছিলো। কিন্তু আমি দূরে দূরেই ছিলাম।

এর কারণও অবশ্যি ছিলো। বাড়ির অন্যরা যা ইচ্ছা তা করতে পারে, কিন্তু আমার মতো একটা উটকো আপদের জন্য এর কোনো কিছুতেই থাকা উচিত নয়। নুরু ভাই কি আমাকে তেমনি একটা কিছু মনে করতেন? হতেও পারে, তা না হলে আমারই বা তেমন করে মনে হবে কেন! সে বছর তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী, সে কারণেই হোক, কিংবা নিজের অহমিকা বোধের জন্য হোক, আমি তার সান্নিধ্য ও স্নেহ কোনোটাই খুব একটা পাইনি। যাও পেয়েছি, তাতে মন ভরেনি ; বরং শূন্য হয়ে গেছে। আমার হীনমন্যাবোধ তো ছিলোই, সেখানে আঘাত লাগলে তিলই তাল হয়ে উঠেছে।

সে কথা এখন থাক, আপাততঃ আমি বড়োখালার গৃহস্থির কাজে লেগে গেছি। কারণ হারাধন যাবার পর আর কোনো বছুরে কামলা আসেনি। এর একটা কারণ হয়তো এই যে, হারাধনের মতো নিষ্ঠাবান কামলা পাওয়া খুব সহজ ছিলো না। তাছাড়া ঠেকা সামাল দেবার জন্য আমরাতো আছিই। আমরা মানে আমি আর বড়ো খালুর ছোট ভাই মফর। ইনিও সে সময় একটি ছোট ছেলে নিয়ে বড়ো খালার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ইনি বাঁশ বেতের কারুকাজ ছাড়া অন্য কিছু করতে পারতেন না। এর ফলেই তাঁর অবস্থা বিপর্যয় ঘটে। কাজেই নিতান্ত পেটের দায়ে তাঁকে এ সময়ে গৃহস্থির কাজে হাত লাগাতে হয়েছে। কিন্তু আনাড়ীপনা তাঁর কিছুতেই ঘোচেনি।

একদিনের একটি কাজের কথা আমার মনে পড়ে। মরা নদীর পাড়ে একটি ক্ষেতের পাট কাটা হয়েছে। সেগুলি বাড়ির কাছে এনে জাগ দিতে হবে। সারা বন্দ বা মাঠ পানিতে সয়লাব। পাটের বোঝা একটার সাথে আরেকটা বেঁধে 'লড়' বানিয়ে টেনে নিয়ে এলেই হলো। মনফর চাচা আর আমি গেলাম সেই কাজ করতে। কিন্তু তিনি সব ব্যাপারেই আনাড়ীপনার এক শেষ দেখালেন। শেষ পর্যন্ত আমিই সব কাজ শেষ করে ডোবা ধান ক্ষেতের আল দিয়ে সেই লড় টেনে নিয়ে এলাম। আর তিনি আমাকে পাগল, গোঁয়ার, ভূত ইত্যাদি গাল দিতে দিতে আমার সাথে লেগে রইলেন। কাজতো শেষ হলো, কিন্তু আমার সারা পিঠ বুক হাত আঁচড়ের দাগে লাল হয়ে গেলো। আঁচড়

'আড়ালিয়া' নামক এক প্রকার জলজ ঘাসের পাতার। ধান ক্ষেতের আলে এগুলি খুব হয়। আমি গোঁয়ার তার কোনো খেয়ালই করিনি। কাজের নেশায় আর কিছু না জানার ফলেও সব কিছু উপেক্ষা করেছি। তাই এখন গা চুলকিয়ে মরছি। মনফর চাচা আমার এই দুরবস্থা চেয়ে চেয়ে দেখেন আর মুচকি মুচকি হাসেন।

বড়ো খালুদের সকলের ছোট ভাই আব্দুল ওয়াহেদ অবশ্যি আমাকে নিয়ে কোনো কারণেই হাসতে পারতেন না। তাঁর কাছে বসলে নানান কথা শুনে মনের ক্ষোভ দূর হতো। কেন জানি না, পুরোবাড়ির মধ্যে তিনিই বুঝি আমাকে অনাবিল স্নেহ করতেন। তিনি প্রবেশিকা পাশ ছিলেন এবং কিছুটা ওষুধপত্রের ব্যবহারও জানতেন। তিনিই কী দিয়ে বুঝি আমার চুলকানি দূর করেছিলেন।

তাঁর সাথে আমার আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখন নদীর পানি অনেকটা কমে এসেছে। খুব সম্ভব সময়টা কার্ত্তিক মাস। এ মাসে নদীতে আলো দিয়ে মাছ মারার সুযোগ দেখা দেয়। পাতাম নৌকার গলুইতে বাঁধা কেরোসিনের মুখকাটা টিনের মধ্যে একটি বড় কুপি বাতি জ্বালিয়ে তার আলোতে মাছ মারা হয়। নৌকাটি লগি দিয়ে একজন সামনের দিকে ঠেলে দেয়। পাড় ঘেঁষে এগিয়ে যাওয়া সেই নৌকার আলো পড়ে পাড়ের কাছের অল্পপানিতে। নানান জাতের মাছ তখন সেই অল্প পানিতে শুয়ে জিরায় বা ঘুমায়। বাতির আলোতে সেগুলি খুব সহজেই দেখা যায়। আর দেখা মাত্রই কোচ নিয়ে যে বাতির পাশে বসে আছে, সে কোচ দিয়ে ঘা মারে আর তাড়াতাড়ি করে নৌকার মাঝখানে কোচের মাথাটি বাড়িয়ে দেয়। একজন সেই মাছ খুলে নেয়ার জন্য থাকে নৌকার মাঝখানে। সে দু'হাতে ঝাপটে ধরে তাড়াতাড়ি খুলে নেয়। এভাবে নদীর পাড় ধরে মাছ মারা চলতে থাকে।

একরাতে আমরাও গেলাম মাছ মারতে। লগিতে ওয়াহেদ চাচা, কোচে নুরু ভাই ও মাঝখানে আমি। আমরা সাইডুলী নদীর পাড় ঘেঁষে চলেছি। মাছ মোটামুটি ভালোই পাওয়া যাচ্ছে। এভাবে এগুতে এগুতে আমরা চলে গেলাম পুরান নগরের কান্দার কাছে। এখানে অবলুপ্ত প্রায় কিছু ইটের গাঁথুনির চিহ্ন আছে আর আছে নদীর পাড় ঘেঁষে একটি বিরাট বটগাছ। এই জঙ্গুলে পাড়টিতে দিনের বেলাতেও কেউ খুব একটা যায় না। বিষাক্ত সাপের ভয় আছে। আমরা যে কখন সেই বটগাছের সোজাসুজি পাড়ের কাছে পৌঁছে গেছি, তা খেয়ালও করিনি, তাছাড়া এখানটায় বেশি মাছ পাওয়ায় সে খেয়াল থাকারও কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ একটা বিরাট হিস্ শব্দে সবার পিলে চমকে গেলো। চেয়ে দেখলাম, বটগাছের গোড়া থেকে একটা বিশাল শঙ্খিনী সাপ নৌকার দিকে ধেয়ে আসছে। কোচ আর লগি হাতে নুরু ভাই ওয়াহেদ চাচা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু আমি নৌকার মাঝখানে ছিলাম বলে কিছুই করতে পারলাম না। বরং তাদের লাফিয়ে পড়ার ধাক্কায় বাতিটা যেমন নিভে গেলো, তেমনি আমিও নৌকার মাঝখানেই গড়িয়ে পড়লাম। আর নৌকাটা পাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে গেলো। প্রায় মিনিট খানেক কারোর মুখে কোনো কথা নেই। তার পরেই সবাই এক সাথে চিৎকার করে উঠলাম।

এরপর লগি বাড়িয়ে ধরে নৌকা টেনে নেয়া, আথালি পাথালি কোচের ঘা মেরে পানিতে পড়া বাতি খুঁজে তোলা আর উঠে চম্পট দেয়া ছাড়া অন্য কিছু করার ছিলো না। কারণ শুধু যে সবাই ভিজে গেছি, তাই নয় ; ভয়েও কাঁপছি। কিন্তু সাপের কী হলো! না, তা দেখার সাহস বা ধৈর্য কোনটাই নেই। আর থাকার কথাও নয়। কারণ এতো বড় সাপ আমরা কেউই কখনও দেখিনি। আমার চোখে সেই বিরাট সাপটির গতি এখনও ভাসছে। বিরাট আকারের মৃত শঙ্খিনী এর আগেও দেখেছি ; কিন্তু এ যে হিস্ শব্দ করে ধেয়ে আসা জীবন্ত যমদূত! এর এইরূপের কথা কি সহজে ভোলা যায়। তাই ভুলতে পারিনি।

ভুলতে পারিনি আরও একটি ঘটনার কথা। কিন্তু সে ঘটনা আমি কীভাবে বর্ণনা করবো, সে কথাই ভাবছি! পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের বইয়ে 'নিরু দিদি'র কথা পড়েছি। তার বাস্তবতা তাই আমাকে বিস্মিত করেনি ; বরং বেদনাতুর করেছে। কারণ আমি যে স্বচক্ষে এই নিরু দিদিকে দেখেছি এবং সে আমারই এক আত্মীয়া। নিরু দিদি তো শরৎচন্দ্রের সত্যিকারের দিদি নয়, পাড়াতো একটা সম্পর্ক মাত্র। তাই হয়তো শরৎচন্দ্রের মতো সে সকল পাঠকেরই দিদি হতে পেরেছে। কিন্তু আমি যার কথা বলবো, সে তো শুধু আমার আত্মীয়া নয়, তার আত্মীয়রাও এখনও জীবিত। নামধাম উল্লেখ করলে তারা কি আমার প্রতি কুৎসিত হবে না। ভাববে না, আমি পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে অনর্থক দুর্নাম ছড়াবার চেষ্টা করছি। আমার মনের ক্ষোভ এভাবেই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। তা না হলে এ ঘটনা বর্ণনা করার এমন কি প্রয়োজন ছিলো। সংসারে এমন কতো ঘটনাইতো ঘটে গেছে। তা না জানায় সমাজের এমন কী ক্ষতি হয়েছে! সুতরাং বেদনা যতোই থাক, সব কথা বলা উচিত নয়।

এখানে এসেই আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমার জীবন কথা, তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরায় কী লাভ! কারণ আমিতো আমার আত্মীয়-স্বজনের কথা খুব শোভন আকারে তুলে ধরতে পারছি না। তাদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেও আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় যে কেবলি তার বেদনার কথা প্রকাশ করছে। তারা কি সেই হৃদয়কে প্রলেপ দিয়ে সুস্থ করতে পারতো! আপন সহোদর, আপন মায়ের অভাব কি তারা মিটাতে পারতো! না, তা কিছুতেই সম্ভব নয়, সম্ভব ছিলো না। তাই তাদের প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই। যদি কোথাও কারও প্রতি কোন কটাক্ষ করে থাকি, তা শুধু জীবনের বাস্তবতার কারণেই করেছি। অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা প্রতিশোধ স্পৃহা তার মধ্যে নেই। সে জন্য আমি আমার জীবন কাহিনী লিখছি না। লিখছি, শুধু একটি জীবন কীভাবে এই পৃথিবীর বুকে তার লেনদেন করে গেলো, সে টুক তুলে ধরার জন্য! এতে কার কী লাভ হবে আমি জানি না; শুধু জানি, আমার কথা আমি লিখে গেলাম।

তাই একান্ত সংকোচের সাথে আমি এই ঘটনার কথা লিখছি। তৎকালে কুলীনরা কীভাবে দাসী বাঁদীদেরকে ব্যবহার করতো এবং তারপর রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিতো, তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ হলো ফটিকের মা। হাঁ, আমার সেই নানীর কথা আমি

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আমার এক বিখ্যাত নানার মৃত্যুর পর তাঁর বাঁদী স্ত্রীর আর ঘরে ঠাঁই হলো না। এমন কি তার নিজের ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত এই বাঁদী মার প্রতি ফিরে তাকালো না। তিনি এখানে সেখানে পাড়া পড়শী আত্মীয়-স্বজনের ঘরে দোরে কাজ করে পেট চালাতে লাগলেন। জুবেদা বুজির বিয়ের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্যের মধ্যে শুধু খেদ নয়, একটা রসিকতার রেশও আছে। বুজি সম্পর্কে নাতিনী, তাই এমনি রসিকতায় তাঁর অধিকার আছে। আর শুধু অধিকার বলেই নয়, এই রসিকতা তাঁর স্বভাবের মধ্যেও ছিলো। এজন্যই তার কাজ কর্মে একটা হালকা ভাব ছিলো। কিন্তু তাই বলে এই পরিণত বয়সে তাঁর পদস্খলন ছিলো খুবই মর্মান্তিক। সবাই তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছে। এটাইতো স্বাভাবিক। তবু কথা থেকে যায়, হে সমাজ, তুমি শুধু আমার ভালোটুকু নেবে ; অথচ মন্দটুক সহানুভূতি দিয়ে বিচারও করবে না, এ কেমন কথা!

ফটিকের মার তাই হয়েছিলো। কোন্ পাষণ্ড তাঁর উপর এমন কলংকের বোঝা চাপিয়ে দিলো, তার খোঁজ কেউ করলো না ; নির্বাসিত করলো এই হতভাগিনী নারীকে। শরীরে পানি এসে তাঁর সে কী করুণ অবস্থা! কিন্তু কেউ তাঁকে ঘরে দোরে ঠাঁই দিতে নারাজ। একদিন দেখি স্বামীর ভিটার পাশে জঙ্গলের ধারে পড়ে আছেন তিনি। কেন জানি তাঁর এ অবস্থা আমার সহ্য হয়নি। আমি সেখানেই কিছু নাড়া এনে বিছিয়ে তার উপর বিছানা পেতে দিলাম। অনেক কষ্টে আমার হাত ধরে তিনি সেই বিছানায় এসে শুলেন। প্রায় নিঃসাড় অবস্থা। সারাদেহই ফুলে ফেঁপে একাকার। কিন্তু বিছানাতো করে দিলাম, রাত্রে কী হবে! শিয়ালে যদি খেয়ে ফেলে! তাই কঞ্চি কেটে কলাগাছের পাতা এনে সেই বিছানার চারপাশে একটা বেড় তৈরি করে দিতে চেষ্টা করলাম।

আমার এইসব কাজ দেখে কিছু কৌতুহলী নারী পুরুষের ভীড় জমেছিলো। দেখলাম তাদের কেউই আমাকে কিছু বলছে না ; বরং তাদের নীরবতার মধ্যে আমার কাজের প্রতি সায়ই আছে। অল্প বয়সী দুয়েকজন আমাকে কিছুটা সাহায্যও করলো। কিন্তু তারা মনে মনে চিন্তা করলেও এ কাজটি করতে পারেনি। কারণ তাদের ঘর আছে, আর সেই ঘরের সাথে সমাজ থাকে, আর সেই সমাজের সাথে ভয়ও আছে। কিন্তু আমার ঘর নেই বলেই আমি মুক্ত। সুতরাং আমি যা করতে পারছি, তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমিও যে সম্পূর্ণ মুক্ত নই, তা কাজ শেষ করে যাবার বেলা টের পেলাম। আমার নানার বাড়ির উঠান পেরিয়ে যাবার সময় আমার অন্য এক নানী ঠাট্টার সুরে বললেন, 'ঘরতো বান্‌লি, এ্যাহন দেখবো কেডা ; কল্‌মাডা পড়্যা নিলেতো তুই-ই দেখতে পারতি।' আমি এ কথায় থমকে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। সেখানে ঠাট্টার চিহ্ন আমার চোখে পড়লো না। কিন্তু কিছু বলতেও মন থেকে সায় পেলাম না। কারণ আমি যা করেছি, তার জন্য কথা শুনতে হবে জানতাম ; কিন্তু এমন কথা যে শুনতে হবে, সেটাই শুধু জানতাম না। এতে মনের মধ্যে পরের উপকার করার যে

একটা সান্ত্বনা ছিলো, সেটাই নষ্ট হয়ে গেলো। আমি ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে নদীর জলে গিয়ে পড়লাম। সেখানে ডুবিয়ে শরীরটা শান্তি পেলো বটে, কিন্তু মনে শান্তি এলো না।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বড়োখালা আমাকে কিছু বললেন না। মনে হলো, তিনি কিছু জানতে পারেননি। আমি খেয়ে গোয়াল ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু মনের মধ্যে কাঁটা বিঁধে থাকলে যা হয়, কিছুতেই আমার ঘুম এলো না। গোয়াল ঘরে থাকি কেন? না, অন্য কোন কারণে নয়, পাহারা দেবার জন্য। আগে এই কাজটি হারাধন করতো। পরে কিভাবে জানি আমার ভাগে এসে পড়েছিলো। এতে আমার সুবিধাই হয়েছিলো। ইচ্ছামতো শুতে পারতাম, ভাবতে পারতাম ; তবে মশার উৎপাত বেশি হলেই ছিলো বিপদ। তখন সব ভাবনা সিঁকেয় তুলে ধোঁয়ার ব্যবস্থা করতে হতো।

সে রাতে ঘুম যখন এলোই না, তখন আস্তে করে বাইরে বেরিয়ে আমি আমার সেই নানীর কাছে পৌঁছে গেলাম। তখন তিনি ছেলে মেয়ে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'কিরে ভাই, আমার কথায় বুঝি খুব রাগ করেছিস?'

'না, রাগ করি নাই ; কিন্তু আপনি এমন একটা ঠাট্টা করবেন, এইটাই বুঝার বাকি ছিলো।'

আমার অভিমানের কথা শুনে তিনি এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন 'আহ্ কী পাগলরে! ঠাট্টাও বুঝস্না। আসলে তোর কাজে আমি খুব খুশী অইছি। দেখছে, এই ফডিকের মারে দিয়া কেডা না কাম করাইছে ; কিন্তু আইজ বিপদের দিনে একজনও ফির্যাও দেখলো না।'

তারপর কথায় কথায় এমন সব ঘটনার কথা তিনি শোনালেন, যা শুনতে-শুনতে আমার কিশোর মন কল্পনার সাগরে ভাসতে লাগলো। এই আশেপাশেই যাদেরকে দেখছি, তারাও যে সবাই বাইরের চেহারার মতো সরল সোজা নয়, সেকথা ভাবতে ভাবতে আমি আমার গোয়াল ঘরে ফিরে গেলাম। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। কিশোর মন এমনিভাবে কথার খোঁচায়, ঘটনার ধাক্কায় জাগ্রত হতে থাকে। আমিও জাগ্রত হলাম। কিন্তু তাতে কী লাভ! ভিখারীর রাগ যেমন নিজেকেই পোড়ায়, তেমনি অক্ষমের স্বপ্ন নিজের মধ্যেই মিলিয়ে যায়।

কিন্তু যিনি আমাকে মানুষের হিংসা বৃত্তি সম্পর্কে এসব কথা বললেন, পরে শুনেছি তিনি নিজেও খুব ভালো নন। তা না হলে এতো সহজে আমার কাছে এতো কথা বলতে পারতেন-না। তিনিই নুরু ভাই সম্পর্কে এমন কথা শোনালেন, যা আমাকে কিছুটা খুশি ও কিছুটা অখুশি করে দিলো। অবশ্য নুরু ভাইকে নিয়ে নাখোশ হবার পালা আমার কখনও শেষ হয়নি।

ইতিমধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় এসে উপস্থিত হলো। সেন্টার পড়েছে নেত্রকোণায়। কাউরাট থেকে তার দূরত্ব ষোল মাইল। দিন দশেক আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে। স্থির হলো নুরু ভাইয়ের সাথে আমি তার বইয়ের বোঝা নিয়ে যাবো। একটি টিনের বাক্সভর্তি বই।

নির্দিষ্ট দিনে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। তেলিগাতী হয়ে লক্ষ্মীপুরের রাস্তায় আমরা নেত্রকোণা পৌছলাম। কিন্তু পথে নুরু ভাইয়ের প্রতি আমার মনটা আরও বিষিয়ে উঠলো। বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হয়েছে. কিন্তু তার চাইতেও বেশি কষ্ট পেলাম তার ব্যবহারে। আমি কি একেবারেই একজন অনাত্মীয় বোঝারু! তা না হলে তিনি এমনভাবে এই বোঝার ভার আমার একার উপর ছেড়ে দিতে পারতেন না। অবশ্য বিছানার বোঝাটা তিনি নিজেই বহন করেছেন। কিন্তু সেটিতো হালকা। অদল বদল করে নিলে এমন কী ক্ষতি ছিলো! কিন্তু কাকে বলবো! যে বুঝে না, তাকে বুঝায় কার সাধ্য!

এমনি অবুঝপনা দেখেছিলাম আরো একটি উপলক্ষে। তখন কোনো একটা ঈদের পরব এসেছে। আমি বড়োখালার নিকট থেকে চার আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে বিড়ি কিনেছি। এমনিতে বিড়ি খাবার সুযোগ খুব হতো না। এর ওর কাছ থেকে চেয়ে খাওয়ার অভ্যাস আমি খুব একটা করতে পারিনি। আর চাইবোই বা কার কাঁছে! আশে পাশে যারা খায়, তারা সবাইতো বয়সে বড়ো। তাই আড়ালে আবডালে হুকোতে টান দিতে হতো। কিন্তু তা-ও বাড়ির বাইরে কোথাও। এমনি ভাবেই চলতো। ঈদের খুশীতে তাই বিড়ি কিনে এনে গাঁটের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। কিন্তু ভোরবেলা নদীতে গোসল করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম নুরু ভাইয়ের হাতে। তিনি যেভাবে মারমুখী হয়ে আমার বিড়িগুলি ছিনিয়ে নিলেন, তাকে অমানুষিক আখ্যা দিলেও যথেষ্ট হয় না। অন্ততঃ একটি কিশোরের তাতে তৃপ্তি নেই।

এ সংসারে এমন অনেক লোক আছে, যারা নিজেরাই শুধু বুঝে। অপরের মন মেজাজের প্রতি চেয়ে দেখবারও তাদের ফুরসত হয় না। আমার নুরু ভাই ছিলেন তেমনি একজন আত্মকেন্দ্রিক লোক। এজন্য তার পরিণতিও হয়েছে করুণ।

কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপাততঃ নয়া বাড়ি থেকে আমার বিদায়ের পালা ঘনিয়ে এলো। নানা কারণেই আমাদের দু'জনের বোঝা বড় খালার পক্ষে আর বহন সম্ভব ছিলো না। এ কারণেই স্থির হলো যে, আমি এখন থেকে পাছপাড়ার খালার এখানে গিয়ে থাকবো। আমার এক নানী আমাকে একথাও বুঝালেন যে, আমার ছোট খালারতো কোন সন্তান নেই, তাই তাঁরা ইচ্ছা করলে আমাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারেন। যাহোক, আমি একদিন নয়া বাড়ি থেকে পাছপাড়ায় চলে গেলাম।

কিন্তু রাহেলা? আমার ছোট বোন? না, তার কথা তখনও আমার কিছু মনে পড়ছে না তার বিয়ের কথাও আমি আর কিছু ভাবিনি। শুধু আমার ছোট খালাতো বোন সালেহার বিয়ের সময় আবার সে কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু অক্ষমের ভাবনাতো ভাবনাই সার। তাছাড়া পাছপাড়া এসে সে কথা আরও বেশি করে ভুলে গেছি। কারণ এখানে কাজের চাপ বেশি। ভোরে খেয়ে দেয়ে গরু নিয়ে বেরুতে হয়। এখানে সারা পাড়ার গরু এক সাথে নিয়ে সাইডুলী নদীর পাড় ধরে ধরে রাখালরা চলে যায় পাল গাঁয়ের নিচ পর্যন্ত। ওদের মধ্যে আমিও আছি। তলার হাওরের অভিজ্ঞতা এখানে নতুন ভাবে কাজে

লাগে। শুধু একটা নতুন ব্যাপার এখানে দেখতে পাই. সেটি হলো মেটে হুকো। সে আর কিছু নয়,—হাতের পাজন দিয়ে মাটিতে দুটি গর্ত করা ; একটি সোজা আর অন্যটি আড়াআড়ি। যাতে একটি গর্ত নিচে কোথাও অন্যটিকে স্পর্শ করে। তারপর সোজা গর্তটির মুখে কল্‌কির মতো তামাকটিকে সাজিয়ে অন্য গর্তটির মুখে মুখ লাগিয়ে টান দেয়া। আর একটি হলো হুকো আর অন্যটি হলো নৈচা। ব্যস, যার মুখে জোর আছে, সেই এর থেকে ধোঁয়া বের করতে পারবে, তামাকও খেতে পারবে। আমি তো বারবার এই মেটে হুকোয় তামাক খেয়েছি।

কিন্তু এই মেটে হুকোতে তামাক খাবার জন্য কি আমি পাছপাড়ায় এসেছিলাম? এমন প্রশ্ন আমার মনে জাগলো কেন! এর আগে তো কোনো কথা এমন তির্যকভাবে আমাকে আঘাত করেনি। সম্ভবত ঃ এটা কৈশোরের স্বপ্ন দেখার ধর্ম। সেই স্বপ্ন দেখতে কেউ যদি প্ররোচিত করে, তবে কিশোরের দোষ কী!

আমার সেই কেলে নানী, সত্যিই তিনি দেখতে খুবই কালো, কিন্তু তার অনেক কথাই আমার কাছে ভালো লেগেছে, আমাকে স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করেছে। সে সব স্বপ্ন হয়তো সফল হয়নি। কিন্তু স্বপ্ন দেখার একটা বড় প্রাপ্তি এই যে, এগুলি চিত্তের প্রসারতা ঘটায়। বাস্তবকে ছেড়ে অবাস্তবের দিকে ঠিক নয়, বরং বৃহত্তর ও মহত্তর বাস্তবের দিকে চেতনার জাগরণ ঘটায়। এজন্য সেই নানী যখন বললেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে আমাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, তখন আমার পক্ষে তেমন কিছু আশা করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এভাবে গরু রাখালি কি সেই সন্তানের যোগ্য কাজ! আর শুধু কি রাখালি, গোয়ালের গোবর ফেলেও কি সেই সন্তান হবার পরীক্ষা দিতে হবে! নয়া বাড়িতে যা হয়নি, আর হলেও বেশি কিছু বলে মনে হয়নি ; এখানে তা-ও যেন ভার ভার ঠেকছে!

এর কারণ নয়া বাড়ির চাইতে পাছপাড়ার সচ্ছলতা অনেক বেশি। সেখানে আশা করার ছিলো না, কারণ পোষ্য বেশি। কিন্তু এখানে আমি একা হয়েও যেন অনেক হয়ে গেলাম। তাই বলে ছোট খালা আর খালু যে আদর করতেন না, তা নয় ; শুধু আমার কাজের সাথে সেই আদরের কোন মিল খুঁজে পেতাম না। মনে হতো, যেটুক না করলেই নয়, সেটুকুই তাঁরা করছেন। কেমন একটা অতৃপ্তির ছোঁয়া লেগে থাকতো।

এর অন্য একটা কারণ হয়তো তাঁদের এই সচ্ছলতা একান্তই নতুন। আমার বয়স কালেই, বলতে গেলে, তা গড়ে উঠেছে। ছোটখালার বিয়ের বেলা, মনে পড়ে, একটি ছনের ছোট চৌচালা ঘরে ছোটখালা সংসার পেতেছিলেন। সেই স্থানে আজ বিরাট বিরাট টিনের চৌচালা হয়েছে, আর মাঠে জমির পরিমাণও অনেকগুণ বেড়েছে। কিন্তু কয়েকটি সন্তান জন্মালেও একটিও বাঁচেনি। মনে হয়, ছোটখালু যেন একদিকে সাফল্য লাভ-করেও অন্য দিকে হেরে গেছেন। তাই তাঁর সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছেন ধন দিয়ে ; যথার্থ অপত্য স্নেহ উবে গেছে। সংসারে বুঝি এমনিই হয়, নিজের সন্তান না হলে পরের সন্তানের দরদ বুঝা যায় না। আমার খালু, এমন কি খালাও এর ব্যতিক্রম নন।

তাই আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হতে দেরী হয়নি। আর স্বপ্ন ভেঙে গেলে সুখের চাইতে দুঃখই হয় বেশি। অবশ্য সেই দুঃখ মোচনের জন্য সহানুভূতির ছোঁয়া পাওয়া যায়, তাহলে তা খুব স্থায়ী হয় না। পাছপাড়ায় এই সহানুভূতির ছোঁয়া বেশি পেয়েছি আহমদ হোসেন ভাইয়ের কাছে। পরে অবশ্য তিনি আমার ছোট বোনাই হয়েছেন ; কিন্তু তখন তিনি আমার বড় ভাই, ছোট খালুর ভাতিজা। তাঁর বড় ভাতিজা নুর হোসেন ভাইও বেশ কিছুটা সহানুভূতির সঞ্চার করেছেন। তবে তাঁর দেখা পেয়েছি খুবই কম। কারণ তখন তিনি জি.টি. পাস করা স্কুল মাস্টার। তাঁর বৌকে ডাকতাম বুজি, তিনিও বড় বোনের মতো আদর করেছেন। এঁদের সহানুভূতি যেমন স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনাকে দূর করেছে, তেমনি জাগরণের বাস্তবতাকেও লঘু করে দিয়েছে। তবু এই পাছপাড়া আমার কাছে মনে হয়েছে একটি বদ্ধ খাঁচা!

তাই আমি এই খাঁচা ছেড়ে উড়ে নয়, ঘুরে বেড়ানোর জন্য এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়েছি। এ সময়ে গোগে মা'র এখানে যাবার মাত্রাটা বেড়ে গিয়েছিলো। তারপর আনু বুজি, জুবেদা বুজি, বরাটিও রাজাইল খালার বাড়ি, এমনি সব আত্মীয়-স্বজনের এখানে বেড়ানো। আর এমনি বেড়াতে গিয়েই জুবেদা বুজির স্বামীর বাড়িতে এমন একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম, যা আমার চেতনায় গুপ্তধনের একটি রহস্য হয়ে বিরাজ করছে।

কাউরাট থেকে মাইল দেড়েক দূরে সেই গ্রাম, নাম মলি। সেখানে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম, একটি টাকার কলসী পাওয়া গেছে পাশের বাড়িতে; সেটি তোলবার চেষ্টা চলছে। নাকে মুখে পানি দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সেই জটলার কাছে। একটি চৌচালা টিনের ঘরের মেঝের অনেকখানি খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। তারপর সেই গর্তের এক পাশে কেবলি খন্তা দিয়ে ঘা দেয়া হচ্ছে। কোনো ধাতব পদার্থে আঘাত লাগলে যেমন টুং করে শব্দ হয়, তেমনি শব্দ হচ্ছে। কোনো সময় খুন্তাটি খুলে গিয়ে আটকে যাচ্ছে সেই কথিত কলসীর কানার সাথে। কিন্তু কিছুতেই সেই কলসীর লাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। এমনি গলদ ঘর্ম পণ্ডশ্রম দেখতে দেখতে এক সময়ে ফিরে এলাম।

কিন্তু ব্যাপারটা কী! সত্যিই কোনো কলসী আছে ওখানে? যদি নাই থাকে, তবে এই লোকগুলি এমন পণ্ডশ্রম করছে কেন! ভোররাত কিসের একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে দেখে শিথানের কাছে একটি কলসীর কোণা মাথা জাগিয়েছে। তারপর থেকে সেটিকে তোলবার জন্য এমনি খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ ওটা যে জীবিত কলসী, ওর সাথে চালক আছে। সেই চালক ছেড়ে না দিলে তার নাগাল পাওয়া খুবই দুষ্কর!

জানিনা এসব কথার সত্যতা কতোটুক! তবে এ ধরনের কাহিনী আরো প্রচুর শুনেছি। আমার পৈতৃক গ্রাম-বীর আহমদপুর আর বৈকুর হাটীর সীমায় রাস্তায় উপর যে পুলটি আছে, তার ডান পাশে আছে একটি জঙ্গল। শুনেছি, সেই জঙ্গলে নাকি শুধু কলসী নয়, গুপ্তধনের বিরাট বিরাট ডেগ আছে। কোনো কোনো রাতে আলো জ্বালিয়ে সার বেঁধে সেগুলি ঘোরাফেরা করে। অনেকেই দেখেছে, কিন্তু কাছে যেতে সাহস

পায়নি। আমার চাচাতো বোন মোগলী বুজি এমনি একটা কলসী পেয়েছিলো একটি ছোট ছেলে নাকি সেই কলসীর সাথে বাঁধা ছিলো। কিন্তু সে সেটি ভোগ করতে পারেনি। বরং এর তাপে অকালে তার একটি ছেলে মারা যায়। অনেকের পুকুরে এ ধরনের ডেগ কলসীর আস্তানা আছে বলেও শুনেছি। কিন্তু নিজের চোখে কিছুই দেখিনি। এমনি কাহিনীর তোড়ে আমিও এক সময় গুপ্তধন খুঁজেছিলাম। পেয়েছিলাম একটি মাটি ভর্তি মেটে হাঁড়ি। এসব কি তেমনি মেটে হাঁড়ির মতো শূন্য গর্ভ, অসার কল্পনা! দৃষ্টি বিভ্রম আর স্নায়ু বৈকল্য দিয়ে কি এদের বাস্তবতা বিচার করা যায়? তবে যাই হোক, মলির এই ঘটনাটি কিন্তু আমার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়ে রেখেছে! কারণ চাক্ষুষ আমি এই একটি ঘটনাই দেখেছি। বিকালে গিয়ে দেখলাম, গর্তটি বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। না, আশা করবার আর কিছু নেই। স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে কখনো ধরা যায় না। জোর করে ধরতে গেলে ক্ষতি হয়, নাকে মুখে রক্ত উঠে মারা যায়।

এগুলি যদি কুসংস্কার হয়, তাহলে এমনি কুসংস্কারে আমাদের গ্রামীণ পরিবেশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পাছপাড়ায় খালাদের বাড়ির সামনে এমনি একটি পুকুর ছিলো। জলজ দাম আর কচুরীপানায় ভর্তি সেই পুকুরে কেউ নামতে চাইতো না। সেখানে নামলে নাকি সব কিছুই তলিয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুটা দূরে নদীর পাড়ে ছিলো একটি বিরাট বটগাছ। তার ডালপালা কেউ কাটতে চাইতো না। ভেঙে পড়ে থাকলেও নিতে ভয় পেতো। কারণ ওর গায়ে আঘাত করলেই রক্ত বের হতো। এমনি সব কথা কতো যে শুনেছি, তার আর ইয়ত্তা নেই। এগুলি শুনে বিস্মিত হয়েছি, উত্তেজনা অনুভব করেছি। অবশ্য এ সময়ের একটি দাঙ্গার ঘটনা বুঝি তার চাইতেও বেশি বিস্ময় আর উত্তেজনা নিয়ে এসেছিলো। এখনও যেন সব কিছু চোখের সামনে ভাসছে!

এই দাঙ্গা বা 'হাজের মাইর'টি হয়েছিলো কাউরাট ও রাজীবপুরের মধ্যে। যুদ্ধ ক্ষেত্র স্থির হয়েছিলো নওপাড়ার বাজার। সেখানে রাজীবপুরের একটি বড়ো দোকান আছে, সেটি যেমন রাজীবপুরীদের একটি বড়ো ঘাঁটি, তেমনি কাউরাটীদের উদ্দেশ্য সেটি আক্রমণ করে তছনছ করে দেয়া। অবশ্য কাউরাটের সাথে রাজীবপুরের কোনো তুলনাই হয় না। অন্ততঃ জনবলে কাউরাট অনেকগুণ বেশি। তাই রাজীবপুর নওপাড়ার বাজারে আসতে পারে, কিন্তু এর চাইতে বেশি এগিয়ে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর কাউরাট, ইচ্ছা করলে রাজীবপুরের ঘরে দোরে গিয়ে আক্রমণ করতে পারে।

এমনি এক মহা উত্তেজনার মধ্যে সকাল থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। পাছপাড়ার দিকে নদীর পাড়ে এসে সবাই জমায়েত হচ্ছে আর লাঠি সড়কি ঘুরিয়ে 'ইয়া আলী' বলে জোঁকার দিচ্ছে। চারপাশে ছেলে মেয়ে দর্শকের ভীড় জমে গেছে। এক সময় দেখলাম 'তেল পড়া' এনে পা থেকে মাথার দিকে উল্টোভাবে ডলা হচ্ছে। হঠাৎ হৈহৈ করে উপস্থিত হলো আলেক মিয়া, সে-ই সেনাপতি। তারপর কয়েকশ মানুষ ছুটলো তার পিছপিছু। লাঠি সড়কি ঢাল তলোয়ার—নাচাতে নাচাতে তারা নওপাড়া

বাজারে ডান দিক দিয়ে সাঁতরে মরা নদী পার হলো। আমরা ছেলে মেয়ে দর্শকরা রয়ে গেলাম নদীর এপাড়ে রাস্তার উপর। সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের এগিয়ে যাওয়া দেখছি। বনবাদাড় ভেঙে সে কী রক্ত নাচানো দৌড়। ওইতো তারা বাজারে উঠে গেলো! কিন্তু একী! সামনে ইট এসে পড়ছে কাউরাটী সৈন্যদের উপর। রাজিবপুরীরা দোকানের পিছন থেকে, গাছের উপর থেকে সেগুলি ছুড়ে ছুড়ে মারছে। কিন্তু তাতেও ফিরাতে পারছে না কাউরাটীদেরকে। টিনের ঘরের বেড়ার উপর আঘাতের শব্দ হচ্ছে। আর আমরা এ পাড়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় কাঁপছি। হঠাৎ সব কিছু ছাপিয়ে গুড়ুম গুড়ুম শব্দ, ধোঁয়া দেখা গেলো। এর পরেই আর্তচিৎকার আর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া। অনেকের দেহই রক্তে ভেসে যাচ্ছে, নদীর পানি সেই রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। আর আমি দুই হাত নেড়ে লাফিয়ে গালাগালি করছি। ওইতো পুলিশ দেখা যাচ্ছে! ওরা নদীর পাড় পর্যন্ত ধাওয়া করছে কাউরাটীদেরকে আর এদিক সেদিক বন্দুক তাক করছে।

না, সব শেষ! ভীষণ কান্না পাচ্ছে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেই রাস্তার উপরেই বসে পড়েছি আমি। কিন্তু একী! আশেপাশে যে কেউ নেই! উত্তেজনায় কিছুই বুঝতে পারিনি, আমাকে ফেলেই সবাই চলে গেছে। এবার কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। দৌড়ে পালাবো কিনা ভাবছি, হঠাৎ দেখি সারা শরীরে রক্ত মাখা একটি লোক নদীতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু সে সাঁতরে নদী পার হবার আগেই আমি পালিয়ে এলাম।

পালিয়ে এসেছে কাউরাটের সৈন্যরাও। তারা আগেই জানতে পেরেছিলো যে, রাজীবপুরের ওরা আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ এনেছে। তবু এমনি উন্মাদের মতো এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে দুঃসাহস আছে নিশ্চয়, তবে বোকামির পরিমাণটাই তাতে বেশি। সেই বোকামির খেসারত দিতে হয়েছে প্রচুর। পঞ্চাশ ষাট জন লোক আহত হয়েছে। ছর্‌রা গুলির আঘাতই বেশি। এ কারণেই কেউ মারা যায়নি। তবে ওদের মারা যাওয়াই বোধ হয় ভালো ছিলো।

কিসের জন্য এই হাজের মাইর? তেল কেনা নিয়ে ঝগড়া। কাউরাটের ক্রেতা আর রাজীবপুরের বিক্রেতা। কথা কাটাকাটি থেকে কিলাকিলি, তারপর সেটি ছড়িয়ে গেলো দুই গাঁয়ের লোকের মধ্যে। ইজ্জতের প্রশ্ন এসে এক অন্ধ জিদে পরিণত হলো। কাউরাটের একগুয়েমিটাই ছিলো বেশি। অথচ কাউরাট এই অঞ্চলের সব চাইতে বেশি শিক্ষিত লোকের গ্রাম। কাউরাটকে অন্যান্য গাঁও সমীহ করে, ভয় পায়। তবু তারা ধৈর্য ধরতে পারলো না।

এমনিই হয়। আমুদপুর থাকার সময় এমনি আর একটি হাজের মাইর দেখেছিলাম। সেটি বেধেছিলো নওহাটা আর তাজপুরের মধ্যে। যুদ্ধ ক্ষেত্রটি ছিলো ভুটিয়ারকোণার বাজারের পাশে কেল্লা তাজপুরের সামনে একটি ময়দানে। সেখানে এর চাইতেও তুচ্ছ একটি কারণ ছিলো। নওহাটার এক ভিখেরীকে মেরেছিলো তাজপুরের এক লোক। সেটিই দুই গাঁয়ের ইজ্জতের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো। নওহাটারা লাঠি সড়কিতে সজ্জিত হয়ে একেবারে তাজপুরের সীমানায় ফুড়িয়া নদীর তীরে এসে দাঁড়ালো। ওদিকে

নদী পেরিয়ে সুসজ্জিত তাজপুরীরাও এগিয়ে এলো। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ানো। এই লাগে এই লাগে ভাব। আমরা তখন গাছের ডালে বসে উত্তেজনায় কাঁপছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাজের মাইর আর হলো না। আশেপাশের গাঁয়ের মুরুব্বী মাতব্বররা এসে সামনে সার বেঁধে দাঁড়ালেন। কিন্তু কাউরাটের বেলায় কেউ দাঁড়াবার সুযোগই পেলো না। কী করে দাঁড়াবে, কাউরাটের লোকেরা কি কাউকে মানতে চায়! তাদের চাইতে বড়ো কে যে তাঁর কথা মানবে!

কাউরাটের এই অহমিকাবোধ পরেও নানান ব্যাপারে দেখেছি। জমিদার প্রধান নওপাড়া থেকে তারা এই অহমিকার শিক্ষা লাভ করেছে। কিন্তু তারাতো আর জমিদার নয়, আর সময়টাও জমিদারীর নয়। শিক্ষিত গাঁয়ের আচার আচরণ শিক্ষিত জনোচিত হওয়াই শোভনীয়। কিন্তু কার্যতঃ তারই বড়ো অভাব!

না, কাউরাটের প্রতি কোনো বিদ্বেষবশতঃ একথা বলছি না। কাউরাটতো আমার মাতুল বাড়ি, খালার বাড়ি, বোনের বাড়ি। তাঁদের নিকট থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। সেজন্য তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আত্মীয় বলেই তাঁদের নিকট আমার প্রত্যাশা ছিলো অনেক বেশি, সেটি পূরণ হয়নি মাত্র। যদি হতো, তা হলে এই শিক্ষিত গাঁয়ের ভাগনে হয়ে আমি সেখান থেকে শিক্ষার সুযোগ পেলাম না কেন! কেন আমাকে ভিন্ গাঁয়ের ভিন্ন লোকের সাহায্য নিতে হলো!

সে কথা এখন থাক্। আপাততঃ একটা নৌকা বাইচের কথা মনে পড়ছে। সেটি কাউরাটের সামনের সাইডুলী নদীতেই হয়েছিলো। এর আগে আমি আর নৌকা বাইচ দেখিনি। সুতরাং কোণাপাড়ার এদিক থেকে ঢোল বাজিয়ে সারি গেয়ে তালে তালে নৌকাগুলি এগিয়ে আসছে, সে দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে। তারপর সন্ধ্যার আগে আগে নৌকাগুলি ডিপুটি বাড়ির ঘাটে এসে ভিড়লো, সেখানে তাদেরকে খাওয়া ও পুরস্কার দেয়া হলো, এসবও স্মরণ করতে পারছি।

এ সময়ে আরো একটি আমি উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে ঘটনা মনে করছি। কারণ এই ঘটনার সাথে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিলো। যে বদ্ধ খাঁচার কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, এ সেই খাঁচা ভাঙার যোগসূত্র!

ছোটখালুর ভাতিজা আহমদ হোসেন ভাইয়ের কথা আগে উল্লেখ করেছি। এ সময়ে তিনি আলমপুরে বিয়ে করেন। তাঁর সেই বিয়ের বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এই বিয়ের অন্য সব ব্যাপারের চাইতে একটি দৃশ্যই আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। বরযাত্রীরা কনের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছে অনেকক্ষণ! কিন্তু বরকে তুলে নেবার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না বলে তারা পাগারের পারে আম গাছের ছায়ায় বসে আছে। আমরা কয়েকজন এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছি। কিন্তু ক্ষিধের জ্বালায় কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। শেষে মাথায় দুর্বুদ্ধি এসে ঢুকলো। পালকি থেকে বাতাসার এক ভেটোয়া আমরা চুরি করে নিয়ে এলাম। তারপর লুকিয়ে সেই বাতাসা খাওয়া। কিন্তু খালী পেটে মিষ্টি কি বেশি খাওয়া যায়! শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতের বাতাসা

পাগারের ব্যাঙ তাড়াবার ঢিল হলো। এভাবেই আমরা কনে বাড়ির লোকদের উপর ক্ষিধের শোধ নিলাম। কিন্তু আলমপুরে যে এই শোধের প্রতিশোধ লুকিয়ে ছিলো, তা তখনও জানতাম না।

বিয়ের পর অনেক দিন চলে গেছে। আমি আমার বন্ধ খাঁচার মধ্যেই আবার ঘুরপাক খাচ্ছি, কখনও বড়শী দিয়ে মাছ মারতে যাই, কখনও শালুক কুড়িয়ে কাজে ফাঁকি দিই। এমন সময় একদিন সকাল বেলা বৈঠকখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ অন্দর বাড়ি থেকে একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্য চেহারার লোক বেরিয়ে এলেন। আমাকে তিনি ইশারায় কাছে ডাকলেন! আমি কিছুটা ভয়ে ভয়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'তোমার নাম কী?'

বললাম, 'ছন্দু।' আমাকে সবাই ছন্দু বলেই ডাকতেন। আমি সেই ডাক নামটাই বলে ফেললাম। কিন্তু তিনি কিছুটা ধমকের সুরেই বললেন,'তোমার নিজের নামটিও ভুলে গেছো দেখছি, তোমার আসল নাম কী?'

এবার বললাম, 'গোলাম সামদানী।'

'যাক, তা হলে মনে আছে। তোমার বাড়ি কোথায়?'

'কাউরাট।'

'কী বললে? কেন আমুদপুর কী দোষ করেছে?'

আমি তখন আর কিছু বলতে পারলাম না। তাঁর গলার স্বরে আমার মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে। কিন্তু শুধু কি ভয়, এর সাথে বিস্ময়ের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ আছে। কে এই লোক! যাকে আমি চিনি না, কিন্তু সে আমার সব কিছু চিনে! এর ফলে আটকা পড়ে গেছি আমি, মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কী কথা বলছো না কেন? বাপের নাম জানো, না তাও ভুলে গেছো?

মাথা নত রেখেই আমি বললাম, 'জানি মৌলবী আব্দুল করিম'—কিন্তু শেষ করতে পারলাম না। আমার চোখ দিয়ে তখন পানি পড়ছে। তিনি আবার বললেন, 'নাম জানলেও তাঁকে তুমি চিনো না। বলো, চিনো?'

এবার আর আমার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব হলো না। আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত রাখলেন। আমি কিছুটা শান্ত হলে তিনি বললেন, 'সত্যি তুমি তোমার বাবাকে চিনো না। যদি চিনতে, তাহলে এ বাড়ির গোয়ালের গোবর ফেলতে না। শুনেছি, তুমি নাকি লেখা পড়া করতে চাও না?'

এসব কথা শুনতে শুনতে আমি কান্না ভুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, বললাম, 'কে বলেছে?'

'আমি তোমার খালুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন, 'না, একে দিয়ে লেখাপড়া হবে না"। সত্যি কি তাই?'

'কৈ, খালুতো আমাকে লেখাপড়ার কথা কোনো দিন জিজ্ঞেস করেননি! লেখাপড়া করবো, সুযোগ কোথায়?'

'যদি আমি তোমাকে সুযোগ করে দিই, পড়বে?'

'পড়বো।'

আমাকে ছেড়ে দিলেন তিনি। আমি তখন উত্তেজনায় কাঁপছি। আমার চৈতন্যের কাণায় কাণায় এখন উথাল পাতাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আর কেবলি মনে পড়ছে, 'হায়, আমি আমার পিতাকে চিনি না!'

সত্যি আমি চিনতাম না। ইনি এসে আজ আমাকে চিনিয়ে দিয়ে গেলেন। আমার বাবার বন্ধু তিনি। তাঁর পুন্য নাম কাজী আব্দুল হালিম। আলমপুরে তাঁর বাড়ি। মদনে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বা কাজীর চাকরি করেন। এককালে বাবার সাথে মঙ্গল বাড়িয়া মাদ্রাসায় পড়তেন। সে বন্ধুত্ব পরে আরো ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা তিনি কিছুই জানতেন না। এবার আহমদ হোসেন ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে সেটি জানার সুযোগ হয়। তাঁর ভাতিজীকেই আমুদ ভাই বিয়ে করেছেন। সেই সুবাদে তিনি এ বাড়িতে আসেন এবং আমার দুরবস্থা দেখতেন পান। তাঁর প্রাণ বন্ধুর কথা স্মরণ করে কেঁদে উঠে।

এভাবেই তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। কিন্তু তিনি এগিয়ে না এলেও তো পারতেন। এ সংসারে কার বোঝা কে টানে! দেখেও কেউ দেখতে চায় না, সবাই নিজের বোঝা নিয়ে ব্যস্ত। তা-না হলে আমার ছোট খালুতো নিজে মাস্টার। প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করতেন। শিক্ষার প্রয়োজন তিনি বহু ছেলে মেয়েকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু কৈ, আমাকে তো একদিনও বুঝাননি; এমন কি জিজ্ঞাসা করেও দেখেননি। তবু তিনি কী করে বুঝলেন যে, আমাকে দিয়ে লেখাপড়া হবে না!

অথচ আমিতো শুনেছি, বাবার সহায়তা না পেলে তিনি খাঁ বাড়িতে বিয়ে করতে পারতেন না কারণ তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছিলো বেশি। ১৯৩৬ সালের ঋণ সালিশী বোর্ডে কেরাণীর কাজ করে অর্থের সন্ধানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। বিত্ত হলেও সামর্থের অভাব ছিলো তাঁর। সেটি বাবার আশীবার্দ দিয়ে পূরণ করে নিয়েছিলেন। অথচ তিনি কি বাবাকে চিনতেন না!

না, কোনো অভিযোগ নয়, আমি তো আগেই বলেছি, প্রত্যাশার অপমৃত্যু! অথচ যার সাথে আত্মীয়তা নেই, জানা শোনা নেই, তিনিই এসে আমার মতো একটা অপদার্থের চেতনায় আগুন ধরিয়ে দিলেন। আর আমি এক অভিনব জ্বালায় জ্বলতে লাগলাম!

এ সংসার বড়ো বিচিত্র! এখানে আত্মীয় নিজেদের আচরণে অনাত্মীয় হয়ে যায় আর অনাত্মীয়রাই নিজেদের আন্তরিকতায় পরম আত্মীয় হয়ে উঠে। আমার জীবনে এর বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি।

কিন্তু সে সব কথা এখন থাক। এখন আমার এই বদ্ধ খাঁচা থেকে বিদায় নেবার কথা বলি আমি যে যাবোই, সে কথা আমি মনে প্রাণে স্থির করে ফেলেছিলাম। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এর কারণ হয়তো, যে কাঠ দীর্ঘদিন

ধরে পানির নিচে পড়ে আছে তাতে আগুন জ্বলবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেননি। না, তাঁদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই এটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীতে ব্যতিক্রমও আছে। সেই ব্যতিক্রমের সাধনাই ছিলো আমার সাধনা: এখনও বুঝি তাই আছে!

আমার যাবার দিন স্থির হলো। মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, 'মা. আমি পড়তে যেতে চাই।'

তিনি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'যাও বাবা।'

বড়ো খালাকে বললাম, 'খালা, আমি পড়তে যাচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'গেলেতো ভালোই হয়, কিন্তু পারবে কি তুমি?'

ছোট খালাকে বললাম, 'খালা, আমি যেতে চাই।'

তিনি বললেন,'যাবে যাও, কিন্তু ফিরে এলেই আমি বিপদে পড়বো।'

আহমদ হোসেন ভাই শুনে বললেন, 'অনেক আগেইতো বলেছিলাম। এবার যখন যাচ্ছোই, তখন আর ফিরে এসো না। আর যদি ফিরতেই হয়, তা হলে মদনের বাজার থেকে এটি কলসী কিনে নিয়ে এসো।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'আমি একটা দড়ি পাকিয়ে রেখেছি। সেটি দিয়ে কলসীটি গলায় বেঁধে সাইডুলী নদীতে ডুবে মরার জন্য'—বলেই তিনি সস্নেহে পিঠে হাত রাখলেন। আমি অভিভূতের মতো তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

না, ডুবে মরবো না আমি। আমিতো সাত হাত পানির নিচ থেকে ভেসে উঠেছি। মনে পড়লো, আমুদ পুরের পৈতৃক ভিটায় থাকতে গাছের সুপারী পাড়তে গিয়ে কুটায় লাগানো দায়ের আছাড়ি পড়ে আমার কপালের একটা দিক সুপারীর মতো ফুলে উঠেছিলো। তারপর কাউরাট এসে সাইডুলী নদীতে ডুব সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবিয়ে রাখা নৌকার বাতায় লেগে আমার কপালের আরেক দিকও ফুলে উঠেছিলো। হাত দিয়ে দেখলে মনে হবে, যেন শিং বেরুতে গিয়েও বের হয়নি। আজ আমার সেই দুটি শিং বেরিয়ে এসেছে। আমাকে বাধা দিলে আমি এখন বিনা দ্বিধায় ঘুঁচিয়ে দিতে পারি। না, কোনো বাধাই আমি মানবো না।

পথঘাট আমার চেনা। সাইডুলী নদী পার হয়ে কোণাপাড়া দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সোজা রাস্তা। পথে পড়বে পাছাড়, বারুইর, কাইটাইল, তারপর একটি নদী। সেটি পার হলে জাহাঙ্গীরপুরের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে মদন। জাহাঙ্গীরপুর স্কুলের সামনেই খেয়াঘাট। সেটি পার হলেই মদন বাজার, কাজীর অফিস। না কোনো অসুবিধা নেই। সেই যে কুলিয়াটি গিয়েছিলাম, তখনই এই রাস্তা আমার চেনা হয়ে গেছে। তাই একাই আমি যেতে পারবো। জীবন পথের নিঃসঙ্গ পথিক আমি!

একাই পথ এগুতে লাগলাম। মনে হলো, হেঁটেতো নয়, উড়ে যাচ্ছি। আগে ভুল বলেছিলাম, আমারতো শিং নয়, দুটি পাখা গজিয়েছে। এক বদ্ধ খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে আমি মুক্ত আকাশে উড়ছি!

ষষ্ঠ তরঙ্গ ॥

'বাস্তা' গ্রামটি মদন থানার অন্তর্গত। মদন থেকে এর দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। সুতরাং গ্রামটি হাওর এলাকার না হোক, ভাটি এলাকার অংশ। এর পিছনে আছে একটি বিল সামনে আর একটি মাঠ বা বন্দ। ডানদিকের দক্ষিণ সীমানায় একটি ছোট্ট নদী বেঁকে এসে এ গাঁয়ের মাটি স্পর্শ করে বেরিয়ে গেছে। তারই পাড়ে বাস্তা জুনিয়ার মাদ্রাসাটি অবস্থিত। একটি চৌচালা টিনের ঘরের মধ্যে চার পাঁচটি শ্রেণী কক্ষ। ঘরটির সামনে একটি মাঠের মতো স্থান। সেখানে দাঁড়ালে অনেক দূর অবধি যেমন দেখা যায়, তেমনি পিছনে নায়েকপুর, ডানদিকের মাখনা ও পূর্ব দিকের তিয়শ্রী গ্রামগুলি চোখে পড়ে।

আমি এই বাস্তা মাদ্রাসায় ১৯৪৫ সালের কোনো এক সময়ে ভর্তি হয়েছিলাম। সঠিক দিন তারিখ মনে নেই। না থাকারই কথা; কারণ ব্যাপারটি এমন কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে না, যাতে করে আমার স্মৃতিতে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। তবে সে সময় পানিতে মাঠ ঘাট সয়লাব হয়ে যায়নি, এটুকই স্মরণ করতে পারছি। তাছাড়া আমার মনের অবস্থাও তখন এমন যে, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া আর সব কিছুই প্রায় ভুলে গেছি। নিচের জলে পড়া ঝুলন্ত মাছের বাম চোখের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর সব কিছুই প্রায় আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অদৃশ্য হয়ে যাবারই কথা। কাউরাটকে আমি বিদ্ধ খাঁচার সাথে তুলনা করেছিলাম। খাঁচার দরজা খুলে দিলেন যিনি, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু বলেছিলাম, 'পড়বো।' কিন্তু কী পড়বো, সেই বিষয় নিয়ে কোনো কথা-ই হয়নি। কারণ তখন পড়াটাই আমার কাছে বড়ো, বিষয়টা নয়। তাই আমি উড়াল দিয়ে সেই খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। এর সবটাইতো ছিলো কল্পনার ব্যাপার; যথার্থ বাস্তবের মুখোমুখি তখনও হইনি।

আর বাস্তবের কথাই যদি বলতে হয়, তা হলে তো সেদিনের মুক্ত আকাশে উড়ার বাস্তবটাও খতিয়ে দেখতে হয়। না, আমি আসতে পারিনি। প্রায় আট মাইল পথ আসতে আমাকে কয়েক বার জিরাতে হয়েছে। এভাবে মগড়া নদী পেরিয়ে মদন বাজারে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা অনেক খানি গড়িয়ে গেছে। 'কাজীর অফিস' লেখা সাইন বোর্ড দেখে একটি দুচালা টিনের ঘরে এসে প্রবেশ করলাম। সামনেই দেখি বসে আছে 'চাচাজী'। হাঁ, আমি তাঁকে চাচাজী বলেই ডাকতাম। এগিয়ে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। তিনি মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বেঁচে থাকো'। এরপর তাঁর সাথেই বাড়ির মধ্যে গেলাম। চাচী বোধ হয়, কিছু একটা করছিলেন, ডেকে এনে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনিও হাসি মুখেই আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের ব্যবহারে আমার সংকোচ অনেকটাই কেটে গেলো। আমি ঘরের ছেলের মতো গোছল করতে বেরিয়ে গেলাম।

আমার চাচাজীর তখন তিন ছেলে দুই মেয়ে। বড় ছেলে সিরাজ আমার প্রায় সম বয়সী। তার ছোট শামসু আর একেবারে ছোট এমদু। মেয়েদের নাম আমার মনে নেই। কিন্তু বিকালেই সবার সাথে আমার ভাব হয়ে গেলো। সব দেখে শুনে মনে হলো, চাচাজী আমার আসার আগেই আমার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেও তারই নিদর্শন দেখতে পেলাম। আমি হাত মুখ ধুয়ে গিয়ে দেখি চাচাজী তখনও 'অজিফা' পড়ছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। তারপর বাক্সের মধ্য থেকে বের করে আনলেন একটি চটি বই। আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটি দিয়েই তোমার পড়া আরম্ভ করতে হবে।'

'কী বই এটা?'—আমি প্রশ্ন করলাম।

'উর্দু কায়দা। তুমি বাস্তা মাদ্রাসায় পড়বে, আমি বলে রেখেছি। তোমার লজিংও ঠিক হয়ে আছে। মাদ্রাসায় পড়তে বেতন লাগবে না, কোনো খরচের দরকার নেই। আর অন্য কোনো অসুবিধা হলে আমিতো আছিই।

আরো অনেক কিছুই তিনি হয়তো বলছিলেন। কিন্তু আমার কানে তখন সে সব কিছু ঢুকছে না। আমার হাতের বইটিই আমার মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছে। দু'কান ভোঁ ভোঁ করছে। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে যতোই দেখছি, ততোই আমার কাছে দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বলে মনে হচ্ছে। কারণ আমার পুঁজিতো সাবুদ আলী ভাইয়ের দেয়া আরবি অক্ষর জ্ঞান। তাই নিয়ে আমাকে এই দুর্বোধ্য প্রহেলিকার জট খুলতে হবে।

কিন্তু আমি মাদ্রাসায় পড়বো কেন? চাচাজীর কোনো ছেলেতো মাদ্রাসায় পড়ে না! তা হলে আমাকে তিনি মাদ্রাসায় দিতে চান কেন! মনটা কেমন ছোট হয়ে গেলো। কারণ ১৯৪১ আমি প্রাইমারী সেন্টার পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কাজেই আমার বাংলা ইংরেজি জ্ঞান মোটামুটি একটা পর্যায়ে ছিলো। সুতরাং আমার ধারণা ছিল সেই লাইনেই একটা কিছু হবে। কিন্তু বাস্তবে এসে দেখলাম আমি মাদ্রাসার ছাত্র হয়ে গেছি। যে মাদ্রাসার পড়াকে ঐ অঞ্চলের লোকেরা 'ফকিরা পড়া' বলে সব সময় করুণার দৃষ্টিতে দেখেছে। অবশ্য আমি নিজেওতো ফকির অনাথ, কাজেই মাদ্রাসাতো আমারই উপযুক্ত স্থান!

চাচাজীর কাছ থেকে চলে এসে বৈঠক খানার কোণায় বসে এসব কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, যাই হোক যেমনি হোক, লেখা পড়াতো; আমি কিছুতেই পিছু হঠবো না। না, কিছুতেই আর সেই বদ্ধ খাঁচাতে ফিরে যাবো না। মনের কোণে কোথায় যেন একটি জিদ ক্ষ্যাপা বিড়ালের মতো ফুলে উঠতে লাগলো। কিন্তু সেই সঙ্গে চোখের কোন থেকে দু'ফোটা পানিও গাড়িয়ে পড়লো!

সেদিন ছিলো মদনের হাটবার। ভাটি এলাকার বাজার বলে সকাল থেকেই লোকজন আসতে থাকে, দুপুরেতো বাজার পুরো জমে যায়। আমি লোক জনের আনা গোনা, বাজার পসার সাজানো দেখতে দেখতে সারা হাট জুড়ে হাঁটতে লাগলাম। ভুলে গেলাম বাস্তবে প্রথম আঘাতের কথা।

দুপুরেই বাস্তার হারুন ভাই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর নাম কি হারুন, না হান্নান, না রায়হান, না অন্য কিছু! কিছুতেই মনে করতে পারছি না। তবে তাঁর চেহারা ছবি অবিকল মনে পড়ছে। শ্যামলা রংয়ের ছিপ্‌ছিপে এক যুবক। মুখের ডান দিকটার নিচের অংশ তুবড়ে ভিতরে সেঁধিয়ে আছে। দেখতে অনেকটা বাংলা পাঁচের মতো। কিন্তু মুখ পাঁচের মতো হলেও তাঁর মাথার প্যাচ সবগুলিই ঠিক আছে। তিনি ভালোভাবেই প্রবেশিকা পাস করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক অনটনে আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। তবে বন্ধুবৎসল, পরোপকারী বলে তাঁর একটা খ্যাতি ছিলো। আমি সেই সুবাদে তাঁর স্নেহের ছোঁয়া পেয়েছিলাম।

বিকালেই হারুন ভাইয়ের সাথে আমি বাস্তা চলে গেলাম। রাত্রে তাঁদের বাড়িতেই রইলাম। পরদিন তিনি আমাকে মাদ্রাসায় নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন। বিকালেই আমি আমার লজিং বাড়িতে চলে গেলাম। সব দেখে শুনে মনে হলো, হাঁ, আমি আসার আগেই আমার জন্য সব ঠিক হয়ে আছে। এ যেন সেই জন্মের মতো, আসার আগেই মায়ের স্তনে দুধ, পরিবেশে আগ্রহ, একটা স্নেহকাতর উৎকণ্ঠা! বাস্তা আমার জন্য বুঝি সেভাবেই অপেক্ষা করছিলো। সত্যিই বাস্তার এই অকৃপণ আতিথেয়তা না পেলে আমার পক্ষে দুর্বোধ্য প্রহেলিকার রহস্য উন্মোচন সম্ভবপর হতো না।!

আমার লজিং মাস্টারের নাম সোনা মিয়া। বেঁটে খাটো গোলগাল চেহারার মানুষটি। মুখে একটি অমায়িক হাসি লেগে আছে। সে হাসি তাঁর স্ত্রীর মুখে আরও বেশি। তিনি দেখতে যেমন ছিলেন সুন্দরী, তেমনি তাঁর মাতৃসুলভ ব্যবহার। প্রায় এক বছর সেখানে ছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে একদিনও তাঁর ছেলে দুটিকে কাছে বসিয়ে পড়ানোর চেষ্টা করিনি। অথচ এ নিয়ে না সোনা মিয়া, না তাঁর স্ত্রী আমাকে কিছু বলেছেন। তবে শেষের দিকে তাঁরা খুবই রাগ করে ছিলেন, তবে তার কারণ অবশ্যি ভিন্ন। যথা সময়ে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো।

আপাততঃ কাঁঠাল গাছের নিচে চৌচালা টিনের ঘরের এক কোণায় তাঁদের দেয়া কাঁথা বালিশ বিছিয়ে আমি আমার তপস্যায় বসলাম। কিন্তু সহজে কি মন বসে। তপস্যা ভঙ্গের প্রচুর উপকরণ চারদিকে ছড়িয়ে আছে, ওরাই বারবার মনকে টেনে নিয়ে যায়। আমি যে বৈঠকখানায় থাকি, তার ডান পাশেই একটি মসজিদ, পাকা; তবে দরজা জানালা তখনও লাগানো হয়নি। সেটি যেমন মনকে টানতো, তেমনি এই মসজিদের পিছনের বাড়িতে ছিলো একজন পাগল, তাকে দেখলেও আমার মানস প্রক্রিয়া বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। এর কারণ সেই দুর্বোধ্য প্রহেলিকা!

কিন্তু উর্দু কায়দা যে আমাকে এতোটা বেকায়দায় ফেলে দেবে, তা আমি স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি। আরবি অক্ষরগুলি আমি চিনি, কিন্তু এখানে সেগুলির মাঝে মাঝে আরো নতুন অক্ষর আছে। আবার সেগুলি একত্র হয়ে যখন শব্দ তৈরি হয়, তখন অনেকগুলি অক্ষরই লেজ খসিয়ে অচেনা হয়ে উঠে। অনেক কষ্টে তাদের পরিচয় উদ্ধার করতে হয়। মাদ্রাসায় গেলে শিক্ষক যা বলে দেন, বাড়িতে আসতে আসতেই তার

অর্ধেক মন থেকে উবে যায়। সে কী ত্রিশংকু অবস্থা! কতোবার যে মনে হয়েছে, এই বুঝি আমি হেরে গেলাম। কিন্তু না, আবার সাহস ফিরে এসেছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে সেই যে মাছের বাম চোখের প্রতিবিম্বের প্রতি একাগ্রতা। তাই এ সময়ের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের অনেক কিছুই আমার কাছে ঝাপ্‌সা!

কিন্তু খুব বেশি দিন নয়, এক মাসের মধ্যেই আমার লক্ষ্য ভেদ সমাপ্ত হয়ে গেলো। আর এই লক্ষ্য ভেদে আমার দোনাচার্য ছিলেন মাখনার মৌলবী সাহেব। তিনি হয়তো খুব একটা শিক্ষিত ছিলেন না, দেখতেও তেমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলে মনে হতো না; কিন্তু কেন জানি তিনি আমাকে পেয়ে বসলেন। তাঁর স্নেহপূর্ণ উৎসাহের কোনো তুলনা নেই। আমি একটু বলতে তিনি এমন ভাব দেখান, যেন আমি দিগ্বিজয় করে ফেলেছি। এর ফল হলো এই যে, আমি একের পর এক দিগ্বিজয় করতে লাগলাম। 'দহম' শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্য তিন মাসে শেষ করে আমি উর্দু কায়দায় অত্যাচারের প্রতিশোধ নিলাম। আমার সাহস শুধু বাড়লো না, আমার মেধাও ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠলো।

মাখনার আমার সেই উস্তাদ যে দিন পরবর্তী শ্রেণী 'নহম'-এ আমাকে উন্নীত করার কথা অন্যান্য শিক্ষকের কাছে বললেন, সেদিন আমি বুঝতে পারলাম যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য আরো শিক্ষক আছেন। সত্যি, শুধু এটুকই নয়, এই তিন মাস আমি কোনো দিকে যাইনি, এমন কি মদনেও আমার যাওয়া হয়নি। আর আমার বইপত্র কে দিয়েছেন, কী ভাবে পেয়েছি, তাও আমি বলতে পারবো না। আমি জানি, আমি শুধু পড়েছি। কখনও আমার বিছানায়, কখনও মসজিদে আর কখনও গাছতলায়। এমন নিরলস মনোযোগের মধ্যে কেউ কোনো বাধারও সৃষ্টি করেনি!

কিন্তু মাখনার,—হায়, তাঁর পুর্ণ নামটি কেন আমি স্মরণ করতে পারছি না, আমার উস্তাদের প্রস্তাব এতো সহজে গৃহীত হয়নি। আমাকে পরীক্ষা দিতে হলো। শিক্ষক আর ছাত্ররা সবাই গোল হয়ে আমার চারদিকে বসলেন, আর আমি সংকোচে লজ্জায় মাথা নিচু করে দহম শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্য একের পর এক মুখস্থ আউড়ে যেতে লাগলাম। কখনও মুখের কথা জড়িয়ে গেলো, কখনও দু'একটা কথা ভুল বললাম; কিন্তু গতি আমার থামলো না। শেষ হয়ে গেলে মাখনার মৌলবী সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। অন্যান্য শিক্ষকরা আমার দিকে চেয়ে আছেন। ত্রিয়শ্রীর মাস্টার সাহেব এক সময়ে বললেন, ঠিক আছে, তাকে 'নহম' শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া যায়।'

কিন্তু সেদিনই আরেকটি প্রমোশন আমি পেয়ে গেলাম। সারা এলাকায় রটে গেলো যে, বাস্তা মাদ্রাসায় মানুষের বেশে একটি জিন পড়তে এসেছে। সচরাচর এমন মেধা দেখা যায় না, আর বাস্তার মতো একটি অখ্যাত মাদ্রাসায়তো তা একেবারেই অকল্পনীয়। কিন্তু আমার মতো মেধার অধিকারী ছাত্র কি সেখানে ছিলো না? অবশ্যি ছিলো, কিন্তু তাদের মেধা আমার মতো দর্শনীয় হবার সুযোগ পায়নি, কিংবা তারা তিন

মাসে 'দহম' পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আমি শুধু পার হলাম না, মানুষ থেকে জিন হয়ে গেলাম!

এর ফল হলো এই যে, বাস্তার সর্বত্র আমি অবাধ-গতি হয়ে গেলাম। বাস্তা গ্রামটি আসলে খুব ছোট, সর্ব সাকুল্যে ত্রিশটি বাড়িও নেই গ্রামে। তাহলেও তার তিনটি পাড়া। আমার লজিং মধ্য পাড়ায়। এর দু'তিনটি বাড়ি পরেই একটি ফাঁকা মাঠ, তারপর দক্ষিণ পাড়ার শুরু। প্রথমেই পড়ে আমার লজিং মাস্টার সোনা মিয়ার শ্বশুরবাড়ি। তাঁর শ্বশুরই মাদ্রাসার সেক্রেটারী। নাম ভুলে গেছি কিন্তু মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি আর মোটাসোটা সেই লোকের চেহারা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। এরপর দু'তিনটি বাড়ি পেরিয়ে সেই হারুন ভাইদের বাড়ি হয়ে এক কালের আনন্দ মোহন কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক আজিজুল হক চৌধুরীদের বাড়ি। এরপর একটি খাল আছে, আরও কয়েকটি বাড়ি আছে। তেমনি আমার লজিং বাড়ি থেকে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে দুতিনটি বাড়ির পরেই একটি খাল; ইস্কান্দর খাঁ, ফিরোজ ভূঞাদের বাড়ি। তারপর আরও চার পাঁচটি বাড়ি। এর মধ্যেই বাস্তা গ্রামের পরিক্রমা শেষ।

কিন্তু এর মধ্যে মাদ্রাসায় যাবার পথে পড়ে যে দক্ষিণ পাড়া, তার উপরই আমি অত্যাচার করেছি বেশি। হাঁ, অত্যাচারতো বটেই, আচার খাওয়ার অত্যাচার। এ সকল বাড়ির উঠানে আচার বা চুকা জাতীয় কিছু দেখলেই আমি নির্দ্বিধায় হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু এর বদলা পেয়েছি সস্নেহ সমাদর। কারণ আমিতো সাধারণ ছাত্র নই, আমাকে খাইয়ে সুখ আছে। তাই ক্ষুধা লাগলে। যে কোন বাড়িতে গিয়ে বলতে আমার কোনো দ্বিধা ছিলো না। ঘরে যা আছে, সমাদরের সাথে তাতেই আমি ভাগ বসিয়েছি। আজিজুল হকদের বাড়িও বাদ যায়নি। এমন কি উত্তর পাড়াতেও আমার হামলা কম ছিলো না।

হায়, বাস্তা! তোমার স্নেহের ঋণ আমি কী দিয়ে শোধ করবো! আত্মীয়-স্বজনের উদাসীনতার খাঁচার আবদ্ধ হয়ে যখন হাঁফিয়ে উঠেছিলাম, তখন একান্ত নিরূপায় বেড়িয়ে এলাম পথে। ভেবেছিলাম, কী জানি কী হয়; সংকোচ, লজ্জা, হীনমন্যতা আমাকে পদে পদে শংকাতুর করে তুলেছিলো। কিন্তু তোমার অকৃপণ স্নেহের পরশ, অনাবিল উদারতা আমার সব শংকা দূর করে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে, 'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয় আমি তাঁরে মরি খুঁজিয়া।'

সত্যি এরপর আমি অকুতোভয় হয়ে গেলাম। আমি দেখলাম, আমি বুঝলাম, আমি পারি, আমি পারবো। শিক্ষার্থীই বলি আর অভিযাত্রীই বলি, যদি আত্মবিশ্বাস না জন্মায়, তা হলে সাফল্য লাভ করতে পারে না। আমার মধ্যে সে আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। সুতরাং এখন কিছুটা বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়লো। যে পাগলের কথা ইতিপূর্বে বলেছিলাম, তারই পাগলামি দেখে একদিন চমকে গেলাম। নিজের স্ত্রীর চুলের খোঁপায় এমন ভাবে কামড়ে ধরেছিলো যে, মহিলার আর্ত চিৎকারে চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো, আমিও গেলাম। তারপর সেই পাগলকে টেনে হিঁচড়ে খোঁপা ছাড়ানো হলো; কিন্তু তার

দুটি দাঁত চুলের মধ্যে জড়িয়ে রয়ে গেলো। তারপর তাকে কুন্দা দিয়ে রাখা হলো মসজিদের পিছনের একটি ছনের বড়ো চৌচালা ঘরে।

এই পাগলের নাম এখন আর মনে নেই। দেখতে দশাসই জোয়ান, কিন্তু কী অসহায় করুণ তার অবস্থা! অবশ্য পরিবারটি ছিলো সচ্ছল। এই পরিবারের এক ভাই নেত্রকোণায় উকালতি করতেন, তাঁর বাসায় আমি গিয়েছি; কিন্তু নাম আর মনে পড়ছে না। সবার ছোট ভাই গৃহস্থির দেখাশোনা করেন। সুতরাং তারা এই পাগল ভাইয়ের চিকিৎসা করানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়নি। এমনিতে কাজ কাম না করলেও খায় দায় চলাফেরা করে। কিন্তু হঠাৎ করে কী যে হয়, ভীষণ মারমুখী হয়ে উঠে। দুটি চোখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে যায়। তখন তার দেহে অসুরের শক্তি। লালপরী এসে ভর করে। তখন কুন্দা দিয়ে রাখা ছাড়া উপায় থাকে না।

জিনপরীর কথা এর আগেও শুনেছি। আর আমি নিজেইতো জিন। কিন্তু পরী যে কী ভয়ঙ্কর তা এই পাগলের কাণ্ড দেখে বুঝতে পারলাম। আগে মসজিদে গিয়ে নিরিবিলি পড়ার চেষ্টা করতাম। একদিন তাকের উপর রাখা কোরান শরীফ সরাতে গিয়ে দেখি হাত দেড়েক লম্বা সাদাটে একটি সাপ কিলবিল করছে। আমি লাঠি এনে সেটি মেরে ফেললাম। আমার লজিং মাস্টার দেখতে পেয়ে আৎকে উঠলেন, 'কী সর্বনাশ! এই সাপ মেরেছো কেন, এগুলি তো জিন। তুমি বুঝি জানো না, জিনেরা ঘুমিয়ে পড়লে সাপের আকার ধারণ করে। মসজিদে তো হর হামেশাই জিন থাকে।'

তাঁর কথা শুনে আমিও মনে মনে আৎকে উঠলাম। না, আর মসজিদে নয়। কী জানি, মানুষের কথাতো ফেলা যায় না, আমি ঘুমুলেও যদি এমনি সাপের মতো হয়ে পড়ি; তা হলে কেউ না কেউ আমাকেও লাঠিপেটা করবে। কিন্তু সত্যি কি আমি জিন? না, তাহলে এতো দিন ঘুমের মধ্যে নিশ্চয় সাপ হয়ে যেতাম। আর কেউ না কেউ তা নিশ্চয় দেখে ফেলতো। যা হোক, আমি জিন হই বা নাই হই এ বাড়িতে জিন পরীর নজর আছে। সুতরাং মসজিদে নামাজের সময় গেলেও অন্য সময় যাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

অবশ্যি বর্ষাকাল তখন পুরো মাত্রায় এসে উপস্থিত হয়েছে। মাঠ-ঘাট খাল-বিল জলে থৈথৈ করছে। নৌকা করে মাঝে মধ্যে ত্রিয়শ্রীয় বাজারে যাই। একদিন গেলাম আরও কিছুটা দূরে দৌলতপুরে। ফুটিদামে ভরা একটা বিরাট বিল পেরিয়ে দৌলত পুরের সামনে যেতেই চোখ জুড়িয়ে গেলো। একটা বিরাট বাঁকা লাউয়ের মতো একটি জলাশয়। কিন্তু কী টলমলে পরিষ্কার এর পানি! কোথাও এক টুকরো জলজ দাম নেই। যদ্দূর দৃষ্টি যায়, রোদ লেগে সেই পানি কেবলি চিক্‌মিক করছে। দেখলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

পরে শুনেছি, এই জলাশয়টির নাম 'নরুনসর'। এর পানি শুধু নয়, মাছও বেশ সুস্বাদু। নরুন সরের এক হাত লম্বা পাবদা মাছ ঐ অঞ্চলের লোভনীয় বস্তু। শীতকালে অবশ্য এর বিস্তার কিছুটা সংকুচিত হয়, কিন্তু দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটে না। তখন

মাঝেমধ্যে 'বাওয়া' বা এক সাথে মাছমারার দল নামে। কিন্তু মাছ খুব একটা পাওয়া যায় না। কারণ এর একটা স্থানে বড়ো বড়ো পাথর আছে, সেগুলি শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে গেছে। সেখানে সব মাছ গিয়ে পালিয়ে বাঁচে। এক সময়ে নাকি এই নরুনসরে মেজবানীর থালা বাসন পাওয়া যেতো। কিন্তু একবার একটি মেয়েলোক একটি থালা গোবর গাদায় লুকিয়ে ফেলায় সেই থালা দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে। পরে অন্যান্য স্থানে শোনা কিংবদন্তি মিশিয়ে দেখেছি, তার অনেকগুলিই নরুন সরের বেলাতেও পাওয়া যায়। এই জলাশয়টির বিশেষ অবস্থাই এ সকল কিংবদন্তির উৎস হয়ে আছে।

ফিরতি পথে আরও একটি বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। সে হলো বেদের বহর। ঐ অঞ্চলে ওদের 'গাইন' বলা হয়। ইতিপূর্বে গাইনের নৌকা যে দেখিনি, তা নয়; কিন্তু এতো কাছে গিয়ে একেবারে নৌকায় উঠে তা দেখিনি। আমার লজিং মাস্টার তামাকের খুব ভক্ত। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'চলো, সর্দারের নৌকা থেকে একটু তামাক খেয়ে যাই।' নৌকা ভিড়িয়ে আমিও গেলাম তাঁর সাথে। নৌকার ভেতরেই ছিলো সর্দার, ডাক দিতেই বেরিয়ে এলো। দাড়ি মোচে ভরা একজন বয়স্ক লোক। নৌকার বাইরের দিকটা দেখলেও বুঝা যায়, এটা সর্দারের নৌকা। কিন্তু ভিতরে উঁকি দিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। একটা নৌকায় যে এতো সাজ সজ্জা থাকতে পারে, তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সর্দার বসার জন্য দুটি মোড়া এগিয়ে দিলো। তারপর ডাকলো, 'চম্পা!' মাঝখানের সুদৃশ্য বেড়ার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো এক কিশোরী শ্যামলা রংয়ের ছিপছিপে শরীর থেকে যেন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য ছিটকে পড়ছে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সর্দার বললো, 'এক বাটি তিলের নাড়ু দে তো, মা!'

সোনা চাচা না, না করলেও সেই নাড়ু এলো। আমার খুব ভালো লাগলো খেতে। এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি। অবস্থা বিপর্যয়ে মানুষ অনেক বদভ্যাসও ভুলে যায়, সঙ্গতির অভাবেই ভুলে যায়। আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে সেই বদভ্যাসগুলি নতুন করে সতেজ হয়। আমারও সেই অবস্থা হয়েছে। বাস্তার মাটির রস আমাকে শুধু সজীব করেনি, আমার তামাকের নেশাকেও নতুন করে জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন কাজটা খুব সহজ নয়, অতি গোপনে সারতে হয়। লুকিয়ে ছাপিয়ে যতোটুক পারি বিড়িতে টান দিই। কিন্তু হুকোর কথা আর ভাবা যায় না। কারণ আমি মাদ্রাসার সেরা ছাত্র। আমাকে হুকো টানতে দেখলে কেউই রেহাই দেবে না। আমার মুরুব্বীতো সবাই; তারা যেমন স্নেহ করে, তেমনি শাসনও করে!

সুতরাং নাড়ুর পালা শেষ হলে ফরশী হুকোয় যখন আম্বুরী তামাক এলো তখন আমি কাতর হয়ে পড়লাম। হায়, সোনা চাচা কী আরামছে টানছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে। আর আমি শুধু গন্ধ শুঁকেই তৃপ্ত থাকতে বাধ্য হচ্ছি! এক সময় তামাক খাওয়া ও বিদায় নেওয়া শেষ হলো। আমি একটা অদ্ভুত চমক নিয়ে ফিরে এলাম। কিশোর মনের কল্পনার ফানুস কেবলি উড়তে লাগলো। এর পরও গাইন আর গাইনের নাও দেখেছি, কিন্তু সেদিনের সেই ভালো লাগার চমক কিছুতেই ভুলতে পরিনি।

সোনা চাচা লোকটা ছিলো বেশ অমায়িক। আমাকে শাসন করার চাইতে সন্তুষ্ট করার দিকেই তাঁর লক্ষ্য থাকতো বেশি। আরেক রাতে সে বললো, 'কিরে মিয়া, মাছ মারতে যাইবা?' আমিতো এক পায়ে খাড়া। সেই আলো দিয়ে মাছমারা। নরুনসরের পাশের সেই বিলটি, যেখানে ফুটি দামে ভরে আছে, সেখানেই আমরা গেলাম মাছ মারতে। হেজাকের আলোতে ফুটি দামের পাশে ভাষা বড়ো বড়ো 'কাইক্যা' মাছে দেখা যায়: ছোট খাটো কলার ডাঁটের মতো ভেসে আছে। ঘা দিলে এক সাথে দুতিনটাও গেঁথে যায়। কিন্তু কোচের ফলা থেকে ছাড়ানোই বড়ো বিপদ। ঠোঁট দিয়ে আঙ্গুলে কামড়ে ধরে। তবু ঘুরে ঘুরে বেশ কিছু মাছ আমরা মারলাম, কিন্তু এ কী! ফিরে যাবার পথ কোন দিকে!

অনেকক্ষণ ধরে লগি ঠেলে নৌকা বাইছে, কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই একই স্থানে। কেমন একটা গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছি আমরা। 'কানা অলায় ধরেছে নির্ঘাৎ। এও এক ধরনের ভূত, মানুষকে পথ ভুলিয়ে ঘুরিয়ে মারে। পরণের কাপড় উলটিয়ে পড়লে নাকি এই ভূতে ছেড়ে দেয়। সোনা চাচার নির্দেশে আমার পরণের তবন উলটিয়ে পরলাম। কিন্তু খুব একটা ইতর বিশেষ হলো না। ভ্যাবাচেকা খেয়ে বিলের পাড়ে লাগানো হলো নাও। আসলে হেজাকের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে সবার, তাই কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। হেজাক নিভিয়ে ফেলা হলো। তখন চোখে পড়লো কিছুটা দূরেই নদী। পাড়ের পানি নেমে যাওয়ার কিছুটা স্থান কাদা কাদা হয়ে আছে। আমরা তিনজনেই সেই কাদায় নেমে পড়লাম। তারপর অনেক কষ্টে সেই কাদার উপর দিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে নদীতে ফেললাম। এ ভাবেই সে রাতে কানা অলার কবল থেকে আমরা উদ্ধার পেলাম।

এমনি সব ঘটনার স্মৃতি জমে উঠছে একের পর এক। এক একটা নতুন বিস্ময়, চেতনাকে বিস্তারিত করে দেবার মতো চমক। কিন্তু আমি কি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি? মোটেও না। ইতিমধ্যে মদন এসেছি, কাউরাট গিয়েছি; কিন্তু আমার সাধনা অব্যাহত আছে। সুতরাং আর তিনমাস পরে আবার মাখনার উস্তাদ আমাকে পরের শ্রেণী 'হাশতম'-এ তুলে দেবার প্রস্তাব দিলেন। এবার আর সেই দর্শনীয় পরীক্ষা দেবার কথা কেউ তুললো না; বরং বাদ সাধলো হাশতমের ছাত্ররা। তারা ঐ শ্রেণীতে আমাকে তুলেদিলে মাদ্রাসা ছেড়ে চলে যাবে বলে হুমকি দিলো। এদের সাথে অন্য শ্রেণীর ছাত্ররাও যোগ দিলো। সে এক তুলকালাম কাণ্ড! একটি ছাত্রের জন্যতো মাদ্রাসা ভেঙে দেয়া যায় না!

আর আমি? আমিও গোঁ ধরে বসলাম যে, তারা যদি অন্যায়ভাবে আমার পথ আটকে দাঁড়াতে পারে, তাহলে আমিও এই মাদ্রাসা ছেড়ে চলে যাবো। কাজেই ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে দাঁড়ালো। মাখনার আমার উস্তাদ হাল ছেড়ে দিলেন। এবার মঞ্চে প্রবেশ করলেন 'আমীর উদ্দিন মিল্কী'। তিনিও আমার শিক্ষক, কিন্তু উপরের শ্রেণীতে পড়ান বলে আমি এতোদিন তাঁর সাহচর্য পাইনি। এবার তিনি আমাকে বুঝানোর ভার নিলেন।

খুব আদর করে বসিয়ে বললেন, 'দেখি, তোর ডান হাতটা দেখি। বাহ্, খুব ভালো হাতরে! তুইতো বিরাট একটা কিছু হবি! শুধু একটা দোষ আছে তোর, রাগটা খুব বেশি। ওটা আরেকটু কম থাকলে দিগ্বিজয় করতে পারতি!'

না, লেখাপড়ার কথা নয়, ধমক দেয়া নয়, অনুনয় বিনয় নয়; এ যে একেবারে নতুন কথা। আমার রাগ জল হয়ে গেলো। আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। তখন তিনি বললে 'পাগল, শুধু পড়লেই হয়; পেড়ারও তো দরকার আছে। সেই যে কথায় বলে না—মিয়া তুমি পড়ছো, কিন্তু পেড়ছো না।'

একেবারে নতুন শব্দ, নতুন অর্থ! আমি জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি নিয়ে তাঁর মুখপানে তাকালাম। তিনি বললেন, 'আচ্ছা তুই ভাত খাস্তো, সেগুলি হজম হতে কতোটুক সময় লাগে? কমপক্ষে চার ঘণ্টা। কিন্তু হজমের সময় না দিয়ে যদি খাওয়ার পর আবার খাস্, আবার খাস, তা হলে কী হবে? বদ হজম হয়ে পেটের সব ভাত বেরিয়ে আসবে না? লেখা পড়াওতো তেমনি খাওয়া, হজম হবার জন্য একটু সময়ের দরকার। এর নামই পেড়া, মানে হজম করা।'

ব্যাস্, আমার হয়ে গেছে। এর জবাব আমি কী দেবো! এরপর যখন তিনি বললেন 'নহমের বইপত্র তোর আর পড়ার দরকার নেই; তুই ক্লাসে পড়াবি।' তখন আমি অভিভূত হয়ে গলে গেলাম। অথচ ব্যাপারটা এমন অভিনব কিছু নয়। সর্দার পড়ুয়া অনেকটা এই কাজই করে থাকে। আমিও সেই কাজই করার সুযোগ পেলাম। মাদ্রাসার হৈচৈও থেমে গেলো।

এ সময়েই হয়তো অধ্যাপক আজিজুল হক চৌধুরী আমার ছাত্র হবার সুযোগ পেয়েছিলো। এখনো সেসব কথা কৌতুকের সাথে স্মরণ করে। অবশ্যি এরপর সে আমার সহপাঠী ও সহকর্মী হবারও সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু শিশু কালের সেই উস্তাদের কথা এখনও সে ভুলতে পারেনি!

সেই যাই হোক, আমি সর্দার পড়ুয়া হবার সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়ে নহমেই থেকে গেলাম। কিন্তু এখানে মাদ্রাসার এই শ্রেণী নামকরণ সম্পর্কে দু'এক কথা বলা দরকার মনে করছি। এক সময়ে ইংরেজি স্কুলের মতোই এই মাদ্রাসারও শ্রেণী নামকরণ হয়েছিলো। কারণ শিক্ষার এই উভয় ধারাই ইংরেজরা চালু করেছিলো। পরবর্তীকালে স্কুলের শ্রেণীগুলির নাম উল্টে গেলেও মাদ্রাসায় কিন্তু সেই আদি অকৃত্রিম ধারাই প্রবহমান ছিলো। ইদানীং মাদ্রাসা অবশ্যি নতুন নাম করণের দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু আমি যখন মাদ্রাসায় পড়ছি, তখনো সেই পুরানো ধারাই বলবৎ আছে। তখন 'ইয়াজদহম' মানে একাদশ শ্রেণী দিয়ে মাদ্রাসার লেখাপড়া শুরু হতো, আমি ইয়াজদহম নিজেই পড়ে ফেলেছিলাম। সুতরাং আমার মাদ্রাসার পড়া শুরু হয়েছিলো 'দহম' অর্থাৎ দশম শ্রেণী দিয়ে। তারপর তিনমাস পরে আমি 'নহম' অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে প্রমোশন পেলাম। এরপর 'হাশতম' অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীতে উঠতে গিয়েই বিপত্তি দেখা দিলো। আর আমি নহম তথা নবম শ্রেণীতেই রয়ে গেলাম। তবে আমার সৌভাগ্য এই যে,

মিস্কী সাহেবের দেয়া এই পুরস্কার আমি বরাবর ভোগ করেছি। এমন কি আলীয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শ্রেণীতেও আমার সহপাঠীরা আমার নিকট তাদের পাঠ্য বুঝে নিয়ে আমাকে ধন্য করেছে!

সে কথা এখন থাক। আপাততঃ আমি আরও একটি ব্যাপারে হঠাৎ করেই জড়িয়ে গেলাম। এটা সেই হারুন ভাইয়ের বদান্যতা। তা তিনি একদিক থেকে ভালোই করেছিলেন। তা না হলে এ ব্যাপারে আরও দেরী হতে পারতো এবং আমার কষ্টও আরো বাড়তো। আমার বয়স তখন ষোলো। পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণেই আমার তখনও খাৎনা বা মুসলমানী হয়নি। অথচ আমি জন্ম মুসলমানও নই। আমার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নেননি।

সেদিন মাদ্রাসায় যাবো বলে বেরিয়েছি। হারুন ভাইদের বৈঠক খানায় দেখলাম মুসলমানীর তোড় জোড় চলছে। আমি থমকে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। হারুন ভাই দেখতে পেয়ে বললো, 'কি হে জিন, আজ মাদ্রাসা নেই?'

আমি বললাম, আছে। কিন্তু আমি যে এখনও মুসলামানই হইনি।'

'তাই নাকি, তাহলে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ো।'

আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে হেসে বললো, 'কি, ভয় পাচ্ছো নাকি?'

আমি বললাম, 'ভয় নয়, ভাবছি'....

'না, কোনো ভাবনার দরকার নেই, তুমি কাটাও বাদবাকী আমি দেখছি।'

তাই হলো, দশবারোটি ছেলের সাথে আমিও সেই বৈঠক খানায় শুয়ে পড়লাম। তারপর ফুলে ফেঁপে গলে টলে পনেরো দিন পরে লুঙ্গি ধরে হেঁটে বেড়াতে সক্ষম হলাম। এ কয়দিনের খাবার দাবার ওষুধপত্র সবই ছিলো পাইকারী। অন্য সবারই বাড়ি ঘর আছে, তারা এনেছে আর আমি ভাগ বসিয়েছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার লজিং মাস্টার রেগে টং, সব চাইতে রেগেছেন তাঁর স্ত্রী। কেন আমি তাঁদেরকে না জানিয়ে পরের বাড়িতে এমন কাজ করে বসলাম। তাঁদের সেই স্নেহভরা রাগ থামাতে আমার খুব বেগ পেতে হয়েছিলো।

এর ফল হলো এই যে, আমার লজিং আর খাওয়া দাওয়া আরো বেশি অনিশ্চিত হয়ে উঠলো। কাঁথা বালিশ দুটি অবশ্যি তাঁদের বৈঠকখানাতেই ছিলো; কিন্তু আমি যেখানে যখন সুবিধা হতো খেতাম ও শুয়ে পড়তাম। এর মধ্যে আবদুল্লাহ্ মুখার্জীর ব্যাপারটি এসে আমার মানস জগতে একটা নতুন শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে গেলো। ধর্ম নিয়ে, বলতে গেলে, আমি তখন থেকেই ভাবতে আরম্ভ করলাম। আমার চিন্তা চেতনার এ এক নতুন দিগন্ত!

শুধু বাস্তা কেন, তখন প্রত্যেক মাদ্রাসাতেই চাঁদা ও সাহায্য আদায়ের একটা চেষ্টা সাংবাৎরিক ব্যাপার। গ্রাম থেকে তোলা হোক, ওয়াজ মহফিল করিয়েই হোক, বছরের একটা আয় করে নিতে হতো। তা না হলে শিক্ষকদের বেতন দেয়া সম্ভব হতো না।

ছাত্র বেতন থেকে আয় হতো অতি সামান্যই। ইদানীং অবশ্যি সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তা হলেও পুরানো স্বভাব দূর হয়নি।

যাহোক, বাস্তা মাদ্রাসাও এমনি চাঁদা আদায়ের জন্য একটি ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করলো। এতে ওয়াজ করবেন বিখ্যাত বক্তা নবীন মুসলমান মৌলানা আবদুল্লাহ মুখার্জী। হাট বাজারে চোঙ্গা ফুঁকে সভার খুব প্রচার হলো এবং নির্দিষ্ট দিনে অনেক লোকজনও এসে জমলো। আমরা অনেকেই সেই সভার স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করছি। প্রথমে স্থানীয় দু'এক জন কিছু কথা বললেন; মাদ্রাসার দুর্দশার কথা, ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনের কথা। তারপর শুরু হলো সেই বিখ্যাত বক্তার ওয়াজ।

তাঁর সুরেলা কণ্ঠের উদাত্ত আহবানে আমি আমার কাজ ভুলে গেলাম। তিনি একের পর এক আরবি আয়াত আর ফারসি বয়াত আউড়িয়ে শুরু করলেন তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কথা। তাঁর নাম ছিলো হরি কিঙ্কর মুখার্জী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু বাড়িতে আগুন লেগে তাঁর সংগৃহীত ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে কোরান শরীফ পুড়লো না দেখে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। সেসব কথাই তিনি অবলীলা ক্রমে দরদ ভরা কণ্ঠে বলে যেতে লাগলেন। আর ইসলাম ধর্মের একেকটি মাহাত্ম্য শুনে শ্রোতারা উল্লাসে 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি দিতে লাগলো। সন্ধ্যার আকাশ বাতাস সেই ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠলো।

আমি অন্যত্র আবদুল্লাহ মুখার্জীর এই বক্তৃতার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পৈতৃক ধর্ম সম্পর্কে তখন কিছুটা ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছে মাত্র। এমন সময় আবদুল্লাহ মুখার্জী আমাকে নতুন ভাবে চিন্তা করতে আহবান জানালো। তাঁর এই বর্ণনা যদি সত্য হয়, তা হলো সেই সত্য দর্শনের সৌভাগ্য তো আমার হয়নি। আমিতো মুসলমানের ঘরের মুসলমান। কিন্তু সে ভিন্নজাতের ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেও ইসলামকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আমার মানা আর তাঁর মানার মধ্যে কী আকাশ পাতালই না পার্থক্য! আমি অন্ধের মতে মানি, আর সে চক্ষুমানের মতো মানে!

আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আহা, তাঁর মতো আমিও যদি সত্যকে দেখতে পারতাম! কৈ, গ্রামে গঞ্জে অনেক বাড়িইতো আগুন লেগে পুড়ে যায়। সেখানে কি কোরান শরীফ নেই! সেগুলি অক্ষত থেকে কি আমাকে সেই সত্য দর্শনের সুযোগ করে দিতে পারে না! কিন্তু এতো এতো লোক তাঁর কথা শুনছে, অবিশ্বাস করার মতো কিছু হলে কি তারা চুপ করে থাকতো! না, না, অবশ্যি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। আমাদের পোড়া কপালের জন্যই আমরা তেমন ব্যাপার দেখতে পাই না!

সেদিন অবশ্য এসব কথাই মনে হয়েছে। কিন্তু আজ! থাক্, আজকের কথা বলে সেদিনের ভালো লাগাকে নস্যাৎ করে দেবার দরকার কি! তাছাড়া আবদুল্লাহ মুখার্জীর সত্য দর্শন মাত্র শুনেছি, কিন্তু তাঁর বাস্তব জীবনে এখনও দর্শন করিনি। সে দর্শনের পর

সবটুক ভালো লাগা বুঝি অবশিষ্ট থাকবে না। থাকলে সবচেয়ে সুখী হতাম আমি। ভণ্ডামির জ্বালা এমন তীব্রভাবে অনুভব করতে হতো না।

থাক সে কথা। আপাততঃ তাঁর সুরেলা বক্তৃতার গুনে মাদ্রাসার জন্য দেখতে না দেখতেই হাজার টাকা চাঁদা উঠে গেলো। এর সিকি ভাগ পাবেন আবদুল্লাহ মুখার্জী। এছাড়া তিনি সর্ব রোগের দাওয়াই প্রায় হাজার খানেক তাবিজ বিক্রি করে ফেললেন। প্রতিটি তাবিজের শিন্নি তথা মূল্য সোয়া পাঁচ আনা। এভাবেও কম করে হলেও আড়াইশ তিনশ টাকার যোগাড় হয়ে গেলো। কিন্তু মানুষের তাবিজের চাহিদা তখনও শেষ হলো না। অগত্যা কেউ একজন তাঁর সাথে গিয়ে তাবিজ নিয়ে আসার কথা তিনি বললেন এবং মাদ্রাসার একজন সেরা ছাত্র হিসেবে সে কাজের জন্য আমাকে নির্বাচিত করলেন। আমি একেবারে বর্তে গেলাম। আল্লাহ্‌র কী মেহেরবানি! এমন পুণ্যবান লোকের সহবতে থাকাও পুণ্যের কাজ।

যাহোক, আবদুল্লাহ মুখার্জী এভাবে এক সন্ধ্যাতেই পাঁচশত টাকা পকেটে পুরে, সেক্রেটারী সাহেবের বাড়িতে ভুরিভোজে আপ্যায়িত হয়ে তাঁর আস্তানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। একেতো শীতের রাত, তদুপরি অন্ধকার। তিনি চড়েছেন মাদ্রাসার ভাড়া করা এক ঘোড়ায়। আর আমরা তিনজন; তাঁর তল্পিবাহক, আমি ও ঘোড়াঅলা চলছি পায়ে হেঁটে। পথে পথে হোচট খেয়ে, কাদা ভেঙে আমরা গিয়ে পৌছলাম মদন বাজারের কাছে মগড়া নদীর পাড়ে। সেখানেই মুখার্জী সাহেবের বজরা। এতে চড়েই তিনি দেশ দেশান্তরে ইসলামের জন্য ঘুরে বেড়ান।

সেই বজরারই এক কোণে, পরিশ্রান্ত আমি হাত পা ধুয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু রাতে ভালো ঘুম হলো না। খুব ভোরে উঠে চলে গেলাম বজরার ছাদে। সেখানে বসে বসে নামাজ পড়লাম এবং কুয়াশা ভেদ করে সূর্যোদয় দেখলাম। বজরার ভেতরে ঘুম ভেঙেছে বলে মনে হলো না। কিছুক্ষণ পরে বজরার ভেতরে আমার ডাক পড়লো গিয়ে দেখি মুখার্জী সাহেব ঘুম থেকে জেগেছেন। নামাজ অজিফার কোনো বালাই নেই, দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে সোজা সকালের নাশতা নিয়ে বসেছেন।

না, কোনোটাই আমার হিসেবের সাথে মিললোনা। বজরার ভেতরের সাজ সজ্জা, খাবার দাবার আচার আচরণ, সবকিছুর মধ্যে একটা ভোগের ব্যাপারই মুখ্য। এর সাথে সেই সত্য দর্শনের মিল কোথায়। তবে এটা ঠিক যে সেই কাহিনী ফাঁদতে না পারলে মুখার্জী সাহেবের ভোগের পেয়ালা এমন উপচে পড়তো না। আমার চোখের সম্মুখ থেকে সেই ভোরের কুয়াশার মতো একটা পর্দা যেন উঠে যেতে লাগলো। আর তার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলো লাল টকটকে একটি প্রশ্নঃ তা হলে কি ধর্ম নিয়েও ব্যবসা করা যায়? সেই শুরু, তারপর এই ব্যবসার কতো বিচিত্র রূপ যে দেখেছি, তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক।

আপাততঃ মুখার্জী সাহেবের সাথে মামলেট, পরোটা ও মগভর্তি চা দিয়ে নাশতা করলাম এবং তাবিজের একটি পোটলা নিয়ে বিদায় হলাম। কিন্তু চাচাজীর অফিসের

খুব কাছে এসে পড়েছি যে. তাই বাসায় গিয়ে দেখা করলাম। জিজ্ঞাসা করায় তাবিজের কথা বললাম। শুনে তিনি হাসলেন। রাস্তা ফিরতে ফিরতে বিকাল হয়ে গেলো। মনে মনে লোক জনের যে ভীড়ের কথা ভেবে শংকিত হয়েছিলাম. ফিরে দেখলাম না. তেমন কিছুই না। দু'তিন জন লোক বসে আছে মাত্র। রাত্রে আরও দু'তিন জন এলো: ব্যস, খেল খতম। বাকি তাবিজগুলি পোটলার মধ্যেই পড়ে রইলো। পরে একদিন কৌতুহলী হয়ে একটা তাবিজ খুলে দেখলাম. ওর মধ্যে এলোমেলো কয়েকটা আরবি সংখ্যার আঁচড় আর কিছু নেই। না থাকারই কথা, কারণ তাবিজের গুণতো শেখার মধ্যে থাকে না, থাকে বিশ্বাসের মধ্যে। আর সেই বিশ্বাসের বেসাতি নিয়েই ঘুরে বেড়ায় বিশ্বাসের সওদাগররা।

তবে আবদুল্লাহ্ মুখার্জীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সে আমাকে একটি নতুন জগতের সন্ধান দিয়ে গিয়েছিলো। এর ফলে আমার সন্ধানী দৃষ্টিতে অনেক ভণ্ডামিই ধরা পড়েছে। কিন্তু আমার উস্তাদ আমীর উদ্দিন মিস্কীর মধ্যেও কি ভণ্ডামি ছিলো? তাঁর সম্পর্কে এমন সব কথা শুনেছি, যা তাঁর অমায়িক ব্যবহার, কথার যাদু আর যুক্তির সারল্যের সাথে ঠিক মিলতো না। তবু সব মিলিয়ে তাঁর স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই স্মৃতিরই একটা অংশ হলো 'বহছ' বা ধর্মীয় বিতর্ক।

মৌলানা আমীর উদ্দিন মিস্কী তামাক খেতেন। ভাটির ময়মনসিংহ গ্রামের এক মৌলানা ফতোয়া জারী করলেন যে, তামাক খাওয়া হারাম। তাই নিয়ে তুমুল বাক্ বিতণ্ডা। মিস্কী সাহেব তামাক খাওয়ার পক্ষে। তিনি বড়ো জোর এটাকে মাকরুহ্ তানজিহী বা রুচি বিগর্হিত বলে মনে করেন; কিন্তু হারাম কিছুতেই নয়। এই ব্যাপার নিয়েই ফতেহপুরের দেওয়ান বাড়িতে এক বিরাট তর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছে। আমরা দল বেঁধে মিস্কী সাহাবের পিছনে ছুটেছি। একটা নতুন কিছু দেখার নেশায় পথের কষ্ট তুচ্ছ করে এগিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন মিস্কী সাহেব, বললেন, 'কিতাব হাদীস তো কিছুই সাথে আনিনি, ফারসি হুকো একটা সাথে নিয়ে এলে হতো'—বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন।

পথে তাঁর নানান কথায় হাসলেও সভাস্থলে পৌছে মানুষের ভীড় দেখে কিন্তু আমাদের মুখ শুকিয়ে গেলো। যদি আমরা হেরে যাই, এই শংকায় বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। বহছ শুরু হলো এক সময়। সভাপতিত্ব করছেন দেওয়ান বাড়িরই কেউ। কিন্তু যুক্তি, পাল্টা যুক্তির দড়ি টানাটানির সার হলো; কোনো মীমাংসাই হলো না। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম যে, মিস্কী সাহেবের সমর্থকের সংখ্যাই বেশি যুক্তির কথা মনে নেই, কিন্তু তাঁর সমর্থনে হৈ হৈ করে উঠার কথা খুব মনে আছে। কারণ তামাক খাওয়ার দলেই তো লোক বেশি।

কিন্তু আসলে ব্যাপরটা কী? মিস্কী সাহেব তামাক খাওয়ার পক্ষে কী যুক্তি দিতেন? নানাভাবে তাঁর কথা যেটুক বুঝেছিলাম, তা হলো এই যে. হজরত মুহম্মদ (সঃ) এর আমলে তামাকের প্রচলন ছিলো না; একারণেই এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই।

সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া কোনো বস্তু বা বিষয়কে হারাম বলা যায় না। তবে ব্যাপারটা যে রুচি বিগর্হিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। দুর্গন্ধ ছাড়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর উপাদান আছে এতে। কিন্তু আমাদের সব খাবার, এমন কি ওষুধের মধ্যেও তো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। তাছাড়া মাত্রার অভাবে ভালো বস্তুও খারাপ হয়ে যায়। নেশা হলেই যে হারাম, এমন কোনো কথা নেই। মাতাল না হলে মদও হারাম হতো না। কাজেই তামাক নয়, ভাত খেয়েও যদি কেউ মাতাল হয়ে যায়, তা হলে তার জন্য ভাত খাওয়াও হারাম। কিন্তু তামাক তো তেমন কিছু নয়; বরং অনেক সময় বেশ উপকারী একটা উত্তেজক হিসেবে কাজ করে। আবার তামাকের ক্ষতিকর দিকটি শুধু তার ধোঁয়ার মধ্যে নয়, শুকনো পাতার মধ্যেও আছে। সুতরাং হারাম হলে সবই হারাম হওয়া উচিত। ধোঁয়া হারাম পাতা হালাল; এ ধরনের ফতোয়া অচল। এছাড়া কোনো ব্যাপার যদি ব্যাপক হারে সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে যায়, তা হলে সে সম্পর্কে বুঝে শুনে নিষেধাজ্ঞা জারী করা উচিত।

এ ধরনের কিছু যুক্তিই তিনি উত্থাপন করতেন। কিন্তু তাঁর সেই উত্থাপনের মধ্যে উপমা উদাহরণ ও হাস্য রসের প্রচুর উপকরণ থাকতো। এ কারণেই মিল্কী সাহেবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী আলেমরাও তাঁর যুক্তির ধারকে ভয় না করে পারতেন না। আমি নিজেও তাঁকে ভয় করতাম। অবশ্য সে তাঁর যুক্তির জন্য নয়; বরং তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষর, তাঁর পাঠ্য বিষয় বুঝানোর অপরূপ দক্ষতা আর তাঁর রসাল কথার জন্য। মনে হতো, এই লোকের দোয়া না পেলে আমার মেধায় কিছুই হবে না। তিনি আমার জন্য দোয়া করেছিলেন কিনা জানি না, তবে আমি তাঁর অযাচিত স্নেহ পেয়েছিলাম। এর ফলে তাঁর কাছে বাস্তা মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষক এমন কি মাখনার উস্তাদও হেরে গেছেন।

কারণ আমাকে তিনি মাদ্রাসার একজন সেবক হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করেছিলেন। এর ফলে আমি যেমন ছাত্র হয়ে শিক্ষকতা করেছি, তেমনি মাদ্রাসার আয় বৃদ্ধির দায়িত্বও নিয়েছি। এসবের মধ্যে একটা গৌরব আছে, আর দায়িত্ব জ্ঞান জন্মানোর জন্য এই গৌরবের একটা বাস্তব মূল্যও আছে। কিন্তু আমার নিজের আয়, আমার নিজের খয় খরচা কীভাবে চলতো? সে সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার। আমি আগেই বলেছি, বাস্তায় আমার খাওয়া থাকার কোনো চিন্তা ছিলো না। লজিং ছাড়াও এখানে সেখানে আমি সে সুযোগ পেয়েছি। এমনিভাবে আমার কাপড় চোপড় ও বইপত্রও সংগৃহীত হয়েছে। আমার কারও কাছে কিছু চাইতে হয়নি। বেশ কিছু লোক ছিলেন, যারা আমার হাতে দশ পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছেন, 'এটা কিনে নাও, ওটা করে নাও।' বিশেষ করে ঈদে পরবে তাঁদের এই দেয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরে আমার অনেক আত্মীয়ও আমি গেলে কিছু টাকা দিয়েছেন। আমি জানতাম এগুলি কী! অনাথ দুঃস্থরাই এমনি দান পেয়ে থাকে। এর ফলে আমার কোনো কিছুর অভাব হয়নি। কারণ পড়ার দিকেই আমার মন ছিলো, পোশাক আশাক নিয়ে ভাববার সময়ও ছিলো

না, সামর্থও ছিলো না। সুতরাং এভাবে যা সংগৃহীত হয়েছে, তাতে আমার খরচ হয়ে উদ্ধৃত্তও থেকেছে।

কিন্তু মাদ্রাসার অবস্থা তেমন ছিলো না। এখানেও সেই দানই নানাভাবে এসেছে, কিন্তু অভাব পূরণ হয়নি। এমনি অভাব পূরণের এক দায়িত্ব একবার আমার কাঁধে এসে পড়লো মোহনগঞ্জ থানার গাগলাজোড় গ্রাম। সেখানকার এক বিরাট জোতদার, নামটা মনে করতে পারছি না; তবে বাড়িতে হাতী আছে। তাঁর কাছে মাদ্রাসার চিঠি নিয়ে যেতে হবে আমাকে এবং তিনি যা দেবেন, তা বহন করে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমি একা যাই কী করে। কাউরাটের কাছে কোণাপাড়ার আবদুল জলিল নামে একটি ছেলে সেই বছরই বাস্তায় দহমে ভর্তি হয়েছিলো। ইতিমধ্যে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, সে-ই আমার সাথী হতে রাজি হলো।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা পায়ে হেঁটে নেত্রকোণা গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে রেলগাড়িতে চড়ে মোহনগঞ্জ। এর পূর্বে আমি রেলগাড়িতে চড়েছি কিনা, মনে পড়ে না। সুতরাং প্রথমে রেলগাড়িতে চড়ার কোনো শিহরণ আমার স্মৃতিতে নেই। কারণ সেই শিশুকালেই নেত্রকোণায় থাকার কল্যাণে রেলগাড়ির সাথে আমার পরিচয় ছিলো। তবে সেদিন এই রেলগাড়ির কামরায় আমার জন্য অন্য একটি শিহরণ অপেক্ষা করছিলো।

মৌলবী আকরাম হোসেন তাঁর নাম। কেন্দুয়া থানারই কোনো এক গাঁয়ে, সম্ভবতঃ শাখরায় তাঁর বাড়ি। তিনি থাকেন সেলবরষের বিখ্যাত জমিদার বাড়িতে। শ্যামলা বর্ণের দোহারা চেহারার লোক, কিন্তু পোশাকে আশাকে খুব সৌখিন। তিনি ছিলেন সেই কামরাতে। আমি তাঁকে তখন চিনতাম না। তিনিই জিজ্ঞাসা করে আমার পরিচয় জেনে নিলেন। তারপর এমনভাবে আমাদের পরিবারিক কথা জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন যে, সবশুনে মনে হলো, তিনি আমাদের অনেক কথাই জানেন। আমি বাস্তা মাদ্রাসায় পড়ছি শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। তারপর বাবার কথা উল্লেখ করে এমন সব বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যে, আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। বস্তুতঃ বাবার এই প্রসঙ্গ বারবার আমাকে কাঁদিয়েছে আর আমার অশ্রুজল চৈতন্য প্রদীপের তেল হয়ে তার উদ্দীপনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে, পুত্রের জন্য পিতার দেয়া উত্তরাধিকার এর চাইতে বড়ো কিছু নেই। ধন সম্পদের সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না।

যাহোক, মোহনগঞ্জ নেমে আকরাম হোসেন সাহেব এক চায়ের দোকানে আমাদেরকে কফি খাওয়ালেন। তিনি ময়মনসিংহ থেকে এই কফি কিনে নিয়ে এসেছেন। কফি খেতে খেতে তিনি বললেন, 'তুমি যদি আগামী রমজানের সময় সেলবরষে এসে থাকো, তা হলে তোমার লেখাপড়ায় যেমন সাহায্য করতে পারবো, তেমনি তোমার বাবার লেখা কিছু ফারসি বয়েতও তোমাকে দিতে পারবো।' একথা শুনে আমি খুব খুশির সাথেই তাঁকে কথা দিলাম।

এরপর তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম গাগলাজোড়ের দিকে। মোহনগঞ্জ থেকে একটি উঁচু রাস্তা ধরে আমরা চলতে লাগলাম। বেলা তখন

দুপুর গড়িয়ে গেছে। খুব ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু কোথায় খাবার পাওয়া যাবে। রাহা খরচ যা এনেছি, তাতে কিনে খাওয়া চলে না। কারও কাছে চেয়ে খেতে গেলেও বেলা আরও গড়িয়ে যাবে। তাই রাস্তার পাশের একটি ধনী বাড়িতে পানি খাওয়ার আবদার জানালাম। বাড়ির সামনের আম গাছের ছায়ায় বসলাম আমরা। আমাদের শুকনো মুখ দেখে পানির সাথে কয়েক মুঠ মুড়িও নিয়ে এলেন। আমরা তাই চিবিয়ে চক্ চক্ করে পানি খেলাম।

এরপর বড়ো রাস্তা ছেড়ে কোণোকোণি রাস্তা ধরতে হলো। আছরের নামাজের সময় তেঁতুলিয়া গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে এক বাড়িতে নামাজ পড়লাম, পানি খেলাম এবং পথের দিশা জেনে নিলাম। না, খুব বেশি দূরে নয়, সামনের বন্দটুকু পেরুলেই একটি গ্রাম, নয়া পাড়া; তার পরেই গাগলাজোড়। কিন্তু আমাদের গতি তখন মন্থর হয়ে এসেছে। পায়ের নিচে যদিও দুর্বার গালিচা বিছানো, তবু পা টেনে আর তুলতে পারছি না। হঠাৎ দেখা গেলো একটি হাতী এগিয়ে আসছে। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে হাতীর চলে যাওয়া দেখলাম। কিন্তু আমাদের পিছনে যে লোকটি একটু আগে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বললো, 'আপনারা কোথায় যাবেন?' আমরা পরিচয় দিতেই বললো, 'ঐ লোকতো ঐ হাতীতে চড়ে চলে যাচ্ছে।'

কী মুশকিল। দে দৌড়, দৌড়াচ্ছি আর চিৎকার করছি। যা হোক হাতীকে থামানো গেছে। আমরা হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের পরিচয় দিয়ে সেই চিঠিটি এগিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক পত্রদিয়ে পরে সবকিছু জানাবেন বলে বিদায় নিলেন। আর আমরা হতভম্বের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে আবার হাতীর চলে যাওয়া দেখতে লাগলাম। না, কিছু করার নেই। তীরে এসে তরী ডুবে গেলে যেমন হয়, আমাদের মনের অবস্থা তখন তেমনি। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ। বেলা তখন পাটে বসে গেছে। একটা ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লেগে এমন একটা আবেশের সৃষ্টি করেছে যে, মনে হচ্ছে, এই দুর্বার গালিচার উপরেই শুয়ে পড়ি।

কিন্তু পেটের অবস্থা এমন যে, এই মখমলের বিছানাতে শুয়ে পড়লেও ঘুম আসবে না। পেটে কিছু দেবার জন্যই একটি লোকালয় দরকার। সামনেই নয়াপাড়া গ্রাম। বিলের পাড়ে সর্ব সাকুল্যে দশপনেরটি বাড়ি। কিন্তু বিলটি পানিতে সয়লাব হয়ে গেছে। উঠতি ফসল বোরো ধান অনেকাংশে তলিয়ে গেছে। সেই সন্ধ্যায় সময়ও দেখলাম, অনেকেই ভিজা ধানের আটি নৌকায় তুলছে। গাঁয়ে এসে ঢুকতেই পচা ধানের গন্ধ নাকে এসে লাগলো। এবাড়ি সে বাড়ি ঢুঁ মারলাম একটু থাকার জাগার জন্য। কিন্তু সর্বত্রই নিরাশ হতে হলো। শেষটায়, হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ের পুব মাথায় মাঠের উপর গিয়ে পৌঁছলাম। না, আর পা চলে না। সেখানেই দুব্বা ঘাসের উপর বসে পড়লাম। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাসে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। আকাশে তখন দ্বাদশীর চাঁদ জোছনা ছড়াতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ সেই জোছনার মাঝে বৈঠা কাঁধে একজন লোক এসে উপস্থিত হলো। থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'আপনারা কে?'

পরিচয় দিলাম এবং নিরাশ হবার কাহিনী শোনালাম তাঁকে। তিনি সবশুনে বললেন, 'কিন্তু এখানে আপনারা রাত কাটাবেন কী করে? স্বজাতি হলে না হয়, আমার বাড়িতেই নিয়ে যেতাম।'

আমরা তাঁর সহানুভূতি দেখে কিছুটা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু 'স্বজাতি' শব্দশুনে নিরাশ হতে হলো। তাই বললাম, 'এছাড়া আর উপায় কী!'

'না, না, তা হয় না'—তিনি বললেন, 'আসুন আমার সাথে।'

ভদ্রলোক একমতো জোর করেই আমাদেরকে সাথে নিয়ে গেলেন। তারপর যে ধনী লোকের বাড়ি থেকে একটু আগেই আমরা নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি, সেখানে গিয়ে ডাক দিলেন, 'গফুর ভাই বাড়ি আছো?'

'কে ডাকে'–বলতে বলতে উস্কু খুস্কু চুল উদাম গা নিয়ে একজন লোক এগিয়ে এলেন, বললেন, 'ও, দিনেশ, কী ব্যাপার?'

'এই দুইজন বিদেশী লোক কি মাঠের মধ্যে রাত কাটাবে নাকি?'

'কী করবো বলো, তুমি আমার ঘরের অবস্থাটা দেখে যাও।'

'ও দেখার দরকার নেই। সবার ঘরের একই অবস্থা। আমি চললাম'—বলে সেই ভদ্রলোক গাছ গাছালীর আড়ালে মিলিয়ে গেলেন। আর আমরা বাড়ির মালিকের পিছু পিছু তাঁর বৈঠক খানায় প্রবেশ করলাম। সত্যি সেখানে তিল ধারণের স্থান নেই। ভিজা ধানে সারাটা ঘর ভর্তি। কেমন একটা সোঁদা গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠার যোগাড়। যাহোক, এর মধ্যেই একটা চৌকিতে লম্বমান হলাম আমরা দুজন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ভাত এলো, সাথে লাঠি মাছের পোনা ভাজা। কিন্তু মুখে দিয়েই বুঝলাম, ওর মধ্যে কুচি শামুকের পোনাও জড়িয়ে আছে। চিবুতেই কচ্ করে উঠে। তবু এই-ই তখন আমাদের কাছে অমৃত। গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম।

ভোর বেলা উঠে বাড়ির একজন বয়স্কা মেয়ে লোকের কাছে বিদায় নিয়ে নেমে এলাম পথে। এভাবে এই একরাত্রির প্রবাস তার বিশিষ্টতা নিয়ে এখনও স্মৃতির মধ্যে জেগে আছে। জেগে আছে দুটি নাম, দিনেশ ও গফুর।

কিন্তু এমনি করে যতোই আমি মাদ্রাসার সেবায় জড়িয়ে গেলাম, ততোই ছাত্রদের একটি দল আমার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন হয়ে উঠলো। তারা আমাকে নাজেহাল করার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি জানি না, শিক্ষকদের মধ্যেও কোনো প্রকার রেষারেষির ভাব ছিলো কিনা। এতে করে একজনের প্রিয় হলে অন্যজনের অপ্রিয় হতে হয় কি-না, তাও আমার জানা ছিলো না। আমি আমার লেখাপড়া নিয়েই মগ্ন থাকতাম এবং যথা সম্ভব শিক্ষকদের নির্দেশ পালন করতাম। এর বাইরে কারোর নিন্দা শোনা বা নিন্দা করার অভ্যাস আমার ছিলো না।

আমার 'হাশতম' শ্রেণীতে উঠার পথে বাধা সৃষ্টির কথা ইতিপূর্বে বলেছি। সেখানে ছাত্ররা হৈচৈ করলেও মারমুখী হয়নি। এবার গাগলাজোড়ের অভিযান থেকে ফিরে এলে বাস্তারই একটি ছাত্র খামাখা আমার সাথে ঝগড়া বাধিয়ে আমাকে মারতে এসে আমার হাতে প্রচণ্ড মার খেলো। তারপর এমন সব কথা বলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলো যে, আমি তা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মুরুব্বী গোছের দু'চার জন লোকের কথাও আমার কাছে ভালো ঠেকলো না। সবশুনে যে বাস্তাকে ফুলের মতো সুন্দর মনে হতো, দেখলাম তার নিচে অনেক কাঁটাও আছে। তার আঘাতে আমার মনের অনাবিল আবেগটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো।

কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই শেষ হলো না। এরপর একজন শিক্ষকের নিকট থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাতে আমার আত্মবিশ্বাস আর অহমিকা বোধ ধূলিসাৎ হবার যোগাড় হলো। বাস্তা মাদ্রাসার গোটা পরিবেশটাই আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠলো।

মৌলানা আমীর উদ্দিন মিল্কীর প্রতি আমার ভক্তি ও ভয়ের কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি তাঁর যোগ্যতা দিয়েই আমাকে বশীভূত করেছিলেন। আমার সর্দার পড়ুয়া হওয়া বা চাঁদা সংগ্রহের দায়িত্ব নেয়া, সবই তাঁর স্নেহের দান। সুতরাং তিনি কোথাও যেতে বললে আমার পক্ষে না করার উপায় ছিলো না। তাঁরই কথায় আমরা চার পাঁচ জন একদিন দূরের একটি গাঁয়ে তাঁর সাথে দাওয়াত খেতে গেলাম। সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত মীলাদ ও ওয়াজ নসিহত হলো। তাঁর রসাল কথা শুনে শুনে বেশ আনন্দেই আমাদের সময় কাটলো ফিরে এসে পরদিন যথারীতি মাদ্রাসায় গেলাম। দুপুরের দিকে হঠাৎ ডাক পড়েলো আমার। আমাকে ডাকছেন যে শিক্ষক, তাঁর সাথে আমার খুব একটা পরিচয় হয়নি। মাস তিনেক হলো তিনি এসেছেন। তবে শুনেছি তিনি খুব রাগী মানুষ।

যাহোক, আমি নির্দ্বিধায় তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি কেন মিল্কী সাহেবের মতো একটা লম্পটের সাথে দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম। আমি তাঁর একথার মৃদু প্রতিবাদ করা মাত্র তিনি তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে আমাকে বেদম পিটাতে আরম্ভ করলেন। মাথায় পিঠে হাতে সর্বত্র তাঁর লাঠির আঘাত আমার দেহে যেমন জ্বালা ধরিয়ে দিলো, তেমনি আমার ভিতরের পশুটাকেও উত্তেজিত করে তুললো। কিন্তু কীভাবে জানি সেদিন আমি এই পশুর আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখালাম। না হলে আমিতো জানি, সেই শৈশবে নেত্রকোণায় বাবার হাতে একদিন মার খেয়েছিলাম মাত্র। এরপর আমার মুরুব্বীরা কেউ আমার গাঁয়ে কখনও হাত তুলেননি। সমবয়সী যারা আমাকে মারতে এসেছে, তারা আমার হাতেই মার খেয়েছে বেশি। কিন্তু আজ নীরবেই আমি সবকিছু সহ্য করে গেলাম।

কিন্তু কেন? কী এমন অপরাধ করেছি আমি? মিল্কী সাহেবের চরিত্র বিচার করার দায়িত্ব আমার নয়। তাঁর সাথে দাওয়াত খাওয়াটা যে অপরাধের কাজ, সে জ্ঞান ও আমার ছিলো না। আর এই শিক্ষককে সেই অপরাধের বিচার করার দায়িত্বই বা কে

দিয়েছিলো। আর অপরাধতো শুধু একা আমিই করিনি: আমরা চার পাঁচজন ছাত্র এক সাথে গিয়েছিলাম। তা হলে অন্যরা এই শাস্তির যোগ্য হলো না কেন! কিন্তু দেখলাম, আমার এই মার খাওয়া নিয়ে না শিক্ষক না ছাত্র, কেউই কোনো কথা বললেন না। বরং আমি বেয়াদবি করে মার খেয়েছি, এমনি একটা মনোভাবই সকলে প্রদর্শন করলেন।

কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকা হয়েই রইলো। কারণ অন্ততঃ এমনি শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ আমি করিনি। তদুপরি মিস্কী সাহেব যতো খারাপই হোন, তিনি একজন শিক্ষক; তাঁর সাথে গেলে আমি নষ্ট হয়ে যাবো, এতেও কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অক্ষম ঈর্ষার জ্বালা ছাড়া আর কিছু আছে বলে আমার মনে হলো না।

অথচ মজার ব্যাপার এই যে, সেই কল্যাণকামী শিক্ষকের নামটি পর্যন্ত আমি ভুলে গেছি। তবে আমি তাঁর প্রতি এই কারণে কৃতজ্ঞ যে, তিনি তাঁর আচরণ দিয়ে মনুষ্য চরিত্রের একটি গোপন কক্ষের দ্বার আমার সম্মুখে উন্মোচন করে গেছেন। এর সাথে শিক্ষকদের প্রতি যে অনাবিল আবেগ আমি পোষণ করতাম, তাতে কোথায় যেন একটি অতৃপ্তির ছোঁয়া এসে লাগলো। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর এই কল্যাণ কামনা হেরে গেলো। কারণ তাঁর হাতে লাঠি পেটা হয়েও আমি মিস্কী সাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারিনি। আমি মিস্কী সাহেবের মধ্যে সেই শিক্ষকের কথিত চরিত্রহীনতার কোনো নিদর্শন খুঁজে পাইনি।

যাহোক, বাস্তা মাদ্রাসায় আমার জীবন সাধনার সারল্য কেমন যেন জটিল হয়ে উঠলো। এর ফলে সর্বত্র অবারিত দ্বার বলে যে একটা উদার সাহস ছিলো, সেখানে সংকোচের ভীরুতা এসে প্রবেশ করলো। তাই বাড়ি ঘরের চাইতে মাঠ ময়দানই হয়ে উঠলো আমার বিচরণ ও অবস্থান ক্ষেত্র। কখনও নদীর পাড়ে, কখনও বিলের ধারে, কখনও কান্দার নির্জন গাছের ছায়ায় আমার সময় কাটতে লাগলো। এ সময়ের একটি করুণ দৃশ্য আমার চেতনাকে বেশ আলোড়িত করেছিলো।

বাস্তা ও ত্রিয়শ্রী গ্রামের মাঝখানে একটি মাঠ। সেই মাঠের দক্ষিণ সীমায় নদী। মাঠ থেকে একটি ছোট খাল নদীতে গিয়ে পড়েছে। তার পাড়ে অনেকগুলি মাঁদার গাছের একটি জটলা। একদিন দেখি, সেই মাঁদার গাছের জটলার কাছে একটি লোক বসে আছে। আমিও বেশ কিছুটা দূরে নদীর পাড়ের একটি গাছতলায় বসে আছি। অনেকক্ষণ পরে আবার ফিরে তাকালাম, না লোকটিতো চলে যায়নি। জিরানোর জন্য হলে এভাবে এতোক্ষণ ধরে বসে থাকবে কেন? আমার পাঠাভ্যাসে বিঘ্ন ঘটলো। আমি তাঁর খোঁজ নেবার জন্য এগিয়ে গেলাম। এমন সময় নদী থেকে একটি লোক উঠে এলো। সে আমাকে সামনে পেয়ে বললো, 'তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

আমি বললাম, ওই যে একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে ওখানে বসে আছে, সে কী করছে, তাই একটু দেখে আসি।'

'না. তোমার দেখে দরকার নেই। ফিরে এসো। ওর কাছাকাছি গেলেও তুমি গাঁয়ে ফিরতে পারবে না।'

'কেন?—আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

'কারণ ওর কলেরা হয়েছে। কাল বিকাল থেকেই ও ওখানে আছে।'

'তাই বলে সে এমন বেঘোরে মারা যাবে?'

'কী করবে, কেউ জায়গা দেবে না; সবাই ভয় করে।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সেই লোকের পিছু পিছু গাঁয়ে চলে এলাম। কিন্তু আমার সমস্ত মন জুড়ে একটি হাহাকার কেবলি এদিক থেকে ওদিকে আছড়ে পড়তে লাগলো। হায় মানুষ! তোমার দয়ার কোনো সীমা নেই, তেমনি তোমার নিষ্ঠুরতারও বুঝি কোনো তুলনা হয় না!

পরে শুনেছি, ভাটি এলাকার এ খুব পরিচিত দৃশ্য। কুসংস্কার আর ভয় এমনভাবে মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, সেখানে করুণা ও নিষ্ঠুরতা উভয়ই ছক বাঁধা পথে আনা গোনা করে। এর বাইরে হলে কাউকেই তা স্পর্শ করতে পারে না। কারণ এমতাবস্থায় কোনো উপকার করার সাধ্য কারোর থাকে না। যে সব ওষুধ পথ্য ও স্বাস্থ্যজ্ঞান এইগণ্ডিকে ভাঙতে পারতো, তারই বড়ো অভাব!

এর ফল হলো এই যে, ঐ মানুষটির এই করুণ মৃত্যু আমার হীনমন্যতা বোধকে নতুন ভাবে সতেজ করে তুললো। নিশ্চয়ই এই লোকটির আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, থাকলে তারা খোঁজ নিতো আর এভাবে ফেলে রাখতো না। এমনি আমারও তো কোনো আত্মীয় নেই, যদি আমারও এমনি কোনো অবস্থা হয়! ভালো থাকলে সবাই ভালো; খারাপ হলে কেউ ফিরেও তাকায় না, এই-ই সংসারের রীতি।

এই সময়েই আজিজুল হক চৌধুরীর এক ভাই বুলবুলের নেতৃত্বে বাস্তায় একটা নাটক হয়েছিলো। সেই নাটকের কী নাম, কী বিষয়, তার কিছুই আমার মনে নেই। শুধু ফিরোজ ভূঞাদের উঠানে যে এর জন্য একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছিলো এবং আমি রাতের আঁধারে ইস্কান্দর খাঁ'দের বাড়ির পাশের গাছ-গাছালির আড়ালে দাঁড়িয়ে তার কিছুটা অংশ দেখেছিলাম, সেই ব্যাপারটি মনে পড়ছে। কারণ আমি মাদ্রাসার ছাত্র, এই সব নাটক ফাটকে আমার যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। এমনিতেই আমার দুঃসাহস মার খেয়েছে। এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে আমার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

তবে একটা কথা ভেবে অবাক হই যে, আমার তৎকালীন এই মনোবেদনার কথা কাউকেই আমি জানাতে পারিনি। এর কারণ আমার জানাবার কোনো স্থান নেই। এই বাস্তায় আমার হিতাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা বেশি; কিন্তু আমার কোনো বন্ধু নেই। আমি সত্যি নিঃসঙ্গ, একা। সেই নিঃসঙ্গতার ভাব এখনও বুঝি আমার কাটেনি।

এ কারণেই হয়তো মদনের চাচাজীর সাথে আমার যোগাযোগ অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কারণ টাকার প্রয়োজন আমার নেই; আমার প্রয়োজন এমন একজন লোকের, যার কাছে আমার আনন্দ বেদনার সব কিছু খুলে বলতে পারি। কিন্তু পরিবার

পরিজনের আবেষ্টনী আমার অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে, তা না হলে তারা হয়তো আমার এই কৈশোরের নিঃসঙ্গ বোধের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারতো। আমার বেদনা আমাকে এমন ভাবে একাকী বহন করতে হতো না!

থাক সে কথা। এখন আমার লেখাপড়ার কথা বলি। সেই যে মিস্ত্রী সাহেব বলেছিলেন, নহমের বইপুস্তক আর তোর পড়তে হবে না; আমিও আর পড়িনি। বরং এর বদলে যে হাশতমে আমি উঠতে পারিনি, তারই পাঠ্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। অবশ্যি সর্দার পড়ুয়া গিরির সুযোগে আমি আমার সহপাঠীদেরকে পাঠ্য বইয়ের সবক বুঝে নিতে সাহায্য করেছি, তাতেই আমার পড়াও হয়ে গেছে। এর ফলে বছরের শেষে আমি বার্ষিক পরীক্ষা দিলাম। এ শ্রেণীর অধিকাংশ পরীক্ষাই মৌখিক। কিন্তু মৌখিক হোক আর লিখিত হোক, আমি যে সবার সেরা হবো, সেতো আগেই জানা ছিলো। কাজেই কোথাও কোনো ব্যতিক্রম হলো না। আমার পথে বাধাদানকারী সেই ছাত্রদেরও আর কিছু বলার রইলো না।

এভাবে বাস্তায় আমার নয় দশ মাসের অভিযাত্রী জীবন কেটে গেলো। আমি নহম শ্রেণীর পাঠ চুকিয়ে হাসতম শ্রেণীতে উন্নীত হলাম।

সপ্তম তরঙ্গ ॥

আমাদের জাতীয় জীবনে এক উত্তেজনাময় কাল ১৯৪৬ সাল। এই সালে এসে আমার জীবন প্রবেশ করেছে। এ সময়ে রাজনীতি বলি, হৈ চৈ বলি ; সেই তুমুল আলোড়ন আন্দোলনের মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়েছি। আমরা, মাদ্রাসার ছাত্ররা রাস্তার আশেপাশে হাট বাজারে গ্রাম-গঞ্জে চোঙ্গা ফুঁকে পাকিস্তানের কথা বলে বেড়াচ্ছি। মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, কবুল মোদের জান পরাণ, —ইত্যাদি শ্লোগান আমাদের কণ্ঠ থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এখানেও আমার কণ্ঠই সবচেয়ে সোচ্চার ; উত্তেজনাও আমারই মনে হয় বেশি।

কিন্তু এই যে উত্তেজনা, এর পটভূমি তখনো আমার আয়ত্তে আসেনি। বক্তৃতা শুনেছি প্রচুর, কিন্তু তার সব কথা তখনো বুঝতে পারিনি। শুধু বুঝেছি পাকিস্তান না হলে আমাদের এই মুসলমানদের আর উপায় নেই। এতোদিন যেমন ইংরেজের গোলামি করেছি, তেমনি চিরকাল হিন্দুদের গোলামি করতে হবে। ব্যস, এই-ইতো যথেষ্ট ; এতেইতো একজন মুসলমান কিশোরকে মাতিয়ে দেয়া যায়। আমিও সেই ভাবেই মেতে উঠেছি। কারণ আমি তখন পুরোদস্তুর মুসলমান!

অবশ্যি ব্যাপারটা যতো সহজে আমি বলে ফেললাম, ততটো সহজ বোধ হয় ছিলো না। কারণ কিশোর মনের সারল্য তখন অনেকটাই জটিল হয়ে উঠেছে। হিন্দুরা কিভাবে অত্যাচার করেছে, তা চাক্ষুষ দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। এর ফলে ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তারা আরো কী সব অত্যাচার করবে, তার কল্পনা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আত্মীয় স্বজন থেকে আরম্ভ করে এই বাস্তা পর্যন্ত আমার মুসলমানরা আমার প্রতি যে ব্যবহার করেছে, সে তুলনায় হিন্দুরা আর বেশি কী করবে! বরং আমার অভিজ্ঞতা উল্টো কথাই জেনেছে। সেই শৈশব থেকে হিন্দুদের যে পরিচয় পেয়েছি, এমন কি নয়াপাড়ার সেই দিনেশ যেভাবে আমার কাছে ধরা দিয়েছে, তা নয়াপাড়ার গফুরের চাইতে অনেকখানি উদার ও বলিষ্ঠ। কাজেই আমার তখনকার মনোভাব খুব নির্ভেজাল ছিলো না। কিন্তু সারা দেশ যেখানে মেতে উঠেছে, সেখানে আমার দ্বিধায় কি আসে যায়! বরং সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দুমড়ে মুচড়ে একটা প্রবল উত্তেজনাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

কিন্তু খুব বেশি দিন নয় ; অল্পদিনেই সেই হৈ চৈ যেন থেমে গেলো। কিভাবে আবার শূন্যতায় ভরে উঠতে লাগলো। হঠাৎ মনে হলো, আমার একটা কিছু করা দরকার। না, লেখাপড়া নয় বরং লেখাপড়ার বাইরে এমন একটা কিছু, যা আমার মনের এই শূন্যতাকে পূরণ করতে পারে।

মাদ্রাসা তখন বন্ধ। খুলতে আরো দশ পনেরো দিন দেরী আছে। এর মধ্যে আমি সেলবরষ ঘুরে আসার জন্য প্রস্তুত হলাম। সেখানে বাবার লেখা ফারসি বয়েত আছে,

যেমন বয়েত আমি পড়েছি গুলিস্তাঁ বুস্তাঁ কিতাব দুটিতে। আমার বাবা কি শেখ সাদীর মতো তেমনি ফারসি কবিতা লিখতে পারতেন! না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। যতোই ভাবছি, ততোই আকর্ষণ বাড়ছে!

সেই আকর্ষণেই একদিন পথ চলতে লাগলাম। পথের গ্রামের নাম অতোশতো মনে নেই, তবে শনির হাওরের পাশ দিয়েই বোধ হয় গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক দূর থেকেই পাখ-পাখালির শব্দ ভেসে আসছিলো। সেই বিরাট বিল পার হতেই বর্ধিষ্ণু একটা গ্রাম, দূর থেকেই চক্চকে টিনের বিরাট বাড়িগুলি চোখে পড়ে। সেই গ্রাম বাঁয়ে ফেলে এঁকে বেঁকে গিয়ে উঠলাম মোহনগঞ্জে। সেখান থেকে দুজন পথচারীর সাথে সন্ধ্যার পরে গিয়ে পৌঁছলাম সেলবরষ জমিদার বাড়িতে।

সেখানে সেই সৌখিন মৌলবী সাহেব আকরাম হোসেন চাচাজী আছেন। বৈঠক খানাতেই তাঁর সাথে দেখা হলো। তিনি আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। আশে পাশে যারা ছিলেন, তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে এমন সব কথা বললেন, যাতে আমার নাক মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে লাগলো।

যাহোক, রাত্রে সেই বৈঠকখানাতেই রইলাম। রাতের খাবার খেতে গিয়ে জানতে পারলাম, সে বাড়িতে গোলাম ইয়াজদানী নামে একজন লোক আছেন, যিনি ফারসি বয়েতের সমঝদার। তাঁর সাথে দেখা হলো। তিনি আবদার করে আমার নিকট থেকে বয়াত শুনতে চাইলেন। আমি বুস্তাঁর বেশ কিছু বয়াত সুর করে আউড়ে গেলাম এবং তাঁর স্নেহ সমাদর লাভ করলাম। চাচাজী আমার প্রশংসা করতে আরম্ভ করলেন। আর এই প্রশংসার মধ্যেও আমার বাবার প্রভাব নতুন করে অনুভব করলাম। ভোরে উঠে দেখি ইতিমধ্যে আমার লজিং ঠিক হয়ে গেছে।

জমিদার বাড়ির বাম দিকে কিছুটা পিছনে সেই লজিং বাড়ি। কিন্তু সে বাড়িতে খাবার সময় ছাড়া আমি খুব কমই গিয়েছি। প্রায় সারাক্ষণ কেটেছে জমিদার বাড়ির বৈঠকখানায়। নাম পরিচয় কারোর কোনোটাই এখন আর আমার মনে নেই। অবশ্যি পরে জানতে পেরেছি, ময়মনসিংহের কাদিয়ানীদের নেতা আহমদ তৌফিক চৌধুরী ঐ জমিদার বাড়িরই ছেলে। তবে এখনও স্মৃতির পর্দায় ঐ বাড়ির সম্মুখের একটি মসজিদ আর তার সামনে একটি বিরাট পুকুরের ছবি আটকে আছে। আমি অবসর পেলেই সেই পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসে থেকেছি।

কিন্তু যে কারণে আমার এই সেলবরষে আসা, সেই কথাটা বলারই সুযোগ পাচ্ছি না। চাচাজী প্রশংসা করে এমন একটা সংকোচ এনে দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে সে কথা বলার সাহসই পাচ্ছি না। তবু এক সময় সেই ফারসি বয়েতের কথা বললাম। শুনেই তিনি কেমন বিব্রত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'মিথ্যা নয়, তোমার বাবার লেখা একটা ছোট খাতাই আমার কাছে ছিলো। কিন্তু কোথায় যে, রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি না।' শুনে আমার মনটা আবার উদাস হয়ে গেলো। মনে হলো, এখানে আমার আর কোনো আকর্ষণ নেই। যে ধারণা করে এখানে এসেছিলাম, বাবার ফারসি বয়েত ; আর? আর আমার লেখাপাড়া। একটির অভাবে অন্যটির গুরুত্বও আমার কাছে কমে গেলো। চার

পাঁচদিন পরেই আমি আমার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। চার পাঁচ দিন অনবরত অশ্রুপাত করে সেই বৃষ্টির কান্না থামলো। আর আমি শুয়ে শুয়ে আমার হৃদয়ের মধ্যেও সেই কান্নার ধ্বনি অনুভব করলাম। কেবলি বাবা, মা, ভাই বোনের কথা মনে পড়তে লাগলো। মনে হলো, মায়ের এখানে যাওয়া দরকার, কিবরিয়াকে দেখা দরকার। বড় খালার এখানে রাহেলাই বা কী করছে! এদের কোন খবরইতো আমি রাখি না। নিজের দুঃখ নিয়ে এমনি ব্যস্ত যে, সবার কথাই ভুলে গেছি। তা হলে এমনিভাবে ভুলে যাবার জন্য বড়ো ভাইকে দোষ দিই কেন!

কিন্তু চাইলেও যাওয়ার উপায় নেই। অকাল বর্ষণে সব রাস্তা ঘাট ভেসে গেছে। সুতরাং নৌকা ছাড়া কোথাও যাওয়া যাবে না। চাচাজী আমার ছটফটানি দেখে বললেন, 'চলো আমিও বাড়িতে যাবো, পথে গোগে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারবো।' আমি তাঁর এই প্রস্তাবে আবার খুশি হয়ে উঠলাম।

কেরায়া নৌকায় চলেছি আমরা। বিল বিলান্তির উপর দিয়ে যেতে যেতে একটা ব্যাপার দেখে বিস্মিত হলাম। এসব বিলে এতো যে রং বেরংয়ের পাখি থাকে, তা আমার জানা ছিলো না। আমি শুধু পানিখাউরী, মাছরাঙ্গা, কুরা, ডাউক ইত্যাদি চিনতাম। এবার একটি পাখি খুব অদ্ভুত লাগলো। ঝুঁটি বাঁধা, লম্বা লেজ, দেখতে অনেকটা টিয়া পাখির মতো কালচে রঙের পাখিটির নাম পি পি। সে পি পি করে শব্দ করে বলেই সম্ভবত; এই নাম।

যাহোক, সারাদিনব্যাপী সেই জলযাত্রার খুব দর্শনীয় কিছু ছিলো না। সন্ধ্যাবেলা আমি গোগ বাজারে নেমে গেলাম। আর কেরায়া নৌকা চাচাজীকে নিয়ে মরা নদী বয়ে উজিয়ে চলে গেলো। তাঁর বাড়ি শাখরা গ্রামটি বোসের বাজারের পশ্চিমে কোথাও।

আমি সন্ধ্যার পরে মায়ের কাছে এসে পৌঁছলাম। কিবরিয়া ভালোই আছে আর রাহেলার বিয়ে নিয়েও একটা কথাবার্তা চলছে। সব শুনে মনে হলো, কিছুই আটকে থাকে না ; সংসার তার নিজের নিয়মে এগিয়ে যায়, কারো জন্য অপেক্ষা করে না। আমার জন্যও আমার আত্মীয়-স্বজনরা বসে নেই। যথা সম্ভব তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন।

আমি সেলবরষে সেই বৃষ্টির মধ্যেই স্থির করেছিলাম যে, যদি সম্ভব হয়, তবে কিবরিয়াকে এবার আমার সাথে বাস্তায় নিয়ে আসবো। পরদিন আমার বিপিতা তথা চাচাজীর নিকট এই প্রস্তাব রাখতেই তিনি খুব খুশি হয়ে সম্মতি দিলেন। কিবরিয়াও দেখলাম যাবার জন্য উৎসুক। সুতরাং খুব সহজেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেলো।

পানিতে সয়লাব পথ-ঘাট পেরিয়ে এলাম নয়া বাড়িতে। রাহেলার সাথে দেখা হলো। কিন্তু সে আমাকে দেখেও সংকোচ বোধ করতে লাগলো। বড়ো হয়েছে, বহুদিনের অদেখা বড় ভাইও এখন পর। কিন্তু আমি যখন বড়ো খালার কাছে আমার টাকার কথা বললাম, তখন সে কিছুটা রাগে ও লজ্জায় আমার সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেলো।

কিসের টাকা? আমার গচ্ছিত রাখা পাওনা টাকা। সেই যে বলেছিলাম, খয়খরচা বাদেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো, তারই কিছু টাকা আমি বড় খালার নিকট আমানত রেখেছিলাম। আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এবার কিবরিয়াকে নিয়ে যাচ্ছি, তার কাপড় চোপড় বই পত্র কিনে দিতে হবে। তাই টাকা কটি চেয়েছিলাম ; কিন্তু পেলাম না।

মনটাই খারাপ হয়ে গেলো। সেই খারাপ মন নিয়ে পানি ভেঙ্গে আমি সেই যে আমার নানার বাড়ির দক্ষিণের বাড়ি, সেই বাড়িতে এসে উঠলাম। কিন্তু এর পরে নৌকা ছাড়া আর যাওয়া সম্ভব নয়। সামনের গোপাট পানিতে একাকার হয়ে আছে। আর এই গোপাটের পরেও আছে সাইডুলী নদী। সুতরাং দক্ষিণের বাড়ির সামনে আম গাছের নিচে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আমার গত্যন্তর রইলো না।

বাড়ির মধ্য থেকে রূপদাস নানা বেরিয়ে এসে আমাদেরকে এভাবে দেখতে পেয়ে বললেন, 'কিরে, কখন এসেছিস? এখানে এভাবে বসে আছিস কেন?'

নানাকে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম। তিনি বললেন, 'এভাবে চুপ করে বসে থাকলে পার হবি কী করে? কাউকে তো বলতে হবে!'

'কেন, এই আমাকে! জোর করে আমাকে ধর। না করলে গালাগালি কর। যেভাবেই হোক আদায় করে নে।'

আমি অভিভূতের মতো তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, কিছুই বলতে পারলাম না। আমার দু-চোখ দিয়ে তখন পানি গড়িয়ে পড়ছে।

নানা বাড়ির ভিতরে গিয়ে লগি বৈঠা নিয়ে এসে ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠে ডাকলেন, 'আয়!' আমি কিবরিয়াকে নিয়ে সেই নৌকায় উঠে বসলাম। নৌকা চলছে আর নানা বলছেন, 'আমরা তোদের জন্য তো কিছুই করতে পারলাম না। হায় রে, তোর বাপের কথা মনে হলে এখনও প্রাণটা হু হু করে কেঁদে উঠে।' আরে অনেক কথাই হয়তো বলছিলেন নানা। কিন্তু আমি আর কিছুই শুনতে পাইনি ; আমি তখন ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছি। হায় বাবা! তুমি আমাকে আর কতো কাঁদাবে। তুমি পথে পথে কতো স্নেহই না ছড়িয়ে রেখে গেছো! এতো আত্মীয়ের আত্মীয়তা নয়, তোমারই স্নেহের পরশ।

এক সময় কোনাপাড়ার মাথায় গিয়ে নৌকা ঠেকলো। রূপদাস নানা আমাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে বিদায় দিলেন।

তাঁর নাম কি রূপদাস? না, রূপ হোসেন। তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম মঞ্জুর হোসেন। গরীব মানুষ, কোনো হাঁক ডাক নেই, চুপচাপ পড়ে আছেন। তাঁর দেবার ক্ষমতা খুবই সীমিত। কিন্তু আজ যা দিলেন, তাই আমার কাছে অনেক। পথ হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, না, বাইরে থেকে পৃথিবীকে যতোটা নিষ্ঠুর বলে মনে হয়, সে ততোটা নিষ্ঠুর নয়। এখানে পথে পথে স্নেহ মায়া মমতা ছড়িয়ে আছে। পথে না বেরুলে তার বিচিত্র রূপ এতো ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যায় না। আমিও পথে না বেরুলে এমনভাবে জানতে পারতাম না। সুতরাং ভয় নাই, পথ তার গন্তব্যে নিয়ে যাবেই!

কিন্তু বাস্তব অবস্থা বুঝি ততোটা সহজ নয়। কাইটাইলের শেষ মাথায় গিয়েই আবার বিপদে পড়লাম। রাস্তা আছে, তবে কোথাও হাঁটু, কোথাও বুক আর কোথাও গলা পানি। শুধু লুঙ্গিটা পরণে রেখে আর সব কাপড় খুলে পোটলা বেঁধে নিলাম। যেখানে গলা পানি, সেখানে কিবরিয়া আমার গলা ধরে ভেসে চলবে।

কিন্তু পানিতে ডোবা পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। ধীরে ধীরে দেখে শুনে এগুতে হয়। সাঁতার হলেই অসুবিধা হবে। কিবরিয়া কতোদূর সাঁতরে যেতে পারবে। না, তেমন কোনো বিপদ হয়নি। তবে আরও বিপদ ছিলো, সামনেই ওঁৎপেতে ছিলো। একটা ছনের ভিটা পেরুচ্ছি। পথে হাঁটু পানি। হঠাৎ দেখি একটা বিরাট সাপ সেই পথের মধ্যে পড়ে আছে। থমকে দাঁড়ালাম। করার কিছু নেই। ফোঁস্ করে উঠলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। না, সর্পরাজের বোধ হয় দয়া হলো। হলদে রঙের মাঝে দুইপাশে দুটি কালো রেখা বিশিষ্ট এই সাপটি ধীরে ধীরে পথ থেকে সরে গেলো। আমি চোখ বুজলে এখনও মনে হয়, সে যেন চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার গতির মধ্যে গাম্ভীর্য আছে, রূপে আছে আকর্ষণ ; তাই তাকে ভুলতে পারিনি। তা ছাড়া সেদিন এভাবে পথ ছেড়ে না দিলে আমাদের কিছু করার ছিলো না। এ ক্ষেত্রেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধে হৃদয় সিক্ত হয়ে আছে। শত্রু বাগে পেয়েও যখন বন্ধুর মতো আচরণ করে, তখন তাকে বন্ধু বলাই ঠিক। পরে শুনেছি আমার এই পথের বন্ধুর নাম 'মেঘ ডুম্বুর'।

না, নিরাপদেই আমরা বাস্তা গিয়ে পৌছলাম। উঠলাম আমার সেই লজিং বাড়িতে। সোনা চাচা বা তাঁর স্ত্রী কিছুই বললেন না। বুঝলাম তাঁদের রাগ অনেকটা পড়ে এসেছে। পর দিন কিবরিয়ার জন্য একটা লজিং ঠিক করে ফেললাম। ফিরোজ ভূঞাদের বাড়ির উত্তরের পাশে একজন মেয়েলোক কিবরিয়াকে দেখে যেন লুফে নিলেন। না, তাঁদের নাম পরিচয় কিছুই মনে নেই ; তবে তাঁদের সেই স্নেহের মধ্যে কিবরিয়াকে ছেড়ে দিয়ে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম। এজন্য আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

পরদিনই মাদ্রাসা খুললো। আমি আমার নতুন শ্রেণীতে এবার পুরাদস্তর ছাত্র হয়ে বসতে লাগলাম। কেন জানি মনে হলো, শিক্ষকদের সাথে ইতিমধ্যেই কেমন একটা দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। যেন আমি হঠাৎই সাবালক হয়ে গেছি। মাখনার সেই উস্তাদ এখনও আছেন ; কিন্তু তিনিও যেন কেমন মন মরা। হয়তো শিক্ষকদের মধ্যকার আগের সেই সম্পর্ক আর নেই, হয়তো অভাব অনটন এসে আগের সেই সন্তুষ্ট ভাবটি নষ্ট করে দিয়ে গেছে; কি হয়েছে আমার ঠিক জানা নেই। জানার প্রয়োজনও নেই। কারণ আমি আর মাদ্রাসার চাঁদা আদায়ের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে যাবো না।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই নাক গলাতে হলো। ভাটি এলাকা, নৌকা ছাড়া যাতায়াত সম্ভব নয়। মাদ্রাসার একটি নৌকা আছে। সেটি সেক্রেটারি সাহেব তাঁর বাড়ির পিছনে ডুবিয়ে রেখেছেন। আর ছাত্ররা খাল সাঁতরে মাদ্রাসায় আসা যাওয়া করছে। কাজেই দলবেঁধে ছাত্র নিয়ে আমিই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কথা বলতেই নানা ক্ষেপে উঠলেন। সোনা চাচার শ্বশুর বলে আমি তাঁকে নানা ডাকতাম। কিন্তু ব্যবহারে

তিনি নাতির কোনো মর্যাদাই দিলেন না। মাদ্রাসার শিক্ষকরা বেতনের কথা বলে তাঁকে উত্যক্ত করেছে, তারই শোধ নিলেন আমার উপর দিয়ে। মনটা আমার বিষিয়ে গেলো। কিন্তু করার কিছু নেই। তাঁকে ছেড়ে আমরা ছাত্ররা মিলে নৌকা সিঁচে নিয়ে গেলাম; তাতেও তিনি রাগ করলেন।

আর আমি হতভাগা আমার মনের রাগ ঢাকলাম আমার ছোট ভাইটির উপর। তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করেছি। কিন্তু সে লেখাপড়ার পরিবর্তে বিলের পানিতে মাছ মারছে আর গাছের ডালে বসে ঠ্যাং ঝুলাচ্ছে। তাই একদিন ধরে দিলাম খুব পিট্টি। কিন্তু পারা গেলো না। সেই মেয়ে লোকটি মাসীর দরদে তাকে আগলে রাখলো। আর আমি রাগ করে বাস্তা ছেড়ে নায়েকপুর চলে গেলাম। অবশ্য এমনিতেও আমার সেখানে যাবার প্রয়োজন ছিলো। কারণ মিস্কী সাহেব সেই নায়েকপুরে থাকতেন। তাঁর কাছে পাঠ্য পুস্তুকগুলির অনেক বিষয় জেনে নেবার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু বাহ্যতঃ আমার রাগাগিটাই বড় হয়ে উঠলো।

নায়েকপুরের মৌলানা সাহেবের নাম আমি কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না। অথচ তাঁর ছেলে আব্দুল আউয়ালের সাথে আমার দোস্তির সম্পর্ক ছিলো। এটি ঘটেছিলো এই নায়েকপুরে গিয়েই। কারণ তাঁদের বাড়িতেই আমি খেতাম। থাকতাম অবশ্যি পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় সেখানে জনাব আলী নামের একজন ছাত্রও লজিং থাকতো। এর কয়েক বাড়ি পরেই একটি বাড়িতে ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার কিছু নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলাম। সেই বাড়ির লোকেরা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে খুব ভালো চোখে দেখতো না। কার বাড়ি এটা? আলী খাঁর? কিন্তু এ বাড়ির ব্যাপারে এমন একটা কথা মনে হবার কারণটা এখন আর মনে পড়ছে না। তবে ও বাড়ির একটি ছেলের আচরণের ফলেও এমনি হতে পারে। যা হোক এ নিয়ে আমার মনে তেমন কোন ক্ষোভ ছিলো না। কারণ আমি ওবাড়িতে ভালো ব্যবহারই পেয়েছি। এর কারণ সম্ভবত ঃ আমি মাদ্রাসার ছাত্র হলেও অসাধারণ মেধাবী।

এ কারণেই আউয়ালের সাথে আমার মৌখিক দোস্তি হলেও কখনও অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়নি। কারণ সে আমার সমকক্ষ ছিলো না। সমকক্ষ না হলে বন্ধুত্ব জমে না। কোলাকুলিটা সেখানেই হয়। তাই তার সাথে আমার সম্বোধন আপনি ছেড়ে কখনও তুই তুমিতে নামার সুযোগ পায়নি। তবে তার পিতা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু তিনি হাঁপানীর রোগী হওয়ায় তাঁর কাছে আমরা পড়ার সুযোগ পাইনি। তবে এই অবস্থাতেও তাঁর সাথে দূরের গাঁয়ে গিয়ে দাওয়াত খেয়ে এসেছি। তখন এই দাওয়াত খাওয়ার ব্যাপারটি প্রায়ই ঘটতো।

এই নায়েকপুরে আরও কয়েকজন বয়সী ছাত্রের কথা মনে পড়ছে। তাদের একজনের নাম আগেই বলেছি। এছাড়াও মনিরউদ্দিন ও আলী নেওয়াজ নামে আরও দুজন ছাত্র ছিলেন। তাঁরা সবাই উপরের শ্রেণীতে পড়েন ; হয়তো দূরের কোনো মাদ্রাসায়। আপাততঃ এখানে মিস্কী সাহেবের কাছে প্রাইভেট পড়তে এসেছেন। আমিও একই কাজ করছি।

কিন্তু এ সময়টা কি রোজার সময় ছিলো? কিছুতেই রোজা রাখা বা সেহেরী ইফতারের কোনো দৃশ্য মনে করতে পারছি না। এমনি আমার নামাজ পড়ার ব্যাপারটাও স্মৃতির বলয়ে খুব একটা দাগ কাটতে পারেনি। এর চাইতে একটা বিরাট সাপের চেহারা মনে পড়ছে। একদিন দেখি, যে বাড়ি মিস্ত্রী সাহেব থাকতেন, তার সামনের উঠানে বেল গাছ তলায় একটা কোচের মধ্যে গাঁথা একটি বিরাট মেছো আহ্লাদ। সাপটি তখনও মরেনি, তখনও কোচের ফলা দুমড়ে মুচড়ে ছুটে যাবার চেষ্টা করছে। আসলে এই সাপগুলি বড়ো পাজি। বর্ষাকালেই এদের উৎপাত বাড়ে। এদের জন্য পোনা মাছ, উজিয়ার মাছ কোনোটাই নিরাপদে মারা যায় না। সবখানেই এরা ওঁৎপেতে বসে থাকে। কায়দা পেলেই ছোবল বসায়। এরা বিষধর গোখরো সাপেরই একটি শাখা ; দেখতে কালচে ছাইরঙ্গা। একারণেই পানির জলজ দামের মধ্যে অবলীলায় মিশে যেতে পারে।

যা-ই হোক, আমাকে আবার বাস্তা ফিরে যেতে হলো। কারণ সেক্রেটারী সাহেব নিজে মাদ্রাসায় এসে আমার কান ধরে বললেন, 'শালা, তোমার কান আমি কেটে ফেলবো। তোমার জন্য আমার মেয়ে আমাকে চৌদ্দ গোষ্ঠি তুলে গালাগালি করছে। তুমি গিয়ে তাকে বলে এসো, সে যেন আর গালাগালি না করে।'

যেতে হলো আবার সোনা চাচার বাড়িতে, থাকতেও হলো। স্নেহের টান বড়ো মারাত্মক! তাকে কোনো কিছু দিয়েই ঠেকানো যায় না। কিন্তু স্নেহ দিয়েও যে রোগ ভালো করা যায় না, তার পরীক্ষা হলো কিবরিয়ার ব্যাপারে। সে ইতিমধ্যে এমন এক রোগ বাধিয়ে বসেছে যে সাধারণ জ্বরের ওষুধে তার জ্বর কিছুতেই থামছে না। তার গলার দুপাশে টনসিলের নিচে ঘা হয়েছে। আজ এ রোগের ওষুধ খুবই সোজা। কিন্তু তখন সেই পরিবেশে এ ছিলো এক মারাত্মক ব্যাপার। সেই ভদ্র মহিলা, যিনি কিবরিয়াকে আগলে রাখতেন, তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমেও কিবরিয়ার শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ফেরাতে পারলেন না। তার জ্বর থামলো, কিন্তু পুরোপুরি আরোগ্য হলো না। এক সময় আমি কিছুটা জোর করেই তাকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এলাম।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। কিবরিয়াতো মায়ের ওখানে ভালোই ছিলো, আমিই বুঝি গোয়ার্তুমি করে টেনে এনে ওর জীবনটা নষ্ট করে দিলাম। ওকে একদিন খুব মেরেছিলাম, সে জন্যই ওর এমন একটা রোগ হয়েছে, একথা ভেবে খুব আক্ষেপ হতে লাগলো। তেমনি অসুস্থ সন্তান নিয়ে মায়ের দুরবস্থার কথাও ভুলতে পারছিলাম না। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যা আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিলো।

আমার উপরের শ্রেণীতে উঠার পথে যে সব ছাত্র বাধার সৃষ্টি করেছিলো, তাদের একজন ছিলো, সম্ভবত ; ওয়াহেদ। দেখতে সুন্দর, বেঁটে-খাটো, খুব পড়ুয়া। আমি আসার আগে ভালো ছাত্র হিসেব তার সুনাম ছিলো। আমি যেন তার সেই রাজ্য জবর দখল করে নিয়েছি। তাই আমার প্রতি তার বিদ্বেষের আর অন্ত ছিলো না। পারত পক্ষে সে আমার ছায়া মাড়াতো না। একরাতে দেখি সে আমার আস্তানার পাশের মসজিদে

বসে পড়ছে। সম্ভবত ঃ আমি নায়েকপুর চলে যাবার পর সে এই স্থানটি নির্বাচিত করেছিলো। কিন্তু আমি যে ইতিমধ্যে ফিরে এসেছি, খুব সম্ভব, সে খবর তার জানা ছিলো না।

যাহোক, আমি মসজিদে গিয়ে ঢুকতেই সে আমাকে দেখে চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি এমনভাবে বেরিয়ে গেলো, যেন আমি তাকে মারতে গিয়েছি। আমি পিছু ডাকলাম, কিন্তু সে ফিরেও তাকালো না। ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটলো যে আরো অনেকে সেটি দেখে আমাকে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। দু'একজন নিরপেক্ষ ছাত্রও এসে জুটলো। আলোচনার মধ্যে তাদের কাছেই শুনলাম, ওয়াহেদ প্রতিজ্ঞা করেছে যে, যেভাবেই হোক, সে আমাকে পরাজিত করবেই। কিন্তু কীভাবে? আমিতো তার নিচের শ্রেণীতে পড়ি! সে কি নিচের শ্রেণীতে এসে আমার পরীক্ষা দেবে?

না, আরও পথ আছে। ফারসী বয়েত আউড়ানোর প্রতিযোগিতা ; আমি যেন এ ব্যাপারে প্রস্তুত থাকি। আমি প্রস্তুত ছিলাম। সুতরাং একদিন ইস্কান্দর খাঁর বৈঠকখানায় সেই প্রতিযোগিতা হয়ে গেলো। ওয়াহেদ আপ্রাণ চেষ্টা করেও হেরে গেলো। বয়েতের সংখ্যা ছিলো পঁচাত্তর থেকে একশ', এক নাগাড়ে মুখস্থ আউড়ে যেতে হবে। সেই প্রথমে আশি পঁচাশি বয়েত বললো। কিন্তু আমার আউড়ানো শয়ের কোঠা পেরিয়েও থামতে চাইলো না। বেচারা লজ্জায় লাল হয়ে ঘেমে নেয়ে উঠলো!

তখন আমার কী হয়েছিলো! আমি একটা ব্যাপার একবার দু'বার, বড়োজোর তিনবার পড়লেই অবিকল মুখস্থ বলে যেতে পারতাম। এ কারণেই মাদ্রাসা জীবনে আমি নিজের ভাষা তৈরি করতে পারিনি। কিতাবের ভাষাই ছিলো আমার ভাষা ; দাঁড়ি কমা সহ অবিকল সেই ভাষা সেই বক্তব্য প্রশ্নের উত্তরে আমি লিখে গেছি। এ নিয়ে প্রশংসা যেমন শুনেছি, তেমনি নিন্দাও কম শুনতে হয়নি। কিন্তু সে আলোচনা এখন থাক।

আপাততঃ আমি আমার দ্বিতীয় প্রমোশনের জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। ছ'মাসের একটি পরীক্ষায় আমি হাসতমের সমস্ত পাঠ্য শেষ করার প্রমাণ দিলাম। শিক্ষকরা নানাভাবে আমাকে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু তাঁদের বলার কিছু রইলো না। এবারও বাদ সাধলো সেই ছাত্ররা। এবার ওয়াহেদের চাইতে মালেক নামের একটি ছেলে খুবই মারমুখী হয়ে উঠলো। কিন্তু এবার মিস্কী সাহেবও আমাকে বুঝাতে এলেন না। আর এলেও আমি তাঁর কথা মানতে পারতাম না। কারণ এ আমার অর্জিত অধিকার। সুতরাং এবার হৈ চৈ টা খুব বেশি জোরেসোরেই চললো। ওরা যেমন মাদ্রাসা ছেড়ে যাবার হুমকি দিলো, আমিও তেমনি পাল্টা হুমকি দিলাম। লেখাপড়ার চাইতে বা বাকবিতন্ডা হলো বেশি।

মনটা মাদ্রাসার সমস্ত পরিবেশের বিরুদ্ধেই বিধিয়ে উঠলো। না, আর নয়, অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কিন্তু যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়! কতো কথা, কতো বাধা! কিন্তু লাভ কী! পড়ার পরিবেশতো নেই। অগত্যা সেই বাধাও ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এলো। তবু বাস্তা ছেড়ে আসতে আমাকে অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে।

বাস্তা মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে আমি যাকে সবচাইতে বেশি ভয় করতাম, তিয়শ্রীর সেই মাস্টার সাহেব, মঞ্জু মিয়া একদিন খুব ধমক দিয়ে বললেন, 'একী আরম্ভ করেছো—তোমরা! পড়লে পড়ো, না হলে বেরিয়ে যাও ; সময় নষ্ট করো না।'

তাঁর এই ধমকে সচেতন হলাম আমি। সত্যিই, এই মাস্টার সাহেবের মধ্যে একটা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলো। নাসিরাবাদ কলেজের আমার বর্তমান সহকর্মী অধ্যাপক আনোয়ারুল হাকিম খান এই ত্রিয়শ্রীর ছেলে। বাল্যকালে সেও তাঁর এই ব্যক্তিত্ব দেখেছে। সুতরাং তাঁর এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবই আমার মনকে এমনভাবে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়েছিলো। সত্যিইতো সময় যে বয়ে যাচ্ছে! না, আর নয়, এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু কোথায় যাবো? হয়বত নগরের নাম অনেক আগেই শুনেছিলাম। নাম শুনে মনে হয়েছিলো, সেখানে হয়তো ভালো পরিবেশ আছে। অন্তত ঃ 'হয়বত' শব্দের অর্থ যদি ভয় হয়, তাহলে সেখানে ছাত্ররা নিশ্চয় শিক্ষকদেরকে ভয় করে। বাস্তার মতো এমন হৈ চৈ করে লেখপড়া পণ্ড করে না।

সেখানেই যাবো বলে মনস্থির করলাম। আগেই গুটিয়ে ফেলেছিলাম। সোনা-চাচার ছেলেরা আমার কাপড় চোপড় বইপত্র লুকিয়ে ফেলতো বলে সেগুলি কয়েকদিন আগেই পোটলা বেঁধে রাস্তার উত্তরের মাথায় এক বাড়িতে রেখে দিয়েছিলাম। সবকিছু সেখানেই পড়ে রইলো। আর আমি একদিন সকাল বেলা কাউকে কিছু না বলে বাস্তার মায়া কাটিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। —জীবনের নিঃসঙ্গ পথিক হলাম।

হয়বত নগর যাবার কিছুটা রাস্তা আমার চেনা। মাস খানেক আগেই সেইপথে ঈশ্বরগঞ্জ থানার কাছে উঁচাখিলা এলাকায় এক বিয়ে খেয়ে এসেছিলাম। কনে বাস্তার, কিন্তু বর এই এলাকার। সে বাস্তা মাদ্রাসারই ছাত্র ছিলো। কিন্তু মাদ্রাসার গণ্ডি পেরিয়েও বাস্তার মায়া কাটাতে পারলো না। তার পথে বাধার সৃষ্টি করলো লজিং বাড়ির একটি সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মেয়েটি সুন্দরী হলেও বর আকবর আলী কুচ্‌কুচে কালো, আবলুস কাঠের মতো রং। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, সাধনা আর নিষ্ঠা থাকলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, আকবরের বেলাতেও তাই হলো, সেও জয় লাভ করলো। আমরা মেয়ের পক্ষ থেকে তার বাড়িতেই গিয়েছিলাম। বাস্তা থেকে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ মাইল পথ হেঁটে সেই বাড়িতে সন্ধ্যার অনেক পরে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। দক্ষিণ দুয়ারী সেই টিনের বাড়ির সম্মুখে বোধ হয় একটি পুকুর আছে। তার পাড় দিয়ে আমরা যখন সেখানে গিয়ে উঠলাম, তখন হেজাক জ্বালানো উঠানে বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে গেলো, এমনি একটা দৃশ্যই শুধু চোখে ভাসছে।

যাহোক, যেদিন ফিরে আসি, সেদিন ঐ বাড়িরই একটা ছেলে, বোধ হয়, আমার সাথে আসছিলো। পম্বাইল মাদ্রাসার সামনে কোনো একটা স্থানে গাছতলার একটি উঁচু ঢিবি দেখিয়ে সে বললো, 'জানো, এখানে একটা 'হাপা' থাকে!

আমি বললাম, 'হাপা কী?'

'ওমা, তাও জানো না! হাপা হলো সাপের রাজা। তার কথাতেই তো সব সাপ চলাফেরা করে। কিন্তু দেখতে সে মোটেও মোটা সোটা নয় ; সুতার মতো চিকন আর সাদা ধব্‌ধবে।

যখন বেরুয়, তখন তার বিষ নিঃশ্বাসে আশেপাশের সব কিছু ঝলসে যায়।'

তার কথা শুনে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। একটা নতুন চমক বৈকি! এ দেশের পথে ঘাটে অজস্র সাপ দেখেছি, কিন্তু 'হাপা'? না, এর আগে দেখবো দূরের কথা, নামটা পর্যন্ত শুনি নাই। অদ্ভুত এই দেশ ; এর দিকে দিকে কতো কথা, কতো ধারণা যে ছড়িয়ে আছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। যতোই দেখছি, যতোই শুনছি, কেবলি অবাক হচ্ছি!

সে যাই হোক, হয়বত নগর একাই আমি যেতে পারবো। কিন্তু মদন? না, মদনের চাচাজীর সাথে বিচ্ছিন্নতা অনেকখানি বেড়ে গেছে। তিনিও খোঁজ নেন না, আমিও আর যাই না। আর এবার যাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। আমি কোন্‌মুখে গিয়ে বলবো, যে বাস্তা মাদ্রাসায় আপনি এতো আগ্রহ করে ভর্তি করিয়েছিলেন, আমি তা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সুতরাং পা টেনে টেনে আমি কাউরাট এসে পৌঁছলাম।

এখানে এসেই শুনি, আমার ছোট বোন রাহেলার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বর আমার নানার বাড়ির সামনের বাড়ির, নাম আমীরউদ্দিন। আমার তালৈর নাম মৌর হোসেন। আগে থেকেই তাঁদেরকে চিনতাম। আমার তালৈ তখন বৃদ্ধ, নুয়ে নুয়ে পথ চলেন। মুখে সর্বদাই একটা অমায়িক হাসি লেগে আছে। তিনিই বড়ো খালাকে বলে কয়ে রাজি করিয়েছেন। অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। কিন্তু আমার কেন জানি ভালো লাগেনি। যাই হোক, বর-তো বলতে গেলে অশিক্ষিত, গৃহস্থির কাজ করে। অথচ কিছুদিন আগেই আমি পুলিশের চাকরি করে, এমন একজন বরের প্রস্তাব এনেছিলাম। চিরাং-এর কাছের কোনো এক গাঁয়ের লোক আমাকে এই প্রস্তাবের কথা বলেছিলো। সবাই রাজি থাকলে তারা পাকা কথা বলবে। কিন্তু বড় খালা শুনেই নাকচ করে দিলেন।

যাহোক, আমার ভালো না লাগলে কি হবে, যথা সময়ে বিয়ে হয়ে গেলো। আমি উপস্থিত রইলাম শুধু। মনটা কেমন ছোট হয়ে গেলো। একি শিক্ষার জন্য? হবেও বা। কারণ শিক্ষার মর্যাদা তখন চোখে পড়েছে ; অন্তত ঃ আমাকে দিয়েই তখন আমি বিচার করছি। যদি কাউরাট পড়ে থাকতাম, তাহলে কে আমাকে চিনতো। কিন্তু আমার বাস্তা ত্যাগের কথা কারোর কাছেই বলতে পারলাম না। এমন কি মায়ের কাছেও না। সেখানে পৌঁছে মনটা আরও উদাস হয়ে গেলো কিবরিয়া এখন ভালো ; খেতে পারে চলতে পারে, কিছুটা মোটা সোটাও হয়েছে। কিন্তু সেই মোটার অধিকাংশটাই পানি। ওকে দেখে সেই ফুট্‌ফুটে চঞ্চল গোলাম কিবরিয়া বলে চিনবার আর কোন উপায় নেই।

কিন্তু কী করবো আমি, কী আমার সাধ্য! কাজেই আমার গন্তব্যস্থলেই রওনা হলাম। আঠার বাড়ি গিয়ে গাড়িতে চড়ে কিশোরগঞ্জ। সেখান থেকে হয়বত নগর মাদ্রাসায় গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা পড়ে এসেছে।

কিন্তু মনের মধ্যে যে ধারণা নিয়ে গিয়েছিলাম, প্রথম দর্শনেই তা কেমন যেন চটকে গেলো। এখানে বাস্তার সেই উদার প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন নেই, তেমনি ছাত্রদের আনাগোনাও তুলনামূলকভাবে কম। আমার উদ্দিষ্ট্য 'হাফতম' শ্রেণীতে মাত্র চার পাঁচজন ছাত্র। একজন শিক্ষক বসে পড়াচ্ছিলেন, তিনিই আমাকে পরীক্ষা করলেন এবং তিনি যে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন, সেটি তাঁর আচার আচরণে বুঝতে পারলাম। তিনিই সামনের খাতায় আমার নাম ধাম তুলে নিলেন। আমি হয়বত নগর মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে গেলাম।

বিকাল বেলা তাঁর সাথেই মাইল তিনেক দূরে এক লজিং বাড়িতে চলে গেলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাস্তার পাশে একটি চৌচালা টিনের ঘর, তার মাঝে একটি হেজাক জ্বলছে ঃ সেই বাড়ির এই দৃশ্যটিই শুধু মনে পড়ছে। সেই শিক্ষকের নাম, লজিং বাড়ির নাম ধাম, এমনি আর সব কিছুই ভুলে গেছি। কারণ পরদিন ভোরে উঠে কাপড় চোপড় বইপত্র নিয়ে আসার জন্য সেই যে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম, আর ফিরে যাইনি।

কিশোরগঞ্জে এসে গাড়িতে উঠে বসলাম, কিন্তু আমি যাবো কোথায়? হয়বত নগরে আর নয়। এখানে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। সত্যি জাগাটার মধ্যে একটা 'হয়বত' বা ভীতি আছে। সেই ভয়েই আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোথায়?

কাতলাসেন মাদ্রাসার নামও আগেই শুনেছিলাম। সেখানে একবার গিয়ে দেখলে কেমন হয়। তাই করবো। সুতরাং গাড়ি আঠারবাড়ি, সোহাগী, ঈশ্বরগঞ্জ হয়ে গৌরীপুরের দিকে এগিয়ে চললো। কিন্তু এখানে এসে হঠাৎ মনে হলো, এভাবে একা ঘোরাফেরা করে মনস্থির করা যাবে না। একজন সাথী দরকার। হঠাৎ জলিলের কথা মনে পড়লো। সেই যে গাগলাজোড় অভিযানে আমার সাথী হয়েছিলো, তাকেই সাথে নেয়া দরকার। কাজেই গৌরীপুর স্টেশনে গাড়ি থামতেই আমি নেমে পড়লাম।

কিন্তু পথে নেমে দেখলাম, মনের স্থিরতা না থাকলে যা হয়, তাই হচ্ছে। হাঁটতে ভালো লাগছে- না, উৎসাহ পাচ্ছি না। তবু পা টেনে টেনে দাঁড়িয়াপুর পেরুলাম। আর পা চলতে চায় না। রাস্তার পাশে পাগাড়ের পাড়ে আমগাছের ছায়ায় জিরাতে বসলাম। তখনি গৌরীপুরের দিক থেকে একজন যুবক এগিয়ে এলেন আমার দিকে। দেখেই চিনলাম তাঁকে, আমাদের গাঁয়ের গোয়াল কান্দিপাড়ার হাফিজ উদ্দিন। এক সময়ে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক হয়েছিলেন। কিন্তু তখন কী করতেন আমার জানা ছিলো না। তবু বেশ আগ্রহ নিয়েই আমার কুশলপরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন যে, আমি যেন এই মাদ্রাসা লাইনের ব্যাপারে অর্থনৈতিক দিকটা চিন্তা করে দেখি। কারণ এই ফকিরা পাড়ায় ফকির হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে একান্তই আরবি পড়ার আকর্ষণ ত্যাগ করতে না পারলে নিউস্কীম মাদ্রাসায় পড়া উচিত।

আমি তাঁর সাথে হাঁটতে হাঁটতে আরো অনেক কথাই শুনলাম। কথাগুলির মধ্যে যুক্তি ছিলো। কারণ আমার যা অবস্থা, তাতে শুধু অন্ধের মতো পড়লেই হবে না, নিজের

পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থাও করতে হবে। কাজেই জ্ঞানার্জনের সাথে অর্থকরী চিন্তা এখন থেকেই করা দরকার। আমার ঝিমিয়ে পড়া উদাসী মন এসব কথার মধ্যে একটা নতুন চিন্তার খোরাক পেলো এবং হাঁটতে হাঁটতেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি নিউস্কীম মাদ্রাসাতেই পড়বো। হাফিজ উদ্দিন সাহেবের কাছে জানতে পারলাম যে, নেত্রকোণার কাছে 'বালি'তে এমনি ধরণের একটি মাদ্রাসা আছে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছি, তখন যাত্রা শুরু করতে দোষ কী! সাহাগঞ্জ বাজারে এসে আমি বামদিকের রাস্তা ধরলাম। সেই রাস্তা বালির দিকে চলে গেছে। আমার পৈতৃক বাড়ি বীরআহমদপুর, আমার ফুফুর বাড়ি ধারাকান্দি, সবগুলি ডাইনে রেখে আমি এগিয়ে চললাম। রাস্তা একটা আছে, তবে খুব সুবিধের নয়। তবু জিজ্ঞাসা করে করে এগিয়ে যেতে তেমন বেগ পেতে হলো না। পথেই পড়লো সেই মহিষহাটী গ্রাম, যেখানে আমার বাবার খালাতো ভাই সেই বিরাট মৌলানা সাহেবের বাড়ি। তখন তিনি জীবিত কিনা আমি জানিনা। তবু এই গ্রামের নাম শুনেই হঠাৎ আমার মনে হলো, খুব ক্ষিধে পেয়েছে। আর তাতো পাবার-ই কথা, কারণ বেলা তখন বেশ হেলে পড়েছে। এর ফল হলো এই যে, পা আর চলতে চায় না। জিজ্ঞাসা করে সেই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। কিন্তু আমি তখন এতোটা শ্রান্ত যে, বৈঠকখানায় ঢুকে আমার পোটলাটি বালিশ বানিয়ে আমি একটি বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়লাম। ঠিক কতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানিনা, সন্ধ্যার আগে একজন মাঝবয়সী লোক আমাকে ডেকে তুললেন। পরিচয় জেনে নিয়ে বাড়ির মধ্য থেকে একটা ছেঁড়া সাদা কাপড়ের টুকরা এনে আমার হাতে দিয়ে আমাকে গোছল করতে বললেন।

আমার পেটে ক্ষিধা, তা নিয়েই ঘুমিয়েছি ; কাজেই তখন আমার গোছল করার মতো মনের অবস্থা ছিলো না। তবু আমি হাতমুখ ধুয়ে শরীরটা মুছে নেবার জন্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কী মতিভ্রম হলো বুঝতে পারলাম না, আমি সেই ছেঁড়া সাদা কাপড়টির একটা দিক ছিঁড়ে তা ভিজিয়ে আমার গা মুছলাম। হয়তো আমি ভেবেছিলাম সবটা কাপড় ভিজিয়ে নষ্ট করার কী দরকার। কিন্তু এটাই আমার কাল হলো। সেই লোক ফিরে এসে ছিঁড়া কাপড়ের টুকরো আমার হাতে দেখেই রেগে গেলেন এবং যা তা বলে আমাকে গালাগালি করতে লাগলেন। আমি ছেঁড়া কাপড়ের কথা বলায় তিনি আরো রেগে গেলেন। তারপর আমার হাত থেকে কাপড়টি ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

এই ভদ্রলোক মৌলানা সাহেবের কী হন, আমার সাথেইবা তাঁর সম্পর্ক কী, কিছুই আমি জানতে পারিনি। তাই তাঁকে আর কিছু বলা বা পিছু ডাকা, কোনোটাই আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। আমি হতভম্বের মতো সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ঘরের কোণে বসে রইলাম। কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেও যখন সেইলোক ফিরে এলো না, তখন নিজের পোটলাটি হাতে নিয়ে আবার পথে নেমে এলাম আমি।

একটা করুণ বিষাদে মনটা ভরে গেলো। একটা ছেঁড়া কাপড় ছেঁড়ার পাগলামির জন্য খুবই অনুতাপ হলো। সত্যিইতো ছেঁড়া হোক, যাইহোক, আমি ছিঁড়তে গেলাম কেন! কিন্তু সাথে সাথে আবার মনের অন্যদিক থেকে একটা ফোঁসফুঁসানিও শুনতে পেলাম। একটা ছেঁড়া কাপড়ইতো, এর জন্য এতো কথা! আজ যদি আমি নেত্রকোণা থেকে এবাড়িতে আসতাম, তাহলে একটা ঘর জ্বালিয়ে দিলেও এতো কথা শুনতে হতো না। হায়, অবস্থার পরিবর্তন মানুষকে কতোটা নীচেইনা নামিয়ে দেয়! আজ একটা ছেঁড়া কাপড়ের চাইতেও আমার মূল্য কম!

অন্ধকারে পথ চলতে চলতে এসব কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু এই অন্ধকারে আমি কোথায় যাবো? বালিতো এখনো অনেক দূর! পথের পাশেই একটা বাড়িতে দেখলাম হেজাক জ্বলছে। নিশ্চয় একটা কিছু আছে। বৈঠকখানার সামনে কয়েকটা লোক বসে গল্প করছিলো। আমি তাদের কাছে গিয়ে রাত্রিবাসের আবেদন জানালাম। দেখলাম, খুব সহজেই আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আমি বৈঠকখানার এক কোণে চৌকির উপর আমার পোটলাটিকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়লাম।

খুব ভোরে উঠে আবার রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। পথে একটা ছোট্ট নদী পার হয়ে একটি বাজারের মতো জায়গা। সেখানেই কিছু বিস্কুট কিনে নিয়ে নাশতা করলাম। কারণ কাল ক্ষিধেয় বড়ো কষ্ট পেয়েছি। রাতে সে বাড়িতে ঘুম থেকে জাগিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা তারা করেছিলো, কিন্তু আমি খুব একটা কিছু খেতে পারিনি। সারাদিনের ক্লান্তি, মনের করুণ বিষাদ, সবকিছু মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিলো যে, তখন খাবারের চাইতে ঘুমই ছিলো আমার জন্য সব চাইতে প্রয়োজনীয়। কিন্তু এভাবে উপোসের সাধনা করলে তো শরীর টিকবেনা। তাই আজ খাওয়া সম্পর্কে একটা নতুন চেতনা জাগলো আমার মধ্যে। কিন্তু সে চেতনায় নিজের অসহায় অবস্থাটাই শুধু বড়ো হয়ে উঠলো। ইচ্ছামতো খাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-তো আমার কাছে নেই। যা আছে, তা দিয়ে বিপদ ঠেকানো যায়, পেট পুরে খাওয়া যায়না!

তবু এই খাবারের খোঁজে গিয়েই আরো একটা ব্যাপারের খোঁজ পেয়ে গেলাম। নেত্রকোণায় নাকি আজ খুব বড়ো একটা মিটিং হবে। খাজা নাজিমউদ্দিন ও ফজলুল হক সাহেব সেখানে আসবেন। তাঁরা কারা, আমি কিছুই জানতাম না। কিন্তু লোকজনের আলোচনার উৎসাহ দেখে বুঝলাম, তাঁরা যে-ই হোন, খুব বড়ো কেউ। সুতরাং তাঁদেরকে দেখবার, তাঁদের কথা শোনবার একটা লোভ জাগলো মনে। যারা এই সব কথা আলোচনা করছিলো, তারাও সেই সভাতে যাবে। আমি বালির ব্যাপার আপাততঃ মুলতবী রেখে তাদের পিছু নিলাম।

পথে যেতে যেতে অনেক আলাপই তারা করছিলো। পাকিস্তান যে হবেই, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। হিন্দুরা গোলমাল করতে পারে, কিন্তু মূল চাবিকাঠিতো ইংরেজের হাতে। তারা দেশ ভাগ করে দিয়ে গেলে হিন্দুরা কী করবে! আর মানুষতো এখন আর আগের মতো হাবাগোবা নয়। এই যে সারা ভারত থেকে লোক এসে কতো

বড়ো একটা সম্মেলন করলো, সেখানেইতো দেখা গেছে সাধারণ মানুষের শক্তি কতো! এমনি ধরণের আরো অনেক কথাই তারা বলছিলো ; কিন্তু আমি তার সব অর্থ তখন উদ্ধার করতে পারিনি। কারণ আমার পৃথিবী তখন খুবই ছোট। নিজস্ব গণ্ডির বাইরে যাবার মতো সুযোগ তখনো আমার হয়নি। আজ সতেরো বছর বয়সের একটি সচেতন শিক্ষিত তরুণ যে পরিমাণ খবরাখবর জানে, আমি তখন এর একশ' ভাগের একভাগও জানতাম না। তৎকালীন গ্রামীণ পরিবেশের তরুণদের সাথেও আমার তুলনা চলেনা। কারণ তাদের পরিবার ছিলো, পরিবেশ ছিলো। কিন্তু আমার একটি না থাকায় অন্যটিও নাস্তিক হয়ে গেছে। আমি তখন আমাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। বাস্তুহারার বাস্তুভিটা যে তার দেহটি, সেটি নিয়েই সে সারা দিনমান ব্যস্ত থাকে। সেদিক থেকে আমি নিতান্ত দেহসর্বস্ব না হলেও পঠনপাঠন সর্বস্ব ছিলাম। কিন্তু ফল হয়েছে একই।

তাই আজ এদের সাথে পথ চলতে গিয়ে মনে হলো, পৃথিবী সম্পর্কে আমি কতোই না অনভিজ্ঞ! না, আমাকে বাইরের খবরাখবর আরো জানতে হবে। এ কারণে আজকে নেত্রকোণা যাওয়াটা একটা নতুন কাজ বলে মনে হলো। সভাস্থলে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম, তখন নিজেকে আর পরিশ্রান্ত মনে হলো না। সেখানেই শুনলাম, হক সাহেব আসতে পারেননি। তিনি পাকিস্তান বিরোধী বলে রাস্তায় লোকজন তাঁর গাড়ি ভেঙে ফেলেছে। তিনি পালিয়ে বেঁচেছেন। তবে নাজিমউদ্দিন সাহেব এসেছেন। একটু পরেই তিনি বক্তৃতা দিতে উঠলেন। পাকিস্তান সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন তিনি। কিন্তু সব ছাপিয়ে তাঁর একটি গালগল্পের কথাই বেশি করে মনে পড়ছে।

পাকিস্তান হবে কি হবে না, তার একটা তুলনা দিতে গিয়েই তিনি গল্পটা বলেছিলেন। তাঁর সেই ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলা গল্পটি ছিলো নিম্নরূপঃ

একজন শিক্ষিত লোকের বেশ বয়স হয়েছে, কিন্তু সে এখনো বিয়ে শাদী করেনি। তার বন্ধুরা এ নিয়ে বেশ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। একদিন এক বন্ধুর ঠাট্টার উত্তরে সে বললো, 'আমার বিয়ে অর্ধেকতো হয়েই গেছে!'

বন্ধু বললো, 'সে কেমন করে?'

লোকটি বললো, 'কেন দুলা দুলহান দুজনে মিলেইতো বিয়ে! আমি তো বিয়ের জন্য রাজী হয়েই আছি। তাই অর্ধেক বিয়েতো হয়েই গেলো বলা যায়। এখন দুলহান রাজী হলেই বাকী অর্ধেকটা হয়ে যায়।'

এইগল্প বলে তিনি বললেন, 'ভাইসব! অর্ধেক পাকিস্তান হয়ে গেছে। কারণ আমরা, মানে-দুলা রাজী। এখন বাকি, অর্ধেক দুলহান মানে হিন্দুরা রাজী হলেই হয়ে যায়।' এই কথা বলে তিনি নিজেই হো হো করে হাসতে আরম্ভ করলেন। শ্রোতাদের মধ্যেও হাসির একটা হুল্লোড় পড়ে গেলো।

কিন্তু আমি হাসতে গিয়েও হাসতে পারলাম না। একেতো পেটের ক্ষিধা, তদুপরি থাকার দুশ্চিন্তা। এদিকে বেলা শেষ হয়ে আসছে। সন্ধ্যার আগেই কোথাও আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিতে হবে। তাই সভা শেষ হবার আগেই আমি গোদাড়া পেরিয়ে

হাঁটতে লাগলাম। শুনেছিলাম, বালি খুব দূরে নয়। সেখানে না পৌছুতে পারলেও অন্ততঃ গ্রামের দিকে কোনো বাড়িতে জাগা করে নিতে পারবো। কিন্তু আমার শৈশবের শহর নেত্রকোণায় আমার জাগা পাওয়া খুবই মুশকিল। কারণ সেখানে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো! কে আমার সমাদর করবে!

অবশ্য রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এমন একজন লোকের সাথে দেখা হয়ে গেলো, যার বাড়ি বালি। আমি জিজ্ঞাসা করাতে ভদ্রলোক আমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং তাঁর সাথেই আমি মাদ্রাসার সেক্রেটারী সাহেবের বাড়িতে গিয়ে পৌছলাম। সন্ধ্যার আবছা আঁধার তখন রাত্রিতে পরিণত হয়েছে।

বালি মাদ্রাসাটি রাস্তার পশ্চিম পাশে একটি পুকুর পাড়ে। আর সেক্রেটারী সাহেবের বাড়ি রাস্তার পূর্বপাশে দু'তিনটি বাড়ির পর। তাঁর নামের মধ্যে 'শমশের' শব্দটি আছে বলে মনে পড়ছে। যা হোক, বাড়িটি বেশ বড়ো, বৈঠকখানাটিও প্রশস্ত ; বেশ আরামেই সেখানে রাত্রিবাস করলাম। পরদিন মাদ্রাসায় গেলে একজন শিক্ষক আমাকে পরীক্ষা করে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত বলে রায় দিলেন। কারণ আমি প্রাইমারী পাশ করেছি মাত্র। আরবি ফারসীতে আমার দখল যতো থাক, এখানে বাংলা ইংরেজিও পড়তে হবে। কিন্তু আমার দাবী ছিলো ষষ্ঠ শ্রেণী। তাঁরা সেটি মানলেন না। অবশ্য পঞ্চম শ্রেণীতে আমি কোথাও পড়েছি, এমন কোনো সার্টিফিকেট দেখাতে পারলে তাঁরা ষষ্ঠ শ্রেণীতেও ভর্তি করতে পারবেন। তাঁদের এ প্রকার নিয়ম কানুনের কচ্‌কচি, কেন জানি, আমার ভালো লাগলোনা। তাছাড়া আরো একটি ব্যাপার আমাকে ভাবিয়ে তুললো, এখানে পড়তে হলে নিয়মিত বেতন দিতে হবে। এসব শুনে নিউস্কীম পড়ার আগ্রহ আমার কমে গেলো।

কিন্তু সেক্রেটারী সাহেব আমার সব কথা শুনে আমাকে খুবই উৎসাহ দিলেন। বেতন দেয়ার ব্যাপারেও তিনি দেখবেন বলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। এমন কি তাঁর বাড়িতেই আমি লজিং থাকবো, এ কথা জানাতেও কসুর করলেন না। সুতরাং পরদিন আমি অনেকটা মনস্থির করেই আমার কাঁথা বালিশ আনার জন্য বাস্তা রওনা দিলাম। তারপর যেতে যেতে কোণাপাড়া গিয়ে পৌছলাম আমি।

এই কোণাপাড়ায় জলিলের কাছে যাবো বলেই গৌরীপুর স্টেশনে নেমেছিলাম আমি। কিন্তু ইতিমধ্যে মহিষহাটীর গালাগালি আর নেত্রকোণার বালি, দুটোই শোনা ও দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই মনের শূন্যতা পূরণ হয়নি। সুতরাং বাস্তা যাবার পথে অনেকটা রাত্রিবাস করার জন্যই কোণাপাড়ায় গিয়ে উঠলাম। না, জলিল বাড়িতেই আছে। এর আগে ওদের বাড়িতে গিয়েছি, কিন্তু এমনভাবে পোটলাসহ যাইনি। তবু সমাদরের কোনো অভাব হলো না। সবচেয়ে বিস্মিত হলাম, যখন শুনলাম, জলিলও বাস্তা ছেড়ে চলে এসেছে। কারণ আমরা ঝগড়াঝাটি করলেও নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের কোনো অসুবিধা হয়নি। তাই জলিলের এই ব্যাপারটা আমার প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ বলেই মনে হলো। অবশ্য জলিলের কাছে বাস্তার পরবর্তী কাহিনী শুনে মনে

হলো, শুধু জলিল নয়, বাস্তার সাধারণ মানুষ, ছাত্র ও শিক্ষকরাও অনেকাংশে আমার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। এর ফলে বিরোধী ছাত্র দলটির লিডার মালেক-ওয়াহেদও বাস্তা ছেড়ে চলে গেছে। আমাকে তাড়িয়ে তারা খুব সুখ পায়নি ; কেউই তাদেরকে সহ্য করেনি।

এসব কথা শুনে মনের শূন্যতা অনেকখানি ভরে গেলো। এবার বাস্তার প্রতি যে ক্ষোভটি আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, তা যেন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এলো। অনেক কথা অনেক দৃশ্যই আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। এর মধ্যেই জলিল যখন বললো যে, ছমির উদ্দিন সাহেবই তোমার জন্য খুব বেশি দুঃখ করেছেন, শিক্ষকদের সাথে এ নিয়ে তাঁর কথা কাটাকাটিও হয়েছে, তখন আমি আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। কালো একহারা চেহারার এই ভদ্রলোক শেষের দিকে আমাদের উস্তাদ হয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই আমি তাঁর অযাচিত স্নেহ লাভ করেছিলাম। সেই স্নেহের টানেই, মনে পড়ে, আমি তাঁর গ্রামের বাড়ি 'সাকোয়াইর' গিয়েছিলাম। মদন থেকে কয়েক মাইল উত্তরে সে গ্রাম। সে সময়ে আমি কাউরাটের সেই আব্দুল ওয়াহেদ চাচার শ্বশুর বাড়িতেও গিয়েছিলাম বলে মনে পড়ছে। কারণ তিনি কাউরাট ছেড়ে এই শ্বশুর বাড়িতেই চলে এসেছেন। এখানেও সেই স্নেহের স্মৃতিই টেনে নিয়ে গেছে। স্নেহের কাঙাল আমি, তাই যেখানে যেটুকু পেয়েছি, দুহাতে কুড়িয়ে নিতে আমার বাধেনি। এমনিভাবে অযাচিত অনাবিল স্নেহের পরশ দিয়ে যাঁরা আমার জীবনের শূন্য ভাণ্ড পূর্ণ করে তুলেছেন, তাঁদের সকলের কথা কি আমি যথাযোগ্য মর্যাদায় তুলে ধরতে পেরেছি? তাঁদের স্নেহের ঋণ কি আমি পরিশোধ করতে পেরেছি?

জলিলের কাছে শুনলাম, ছমির উদ্দিন সাহেব কোণাপাড়ার পাশের গাঁয়েই এক বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। পরদিন ভোরেই জলিলকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখতে পেয়েই জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন যে, আমাদের মতো ভালো ছেলেরা মাদ্রাসা ছেড়ে চলে গেলে তাঁরা পড়াবেন কাদেরকে। সুতরাং আমি যদি বাস্তা যাই, তাহলে তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

নতুন করে স্নেহের পরশ পেয়ে আমরা তাঁর নিকট বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম ; কিন্তু বাস্তা ফিরে যাবার ব্যাপারে কোনো কথাই তাঁকে দিতে পারলাম না। পথের পাশেই জলিলদের মামার বাড়ি। তার মামাদের একজন, আব্দুল হাই—বাস্তা মাদ্রাসায় উপরের শ্রেণীতে পড়তো। সে আমাদেরকে দেখতে পেয়ে কিছুটা ধমকের সুরেই বললো যে, আমাদেরকে নাকি 'ছুম্মা খারা' শয়তানে ধরেছে, তাই আমরা মাদ্রাসা ছেড়ে এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

তাঁর কথাটা আমরা ঠাট্টা মনে করেই গায়ে মাখিনি। কিন্তু পথে আসতে আসতে হঠাৎ মনে হলো, ঠিক কথাই সে বলেছে। জলিলের যাই হোক; কিন্তু আমি? আমিতো ইতিমধ্যেই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘুরে এসেছি, তবু কোথাও মনস্থির করতে পারিনি।

সুতরাং জলিলকে না ধরলেও আমাকে নির্ঘাৎ ছুম্মা খারায় ধরেছে। মনটা কেমন উদাস হয়ে গেলো।

'ছুম্মা খারা' শব্দটি আরবি। এর শুদ্ধ উচ্চারণ 'ছাম্মা খায়রুন' অর্থাৎ অন্যত্র ভালো। সেই 'হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোথা অন্য কোনখানে।' অনেক ছাত্রকেই এমনি মনোভাবে পেয়ে বসে আর তারা বিচিত্র পাতিলের ছালুন চাখতে চাখতে জিহ্বার স্বাদই হারিয়ে ফেলে। তাদের মতো আমারও কি একই অবস্থা হয়েছে!

রাত্রে ব্যাপারটা নিয়ে জলিলের সাথে আলোচনা করলাম। তখনই শুনতে পেলাম যে, আমার বাস্তার সেই দুই শত্রু মালেক ও ওয়াহেদ কাতলাসেন মাদ্রাসায় ভর্তি হবে। আমিতো আগেই কাতলাসেন যাবার জন্য পথে নেমেছিলাম। কিন্তু মাঝখানে আমার পথ গেলো বেঁকে। আমি ওল্ডস্কীম থেকে নিউস্কীমে চলে গেলাম। আমার শত্রুরা নিশ্চয়ই মনে করবে, আমি ভয়ে পালিয়ে গেছি। না, আমি ভয় পাই না, আমি কাতলাসেনে গিয়েও দেখিয়ে দেবো যে, আমিই শ্রেষ্ঠ। হঠাৎ একটা উত্তেজনা এসে আমার মনের শূন্যতাকে জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দিলো। একটা প্রতিযোগিতার আনন্দ অর্থকরী বিদ্যা অর্জনের চিন্তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে লাগলো। আমি দেখলাম, অর্থকরী বিদ্যার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে, সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ না করলে লাভের আশা করা যায় না। অথচ আমার এই পুঁজিরই বড়ো অভাব। সুতরাং এই ফকিরা পড়াতে যেমন পুঁজি লাগে না, তেমনি লাভও নেই। কিন্তু আমার জন্য একটা নির্মল আনন্দের উপকরণ আছে। অন্ততঃ শত্রুদেরকে পরাজিত করার আনন্দ আমি একমাত্র এখানেই পেতে পারি।

কাজেই সব ছেড়ে কাতলাসেন যাবার ব্যাপারে মনস্থির করতে আমার খুব বেগ পেতে হলো না। জলিলকে বলতেই সেও দেখলাম এক পায়ে খাড়া। কাজেই পরদিন ভোরেই আমরা কাতলাসেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো বলে স্থির করলাম।

কিন্তু সেই রাত্রের শেষ দিকে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়ে আমাদের যাত্রা বিলম্বিত করে দিলো। না, রাস্তা-ঘাটের অসুবিধা নয়, একটা ঘটনার অসুবিধা। সেটি ঘটেছিলো জলিলদের মামার বাড়ির সামনের মসজিদের পাশে। সেখানে এক দরবেশ গর্তের মধ্যে চিল্লায় বসেছিলো, বৃষ্টির তোড়ে অকালে তার তপস্যা ভঙ্গ হলো।

মূল ব্যাপারটি ঘটে চারপাঁচ দিন আগে। সকাল বেলা কোণাপাড়ার লোকজন দেখতে পেলো, নদীর পানির উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসে একটি লোক ভেসে যাচ্ছে। নদীর পাড়ে লোকজনের ভিড় জমেছে, তারা চীৎকার করে 'পানি সোয়ার' এই দরবেশকে পাড়ে উঠে এসে পায়ের ধূলো দিতে কাতর মিনতি জানাচ্ছে। এর ফলে এক সময়ে দরবেশের ধ্যান ভাঙলো এবং তিনি কাপড় ভিজিয়ে সাঁতরে এসে পাড়ে উঠলেন। কিন্তু তিনিতো চিল্লায় বসেছিলেন, সেটি যখন ভেঙেই গেলো, তখন স্থলভাগেই তাকে সে কাজটি শেষ করতে হবে। তাই তিনি লোকজনের সাহায্যে মসজিদের পাশে একটি গর্ত করিয়ে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে তার মাঝখানে ধ্যানে বসেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির পানি

তাকে সেখানেও থাকতে দিলোনা। তিনি কাদা মাখিয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠে এসেছেন। আর ভক্তরা তাকে পরম আদরে ঘিরে ধরেছে।

সুতরাং কাতলাসেন যাত্রা স্থগিত করে তাকে দেখতে গেলাম। মানুষের ভীড়ের মধ্যে বসে আছেন তিনি। শ্যামলা বর্ণের দোহারা একটি লোক। পরনের আলখেল্লায় কাদামাটি লেগে আছে। তিনি পা ছড়িয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন, আর দু'দিক থেকে দু'জন তার পা টিপছে। মানুষের এই আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগলো না। মনটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেলো। পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসে আমি বললাম, 'দরবেশ না ছাই! চেহারা দেখেই মনে হয়, একটা ধূর্ত ফাঁকিবাজ। বুজুরকি দেখাচ্ছে।'

জলিল আমার কথা শুনে চমকে উঠলো। পাশের আরো একজন বয়স্ক লোক, বোধ হয় আমার কথা শুনে ফেলেছিলেন, তিনি বললেন, 'আরে মিয়া, পানিতে ভেসে আসাটাতো আর অস্বীকার করা যায় না, আমি যে নিজের চক্ষে দেখেছি।'

আমি বললাম, 'দেখেছেন ঠিকই, তবে সেখানেও ফাঁকি ছিলো।

'কী রকম?'—লোকটি বোধ হয় রেগে গেছেন।

'কারণ যে লোক পানিতে বসে ধ্যানস্থ হতে পারে, সে সাঁতরিয়ে পাড়ে উঠে কেন। সে-তো ভেসে ভেসে এসেই পাড়ে উঠার কথা!'

আমার এই কথায় সেই লোকটি কেমন যেন চুপসে গেলেন। কিন্তু তা হলেও হাল ছাড়লেন না, বললেন, 'তাহলে পানিতেই বা ভাসলো কী করে?'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'জুত মতো একটা কলসী পাছার নীচে বসাতে পারলেই ভাসা যায়। তারপর সেটি নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে সাঁতরে পাড়ে উঠতে হয়।'

এবার তিনি আর দূরে থাকতে পারলেন না। এগিয়ে এসে আমার পিঠ হাতড়ে আমার পরিচয় নিলেন। দেখলাম, তিনিও আমার দলেই, শুধু হিসাব মিলাতে পারছিলেন না। তাই আমার হিসাব মিলানো এতো তাড়াতাড়ি মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু আমিই-বা এভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করতে গেলাম কেন? আমার মানস চেতনার এই দিকটি লক্ষ্য করবার মতো। কারণ আমি আমার এই বক্তব্যে নিজেও কম বিস্মিত হইনি। বিশেষ করে আমার অনুমান যখন একটি বয়স্ক লোককে মুগ্ধ করতে পেরেছে, তখন সেটিকে আর ছেলেমানুষী বলে কল্পনা করতে পারছিনা। না, ধর্মকে আমি মানি, কিন্তু ধর্ম নিয়ে ব্যবসা-প্রতারণাকে আমি ঘৃণা করি। আব্দুল্লাহ্ মুখার্জীই এ ব্যাপারে আমাকে সচেতন করে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই শিক্ষা, আজ দেখলাম, আমার অলক্ষ্যে শক্তি সঞ্চয় করে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে মুখার্জীও আমার একজন শিক্ষক।

কিন্তু আমার মনের অন্য একটি দিকও আমাকে কম বিস্মিত করলো না। নদী পেরুলেই কাউরাট, সেখানে খালারা আছেন, আমার ছোট বোনটি আছে : আবার অন্য একটি নদী পেরুলে গোগ, সেখানে মা আছেন, অসুস্থ ছোট ভাইটি আছে। কিন্তু আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কেন আমি এভাবে আমাকে লুকিয়ে রাখতে চাইছি!

সেকি এজন্য যে, আমি লেখাপড়া ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যার ফলে আমার নিজের মনেই এমন একটা অপরাধবোধ জাগ্রত হয়েছে, যা আমাকে স্থির হতে দিচ্ছে না। আমি কোথাও স্থির না হয়ে আর তাদের সামনে যেতে পারবো না। তারা আমার বর্তমান অবস্থা শুনে কেউ দুঃখ পাবে, কেউ মুচকি হাসবে ; না, এ আমি হতে দিতে পারি না। তাই কাউরাটের কাছে এসেও সেখানে আমার যাওয়া হয়না। এমনকি আমার কাঁথা বালিশ বইপত্র আনতে বাস্তাও আমি যেতে পারি না। না, আগে তুমি ছাত্র হও, তার পরে অন্য কথা। চলো, কাতলাসেন চলো!

পরদিনই হাঁটা পথে রওনা হলাম আমরা। আশুজিয়া, রামপুর হয়ে আমুদপুর পেরিয়ে সাহাগঞ্জ আসতে আসতেই বেলা শেষ হয়ে গেলো। আমুদপুরতো আমার পৈতৃকগ্রাম, সেখানে থেকে গেলেই পারতাম। না, কোথাও থাকবো না, শুধই এগিয়ে যাবো। কিন্তু একথা বলা যতো সহজ, বাস্তবে সেই মতো চলা খুবই কঠিন। তাই দাঁড়িয়াপুর গিয়ে যাত্রা বিরতি করতে হলো। সেখানে শরিয়ত আলী মাস্টার সাহেবের বাড়ি। তিনি বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এর আগেও আমি একদিন এসেছিলাম। তিনি আমাদেরকে খুব সমাদরের সাথেই গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর কাছে আমার বৃত্তান্ত খুলে বললাম। শুনে তিনি উৎসাহ দিলেন, বললেন, 'যাই করো, তোমার বাবার কথা শুধু মনে রেখো।'

আবার বাবার স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন তিনি। কিন্তু আজ কেন জানি না, আমার জন্মদাতা এই ভদ্রলোককে ঘিরে আমার মনের কোণে একটা ঈর্ষার ভাব জেগে উঠলো। এই ভদ্রলোক পথে পথে কতো বন্ধু সৃষ্টি করে গেছেন! আর তাঁর সেই বন্ধুরা কী আবেগ আর শ্রদ্ধা নিয়ে না তাঁর স্মৃতিকে লালন করছেন। তাঁদের কথার মধ্যে, তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে জন্মদাতার স্নেহের পরশই যেন আমি লাভ করেছি! আমার মন এক নতুন আবেগে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'না, বাবা! তোমাকে আমি ভুলবো না। তোমাকে অতিক্রম করাই হবে আমার সাধনা!'

সেই আবেগ নিয়েই পরদিন পথ চলতে লাগলাম। গৌরীপুর হয়ে পায়ে হাঁটা রাস্তায় ময়মনসিংহ। পয়সা-কড়ি যে আমাদের কাছে একেবারে নেই, তা নয় ; কিন্তু পা যখন আছে, আর আবহাওয়াটাও যখন ভালো, তখন তাকে কাজে লাগানোই উচিত। দুপুরেই ময়মনসিংহ পৌঁছে গেলাম। এর আগে এই শহরে আর আসিনি। কাজেই এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে দেখতে লাগলাম। জেলখানাটাও দেখা দরকার। কিন্তু শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে তবু হাঁটতে লাগলাম সেই পথেই। রাস্তায় নতুন মাটি কাটা হয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, একটা বিরাট সাদা চাদর যেন বিছিয়ে রেখেছে কেউ। কিন্তু এই সাদা চাদরকে 'দস্তরখান' মনে করার কোনো কারণ নেই। আমাদের পেট চুঁ চুঁ করলেও সেখানে কেউ খাবার এগিয়ে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে নেই!

জলিলের বুদ্ধি বিবেচনা আমার চাইতে কিছুটা ভিন্ন। আমার মতো ফালতু সংকোচ তার নেই। সে-ই বুদ্ধিটা তুলে ধরলো। আশেপাশের বাড়িগুলিতে চেয়ে খেয়ে নিলে

কেমন হয়। মন্দ কী, এগিয়ে গেলাম। এক ভদ্রলোক বৈঠকখানার বারান্দায় বসেছিলেন। আবদার শুনেই খেঁকিয়ে উঠলেন, বললেন, 'মাদ্রাসার ছাত্র হলেই মেগে খেতে হবে, এ শিক্ষা তোমাদেরকে কে দিয়েছে? পয়সা যদি না-ই থাকে, তা হলে এক বেলা কাজ করেও তো খাবারটা যোগাড় করতে পারো। নবীতো কোনোদিন নিজে মেগে খাননি ; বরং ইহুদীর কাজ করে খাবার যোগাড় করেছেন।'

আরো অনেক কথাই তিনি বললেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই ঝাল-টক-মিষ্টি বচন শুনলাম। কিন্তু আসল ব্যাপারে কিছুই হলো না। তিনি তাঁর বচন সুধাপান করিয়েই আমাদেরকে বিদায় দিলেন। আমাদের ক্ষুধার বেগও অনেকটা কমে গেলো। মনে মনে বললাম, আর নয়, খুব শিক্ষা হয়েছে! জেলখানা দেখা আর হলো না। শহরে এসে গাঁটের পয়সা খরচ করে উদরপূর্তি করতে হলো। কিন্তু বেলা তখন পড়ে এসেছে। তবু আমাদের গন্তব্য কাতলাসেনের রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

বর্তমানে আকুয়া ইউনিয়ন পরিষদের অফিস যে স্থানটিতে অবস্থিত, সেখানে তখন একটি স্কুল, রাস্তার দুপাশেই বাঁশের ঘন জঙ্গল। বামদিকে মোড় ঘোরার আগেই এক মাঝবয়সী লোকের সাথে দেখা হলো। তিনি আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আমাদের পরিচয় ও গন্তব্য জিজ্ঞাসা করলেন। মাদ্রাসায় ভর্তি হবো শুনে তিনি বললেন, 'তুমি বাবা, আমার ওখানে চলে এসো। আমার একটি লজিং দরকার। আমার নাম ঈমান আলী, আমার বাড়ি বারুরী ; লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই চিনিয়ে দেবে।'

আমি বললাম , 'ঠিক আছে।' আর জলিল মুচকি হাসলো, বললো, কী ব্যাপার, ভর্তি হবার আগেই যে লজিং ঠিক হয়ে গেলো। আমি শুনেও কোনো কথা বললাম না। শুধু মনে হলো, হয় যখন, তখন এভাবেই হয়, না চাইতেই হয়।

যাহোক, সন্ধ্যার আগেই আমরা মাদ্রাসায় গিয়ে পৌঁছুলাম। কিন্তু তখন সেখানে লোকজন পাওয়া মুশকিল। অনেক আগেই মাদ্রাসা ছুটি হয়ে গেছে। যে দু'একজন আছেন, তাঁরা আশেপাশের লোক; মাগরেবের নামাজের জন্য বসে আছেন। তাঁদের সাথে আলাপ হলো। মাগরেবের নামাজের সময় আরো কয়েকজন এলেন। এভাবে আমাদের পরিচয়টা বিস্তৃতি লাভ করলো। আর অবাক কাণ্ড! যে কারণে পথের মধ্যে জলিল আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসেছিলো, এখানে তার বেলাতেও সেইটিই ঘটলো। একজন মুসুল্লী আমাদের পরিচয় জানতে পেরে বললেন, 'আমার খোঁজে একটা লজিং আছে, আপনাদের একজন সেখানে যেতে পারেন।'

আমি জলিলকে দেখিয়ে বললাম, 'ওকে নিয়ে যান। আমার লজিং ঠিক হয়ে গেছে। আমি পরে সেখানেই যাবো।'

জলিল সেই ভদ্রলোকের সাথে চলে গেলো। কিন্তু আমি গেলাম না। বরং খোঁজ নিয়ে মাদ্রাসার সেক্রেটারী সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। কাছেই বাড়ি। সেক্রেটারী সাহেবের নাম আবুল ফাত্তাহ খান। সেখানেই আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হলো। সেক্রেটারী সাহেবের অমায়িক ব্যবহার ভালোই লাগলো।

কিন্তু আমার লজিং বাড়িতে আমি গেলাম না কেন? এর কারণ, সেটি এই মাদ্রাসা থেকে মাইল দেড়েক দূরে। তাছাড়া তখনো আমি জানতাম না যে, জলিল যে বাড়িতে লজিং থাকবে, সেটি আমার লজিং বাড়ির পাশেই। কিন্তু এসব ছাড়াও একটি বড়ো কারণ মনের কোণে লুকিয়ে ছিলো। আমার যে শত্রুরা এখানে আসবে বলে আমি উত্তেজিত হয়ে এখানে আসার ব্যাপারটি স্থির করেছিলাম, তারা এখানে এসেছে কিনা, সেটি জানতে না পারা পর্যন্ত আমি লজিং বাড়িতে যেতে চাই না। কারণ তারা যদি এখানে না এসে থাকে, তা হলে আমার এখানে ভর্তি হওয়া অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কারণ তাদের খোঁজ না নিয়ে ভর্তির ব্যাপারটি শুধু নয়, আমার লেখা পড়ার মধ্যেই সেই আনন্দের বস্তুটি আর থাকবে না। কারণ সেই জয়ের আনন্দটি পাবার জন্যই আমি এখানে এসেছি। তা না হলে অর্থকরী বিদ্যার সুযোগ আমি ত্যাগ করতাম না।

আজ ভাবি, কী অহেতুক উত্তেজনাই না তখন পোষণ করেছি! তুচ্ছ বিষয়েও কী গভীর আবেগে মন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে! একটি তরুণের হৃদয়ে এমনি ধরনের আবেগ হয়তো একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি কিছুটা অস্বাভাবিক ভাবেই সেটি ধরে রেখেছি। কেমন একটা জিদ তখন আমাকে পেয়ে বসেছিলো। এর জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতেও আমি পিছপা হইনি। অবশ্যি সেটি না থাকলে এই বদ্ধ খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া কোনো কালেই আমার পক্ষে সম্ভব হতো না!

আর রাতের বেলা এই বদ্ধ খাঁচার কথা ভাবতে গিয়েই, যিনি আমাকে এই খাঁচা ভেঙে পালিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলেন, সেই চাচাজীর কথা মনে পড়লো। কৈ, আমিতো এবারও তাঁর কাছে গেলাম না! এই যে, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর জন্য তাঁর কাছে কি আমার অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিলো না! আমি কি তাঁকে উপেক্ষা করে অকৃতজ্ঞ হয়ে যাচ্ছিনা!

এসব ভেবে মনটা কেমন ছোট হয়ে গেলো। কিন্তু আমার মনের আঁতিপাঁতি খুঁজেও তাঁর প্রতি কোনো ক্ষোভ আর সেই ক্ষোভ থেকে উপেক্ষার কোনো চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলাম না। ব্যাপারটা আসলে একটা স্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতা মাত্র। ছেলেমেয়ে বড়ো হলে যেমন পিতামাতার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এও তেমনি একটা কিছু। তাছাড়া একটা ভয়ও আছে। যে ভয়ে আমি আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে যাইনি, এখানেও সেই ভয়। তবু মনের মধ্যে কোথাও যেন কাঁটার মতো একটা কিছু বিঁধতে লাগলো। আমি ঠিক করলাম, আগামীকালই পত্র দিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি চেয়ে নেবো।

মনে মনে সেই চিঠির একটি খসড়াও আমি তৈরী করে ফেললাম। আমি লিখবো, খুব তাড়াহুড়োর জন্যই আমি দেখা করে অনুমতি নিয়ে আসতে পারিনি। কারণ বাসায় আমার লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তাই সময় নষ্ট না করে আমি কাতলাসেন চলে এসেছি। এখানে ভর্তি হলে শান্তিতেই লেখাপড়া করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে। না, আপনার কথা অ ম ভুলে যাইনি। আমার জন্মদাতার যে নামটি আপনি

উদ্ধার করে দিয়েছিলেন, সেটি জপতে জপতেই আমি এগিয়ে যাচ্ছি। আপনি শুধু আমার জন্য খালেস দোয়া করবেন।

চিঠিটা মোটামুটি মন্দ হয়নি। অন্ততঃ আমার মনের তৎকালীন অবস্থার জন্য এটিই যথেষ্ট। কারণ এই চিঠিটা লিখে অনেকটা শান্তি পেলাম। যে অপরাধবোধের কাঁটা মনের মধ্যে এতক্ষণ বিঁধছিলো, তা যেন আর বিঁধছে না বলে মনে হলো। আমি একটা প্রশান্তির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে সক্ষম হলাম।

পরদিন মাদ্রাসায় গিয়ে জলিলের সাথে দেখা হলো। সে শুধু মালেক নামের ছেলেটির খোঁজ দিলো। সে একাই এসেছে। ওয়াহেদও আসতে পারে বলেছে। এ সংবাদ শুনে একটা দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেলো। এবার শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করা দরকার। জলিলের ব্যাপারটা সোজা। সে নহমেই ভর্তি হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা তত সোজা নয়; বরং অনেকাংশেই জটিল।

বাস্তা মাদ্রাসায় আমি যে শ্রেণীতে উঠতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তার নাম 'হাফতম' অর্থাৎ সপ্তম; কিন্তু মানের দিক থেকে চতুর্থ শ্রেণী। আমার ঘোরাফেরার ফলে সেই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক আমি খুব একটা পড়তে পারিনি। কিন্তু আমার ইচ্ছা, অবস্থা যাই হোক, পরের শ্রেণী অর্থাৎ 'শশম'-এ আমি ভর্তি হবো। কিন্তু আমার এই ইচ্ছাটি কেমন হবে, আমি পারবো কি পারবোনা, সেই মৌলবী খতিয়ে দেখার জন্য একজন সহানুভূতিশীল শিক্ষকের দরকার। ঠিক সেই মাখনার সেই মৌলবী সাহেবের মতো। যাতে সহজেই আমার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

কিন্তু কার কাছে জিজ্ঞাসা করবো? কারোর সাথেই তখনো তেমন পরিচয় হয়নি। তবু যা থাকে কপালে বলে একটি ছেলেকে আমার এই বিপদের কথা বলেই ফেললাম। এই ছেলেটির নাম লুৎফর রহমান। সে জমাতে পাঞ্জমে পড়ে। বর্তমান যদ্দূর মনে পড়ে মধুপুর হাইস্কুলে সে মাস্টারি করে। সে-ই আমাকে কারী সাহেবের কথা বললো। তিনি মাদ্রাসায় আসেন নি। কিন্তু মাদ্রাসার কাছেই তাঁর বাড়ি। লুৎফরের সাথে সেখানেই গেলাম। অদ্ভুত লাগলো তাঁর অমায়িক কথাবার্তা ও আচরণ। আমাকে একটু পরীক্ষা করেই তিনি বিরাট সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললেন। মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। কিন্তু ভর্তির ব্যাপারটি সেদিন আর হলো না।

বিকালে জলিলের সাথে আমার লজিং বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। সেই ঈমান আলীর বাড়ি। এর দক্ষিণের বাড়িতেই জলিল থাকে, সে বাড়ি ইয়াদ আলীদের। কিন্তু আমার লজিং বাড়ির অবস্থা ব্যবস্থা দেখে মনটা একটু দমে গেলো। বলতে গেলে গরীবের সংসার। এখানে থাকতে গেলে কষ্ট পেতে হবে। আগে খোঁজ নেয়া দরকার ছিলো। আগ্রহ দেখে আমি হুট্ করে চলে এলাম। এখন ফিরে যাই কী করে! কিন্তু রাতের বেলা ঈমান আলীর সাথে দেখা হবার পর মনের এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেলো। ভদ্রলোক যেন আত্মীয়ের মতোই আমার কাছে সব কিছু খুলে বললেন এবং গরীব বলে আমি যাতে তাঁকে হেলা না করি, তার জন্য করুণ আবেদন জানালেন। আমি তাঁর এই

ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিশেষ করে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে স্নেহের সেই পরশ পেলাম, যার কাঙাল আমি সর্বদাই। ঈমান আলীর বিত্ত ছিলোনা, কিন্তু চিত্ত ছিলো!

সুতরাং আমার লজিং এখানেই ঠিক হয়ে গেলো। আমি তাঁদেরই দেয়া সামান্য বিছানা পত্রে একটি নাড়ার ছাওয়া ঘরের মধ্যে পাতা একমাত্র চৌকির উপর নিজেকে ন্যস্ত করলাম। মনে মনে বললাম, ভর্তির কাজটা শেষ হলেই বাঁচি।

কিন্তু সকাল বেলা জলিল এসে মনের এই স্বস্তির ভাবটি নষ্ট করে দিলো। মালেক কাছেই কোথাও থাকে। আমার সাথে দেখা না হলেও জলিলের সাথে তার দেখা হয়েছে। সে নাকি বলেছে, পাঞ্জমে ভর্তি হবে। একথা শুনে আমার সব বন্দোবস্ত আবার উলট-পালট হয়ে গলো। আমার ধারণা ছিলো, ওরা শশমের চাইতে বেশি দূর অগ্রসর হবে না। তাই শশম নিয়েই আমি ব্যস্ত ছিলাম, এখন দেখছি, এখানে এসেও আমার পথে ওরা বাধা হয়েই দাঁড়াচ্ছে। আমি কি এই প্রথম চালেই ওদের কাছে হেরে যাবো? না, না, কিছুতেই না। আমি জলিলকে বললাম, 'ওরা যদি পাঞ্জমে ভর্তি হয়, আমিও পাঞ্জমেই ভর্তি হবো। ওরা যেখানে যাবে, আমিও সেখানেই যাবো। তবু ওদের কাছে হার মানবোনা। বাস্তায় হাফতমে উঠতে দেয়নি, অর্থাৎ ওরা আমার সাথী হতে চায় না। এখানেও পাঞ্জমে ভর্তি হবার কারণ একটাই। কাজেই আমিও পাঞ্জমে ভর্তি হয়ে দেখবো ওরা কোথায় যায়?

কথাগুলিতো খুব ডাঁটের সাথে বললাম। কিন্তু বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। কারণ একলাফে গাছে উঠতে চাইলে যা হয়, এখানে যদি তাই হয়, তা হলেতো হাত পা ভেঙে পঙ্গু হতে হবে। হাশতম মানে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য আমি পড়িনি। শশম মানে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হলে পুষিয়ে নিতে অসুবিধা হতো না। কিন্তু একলাফে সেটা ডিঙিয়ে একেবারে ষষ্ঠ শ্রেণীতে! কিন্তু কী করবো, এ আমার ভবিতব্য। তা না হলে এই প্রতিযোগিতার মুখে আমি পড়বো কেন! পথ তো খোলাই ছিলো, আমি সেই পথে অন্যত্র চলে গেলেই পারতাম। না, ব্যাপারটা বরং উলটো, আমিই প্রতিযোগিতার লোভে শত্রুজয়ের আনন্দ লাভের জন্য এখানে এসেছি। সুতরাং পিছিয়ে যাবার উপায় নেই, যুদ্ধ করতেই হবে।

বেশ একটা নতুন উত্তেজনা! মাদ্রাসায় পৌঁছে লুৎফরকে বললাম, 'আমি তোমার সাথেই পড়বো, আমি পাঞ্জমে ভর্তি হবো।'

সে শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। তাঁর আচরণের মধ্যে বন্ধুত্বের একটা আস্বাদ পেলাম। যাত্রা শুভ বলেই মনে হলো। সংসারে শুধু শত্রু নয়, বন্ধুও আছে।

১৯৪৭-এর প্রথমদিকে কোনো এক সময়ে আমি কাতলাসেন মাদ্রাসার জমাতে পাঞ্জম তথা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলাম।

অষ্টম তরঙ্গ ॥

কাতলাসেন সিনিয়র মাদ্রাসাটি ময়মনসিংহ শহর থেকে মাইল ছয়েক দূরে ফুলবাড়িয়াগামী সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। এর পশ্চিম দিকে একটি বিরাট বিল। উত্তর দিকে সেই বিল থেকে একটি খাল বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে পুব দিকে চলে গেছে। দক্ষিণ দিকে একটি ছোট বাজারের মতো জায়গা। দোকান পসার খুব একটা নেই, কিন্তু হাটবারে এখানে হাট জমে। মাদ্রাসায় দুটি চৌচালা টিনের ঘর। এর একটি পশ্চিম দিকে উত্তরে দক্ষিণে আর অন্যটি উত্তর দিকে পূবে পশ্চিমে লম্বালম্বি দাঁড়িয়ে আছে। এদের সংযোগ স্থলে উত্তর পশ্চিম কোণায় একটি মসজিদ। পশ্চিম দিকে একটি পুকুরের পাড়ে ছাত্রদের পেশাব পায়খানার স্থান। এই ছিলো তার তখনকার অবস্থা।

তবে একটা ব্যাপার এই ছিলো যে, বাস্তা, এমন কি হয়বত নগরের চাইতে এখানে ছাত্র সংখ্যা আমার কাছে বেশিই মনে হয়েছে। তাছাড়া উস্তাদদের সংখ্যাও কম নয়। কারী সাহেবের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু পরবর্তীতে গোপাল নগরের হাসান সাহেবকেই সব চাইতে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। এছাড়া হাফেজ সাহেব এবং আরো কয়জন শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে তাঁদের অধিকাংশের নাম এখন আর আমার মনে নেই। শুধু মাস্টার সাহেবের নামটা জেনে নেবার সুযোগ হয়েছে। কারণ তাঁর ছেলে অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম এখন আমার সহকর্মী।

এসব কারণেই এখানে ভর্তি হয়ে মনে হলো, আমি ঠকিনি। ছুম্মাথারা যদি ধরেই থাকে, তাহলে সে ভালো স্থানেই নিয়ে এসেছে। তাছাড়া আরো একটি ব্যাপার এখানে উল্লেখ করার মতো। এই মাদ্রাসায় একটি পাঠাগার আছে। বাস্তায় এসবের কোনো বালাই ছিলোনা। সুতরাং এটি আমার জন্য একটি নতুন আকর্ষণ। এ কারণেই কাতলাসেনে আমি অপাঠ্য পুস্তকের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এর ফলে, বলতে গেলে, এসময়েই আমার লেখার অভ্যাস গড়ে উঠে।

লেখালেখির কথা যখন এসেই পড়েছে, তখন সে ব্যাপারে কিছু কথা বলে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছি। সাধারণভাবে ছোট বড়ো সব লেখকের জীবনেই প্রথম লেখার একটা ব্যাপার থাকে; আমার জীবনেও আছে। যদ্দূর মনে পড়ে, আমার প্রথম লেখা একটি গদ্য রচনা, নাম 'শ্রীগোলের আত্মকাহিনী'। এটি ঠিক কোন সালে লিখেছিলাম, বলা খুব শক্ত। তবে এটুকু মনে পড়ছে যে, এটি লেখার স্থান বড়ো খালাদের বৈঠকখানা। সেখানে বসেই কাঠ পেন্সিলে এই করুণ কাহিনীটি আমি রচনা করেছিলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই তার করুণ পরিণতি ঘটে। এরপর সেটি কোথায় হারিয়ে গেছে, আমি আর খোঁজ রাখিনি। আত্মজীবনীর এই অংশটি লেখার অনেকদিন পর অবশ্যি তার সন্ধান পাওয়া গেছে।

কিন্তু এই করুণ কাহিনীর বিষয়টি কী ? আমাদের গ্রামাঞ্চলে স্বর্গ থেকে শিয়াল কুকুরের পতন সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। শিয়াল ও কুকুর নাকি স্বর্গে বন্ধুই ছিলো। কিন্তু শিয়াল ছিল অতিমাত্রায় লোভী। সে একদিন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলো ধবধবে সাদা থরে থরে কী যেন পড়ে আছে। স্বর্গীয় দৈ-এর সঙ্গে এই রঙের খুবই মিল। সে ভাবলো, সেই দৈ ছাড়া এগুলি অন্য কিছু নয়। লোভে তার জিভ্ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বন্ধু কুকুরকে সে তার মনের কথা বললো।কিন্তু কুকুর বিশ্বাস করলোনা। বরং শিয়ালকে সাবধান করে দিলো যে, বেশি লোভ ভালো নয়।

কিন্তু সেই যে কথায় বলে, যা নাগালের বাইরে, তার জন্যই চিত্ত বেশি চঞ্চল হয়ে উঠে। শিয়ালেরও তাই হলো, তার আহার নিদ্রা ঘুচে গেলো। শেষ পর্যন্ত কুকুর বাধ্য হলো তার বন্ধুর কথায় রাজী হতে। তারপর একদিন তারা দৈ-এর লোভে স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে নেমে এলো। কিন্তু হায়, যাকে দৈ ভেবেছিলো, সে হলো নদীর চরে থরে থরে ফোটা কাশের ফুল! সেই থেকে শিয়াল রাতের বেলা হায় হায় করে চীৎকার করে, আর কুকুর তা শুনতে পেলেই ঘেউ ঘেউ করে গালি দেয়। সেই থেকে তাদের মধ্যে এমন চরম শত্রুতা!

এই লোভের কাহিনীই শিয়াল মানে 'শ্রীগোল' নিজের জবানিতে বর্ণনা করেছে। কুকুর সেখানে হয়েছে 'কৌকর'। কিন্তু রচনাটি শেষ না হতেই সেটি আমার নুরু ভাইয়ের দৃষ্টিতে পড়ে এবং তিনি সেটি পাঠ করে মুখ বাঁকিয়ে এমন তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করেন যে, কোনো কুকুরও বুঝি কোনো শিয়ালকে এমনভাবে মুখ ভেংচায় না। এর ফলে রচনাটি শেষ করার উৎসাহ আমি হারিয়ে ফেলি এবং আমার অস্থির জীবন পরিক্রমায় সেটি হারিয়ে যায়।

কিন্তু শুধু গদ্য নয়, পদ্যও আমি লিখেছি। তবে আমার প্রথম পদ্যটি আরো পরের ব্যাপার। আর সেটি রচনার স্থান পাছপাড়ার ছোটখালাদের বৈঠকখানা। পদ্যের শিরোনাম 'জেহাদের আহ্বান' আরম্ভ কতকটা এই রকম, 'হে মুসলিম! উঠ ত্বরা করি, ধর তরবারী, করহে কাফের বধ। কাফের শোনিতে, বহিতে বহিতে, হয়ে যাক্ নদী নদ॥' এর পর কীভাবে তা শেষ হয়েছে, তা আর মনে নেই। তবে এতে কাফেরদের ভয় পাবার যে যথেষ্ট উপকরণ ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ দুটো রচনার উল্লেখ এ জন্যও প্রয়োজনীয় যে, আমার মানস পরিবর্তনের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাসও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। প্রথমটির মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব অলক্ষ্যে এসে ঠাঁই নিয়েছে, অন্ততঃ নামকরণের মধ্যেই তার আভাস পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয়টি' মহাশ্মশান' মহাকাব্য পাঠের ফসল। এর সাথে ধর্ম ও পাকিস্তানও এসে জট পাকিয়েছে। কারণ কাতলাসেন মাদ্রাসা লাইব্রেরী থেকে আমি প্রথম যে উল্লেখযোগ্য বইটি পড়ি, সেটি হলো এই মহাশ্মশান। এর সাহিত্যিক মূল্য তখন আমার জানার কথা নয়। আমাকে যা আকর্ষণ করেছে, তা হলো তার শাখা প্রশাখায় পল্লবিত বিরাট কাহিনী ও সহজ সরল ভাষা। এর ফলে একটা আবেগ এই মহাকাব্যটির পাতায় পাতায় বিচরণ

করতে আমাকে সাহায্য করেছে। আর আমি তার প্রভাবে একটি নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি। সেই ধর্মীয় চেতনা পাকিস্তানেরই দান।

আমি রামায়ন-মহাভারত পড়েছিলাম ১৯৪১-এ আর মহাশ্মশান পড়লাম ১৯৪৭-এ। এর মধ্যে ছয় বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু এই স্বল্প সময়েই আমাদের চেতনার পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। ধর্ম আগেও ছিলো, কিন্তু তার মধ্যে তখন এমন উন্মাদনা ছিলোনা। এর ফলেই সম্ভবতঃ আমার প্রথম যে লেখা পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে, সেটি পাকিস্তান সম্পর্কীয় একটি কবিতা। এর প্রকাশকাল ১৯৪৮- এর প্রথম দিক। তার বিষয় বস্তু এখন আর মনে না থাকলেও তাতে যে সেই উন্মাদনার চিহ্ন ছিলো, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এভাবে কাতলাসেন মাদ্রাসায় ভর্তি হবার পর আমার চেতনায় একটি নতুন মাত্রা যোগ হলো। আমি শুধু ধর্ম নিয়ে তখন চিন্তা করছিনা, তাকে অন্যের নিকট প্রকাশ করারও চেস্টা করছি। এর ফলে আমি এখন আর পাঠ্যসর্বস্ব একমাত্র ছাত্রই নই, আমি অপাঠ্য পাঠরত একজন সমাজকর্মীও হয়ে উঠেছি। অন্ততঃ ধর্ম কর্মের ব্যাপারে আমার নিজস্ব মতামত প্রকাশের একটা চেষ্টা চলছে।

কিন্তু এসব ব্যাপার কি তখন আমার জন্য উচিত কাজ! উচিত যে নয়, সে-তো আমিও বুঝি। কিন্তু কী করবো, আমার চেতনা যে আমাকে সেই নিষিদ্ধ বস্তুর দিকেই ঠেলে নিয়ে যায়! আদম যে কেন, কিসের টানে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের জন্য আল্লাহ্‌র সাবধান বাণী ভুলে গিয়েছিলেন, সেতো আমি আমার তৎকালীন মানসিক অবস্থা দিয়েই বুঝতে পেরেছি। সুতরাং আমি যে আমার শিক্ষক-অভিভাবকদের সাবধান বাণী ভুলে যাবো, তা আর বিচিত্র কী!

হ্যাঁ, আমি জানি; আমার মনেও সে চিন্তা ছিলো বৈকি! আমিতো দুই শ্রেণী লাফ মেরে ডিঙিয়ে শক্রজয়ের প্রতিযোগিতায় নেমেছি। আর সেই প্রতিযোগিতাতো পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং মনপ্রাণ দিয়ে সেই সাধনাই তো আমার একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন একট দৃঢ় প্রত্যয় ছিলো যে, না, পাঠ্যের সংখ্যা এখানে বেশি হলেও আমি পারবো। কারণ তখন তো তিনমাসই আমার জন্য যথেষ্ট ছিলো। আর এখনতো এক বছর সময় পাচ্ছি। সেই তুলনায় চার গুণ বেশি সময়।

এছাড়া আরো একটি ব্যাপার, সেই যে মিস্ত্রী সাহেব আমাকে সর্দার পড়ুয়া বানিয়ে সহপাঠীদের শিক্ষাদানের একটি দক্ষতা আমার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন,তিনমাস না যেতেই কাতলাসেনেও সেই ধারা চালু হয়ে গেলো। এর ফলে আমার শক্র মালেকই আমার ব্যাপারে রটিয়ে দিলো যে, আমি আসলে একটা জিন। বাস্তায় সবাই এ ব্যাপারটা জানতো, কাতলাসেনেও জানলো। কারণ ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় আমি সবাইকে টপকে প্রথম হয়ে গেলাম।

না, এতে বিস্ময়ের কিছু ছিলো না। এর মূলে ছিলো আমার অসাধারণ মেধা শক্তি। পরীক্ষার খাতায় যদি পাঠ্যপুস্তক হুবহু উঠে আসে, তাহলে পুরো নম্বর দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে কি! আমি যে প্রশ্নটি বুঝেছি, তার প্রমাণতো আমার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি, কাজেই পরীক্ষক সন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আমার প্রতিযোগীরা অসন্তুষ্ট হয়েছে। অবশ্যি যথার্থ প্রতিযোগী বলতে একজনই, মালেক। অন্য শত্রুটি, সেই ওয়াহেদ কাতলাসেনে আসেইনি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো মালেক, লুৎফরের কাছেই দাঁড়াতে পারেনি। তাকে অনেক পিছনে ফেলে লুৎফর দ্বিতীয় হয়েছে। এতেই সে মহাখুশী।

কিন্তু তাই বলে মালেক হাল ছাড়েনি। পরীক্ষাতো সামনে আরো আছে, সেখানে সে প্রতিশোধ নেবে। আমিও তো তাই চাই; সে যতোদিন পারে আমার পিছনে লেগে থাকুক, আমি বারবার তাকে পরাজিত করে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করবো!

কিন্তু প্রথম যুদ্ধে মালেককে পরাজিত করলেও অর্থের অভাবকে আমি পরাজিত করতে পারেনি। এ ব্যাপারে মালেক নিশ্চিন্ত, কিন্তু আমার চিন্তা না করে উপায় নেই। কারণ আমার পুঁজি যা কিছু ছিলো, গত তিন মাসে তা শেষ হয়ে গেছে। লুৎফরের কাছ থেকেও কিছুটা ধার করে ফেলেছি। আপাততঃ একটা লুঙ্গি হলে আরো একমাস অনায়াসে চালিয়ে দিতে পারবো। তারপর আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বেড়িয়ে আসতে হবে। তাতে রথ দেখা ও কলা বেচা দুটোই হবে।

তবে ইতিমধ্যেই আমি বাবার আরেক বন্ধুর সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি চকবাজারের বড়ো মসজিদের পাশে দাওয়াখানায় বসেন। তাঁর নাম হেকিম জাফর আহমদ। আমাদের পাশের গ্রাম নওহাটায় তিনি শাদী করেছেন। সেই সুবাদে তিনি বাবার নাতিন জামাইও হন। সুতরাং আমাদের হাল হকিকত তাঁর জানা।

কাতলাসেনে ভর্তি হবার পর আমরা, মানে অধিকাংশ সময় আমি ও জলিল, শুক্রবারে বড়ো মসজিদে গিয়ে জুম্মার নামাজ পড়তাম। এতে দরকারী এটা সেটা কেনার যেমন সুযোগ হতো, তেমনি, বলতে লজ্জা পাচ্ছি, সুযোগ পেলে ছ'আনার টিকেট কিনে পর্দার উপর জ্যান্ত মানুষের নড়াচড়াও দেখতাম। না, এ ব্যাপারে নতুন কোনো শিহরণ আমার ছিলো না। কারণ সিনেমার সাথে আমি শৈশবে নেত্রকোণাতেই পরিচিত হয়েছিলাম। সুতরাং এ সময়ে নিষিদ্ধ বস্তু আস্বাদের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মাঝে মাঝে এর প্রতি আকৃষ্ট হতাম। কিন্তু পরিবেশ মোটেও ভালো লাগতো না।

সে যাই হোক, এমনি জুম্মার নামাজ পড়ার অবকাশেই হেকিম সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয়। তাঁর কাছে আরেক প্রস্ত বাবার প্রশংসা শুনলাম। তবে আমি যে লেখাপড়া করছি, এতে তিনি খুব আনন্দিত হলেন এবং প্রয়োজনে অসুবিধার কথা তাঁকে জানাতে বললেন। সুতরাং আমার প্রয়োজনীয় লুঙ্গিটি তাঁর নিকট থেকে আদায় করার জন্য আমি উৎসাহিত হলাম। কিন্তু সেদিন জলিলকে সাথে নিতে ভয় পেলাম আমি। কারণ, কী জানি, তিনি যদি না করে আমাকে জলিলের সামনে লজ্জা দেন। কারণ এ লজ্জাও তো এক ধরনের পরাজয়ের লজ্জা!

এ কথা স্বীকার করে নিতে আমার বিন্দুমাত্রও সংকোচ নেই যে, ছোটবেলা থেকে মানুষের দয়াতেই আমি মানুষ হবার চেষ্টা করেছি। তবুও কোনো কিছুর জন্য যত্রতত্র হাত পাতার লজ্জা আমি কোনো কালেই ত্যাগ করতে পারিনি। আজ সচ্ছলতার মধ্যে যেমন একান্ত নিরুপায় না হলে কারো কাছে কিছু চাইতে পারি না, তেমনি সেদিনের অভাবের মধ্যেও আমার এ অভ্যাসটি ছিলো। বাস্তায় আমার সচ্ছল হবার উপায়টি আমি বলেছি। পরবর্তী পর্যায়েও আত্মীয় স্বজন নির্বিশেষে যাদের যা দেবার, তা নিজেদের গরজেই দিয়েছেন। আমি হাত পেতে নিলেও হাত পেতে দাঁড়াইনি।

সুতরাং সেই সংকোচ নিয়েই আজকে কাজ আছে বলে খুব সকালে বেরিয়ে পড়লাম। ময়মনসিংহগামী এই রাস্তাটি তখন সুরকি বিছানো লাল পথ। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই সুরকি চটকে গেছে। তবে সুবিধা ছিলো এই যে, দুধারের গাছের ছায়ায় ছায়ায় পথ চলা যেতো। কিন্তু বেশিদিন পথের এই শোভা রইলো না। পাকিস্তান হবার পর দিনে রাতে স্বাধীন মানুষ সেই সব গাছপালা লাকড়ির জন্য কেটে সাবাড় করে দিলো। কিন্তু সে কথা এখন থাক!

আপাততঃ সেইসব গাছের ছায়া দিয়েই আমি পথ চলছি। ঘোড়ার গাড়ি অবশ্যি ছিলো কিন্তু তাতে চড়বার সামর্থ আমার ছিলোনা। হাঁটতে হাঁটতে গরুর খোয়াড় পেরিয়ে বিস স্কীম স্কুলটি ডাইনে রেখে মোড়ল বাড়ির মসজিদের সামনে দিয়ে কোনাকুনি সামনের রাস্তায় গিয়ে উঠলাম। অন্যদিন চৌরঙ্গীর মোড়ের পরে নওমহলের কাঁচা রাস্তায় চলে যেতাম। আজ যেহেতু মজিদ ডেপুটীর বাড়িতে যাবো, তাই হাজী বাড়ির সামনে দিয়ে সদর রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম। হেকিম সাহেবের বর্ণনামতো বাউন্ডারী রোডের ডান দিকের প্রথম গলিতে ঢুকলাম এবং খুব সহজেই আমার উদ্দিষ্ট দাওয়াখানার সাইন বোর্ডটি পেয়ে গেলাম।

হেকিম সাহেব তখন রোগী দেখছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ বসার পর আমি আমার আবেদন জানাবার সুযোগ পেলাম। তিনি পরদিন কিংবা পরের শুক্রবারে আসার কথা বলে আমাকে বিদায় দিলেন। যাহোক, একেবারে নিরাশ করেননি। কিন্তু নিরাশ করলেও বলবার কিছু ছিলো না। কারণ তাঁর অসচ্ছল অবস্থার কথা মোটামুটি আমার জানা ছিলো। দুটি বিয়ে করেছেন,দু'তরফেই সন্তান আছে। এক স্ত্রী থাকেন গৌরীপুরের কাছে কাউরাট কোণাপাড়ায়, গ্রামের বাড়িতে, আর অন্য স্ত্রী, ডেপুটী সাহেবের সম্ভবতঃ ভাতিজী, এখানে এই শহরে। সুতরাং দুই সংসারের টানাপড়েনে তিনি খুব একটা সচ্ছলতা অর্জন করতে পারেননি। আমার আবেদন শুনে তাই তিনি সন্তুষ্ট হননি। তবে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমার এ প্রকার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এবং আমাকে অভাবের তাড়না থেকে মুক্তি দেবার জন্য তিনিই আমাকে একজন মুরুব্বী ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই দান আমার জীবনে নানা দিক দিয়েই ফলপ্রসূ হয়েছে। সে প্রসঙ্গ যথা সময়ে আসবে।

যাহোক, পরদিন নয়, পরের শুক্রবারেই আমাকে আসতে হলো। জলিল বাড়িতে গিয়েছিলো বলে সেদিন একাকীই আসতে পারলাম। কিন্তু সেদিন গরুর খোঁয়াড় পেরুতেই নতুন উপসর্গ দেখা দিলো; হঠাৎ বাহ্যির বেগ হলো। কোথায় কাজটা সারা যায়, সে চিন্তা করতে করতে রাস্তা ধরেই এগুতে থাকলাম। মোড়ল বাড়ি বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, রাস্তার ডান পাশে একটি ছোট পাগার আছে আর তার পাশেই একটি বটগাছের নীচে জঙ্গুলে জায়গা। সুতরাং সেখানে কাজ শেষ করে নির্বিঘ্নে পানি খরচ করতে পারলাম। তারপর নির্বিবাদে চলে গেলাম বড়ো মসজিদের সামনে। কারণ সেখানেই হেকিম সাহেব থাকবেন বলেছিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই কেউ একজন বললেন' 'কী ব্যাপার, আপনার তবনের পিছন দিকে এতো রক্ত কেন?'

তার কথায় চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম, সত্যিই আমার পিছন দিকটা রক্তে ভেসে গেছে। কিন্তু এই রক্তের উৎস কী, তা অনেক কষ্টে খুঁজে বের করতে হলো। আমার উরুর ভিতরের দিকে একটি ছোটগর্ত। বুঝতে পারলাম, চিনা জোঁক ধরেছিলো। খেয়ে ঢোল হয়ে পড়ে গেছে। আমি খোঁজও পাইনি। সেই বটগাছের তলা থেকেই আমার কাপড়ে রক্ত ঝরছে। কাজেই ধুয়ে ভিজা কাপড়ে জুম্মার নামাজ পড়তে হলো। নামাজের পর হেকিম সাহেবের দেখা পেলাম। তিনি চারটি টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। আমিও বাজারে এসে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে একটি লুঙ্গি আর আট আনা দিয়ে দু'প্যাকেট সুন্দরী বিড়ি কিনে ফেললাম। ব্যস, এতেই আমার একমাস কেটে যাবে। সুন্দরী বিড়ির তখন খুব সুনাম ছিলো।

না, আজ আমার দিনে দু'প্যাকেট সিগারেট লাগলেও সে সময়ে দু'প্যাকেট বিড়ি দিয়ে একমাস চালিয়ে দিতে পেরেছি। কিন্তু পথ হাঁটতে হাঁটতে আমার কেবলি মনে হচ্ছিলো, দু'দিন হেঁটে যদি একটি লুঙ্গি আদায় করতে হয়, তা হলে অন্যসব ব্যাপার জড়ো করতে আমার কতো দিন লাগবে! আর এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে যদি সময় নষ্ট করতে থাকি, তাহলে আমার সাধণার কী হবে! কাজেই এভাবে আর চলছেনা। একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু কী ব্যবস্থা?

আমার আত্মীয় স্বজনের চোখ কি এখনো খোলেনি। এখনো কি তারা বুঝতে পারেনি যে, আমাকে দিয়ে লেখাপড়া হবে। না , এই আবদার নিয়ে আমি কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবোনা। কাজী সাহেবের কাছেও না। কারণ আমার চিঠির উত্তরে তিনি যে সব কথা লিখেছেন, সেখানে স্বার্থের রেশ আছে। তাঁর সেই স্বার্থ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, সে কথা এখন থাক। কিন্তু তাহলে আমার উদ্ধার পাবার পথ কী?

না, কোনো পথ নেই। একমাত্র লজিং বাড়ি যাবার পথই তখন চোখে পড়ছে, সেখানেই গেলাম। যাকগে, একমাস পরে আবার চিন্তা করে দেখা যাবে।

কারণ আমি তখন খুবই ব্যস্ত। শেখ সাদীর 'করিমা' বলে একটি উপদেশাত্মক পদ্য পুস্তক আছে, আমি তখন তার পদ্যানুবাদ করছি। আর ইতিমধ্যে বেশ জোরালো একটি

লেখাও লিখে ফেলেছি, নাম 'রক্ত চোষার ফরিয়াদ'। ঘটনাটি খুবই সামান্য. কিন্তু সেই সামান্যের মধ্যেই আমি একটা অসামান্য তাৎপর্য নিয়ে এসেছি।

একদিন মাদ্রাসায় যাচ্ছি, দেখি রাস্তার পাশে ইয়া মোটা এক জোঁক দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে। তখনো তার খণ্ড দুটি একটু একটু নড়ছে। দেখে কেমন একটু মায়া হলো। ব্যস, সেই জোঁকের ফরিয়াদ রচনা করে ফেললাম আমি। সে বলছে, 'আমি রক্ত চুষি বলেই আমাকে এমন নির্মমভাবে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছো। কিন্তু মানুষ, তুমি কী করো? তুমি যে অগণিত মানুষের রক্ত শোষণ করছো, তোমাকে দ্বিখণ্ডিত করবে কে? তুমি যেদিন দ্বিখণ্ডিত হবে, সেই দিন আমার আত্মা শন্তি পাবে।' মোটকথা এমনি একটা কিছু ছিলো। সেটাই উদাহরণ উপমায় সজ্জিত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু এ ভাবনা হঠাৎ আমার মাথায় এসে চড়াও হলো কেন?

কারণ আমার মানসিক অবস্থা তখন এই ভাবনা থেকে খুব একটা দূরে নয়। যদিও করিমার প্রার্থনার মধ্যে আমি ডুবে আছি, তবু আমার চিত্ত সেই প্রার্থনায় তৃপ্তি পাচ্ছেনা। কারণ সেখানে পাপের জন্য যতোটা কাতরতা আছে, পার্থিব বস্তুর জন্য সেই পরিমানেই আছে ঘৃণা। প্রাচুর্যের মধ্যে যে ক্লেদ জমে উঠেছে, তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্য একটা আর্তি। কিন্তু আমার মনে তো এমন কোনো গ্লাণি নেই; বরং পার্থিব সামান্য একটু সচ্ছলতার জন্যই আমি লালায়িত তাই এই প্রার্থনার স্থলে 'রক্ত চোষার ফরিয়াদ' ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।

কিন্তু যতো যুক্তিই দিইনা কেন, রক্ত চোষার এই ফরিয়াদ আমার অবহেলায় হারিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালের সচ্ছলতা এসব ছোটলোকের কথাবার্তাকে উদাসীনতার মধ্য দিয়ে হারিয়ে যেতে দিয়েছে। অবশ্যি সেই সচ্ছলতা তখনো বেশ কিছুটা দূরে।

আপাততঃ নতুন একটি ছেলের সাথে পরিচয় হলো। ছেলেটির নাম ছফির উদ্দিন। বাড়ি ফুলপুর থানার বাইটকান্দি। খুব সম্ভব সে তখন কাতলাসেনে জমাতে হাফতমে পড়তো। আমার করিমার অনুবাদ শুনেই বোধ হয়, আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। আর একেবারে আমাকে বড়ো ভাই বানিয়ে ফেলে। পরবর্তীকালে ময়মনসিংহ বারের এডভোকেট মৌলানা ছফির উদ্দিন হয়েছে, কিন্তু বড়ো ভাই মানার সেই ধারা সে এখনো ভুলতে পারেনি। তাঁর জীবনপথ আমার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত; কিন্তু সম্পদে বিপদে সে আমার কাছে আসে, আমার পরামর্শ চায়। আমিও সময় পেলে তাঁর ওখানে যাই, তাঁর উপদেশ শুনি। এ সম্পর্কটি, আমার মনে হয়, এক অনাবিল বন্ধুত্বের নিদর্শন।

আমার লজিং বাড়ির কিছুটা উত্তরেই সে লজিং থাকতো। একদিন গ্রাম থেকে তার ভগ্নিপতি এসেছে বলে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো। গিয়ে দেখলাম, মাঝ বয়সী এক অমায়িক ভদ্রলোক। আমাকে দেখেই বললেন, 'আপনাকে কিন্তু আমি চিনি, ছফির আপনার কথা এতো বলেছে যে, রাস্তায় দেখলেও আপনাকে আমি চিনে ফেলতাম। যা

হোক. আমি নিজে ইচ্ছা করেই আপনার সাথে সাক্ষাত করে গেলাম। আমার একটা আবেদন আছে, সময় মতো গরীবখানায় একবার পায়ের ধূলো দেবেন।'

আমিও তাঁর বিনয় বচনের উত্তরে হেসে বললাম, 'এটা এমন কোনো ব্যাপারই নয়, ছফির নিয়ে গেলেই আমি তার সাথে চলে যাবো।'

পরে সত্যি আমি একবার বাইটকান্দি গিয়েছিলাম। সেই গাঁয়ের সাথে জড়িত হবার পূর্ব প্রস্ততিই ছিলো এই কথোপকথন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কিন্তু সে কথা এখন থাক। এখন আমার লেখাপড়ার কথা বলি, ষান্মাসিক পরীক্ষার কথা বলি। এ পরীক্ষাতেও আমার পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ন রইলো। আর এর ফলে আমার শত্রুর মনের জোর কমে গেলো। কারণ তখনকার পরীক্ষার ধারাটাই এমন ছিলো যে, তাতে কারচুপির কোনো অবকাশ ছিলো না। শিক্ষক ব্ল্যাক বোর্ডে প্রশ্নগুলি লিখে দিতেন আর আমরা নিজেদের আনা কাগজেই সেগুলির উত্তর লিখে দিতাম। এভাবেই সব ক্লাসে সাধারণ পরীক্ষাগুলি হয়ে যেতো। শুধু বার্ষিক পরীক্ষার বেলা সিট ফেলে পৃথক বসার ব্যবস্থা করা হতো। অবশ্যি সে সময় নকল যে ছিলো না, তা নয়; তবে সে কাজটিকে ছাত্র শিক্ষক নির্বিশেষে কেউই ভালো চোখে দেখতো না। আমি আমার ছাত্র জীবনে কখনো নকলের দ্বারস্থ হইনি। কারণ আমার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। এ কারণেই আমি আমার উত্তরপত্রের লেখাও পারতপক্ষে কাউকে দেখতে দিতাম না। কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই তখন ছিলো প্রতিযোগিতার। আর সেভাবেই আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম।

মালেক এই অসম প্রতিযোগিতায় বারবার হেরে গেছে। শেষ পর্যায়ে সে আমার বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলো। এমনকি তার ডাকে আমি তাদের গ্রামের বাড়ি গোবিন্দশ্রীতে গিয়েছি। একবার সেখানে সপ্তাহখানেক ছিলামও। সেসময় মালেকের কোনো এক আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে যাবার বেলা ধনু নদীর পাড় ধরে আমি সেই গাগলাজোড় গ্রামেও গিয়েছিলাম। গোবিন্দশ্রীর উত্তর-পশ্চিম কোণে ওদের বাড়ি। একটি উচুঁ টিলার চারপাশে গাছ দিয়ে বেষ্টন করা । সেগুলির অধিকাংশই ভাটি অঞ্চলের বিখ্যাত মান্দার ও মেরা গাছ। বাড়িটির বাইরেই তলার হাওরের বিরাট বিস্তার। বর্ষাকালে সেই বিস্তারই হয়ে উঠে সমুদ্র। তখন নৌকা ছাড়া এক পা-অগ্রসর হওয়া যায় না। বাহ্যি করতে হলে নৌকায় বসেই করতে হয় এবং তখন পাংগাশ মাছের লেজের ঝাপটায় কাপড়-চোপড় ভিজে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এভাবে মালেকদের বাড়ির শুকনো ও ভেজা উভয় পরিবেশই আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। আর জিহবায় লেগে আছে ওদের বাড়ির গাওয়া ঘিয়ের স্বাদ।

এ ছিলো আমার পরিপূর্ণ বিজয়। যে ছিলো শত্রু, তাকে শুধু পরাজিত করলাম না, তাকে বন্ধুতেও পরিণত করলাম। একারণেই মালেকের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কারণ সে আমাকে প্রতিযোগিতায় না ডাকলে, এভাবে আমি অসাধ্য সাধণ করতে পারতাম না। আবার সে পরাজিত হয়েও আমার বন্ধু না হলে এমনভাবে পরিপূর্ণ বিজয়ের আনন্দ আমি লাভ করতামনা। সে ক্ষত বিক্ষত হয়েও আমাকে আনন্দের স্বাদ

দিয়েছে। যথার্থ বন্ধুর লক্ষণই-তো এই। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, ঊনপঞ্চাশে আর মালেককে কাতলাসেনে দেখতে পাইনি। সে না বলেই কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে!

কিন্তু সেকথা থাক। মালেকের দেয়া সাফল্যের বোঝা আপাততঃ আমাকে টেনে এনেছে বিদ্যাগঞ্জে। এখানে আসগর নামে আমার এক সহপাঠীর বাড়ি। স্থির হয়েছিলো যে, রমজান মাসে আমি সেখানে গিয়ে থাকবো এবং আশেপাশের বেশ কয়েক জন সহপাঠীর সাথে লেখাপড়া করবো। তাই আমি বিদ্যাগঞ্জে এসেছি। তখন বোধ হয় সাতচল্লিশের জুলাই মাসের শেষদিক। আসগরদের বাড়ির সামনের ব্রহ্মপুত্র নদে খুব বেশি পানি হয়নি। চরের বালি তখনো রোদ লেগে চিক্ চিক্ করছে।

আসগরদের বাড়িটা বিদ্যাগঞ্জ বাজারের উত্তর দিকে বেশ কয়টা বাড়ির পরেই। বিকাল হলেই আমি চলে গিয়েছি বাজারে, নয়তো নদীর চরে। নদীর পাড়ে বেশ কয়টা গাছের জটলা। সেখানে দু'তিনটে হাতী বাঁধা থাকতো। শুনেছি কোন জমিদারের হাতী নাকি এগুলি, বর্ষাকালে এখানেই থাকে। কখনো চলে যেতাম সেই রেললাইনের ধারে, যেখানে তখনো কয়েকটা এবড়োথেবড়ো বগি পড়ে আছে। কিছুদিন আগেই এখানে একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। দুটি রেলগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রচুর লোক ক্ষয় হয়েছিলো। সেখানে গেলেই সেইসব লোকের আর্তচীৎকার যেন শুনতে পেতাম। হাঁটতে হাঁটতে আরো পশ্চিমে একটি বাড়িতে চলে যেতাম। সেখানে একজন উচ্চ শিক্ষিত লোকের সাথে আলোচনা করে বেশ আরাম পাওয়া যেতো। বিষয় বস্তু এই ধর্মীয় তাত্ত্বিকতাই ছিলো; কিন্তু খুব একটা কিছু মনে পড়ছেনা। আসলে এ সময়ে আমার শরীর ও মন উভয়ের অবস্থাই খুব ভালো ছিলো না। পেটের অসুখে ভুগছিলাম আর কিছুদিন আগেই খবর পেয়েছিলাম যে, কিবরিয়া আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে।

তবু স্মৃতির বলয়ে লেখাপড়া ও আলোচনার চাইতে মাছ মারার দৃশ্যই অধিকতর জ্বলজ্বল করছে। চরের বালু খুঁড়ে সাদা উরচুঙ্গা ধরা আর সেই উরচুঙ্গা বাইরে ভরে ডুবা চরের ঝাউগাছের নীচে রেখে দেয়া। তারপর পরদিন গিয়ে ডুবিয়ে সেই বাইর তোলা। এর ভেতরে কোথাও একটি, কোথাও চার-পাঁচটি পর্যন্ত বড়ো বড়ো চিংড়ি। আসলে ঝাল ঝাল মরিচে এই চিংড়ি ভাজা খেয়েই পেটে অসুখ বাধিয়েছিলাম। রোজার কারণে সেই অসুখ আর দূর হতে চাইছিলো না। এমনকি আসগরের দেয়া বাঘমার্কা বড়িকেও সে ভয় পেলোনা। পেট ফাঁপিয়ে চুয়া ঢেঁকুর তুলিয়ে সে আমাকে খুবই জ্বালিয়ে ছিলো।

তবু এ অবস্থা নিয়েই এ বাড়ি সে বাড়ি দাওয়াত খেতে হয়েছে। কিন্তু এই দাওয়াতের খাওয়া আমার পেটে কোনো দিনই সহ্য হয়নি। লেখাপড়াটা মোল্লাসুলভ হলে কী হবে, পেটটা আমার কোনো দিনই মোল্লা হতে পারলো না। মনে পড়ে বারুরীতে একদিন ঈমান আলীদের বাড়ির পূবের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে আবদারের ঠেলায় পেট এমনি ভরেছিলো যে, রাতের বেলা পেটফুলে আমার দম বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিলো। এজন্য আমি পারত পক্ষে দাওয়াতের পথ মাড়াতাম

না। কিন্তু মদ্রাসায় পড়বো, অথচ দাওয়াত খাবো না,এ তো হতে পারে না। তাই মাঝে মধ্যেই পেটের উপর অত্যাচার হতো।

তাই আসগরদের বাড়িতে এসেও রেহাই পেলাম না। একেতো রমজান মাস, তদুপরি সহপাঠীদের আবদার। সুতরাং পেটে না চাইলেও বাধ্য হয়ে যেতে হতো। একদিন নদীর পূব পাড়ের চরে আমার এক সহপাঠীদের বাড়িতে গেলাম। তাদের বাড়িতে অবশ্যি একটা ভিন্নতর আকর্ষণও ছিলো। এর আগে আমি কাপড় বোনার তাঁত এমনভাবে কাছে থেকে দেখিনি। চরকায় সুতা বলা, রং করা, তাঁতে টানা দেয়া, মাকুতে সুতা জড়ানো, তারপর পায়ে হাতে এক সাথে তাল মিলিয়ে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে কাপড় হয়ে উঠার মধ্যে একটা অদ্ভুত শিহরণ আছে। সেই শিহরণ আমার মনের মধ্যে জেগে আছে।

আরো জেগে আছে তাদের বাড়ির পিছনেই নদীর চরে বাঁধ দিয়ে মাছ মারার দৃশ্য। রাতের বেলা সেই বাঁধে মাছ উঠে এবং দিনের বেলা বাইর পেতে সেই মাছ ধরা হয়। এর মধ্যে চোখ ভাসিয়ে সাঁতার কাটে, এমন একটি মাছের দুষ্টুমি দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছি। ওকে কিছুতেই ধরা যায় না, ধরতে গেলেই সে লাফিয়ে দূরে চলে যায়।

এর মধ্যে হঠাৎ সেই মৌলবী সাহেবের কথাও মনে পড়ছে। সেই মাছটির সাথে মৌলবী সাহেবের কি খুব মিল ছিলো! আমার চরের সহপাঠীর বাড়ি থেকে কিছুদূরেই তাদের বাড়ি। কিন্তু সাক্ষাত করতে গেলে আমাদের প্রতি যে তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাকালেন, সেই মাছটি বুঝি তেমন দৃষ্টিতে তার শিকারীদের প্রতিও তাকায়না। সত্যিই তিনি সেই মাছের মতোই লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রইলেন। আমি এই সব লোকের সত্যিকার অবস্থাটা জানি। এদের অহমিকার অধিকাংশটাই অন্তঃসারশূন্য যথার্থ অহমিকা আকর্ষণ করে, দূরে ঠেলে দেয় না। নাম মনে নেই, হয়তো বা জানিনা, তবুও তার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কিন্তু আমাদের লেখাপড়া আর ভাবনা চিন্তার মাঝেই ১৪ই আগষ্ট এসে উপস্থিত হলো। সত্যিই পাকিস্তান হয়ে গেলো, দেশ স্বাধীন হলো। রাত থেকে সে কী উত্তেজনা! সকালবেলা বিদ্যাগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। সবাই গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে। যেন সেই গাড়িতে চড়ে পাকিস্তান আসছে আর সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সার বেঁধে অপেক্ষা করছে। শুধু হাতে ফুলের মালা নেই, এছাড়া আর সব কিছুই আছে। কিন্তু পথে ঘাটে দোকানে পসারে ফুলের মালা আর নিশানের মালার অভাব নেই। সবাই সেজেছে আর সাজিয়েছে। এখন গাড়িতে চড়ে পাকিস্তান এলেই হয়।

এলো সেই গাড়ি। তার আগা-পাছ-তলা ফুলের মালা আর নিশান দিয়ে সাজানো। আরোহীর এতো ভীড় যে এগুয় কার সাধ্য! তবু এর মধ্যেই ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি করে গাড়ির ছাদে গিয়ে উঠলাম। টিকেটের কোনো বালাই নেই। কিসের টিকেট! গাড়িতো এখন আমাদের। আমাদের গাড়িতে আমরা চড়ছি, পয়সা দেবো কাকে ? অন্যের বেলা

না হয়েছে জানি না, কিন্তু এ-ই আমার বিনা টিকেটে গাড়িচড়া। আগে ভয় করেছে, কিন্তু আজ আর ভয় নেই। এমনকি মৃত্যু ভয়ও আজ উত্তেজনার নীচে চাপা পড়ে গেছে। স্বাধীনতার ধর্মই বুঝি এই, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার সাথে এর কতোই না মিল।

একথা আজ মনে হলেও সেদিন মনে হয়নি। আমরাতো কিশোর তরুণ, সেদিন বয়স্ক বুদ্ধিমানদেরকেও এমনি স্বেচ্ছাচারিতায় ভেসে যেতে দেখেছি। তারাও গাদাগাদি করে আমাদের সাথে গাড়ির ছাদে উঠেছে। জনতার ভারে আর তুমুল চীৎকারে ধুকতে ধুকতে সেই গাড়ি এসে পৌঁছেছে ময়মনসিংহ স্টেশনে। শহরেও একই অবস্থা, হৈচৈ, লোকে লোকারণ্য। সেই ভীড়ের ঠেলায় টিকতে না পেরে চলে গেলাম নদীর পাড়ে। কারণ এই রোজার মধ্যে উত্তেজনা ঠেলাঠেলির ফল যা হবার, তাই হয়েছে। ঘেমে নেয়ে এখন তৃষ্ণায় প্রাণ আইঢাই করছে।

সে বছর ১৪ই আগষ্টের সাথে কি রমজানের সাতাশ তারিখের যোগ হয়েছিলো ? তা না হলে বাইরের আলোক সজ্জার সাথে তাল মিলিয়ে মসজিদে এমন প্রচণ্ড ভীড় হতো না। অবশ্যি সেই ভীড় সিনেমা হলের সামনেও কম ছিলো না। সে রাতে ঘুরে বেড়িয়ে আমি কোথায় ছিলাম ? যদ্দূর মনে হয়, রেলস্টেশনে। কারণ এ আস্তানা আমার বেশ পরিচিত। কিছুটা অসুবিধা নিশ্চয়ই আছে, তবে সুবিধা মতো জায়গায় একবার শুয়ে পড়তে পারলেই নিশ্চিন্তি। কারণ আমারতো খোয়া যাবার তেমন কিছু ছিলো না। ন্যাংটার আবার বাটপারের ভয় কী!

হ্যাঁ, আমি বিদ্যাগঞ্জ থেকে বিদায় নিয়েই এসেছিলাম। কারণ ঈদের পরব উপলক্ষে আমার বাৎসরিক আত্মীয় দর্শনে বেরুতে হবে। পীর ফকিররা যেমন মুরীদ বাড়িতে যায়, দেখা সাক্ষাত আদায় উসুল করে, আমার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি। অবশ্যি পীরের সাথে তুলনা দেয়াটা খুবই অবাস্তব হয়েছে মানি, তবে নিজের আবরু ঢাকবার জন্য এর চাইতে ভালো উপমা আমি আর খুঁজে পাইনি। যদিও আমি পীরও নই, ফকিরও নই; বরং এদু'টিকেই আমি সমান পর্যায়ে ঘৃণা করি। তবু তাদের মতোই আমাকে ঘুরতে হচ্ছে।

ধারাকান্দি ফুফুর বাড়ি হয়ে ঝলমলা দিয়ে যখন আমুদপুর যাচ্ছি, তখন এমনি এক পীরের সাথে দেখা হয়ে গেলো। আমাদের পশ্চিমের বাড়ির রুস্তম ভাই। হাতে আসা, মাথায় বাবরী চুল, পরনে আলখেল্লা, আমিতো দেখে অবাক! রুস্তম ভাই তার জোব্বা নিয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরলো। আমি তাঁর আকর্ষণ এড়াতে পারলাম না। ঝলমলারই এক বাড়িতে গিয়ে উঠলাম তাঁর সাথে। রুস্তম ভাই একবার বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো, সে সময় তাকে 'সারিবাদী সালসা' খেতে দেখেছি, এরপর ঘাটু গানের আসরেও তাকে মাথা দোলাতে দেখেছি, কিন্তু আজ তাঁর এইরূপ দেখে মেজাজটা বিগড়ে গেলো। সনাতন ধর্মের পরিচয় আর এইসব বুজুরকির পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে আমি প্রায় একটা লেকচারই দিয়ে ফেললাম। কিন্তু সব শুনে তিনি শুধু মুচকি হাসলেন।

তারপর বললেন, 'তুমিতো দেখছি অনেক কথাই জানো, কিন্তু আমরা ভাই মুক্খু শুক্খু মানুষ; এতো কথা কি বুঝতে পারি।'

কিন্তু আজ ভাবি, সেদিন কী পণ্ডশ্রমই না আমি করেছিলাম। এদের ধারাইতো পৃথক। সেই যে মেরাজের রাতে নব্বই হাজার কথা হয়েছিলো, তার মাত্র ষাট হাজার 'জাহেরী', আর বাকী ত্রিশ হাজারই 'বাতেনী'। সে সব কথাতো কোরান হাদীসে নেই, সিনা -ব-সিনা- চলে এসেছে। সুতরাং সেই সিনার সাথে সিনা না মিলালে জাহেরী জ্ঞান দিয়ে তা বুঝার সাধ্য নেই। তাই মারফতীরা সব সময় মুচকি হেসে জাহেরী আলেমদের যুক্তি তর্ককে উড়িয়ে দেয়। ভাবটা যেন, হায়রে মূর্খ।

সেদিনতো এতো কথা বুঝতাম না, তাই মনটা খারাপ হয়ে গেলো। না, রুস্তম ভাইয়ের জন্য নয়, আমার নিজের জন্য। কারণ পরিবেশ দিয়েই বুঝলাম, এরা এই যুক্তি তর্কের কোনো কদরই করেনা। তা হলে আমি এগুলি শিখছি কাদের জন্য? এসব দিয়ে পয়সা পাবো না, সে তো জানা কথা। অন্ততঃ দেশের মানুষের উপকার হলেও একটা সার্থকতা ছিলো। কিন্তু রুস্তম ভাই যে ভাব দেখালো! থাক্ সে কথা।

আমুদপুর হয়ে কাউরাট গেলাম। এবার আর আশুজিয়া বলাইশিমুল হয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। বরং বৌসের বাজার পার হয়ে আটাশিয়া দুর্গাপুরের লাহিড়ী বাড়ির সম্মুখ দিয়ে নওপাড়া হয়ে সেখানে গেলাম। যেতে যেতে মনে হলো, এই যে রাস্তায় দুটো উঁচু পুল দেখলাম, একটি রামপুর বৌসের বাজারের মাঝখানে আর অন্যটি আটাশিয়া দুর্গাপুরের কিছু আগে, এ দু'টি স্থানেরই যেন একটি বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। স্থান মাহাত্ম্য বলে যে একটা কথা আছে, তা এ দু'টি পুলের কাছে দাঁড়ালেই বেশ বুঝা যায়। সম্ভবতঃ এর কারণেই এ দু'টি স্থানকে মানুষ ভয় পায়। এগুলি নিয়ে নানা কথাও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

এমনিভাবে দেখতে গেলে ভাটি এলাকার একটি বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিতে হয়। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটা উদার বিস্তার আছে; তার আকর্ষণ অন্য স্থান অপেক্ষা এজন্যই বেশি যে, তা দৃষ্টিকে চেপে ধরে না, বরং খেলে বেড়াতে সাহায্য করে। জানি না আমার পক্ষেন্দ্রিয়ের কাছে এই বিস্তারের একটি অস্বাভাবিক আকর্ষণ আছে কিনা, তবে আশৈশব আমার ইন্দ্রিয়গুলি নদী-মাঠ-খাল-বিলের সাথে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, এ কারণেই আমার পৈতৃক গ্রাম আমুদপুরের চাইতে ধারাকান্দি আমার কাছে ভালো লেগেছে। এ কারণেই বাস্তা ছেড়ে এসে হয়বতনগর যাওয়া মাত্রই আমার মনে হয়েছে, আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো। এমন কি এই কাতলাসেন মাদ্রাসার পিছনে যদি একটি বিলের বিস্তার না থাকতো, তাহলে হয়তো আমার অস্বস্তি বোধ হতো। এটি মানুষের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবেরই একটি বিশেষ দিক।

এই কথাগুলি এখানে এ কারণেই বলছি যে, আমার প্রকৃতির মধ্যেও এমনি একটি খোলামেলা ভাব আছে। আমি অহেতুক মনের ভিতরে কোনো কিছু চেপে রাখতে পারি না। আমি চাই, আমার সামনে যা আসে, তা খোলাখুলিই আসুক, রহস্যের আবিলতা

দিয়ে তাকে যেন জটিল করে তোলা না হয়। এজন্যই জীবনের মধ্যে শুধু নয়, ধর্মীয় বিশ্বাসের রহস্যময়তার মধ্যেও আমি কোনো আকর্ষণ খুঁজে পাইনি।

আমার স্বভাবের এই দিকটি ভালো কি মন্দ তা আমি বলতে পারবোনা; তবে এর মধ্যে যে একটা সারল্য আছে, সেটি অনেক সময়ই আমার কাছে তৃপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই অকারণে সেটি আহত হলে আমার ভীষণ রাগ হয়, আমি সহ্য করতে পারিনা।

এবার কাউরাট হয়ে আমি মদন গেলাম। চাচাজীর কাছে মৌখিকভাবে আমার অবস্থাটা জানিয়ে আসা দরকার। অবশ্যি ইতিমধ্যে তিনি পত্র মারফত আমার সব কথাই প্রায় জেনে ফেলেছেন, তবু আমার সশরীরে উপস্থিতির একটা পৃথক মুল্য আছে। আর ভয়ের যে কারণ ছিলো, তা এখন আর নেই। এজন্য সবশুনে তিনি খুশী হলেন।

চাচাজীর অফিসটি বাজারের মধ্যে। আমি বিকালে পাশের একটি দোকানে বসে আমার প্রিয় বিড়ির ধোঁয়া যখন উপভোগ করছিলাম, তখন পরিচিত দোকানী হঠাৎ বলে বসলো, 'দেখুন মিয়া, আপনি কাজী সাহেবকে ঠকিয়েছেন।'

আমি কিঞ্চিৎ রুষ্ট হয়ে বললাম, 'বলেন কী, আমি ঠকিয়েছি!'

'হ্যাঁ, তিনি আশা করেছিলেন, আপনি তাঁর বড়ো মেয়েটার ভার নেবেন।'

'এমন আশা করলেন, কোথায় করলেন কৈ আমাকে তো কিছু বলেননি! তাছাড়া বললেই কি তাঁর এই আধপাগলা মেয়েটির ভার আমি নিতে পারবো! একি আপনি সম্ভব বলে মনে করেন?'

দোকানী আমার উষ্মা দেখে মুচকি হাসলো, বললো, 'মেয়েতো আরো আছে।'

আমার কেমন খটকা লাগলো, এ কী কথা বলছে লোকটা! আমি আর কথা না বাড়িয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার মনে হলো, দোকানীর এমনি সব কথা জানা ও বলার উৎস নিশ্চয় চাচাজী। কিন্তু তিনি তো আমাকে বললেই পারতেন। তাছাড়া মনের মধ্যে এমন কিছু থাকলে তাঁর সাথে আমার বিচ্ছিন্নতা এভাবে বাড়ার তো কথা নয়। অবশ্যি ইদানীং তিনি পত্রে একটি উর্দু বয়েত বারংবার লিখেছেন, সেটি এই, 'হে বাবা, আবছ্ ফেকরে দাওয়া, জুজে মসিহা দরদে দিল যাতানেহি।' যার অর্থ হলো বাবাগো, ওষুধের চিন্তা করে কী লাভ! মসিহা ছাড়া যে অন্তরের ব্যথা দূর হয় না। কিন্তু এই মসিহা তো পার্থিব অপার্থিব উভয় ব্যাপারেই প্রয়োগ করা যায়।

আর এই বা কেমন কথা, তিনি আল্লাহ্‌র মতো এমন শত পর্দার অন্তরালে থেকে চিঠি আর দূত মারফত দুর্বল বান্দার ঈমান পরীক্ষা করছেন কেন! সামনে এসে বললেই তো পারেন, 'হে বান্দা, আমি তোমার অখণ্ড আনুগত্য চাই। তিনি আমাকে বলতে গেলে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে আমার অদেয়তো কিছুই ছিলো না।

নদীর পাড়ে ঘুরতে ঘুরতে মনটা কেমন এক অভিমানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, এমনওতো হতে পারে চাচাজী কিছুই বলেননি, দোকানী তার স্বার্থ চিন্তা থেকে এমন একটা গল্প ফেঁদে বসেছে। এটাই বরং এখন আমার কাছে বিশ্বাস্য

হওয়া উচিত। কারণ তাঁর প্রতি যে আবেগ আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার পরিসমাপ্তি আমি কোনো স্বার্থ চিন্তা দিয়েই ঘটাতে চাইনা।

কিন্তু যতোই বলি, একটা অহেতুক বিষাদ আমার মনকে পীড়ণ করতে লাগলো। সেই বিষাদের ভাব নিয়েই পরদিন বাস্তা এসে পৌছলাম। আমার কাঁথা বালিশ বইপত্র গুলি উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু চাঙ্গের উপর অতিযত্নে যে পোটলাটি রেখে গিয়েছিলাম খুলে দেখলাম, তার মধ্যে দু'তিনটি ইঁদুর পরিবার খুব নিশ্চিন্ত আরামে সংসার পেতেছে। বস্তুগুলি আমার ব্যবহারে না লাগলেও তাদের ব্যবহারে লেগেছে। শুধু এটুকুই নয়, বাস্তায় ঘোরাফেরা করে বুঝলাম, সেখানেও স্মৃতির পোটলায় ইদুঁর ঢুকেছে। কেটে টুকরো টুকরো করতে আর খুব বেশি দেরী নেই। সেই যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে'আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইণ্ড,' তা বড়ো বাস্তব। অদর্শনে অপত্য স্নেহও শিথিল হয়ে যায়। সংসার বড়ো বিচিত্র স্থান।

আবার কাউরাট এসে পৌছলাম। মনের অবস্থা খুব ভালো নয়। রাহেলাদের এখানে গিয়ে আরো খারাপ হয়ে গেলো। রাহেলার হাত গলা কান সব খালি। এমনিতে অলংকারের পক্ষপাতী আমি নই। কিন্তু আমাকে আঘাত করলো 'ফটক; আনা অলংকারের সংবাদ। গ্রামাঞ্চলে এটা প্রায় সর্বত্রই হয়। অন্যের অলংকার কর্জ করে বিয়ের সময় দেয়া হয়। তারপর যথারীতি সেগুলি ফেরৎ নেয়া হয়। যার ফলে দু'মাস না হতেই বিয়ের কনের গা অলংকার শূণ্য হয়ে যায়। এই ফাঁকিটাই আমাকে খেপিয়ে দিলো। আমি ভগ্নিপতিকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিলাম।

হঠাৎ মনে হলো, আমি বেশ মুরুব্বী হয়ে গেছি। পথে রুস্তম ভাইকে উপদেশ দিয়েছি, এখানেও ভগ্নিপতিকে উপদেশ দিলাম। বড়ো ভাই হিসাবে বোনকে লালন পালন করতে না পারলেও উপদেশ দেবার সুযোগ পেলে ছাড়তে রাজী নই। ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, এবার কাতলাসেন ফেরা যাক। সেখানেই ফিরে এলাম।

কারণ আমার অনেক অকাজ পড়ে রয়েছে। মাদ্রাসা খোলার কয়েক দিন দেরী আছে। এর মধ্যে করিমার অনুবাদের কাজটি শেষ করে রাখতে হবে। মাদ্রাসা খুললে আর অন্য দিকে মন দেয়া নয়, সোজা বার্ষিক পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে হবে।

কিন্তু আমি চাইলে কী হবে, আপদ ওৎ পেতেই ছিলো। ছফির এলো তার বোনাইর পত্র নিয়ে। বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন, না গেলেই নয়। ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন রহস্যজনক বলে মনে হলো। কারণ আমি এমন কেউকেটা নই যে, বাইটকান্দির মানুষ আমার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসে আছে। যাহোক, আমি যেতে রাজী হলাম।

যাবার দিন দেখলাম আমি একা নই। আরো চার পাঁচজন ছাত্র। তার মধ্যে জলিল এবং মালেকও আছে। গাড়িতে উঠে বসার পর বললাম, 'কী ব্যাপার ছফির, এতো লোকজন! মনে হচ্ছে কোনো একটা বিশেষ ব্যাপার আছে।'

সে জানতো কিনা জানি না, তবে কিছুই বললো না। আমরা হৈচৈ করতে করতে নখলা পেরিয়ে বিকালে বাইটকান্দি গিয়ে পৌছলাম।

এর ফলে আমি আগের চাইতেও বেশি গম্ভীর হয়ে গেলাম। কিন্তু সাথীগুলির হুল্লোড় থামলোনা; তারা যেন সত্যি বরযাত্রী হয়ে এসেছে। মাস্টার মানে ছফিরের বোনাই এসে বসলেন আমার পাশে, বললেন, 'কী ভয় ভয় করছে নাকি?'

আমি বললাম, 'ঠিক ভয় নয়, তবে সাজসজ্জার অভাবে লজ্জা পাচ্ছি। আগে জানলে লজিং বাড়ি থেকে অন্ততঃ পংখীরাজ ঘোড়াটা সাথে নিয়ে আসতে পারতাম।'

আমার এ কথায় ছফির, জলিল, মালেক ওরা হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। কারণ ওরা ঘোড়াটাকে দেখেছে। আমার লজিং মাস্টার ঈমান আলীর বড়ো ভাই আরব আলী সেই ঘোড়া দিয়ে চালের ব্যবসা করে। হাড় জিরজিরে সেই ঘোড়ার সামনের দু'পায়ের উপরের দিকে গাদির ঘষা লেগে ঘা হয়েছে। দেখলে মনে হবে, কয়েকদিন আগেই তার পাখা কেটে আকাশ থেকে নামানো হয়েছে। সেই কাটা ঘা যেমন এখনো শুকায়নি, তেমনি উড়ে বেড়াতো বলে এখনো ভালো করে হাঁটতে শিখেনি।

যাহোক, এভাবে আমার মনের গুমোট অনেকটা কেটে গেলো। শুনলাম, বিকালে আরো একটা প্রোগ্রাম আছে। স্কুলের মাঠে এক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে সবাইকে যোগ দিতে হবে। বুঝলাম, এও আরেক পরীক্ষা। কিন্তু এসব পরীক্ষা দেয়া আর তাতে পাশ করাতো কোনো ব্যাপারই নয় ; বরং এগুলি ছাপিয়ে সেই আসল পরীক্ষার সেই অদৃশ্য মুখটি মনের পর্দায় ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠতে লাগলো। তরুণ মনের কল্পনায় রং ধরতে তো খুব বেশি সময় লাগে না।

যাহোক, বিকালের সেই সভায় যোগ দিলাম আমরা। কেউ কোরান পড়লো, কেউ গজল গাইলো, আর আমি একটা ছোটখাটো বক্তৃতাই দিয়ে ফেললাম। ইসলামী মূল্যবোধের উপর সেই বক্তৃতার বিষয় আজ আর মনে নেই, তবে বক্তৃতার শেষে শ্রোতাদের হাত-তালিটি এখনো বেশ মনে পড়ছে। যার অর্থ হলো এখানেও আমি পাস করেছি। মাস্টার সাহেব কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'ফুলমার্ক'।

এভাবেই আমরা সন্ধ্যার পরে অকুস্থলে গিয়ে পৌছলাম। বিরাট দু'খণ্ড বাড়ি। পশ্চিম দিকে কোথাও আরো একটি বাড়ি আছে। কিন্তু সম্মুখে যা দেখছি, তাইতো অনেক। একটু পরেই পাশের বাড়িতে গেলাম চায়ের দাওয়াত খেতে। গিয়ে দেখি, আরে এ যে আমার উস্তাদ মওলানা রউফের বাড়ি তাঁর মুখ দেখে যেন অকূলে কুল পেলাম। তিনি কয়েক মাস আগেই কাতলাসেনে শিক্ষকদের দলে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর সাথে বেশ পরিচয় হয়ে গেছে। স্বভাবে হাসিখুশী, বেশ অমায়িক ভদ্রলোক। চায়ের চাইতে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়াই হয়ে উঠলো আমার লক্ষ্য।

কিন্তু আয়োজনের ঝামেলা এড়িয়ে আমার প্রয়োজনকে ভাষা দিতে বেশ দেরী হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ রাতে তিনি আমাকে নিরিবিলি ডেকে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, তাঁর মুখ বেশ গম্ভীর। তিনি বললেন, 'যে বাড়িতে তোমাকে আনা হয়েছে,

এটি আমার শ্বশুর বাড়ি। আর যার ব্যাপারে তোমাকে এমনভাবে ঘিরে ধরা হয়েছে, সে আমার শ্যালিকা।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো আপনিই সব চাইতে যোগ্য ব্যক্তি : আপনিই বলুন, আমার কী করা উচিত!'

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, 'আমাকে কিন্তু তোমার মত জানার জন্য বলা হয়েছে, আমার মত দেয়ার জন্য নয়।'

'কিন্তু আমি যে কিছুই দেখিনি, কিছুই বুঝিনি ; আর আপনি তো সব কিছু দেখেছেন, বুঝেছেন। সুতরাং আপনার উপর আমি নির্ভর করতে পারি!'

আমার কথা শুনে তিনি হাসলেন, বললেন, 'না, মেয়ে ভালো আর ধন সম্পদেরও অভাব নেই। তবে সেই যে কথায় বলে, একটা দিক কোথাও বেশি হলে, অন্যটা তুলনামূলকভাবে কমই হয়ে থাকে। এখানেও তাই আছে।'

তাঁর কথা শুনে আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। মনে হলো, তাঁর মনে কোথাও একটা ক্ষোভ আছে, অলক্ষ্যে সেটাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু তিনি নির্বিকার ভাবেই বললেন, 'তাহলে তোমার মত কী?'

আমি বললাম, 'আমারওতো আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের সাথে বুঝাপড়া করা দরকার। সম্পর্কটাতো একদিন দু'দিনের নয়।'

'তাতো নিশ্চয়, তাই হোক', বলে তিনি আমার পিঠে হাত রাখলেন। আমি তাঁর স্পর্শের মধ্যেই একটা আন্তরিকতার ছোঁয়া পেলাম।

সে রাতেই মাস্টার সাহেবের এখানে ফিরে এলাম আমরা। মনে হলো, যে খেলা জমেছিলো, তা যেন শেষ হয়ে গেছে। সবাই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। পরদিন সকালে তাই কিছুটা ক্লান্তি নিয়েই আমরা কাতলাসেন ফিরে এলাম।

মাদ্রাসা খুলেছে। আমার ব্যস্ততাও বেড়েছে। শুধু পরীক্ষার পড়া নয়, অনুবাদটাও শেষ করে ফেলতে হবে। ইতিমধ্যে মাদ্রাসায় দেখলাম একটি পত্রিকা এসেছে, নাম 'কোরান প্রকাশ'। পত্রিকাটি মাসিক এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক নতুন লেখকদের ব্যাপারে খুব উৎসাহব্যাঞ্জক কথাবার্তা লিখেছেন। আমিও সেই উৎসাহে উৎসাহী হয়ে উঠলাম। আমার অনুবাদটি এই পত্রিকায় পাঠাবো বলে স্থির করলাম।

কিন্তু মাদ্রাসায় ইতিমধ্যেই আরো একটি ব্যাপার ঘটে গেছে। একজন নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসেছেন। নাম মৌলানা হাবিবুল্লাহ্। ছাত্রদের আলাপ আলোচনায় জানলাম, তিনি আহলে হাদীস বা লা-মজহাবী। মজহাব লা-মজহাবের ব্যাপারটা আমি আগেই কিছুটা জানতাম ; এবার ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে এ ব্যাপারে সৃষ্ট একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়া থেকে আরো জানার আগ্রহ বাড়লো। কিন্তু এ সম্পর্কে যতোই চিন্তা করলাম, ততোই আমার ধর্ম সম্পর্কীয় চিন্তায় একটা নতুন জটিলতা বৃদ্ধি পেলো।

না, বাস্তা থাকতে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা কারো কাছে শুনিনি। মনে হলো, সে অঞ্চলে বোধ হয় মজহাবীদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এখানে দু'দলেরই লোক আছে। এমন কি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কাজেই হাবিবুল্লাহ সাহেবের আগমনে অনেকেই নাখোশ হয়েছেন। কিন্তু আমি নাখোশ হবার কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। ভদ্রলোক দেখতে শুনতে ভালো, কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির হলেও অমায়িক, আর সর্বোপরি তাঁর পাণ্ডিত্য আছে। যদিও আমি নিজে সে পাণ্ডিত্য বিচারের সুযোগ পাইনি। কারণ তিনি উপরের শ্রেণীগুলিতেই পড়াতেন। তবু ছাত্রদের কথাবার্তা থেকেই এ ধারণা পেয়েছিলাম।

আমার নাখোশ না হবার কারণ আমার ধর্মীয় বিশ্বাসের সরলতা। আমার স্বভাবের মধ্যে যে একটা খোলামেলা সহজসরলভাব আছে, সে ব্যাপারে একটু আগেই আমি বলবার চেষ্টা করেছি। ধর্মীয় বিশ্বাসের বেলাতেও এই সারল্য তার পথ হারায়নি। এ কারণেই আমার মনে হয়েছে, ধর্মের যা কিছু আছে, তা যদি মানবার মতো হয়, তাহলে সবাইকে তা সমানভাবে মানতে হবে। তা না করে সেই ব্যাপারগুলি নিয়ে এমনি ভাগাভাগি আর রাগারাগি করাটা কেমন যেন বিসদৃশ! এর পিছনে তাহলে ধর্মের ব্যাপার নয়, অন্যকিছু আছে। কৈ আল্লাহ্-রসুল কোরান-কিতাবকে তো এমনভাবে ভাগ করা যায় না। এ কথা কি বলা যাবে যে, আল্লাহ্ শিয়া অথবা সুন্নী, মজহাবী অথবা লা-মজহাবী? তা হলে তাঁর বান্দারা এমনভাবে শত বিভক্ত হয়ে গেলো কেন?

আমি জানি এবং মানিও যে, আমার চেতনার মধ্যে যুক্তিবাদিতার একটা প্রভাব আছে। কিন্তু সেই যুক্তিবাদিতা হঠাৎ করে উদয় হয়নি। আমি সরল বিশ্বাসেই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আবদুল্লাহ মুখার্জীর মতো ধর্ম ব্যবসায়ীরাই আমার সারল্যকে আহত করে আমার মধ্যে সন্দেহের ক্ষত সৃষ্টি করেছে। আর সেই ক্ষত থেকে প্রবাহিত রক্তধারাই দিনে দিনে আমার চৈতন্যকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই আমি অযৌক্তিক কিছু বিশ্বাস করতে পারিনা, অহেতুক কিছু শুনলেই আমার খতিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়।

সুতরাং কাতলাসেন মাদ্রাসায় মজহাবী ছাত্রদের বাঁকা মন্তব্য আমার কাছে ভালো লাগেনি। আমি তাতে মজহাবী হয়েও যোগ দিতে পারিনি। কিন্তু ব্যাপারটা যে এইসব অঞ্চলে কতোটা রেষারেষির সৃষ্টি করে রেখেছে, তার একটা কদর্য পরিচয় পেয়েছিলাম ধানিখোলায়। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

আপাততঃ আরো একটি ব্যাপার আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। তখন 'পয়গাম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আসতো মাদ্রাসায়। তার মধ্যে একদিন দেখলাম, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে একটি রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে। বিষয়বস্তু এখন আর সঠিক মনে নেই, তবে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কেই একটা কিছু হবে। আহ্বান করা হয়েছে ঢাকা জেলার কুমরাদি মাদ্রাসার সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে। আহ্বায়ক সভাপতির নাম 'মোজাফ্ফর হোসেন'। তাঁর 'পার্থিব সুখ' নামে

একটি বই ইতিমধ্যে আমি পড়ে ফেলেছি। বইটির ভাষা-সংস্কৃত ঘেঁষা হলেও বিষয়বস্তু আমার ভালো লেগেছে। কারণ ওর মধ্যে যুক্তিবাদিতার রেশ আছে।

সুতরাং আহ্বায়কের সাথে এই পরিচয়ের সুবাদে আমি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহী হয়ে উঠলাম। কয়েক রাতের চেষ্টায় একটি রচনাও তৈরী হয়ে গেলো। কিন্তু গোল বাধলো একটি শর্ত নিয়ে। মাদ্রাসার সুপারের নিকট থেকে আমার ছাত্রত্বের সার্টিফিকেট দিতে হবে। এখন আমি যদি এই রচনা নিয়ে সুপারের কাছে যাই, তা হলে লেখাপড়া ছেড়ে বাজে কাজে সময় নষ্ট করছি বলে বকুনি খেতে হবে এবং সেই সঙ্গে আমার লেখাটিও কেড়ে নিয়ে তিনি আটকে রাখবেন। কারণ আমি ভালো ছাত্র বলেই আমার প্রতি তাঁদের কড়া নজর। তদুপরি আমি এক পয়সা বেতন দিই না, বরং উল্টো মাদ্রাসা লাইব্রেরী থেকে আমার বইপত্র দেয়া হয়। কাজেই তাঁদের এই খবরদারি আমিও মেনে নিতে বাধ্য।

কাজেই এখন উপায়? মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি জাগলো, ভিন্ন নামে পাঠাবো। কিন্তু কী নাম? এমন একটা নাম, যা প্রয়োজন হলে আমার নামের অংশ বলে চালিয়ে দিতে পারি। 'আবুল ফালাহ' শব্দটিই ভালো লাগলো; এর অর্থ সাফল্যের পিতা। কী জানি নামের টানেও হয়তো প্রতিযোগিতায় আমার সাফল্য লাভ হতে পারে। আর সুপারের নিকট থেকে সার্টিফিকেট আদায় করতেও আমি সফল হবো। হলোও তাই, অন্য একজন শিক্ষক হাসান সাহেবের সহায়তায় আমি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ফেললাম এবং যথা সময়ের পূর্বেই কুমরাদি মাদ্রাসায় তা পাঠিয়ে দিলাম।

আপাততঃ এই ঝামেলাতো মিটলো, কিন্তু মূল ঝামেলাটিই রয়ে গেছে। সেটি সেই অনুবাদ। কিন্তু সে কাজটি এতো সহজ নয় ; করিমার পদ্যানুবাদ করছি আমি। এতে শুধু অর্থ উদ্ধার করলেই হয় না, সেই অর্থটি যথাযথ রেখে ছন্দ মিলাতে হয়। কাজেই দেরী হতে লাগলো। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা, যে ভাবেই হোক শেষ করতে হবে। কয়েক দিন দিনেরাতে পরিশ্রম করে শেষ করলাম। এবার কলকাতা পাঠানোর উপযোগী একটি নতুন কপি তৈরী করতে হবে। এর মধ্যেই একদিন ছফিরের ভগ্নিপতি এসে উপস্থিত। একেবারে আমার লজিং বাড়িতে চলে এসেছেন। দেখেই বললেন, 'কী ব্যাপার, রাজকন্যা আর কতো অপেক্ষা করবে?'

আমি বললাম, 'খুব ব্যস্ত, আত্মীয় স্বজনের কাছে যেতে পারিনি। এখন বিয়ে করার চাইতে পরীক্ষায় পাস করা আমার জন্য অধিকতর জরুরী।'

তিনি শুনে হাসলেন, কিছু বললেন না। বলার কিছু ছিলোও না। কারণ আমার আগ্রহ থাকলে পরীক্ষা কোনো বাধাই সৃষ্টি করতো না। কিন্তু আমার আগ্রহই সৃষ্টি হয়নি। আয়োজনে আলাপে কল্পনায় যে নেশার ভাব এসেছিলো, তা-ও রউফ সাহেবের কথায় চটকে গেছে। সেই যে তিনি বলেছিলেন, একটি দিক বেশি হলে অন্যটি কম হয়, সেটিই আমার চেতনাকে বিমূঢ় করে দিয়েছে। কারণ সেই কমের ব্যাপারটির অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে ; চরিত্রের অভাব হতে পারে, রুচির অভাব হতে পারে, দরিদ্র

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব হতে পারে। তদুপরি শ্বশুর হবেন যিনি, তাঁর সান্নিধ্যতো আমি পাইনি। তিনি বরং দূর থেকে যেন হাতি দিয়ে হাতি ধরার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। না, আমি কারো করুণার পাত্র হতে চাই না। আমাকে পেয়ে যে বলবে, একটা অমূল্য কিছু পেয়েছে, তার হৃদয় ভরে গেছে ; আমি তার কাছেই যাবো। বিত্তের জন্য আমি কাতর নই, আমি চাই চিত্ত। আমি যে চিত্তের কাঙাল।

তাই আমার অনাগ্রহ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এই অনাগ্রহ যিনি বদলে দিতে পারতেন, সেই রউফ সাহেবের সাথেতো প্রায় প্রতিদিনই দেখা হচ্ছে। কৈ তিনি তো কিছু বলছেন না! কারণ যে ভোঁতা ছুরি দিয়ে তিনি তাঁর নিজের নাক কেটেছেন, তেমনি এক ছুরি দিয়ে আমার নাক আর কাটতে চান না। তা না হলে তিনি এমন ভাবে এমন কথা আমার কাছে বলে ফেলতেন না। তিনি আমার উপকারই করেছেন।

না, তাঁর প্রতি আমার সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখি না। আমি সেখানে বিয়ে করলে তাঁর কী ক্ষতি হতো! কাজেই তিনি যে আমাকে ফাঁকি দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছেন, একথা আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের কারো কারো মাথায় এলেও আমার মাথায় আসেনি। কারণ মূল ব্যাপারটিই আমাকে টানতে পারেনি। এ কারণেই যেখানে আমি যাই নি, সেখান থেকে ভেগে আসার কোনো প্রশ্নই উঠে না। গরু পছন্দ হলে দালালকে এড়িয়েও গরু কিনে ফেলা যায়!

অতএব এ ব্যাপারের এখানেই ইতি হয়েছিলো। এরপর এ সম্পর্কে আমাকে কেউ আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেনি। আমিও কারো কাছে কোনো কথা বলতে যাইনি। শুধু একটি কথা ভেবে এখনো অবাক লাগে ; এমন একটি ঘটনা আমার তরুণ মনে কোনো প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করলো না, আমি সবকিছু বেমালুম ভুলে গেলাম। এতোটা নির্বিকার হিসেবী আমি হতে পারলাম কী করে!

যদ্দূর মনে হয়, তখন আমার চেতনায় একটা আত্মমর্যাদার ভাব জাগ্রত হয়েছে। এর ভিত্তি তো পিতৃ পরিচয়ের মধ্যে ছিলোই। ইতিমধ্যে তার সাথে আমার নিজস্ব শক্তি যুক্ত হয়ে সেটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। আমি এটুকু অন্ততঃ বুঝতে পেরেছি যে, আমি ফেলনা নই, আমার একটা শক্তি আছে, আকর্ষণ আছে। আর তা শুধু কাছের মানুষকে নয়, দূরের মানুষকেও আকৃষ্ট করে। বস্তুতঃ তরুণ মনের এই অহমিকা বোধের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। সে শক্তি যেমন অনায়াসে গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, তেমনি পদস্খলিত হয়ে গড়াগড়ি দিতেও তার জুড়ি নেই।

তাছাড়া এরই প্রভাবে এমন কি ধর্মীয় ব্যাপারেও আমার একটা পৃথক রুচিবোধ জাগ্রত হতে আরম্ভ করেছে। প্রচলিত অনেক আচার আচরণ একারণেই আমার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারেনি। এ সময়ের একটি ঘটনায় এই পার্থক্যটি ধরা পড়ে।

বাস্তা মাদ্রাসায় থাকতে কোনো একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে দল বেঁধে দাওয়াত খাওয়ার কথা আমি উল্লেখ করেছি এবং আমি নিজেও এতে যোগ দিয়েছি। ব্যাপারটা

তখনই আমার কাছে কাঙালীভোজের মতো একটা কিছু মনে হলেও তাকে বিচার করার শক্তি আমার ছিলো না। কিন্তু কাতলাসেনে আসার পর পারত পক্ষে আমি এই দাওয়াতে যোগ দিইনি। এর কারণ শুধু আমার পেটের অসুবিধা নয়. যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি; বরং পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই কেমন একটা প্রতারণার গন্ধ ছড়িয়ে আছে বলে আমার মনে হয়েছে। কারণ মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থেই এমনি সব দাওয়াতের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত মুসুল্লীরা কোরান ও দোয়া দরূদ পড়ে আত্মার সদ্‌গতি কামনা করেন। কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় এমনি সদ্‌গতি কামনার কোনো মূল্য নেই। কারণ যদি এতে আত্মার সদ্‌গতি হয়, তা হলে পাপাচারী ধনী ব্যক্তিরা অনায়াসে এসবের মাধ্যমে বেহেশতে যাবার সুযোগ লাভ করতে পারে। যারা এসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তারাও জানেন যে, মৃত ব্যক্তি তার কৃতকর্মের ফল ছাড়া অন্য কোনো কিছুই ভোগ করার ক্ষমতা রাখে না। পুত্র সন্তান, স্থায়ীদান ইত্যাকার ব্যাপারগুলি তার কৃতকর্মেরই অংশ। এমনকি তার জন্য জানাযার নামাজে যে দোয়া করা হয়, তাতেও মৃত ব্যক্তির চাইতে একটি সার্বজনীন কল্যাণ কামনাই বড়ো হয়ে ওঠে। অথচ এসব জানা সত্ত্বেও আলেমরা এমনি অনুষ্ঠানে যোগ দেন শুধু প্রচলিত প্রথার অনুসরণে আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য। আর এ প্রথাটিও পড়শীদের প্রভাবেরই ফসল।

কিন্তু আমি যে ঘটনাটির কথা বলতে চেয়েছিলাম, সেটি একটু ভিন্ন ধরনের। আমার লজিং বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি পুকুরওয়ালা বাড়িতে সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এই অনুষ্ঠানটির নাম 'খত্‌মে শেফা'। সাধারণভাবে মুমূর্ষু ব্যক্তির আরোগ্য কামনায় এমনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে 'মুশকিল আসান'ও এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কোরানের একটি আয়াত লক্ষাধিক বার জপ করে উদ্দেশ্যের জন্য দোয়া করা হয়। ব্যাপারটা দশ বারোজন লোকের সারাদিনের কাজ। আমি অনেকটা কৌতূহলী হয়েই এতে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব এবং হীনমন্যতার প্রভাব আমাকে খুবই ব্যথিত করেছিলো। এর আগে আমি এ ধরনের অনুষ্ঠান দেখিনি; কিন্তু এর ফলে পরবর্তীকালে এ ধরনের অনুষ্ঠানে আমি আর যোগ দিইনি।

না, অন্তর থেকে কারো জন্য কল্যাণ কামনার যে কোনো মূল্য নেই, সে কথা আমি বলছি না। তবে এর প্রমাণ আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া উচিত। কিন্তু কথিত অনুষ্ঠানে তারই প্রচণ্ড অভাব লক্ষ্য করেছি। অবশ্যি একটু আগেই কৃতকর্মের ফল পরিবর্তনের ক্ষমতা যে এমনি কল্যাণ কামনায় নেই, সে কথাও আমি বলেছি। আর এখানেও রোগমুক্তি যে এতে সম্ভব নয়, সেটা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই একে একটা অন্তঃসার শূন্য প্রথা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আমার মনে হয়েছে, আমরা দু'বেলা পেট পুরে খাবার ও দুটি টাকা পাবার লোভেই এখানে সমবেত হয়েছি।

কারণ অন্তর আর আন্তরিকতার ব্যাপারটিই ভিন্ন রকম। আমার লজিং বাড়ির একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। আমি আগেই বলেছি যে, আমার লজিং

মাস্টার ঈমান আলীর অবস্থা সচ্ছল নয়। কোনো প্রকারে কায়ক্লেশে তিনি তাঁর সংসার চালান। অথচ এরই মধ্যে তিনি আমার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। আর আমি শুধু তাঁর আন্তরিকতার প্রতি সহানুভূতি জানাতেই তাঁর অসচ্ছলতার দায় ভাগ গ্রহণ করেছি।

অথচ ইতিমধ্যেই আমার যেটুকু সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে আমি ইচ্ছা করলে এই এলাকার যে কোনো সচ্ছল পরিবারে আমার স্থান করে নিতে পারতাম। সে কথা আশে পাশের অনেকে অনেকবার বলেছেনও। তাঁরা ঈমান আলীর প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ পোষণ না করেও শুধুমাত্র আমার কষ্ট লাঘবের জন্য সৎ পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আমি এই গরীব ভদ্রলোকের অন্তরকে আঘাত করতে পারিনি।

আমার লজিং বাড়ির পশ্চিমের বাড়িটার নাম সরকার বাড়ি। সেখানে এক সদালাপী বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁর নাম হোসেন আলী সরকার। তিনি কতোটুকু শিক্ষিত ছিলেন, তা আমি জানতাম না। কিন্তু তাঁর প্রয়োজনীয় সচ্ছলতা এবং সেই সঙ্গে একটা রুচিবোধ ছিলো। এর আকর্ষণেই আমি তাঁর এখানে গিয়ে আড্ডা দিতাম। আর তিনিও সস্নেহ সমাদরে আমাকে গ্রহণ করতেন। এভাবে তাঁর এখানে কতো যে চা নাশতা খেয়েছি, তার আর ইয়ত্তা নেই। তিনিই একদিন হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার বোধ হয় খাওয়া-দাওয়ায় খুব কষ্ট হচ্ছে!'

আমি বললাম, 'কষ্টের সংসার আমাদের, কষ্ট তো হবেই।'

তিনি বললেন, 'দু'বেলা রুটি খাওয়ার অভ্যাস কি আগে ছিলো?'

আমি তাঁর কথায় অবাক হয়ে উত্তর দিলাম, 'রুটি কোথায়,আমিতো দুবেলা ভাতই খাচ্ছি। আপনি রুটির কথা শুনলেন কার কাছে?'

আমার কথা শুনে তিনি কেমন যেন থমকে গেলেন, বললেন, 'ইদানীং ঈমান আলীর কিছুটা টানাটানি যাচ্ছে। আমার স্ত্রী বলছিলেন যে, ওরা এখন দু'বেলা রুটি ছাড়া আর কিছু খেতে পারছে না। তাই আপনাকে মাঝে মধ্যে আমার এখানে জিভের স্বাদ বদলাবার জন্য বলবো ভেবেছিলাম।'

আমি তাঁর এই স্নেহের স্পর্শে অভিভূত হলাম। কিন্তু রুটির ব্যাপারটি আমার মনে একটা খটকা হয়ে রইলো। রাতের বেলা ঈমান আলীকে পাকড়াও করলাম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি কয়েক মুহূর্ত থ মেরে রইলেন, তারপর বললেন, 'আপনি যে আমার এখানে আছেন, এই-ইতো আমার জন্য যথেষ্ট। তাই বলে আপনাকে তো আর কষ্ট দিতে পারিনা।'

আমি কিছুটা রাগ করেই বললাম, 'তাই বলে আপনারা দু'বেলা রুটি খেয়ে আমাকে দু'বেলায় ভাত খাওয়াবেন, এ কেমন কথা! আপনিতো আমার সব কিছুই জানেন, আমি এমন কোনো বড়ো লোকের পুত নইযে রুটি খেতে আমার কষ্ট হবে!'

ঈমান আলী আর কিছু বলতে পারলেন না, শুধু আমার পিঠের উপর তাঁর ডান হাতটি রাখলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম, দেখলাম তাঁর চোখ দু'টি ছলছল করছে। আমার চোখও কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এলো!

অথচ এই ঈমান আলীকে সৎ লোক বলতে যা বুঝায়, তা বলা যায় না। তাঁর অনেক নিন্দাই আমি অনেকের মুখে শুনেছি। অতীতে খুন-খারাবিসহ অনেক কিছুই তাঁর চরিত্রে জড়িয়ে আছে। আলোচ্য সময়ে তিনি পাটের ফড়িয়া, নানা ধরনের টাউটগিরি করেন। তাঁর আয়ের একটি বিশেষ উৎস ছিলো দাপুনিয়া বাজারের কাছে মাস খানেক ধরে যাত্রাগানের আসর জমানো। এ বছর পাকিস্তান হয়ে মানুষ বুঝি ধার্মিক হয়ে গেছে। তাই যাত্রার আসর জমেনি। তাঁর সংসারেও টানাটানি বেড়েছে।

কিন্তু এতো সব জানার পরও যে আমি তাঁর অসচ্ছল সংসারে রয়ে গেলাম, সে কিসের জন্য? সেই অন্তরের জন্য। কাজেই অন্তর আর আন্তরিকতা কাকে বলে, আমি তা খুব ভালো করেই জানতে পেরেছিলাম। পারিবারিক বেষ্টনীতে যারা বড়ো হয়ে ওঠে, হয়তো তাদের কাছে ব্যাপারটি এমনভাবে ধরা পড়ে না। কিন্তু রাস্তায় নেমে এলে এর পরিচয় জোনাকীর আলোর মতোই অন্ধকারে পথ দেখায়। আমি তাই এ ব্যাপারে এতোটা সচেতন। এ কারণেই আমি যখন নিজেকে চিত্তের কাঙাল বলি, তখন পুঁথির কথা আউড়ে বুজুরকি দেখাবার জন্য বলি না, আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। সত্যি বলতে কি, চিত্তের জন্য আমার এই কাঙালিপনা এখনো ঘুচেনি।

কিন্তু সে কথা থাক। আপাততঃ আমার অনুবাদের নতুন কপি তৈরী হয়ে গেছে। আমি একদিন কোরান প্রকাশের ঠিকানায় তা পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু আরেকটি খবর এসে আমার পরীক্ষার পড়ায় কয়েকদিনের জন্য ব্যাঘাত ঘটিয়ে দিলো। সেই পয়গাম পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই দেখতে পেলাম, কাতলাসেন মাদ্রাসার ছাত্র আবুল ফালাহ্ কুমরাদি মাদ্রাসা কর্তৃক আহুত রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে স্বর্ণ পদক পেয়েছে। খবরটা একান্তই খুশির, কিন্তু আমি খুশী হতে পারলাম না। কারণ সে পথ আমি নিজেই বন্ধ করে রেখেছি। একমাত্র আমার শিক্ষক হাসান মৌলবী সাহেব ছাড়া আর কেউ এই ছাত্রটিকে চিনে না। অথচ মুশকিল হয়েছে এই যে, আমার একমাত্র সাক্ষীটি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। আমার ভ্যাবাচকা অবস্থাটা দেখবার মতো। যদি জোর গলায় বলতে যাই যে, আমিই আবুল ফালাহ, তাহলে কেউ অবিশ্বাস করলে আমি কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবো না। কারণ একদিকে যেমন এই আবুল ফালাহ্ শব্দটি আমার নামের সাথে কেউ কোনোদিন দেখেনি, তেমনি রচনাটির কোনো কপিও আমার কাছে নেই। সুতরাং আমার অবস্থা হলো, বড়শীতে একটা প্রকাণ্ড মাছ বাধিয়েছি, কিন্তু সেটাকে কিছুতেই ডাঙায় তুলতে পারছিনা। তাছাড়া সুতা ছিড়ে যাবার দুঃশ্চিন্তাও আছে। যদি কেউ আবুল ফালাহ সেজে এসে দাঁড়ায়, তখন কী হবে!

কোনো আনন্দের খবর যে এমন ভাবে নিরানন্দের উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা এর আগে আমি আর এমনভাবে উপলব্ধি করিনি। যাহোক, দু'চারজন বন্ধু বান্ধব এবং হাসান সাহেবের সহায়তায় আমি নিজেকে আবুল ফালাহ্ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম। কিন্তু লেবু বেশি চটকালে যেমন তার স্বাদ-গন্ধ কোনোটাই থাকে না, আমার এ ব্যাপারটিও তেমনি হয়ে গেলো। কিন্তু সে যাই হোক্ আমার স্বর্ণপদক কোথায়?

মরাদি মাদ্রাসায় শেষ পর্যন্ত পত্রই লিখলাম। উত্তর এলো যে, যথা সময়েই তা পাঠানো হয়েছে। তা হলে তা গেলো কোথায়! খুঁজে পেঁতে শেষটায় মাদ্রাসার সেক্রেটারী সাহেবের বাড়ি থেকে তা উদ্ধার করলাম। তাঁর নামতো আবুল ফাত্তাহ খান। পিয়ন ছাত্রকে না পেয়ে শেষমেষ তার হাতেই বস্তুটি তুলে দিয়ে গেছে। যাহোক, আবুল ফাত্তাহ এবার সেটি আবুল ফালাহ্‌র গলায় পরিয়ে দিলেন।

সরলতার বিপদ বুঝি এখানেই। আমিও এর জন্য কম বিপদে পড়িনি। এমনি আরো একটা ব্যাপার হলো করিমার অনুবাদের সেই পাণ্ডুলিপি। সেটি পাঠানোর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই পত্র এসে উপস্থিত। অনুবাদটি দীর্ঘ ব্যাপার বলে পত্রিকায় ছাপানো সম্ভব নয়। অন্য কোনো লেখা থাকলে যেন পাঠিয়ে দিই। দিলাম একটা কবিতা পাঠিয়ে। সাথে একটি পত্রও দিলাম, যেন অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়। মাস তিনেক পরে 'পাকিস্তান' নামের এই কবিতাটি সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও অনুবাদটি আর ফেরৎ পাইনি। এদিকে অবহেলার ফলে আমার খসড়াটিও ততোদিনে হারিয়ে গেছে। এভাবে আমার একটি কষ্টের ফসল 'কোরান প্রকাশ' সম্পাদকের আবর্জনা স্তূপে ঠাঁই লাভ করেছে।

এ ব্যাপারটি আরো বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালে অনুবাদে যদি আমার কোনো দক্ষতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে তার উৎস হলো এই করিমার অনুবাদ। আমি জানিনা, সেকালে শেখ সাদীর কবিতার কোনো অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা। যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আমার এই অনুবাদটি ভিন্নতর মর্যাদাও বহন করতে পারতো। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, পাঠক কেন, আমার নিজেরও আর তা পড়ে দেখার কোনো সুযোগ নেই। স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে অনেক কষ্টে তার একটি মাত্র ছত্রের আভাস পেয়েছি-'বোরাক পরে সোয়ার হয়ে গেলেন তিনি জাহাঙ্গীর ; একের পর এক ছাড়িয়ে গেলেন সাততলা ঐ নীলপুরীর।' শুনতে মন্দ লাগছে না। হয়তো অনুবাদটি ভালোই হয়েছিলো। কিন্তু মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সেই ঐশ্বর্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় বোধ হয় পরবর্তীকালে আমি পত্র পত্রিকায় লেখা পাঠাতে খুব একটা উৎসাহ পেতাম না। এখনো সেই নিরুৎসাহ ভাব যায়নি।

যাহোক, এভাবেই বিভিন্ন ব্যাপার এসে পরীক্ষার জন্য আমার প্রস্তুতিকে বিঘ্নিত করেছে। কিন্তু সত্যিই কি বিঘ্নিত করেছে? বোধ হয় না। কারণ আমিতো বিদ্যাগঞ্জে গিয়েই সে প্রস্তুতি অনেকটা সেরে রেখেছিলাম। সেখানেতো শুধু সহপাঠীদের সাথে পড়িনি, বলতে গেলে তাদেরকে পড়িয়েছি। আর এ কাজটি করলে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে আবছা ঝাপসা সব ধারণাই পরিষ্কার হয়ে উঠে। কারণ নিজে না বুঝলে কাউকে বুঝানো যায় না। সুতরাং এখন আমার কাজ হলো চোখ বুলিয়ে নেয়া। তা সে কাজ করতে আমার কোনো বেগ পেতে হবে না। কারণ আমারতো বাছ বিচারের কোনো প্রশ্ন নেই, কমন আন-কমন খোঁজার কোনো বালাই নেই ; আমার শুধু আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পড়ে যাওয়া। তারপর স্মৃতির কাজতো স্মৃতিই করবে।

তবু এ সময়েই প্রথম লক্ষ্য করলাম, কেমন একধরণের একটা দুঃশ্চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। মনে হচ্ছে আমি যেন কিছুই জানি না, কিছুই শিখিনি। এ ভাবটা বাস্তায় ছিলোনা। সেই একচল্লিশের প্রাইমারী সেন্টার পরীক্ষায় ছিলো কিনা মনে করতে পারছিনা। তবে বাস্তার চাইতে বিষয়বস্তু এখন বেশি আর সবটাই লিখে পরীক্ষা দিতে হবে। সুতরাং দুঃশ্চিন্তা হওয়াটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্নপত্র হাতে আসার পর আবার অবস্থা ভিন্ন রকম। একেকটা প্রশ্ন পড়ছি, আর দুঃশ্চিন্তার মেঘ কেটে যাচ্ছে। প্রশ্নপত্র পড়া শেষ হলে মনে হলো, আমি এই কয়টি প্রশ্নেরই উত্তর যেন শিখে এসেছি, আর বাদবাকী সব কিছু ভুলে গেছি।

হ্যাঁ, এভাবেই আমার পাঞ্জমের পরীক্ষা শেষ হলো। ফল তো কী হবে জানাই ছিলো, সহপাঠীদের চাইতে অনেক নম্বরের ব্যবধানে আমি প্রথম হয়ে পাশ করলাম। এবার আমি যে শ্রেণীতে উন্নীত হলাম, তার নাম 'চাহারম'।

নবম তরঙ্গ ॥

আমার জীবনকাল খৃষ্টীয় ১৯৪৮ সনে এসে প্রবেশ করেছে। এ সনটি আমাদের জাতীয় জীবনে নানা কারণেই স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশেষ করে জিন্নাহ সাহেবের কথা বলা যায়। জাতির পিতা হয়ে তিনি ঢাকায় এসে রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দুর কথা বলেছিলেন, তার প্রতিবাদে সেদিন কার্জন হলে 'না, না,' ধ্বনি উত্থিত হয়েছিলো। সেই-ই বোধ হয়, পাকিস্তানী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রথম সরব প্রতিবাদ। কিন্তু আমিতো নিজে সেই দৃশ্য দেখিনি, সেই শব্দ শুনিনি ; এমন কি তার কোনো আলোচনাও মাদ্রাসার পরিবেশে ছিলো না। পত্র-পত্রিকা মাদ্রাসায় আসতো, কিন্তু কালেভদ্রে ছাড়া আমরা তার দেখা পেতাম না। তবে এ ব্যাপারটি না জানলেও জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শোনার শিহরণ এখনো ভুলতে পারছিনা। মাদ্রাসার এই নিস্তরঙ্গ পরিবেশেও তা আলোড়ন তুলেছিলো।

না, তখনো আমি রাজনীতি বলতে কী বুঝায়, তার খুব একটা কিছু জানি না। বাস্তায় থাকতে পাকিস্তানের জন্য চোঙ্গা ফুঁকেছিলাম, বক্তৃতা শুনেছিলাম ; কিন্তু এসব কাজ আমার মধ্যে চেতনার কোনো ভিত্তি তৈরী করতে পারেনি। কাতলাসেনে তাই রাজনীতি নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা জন্মায়নি। আমার প্রতিযোগিতা, আমার আত্মপ্রকাশের তাগিদই আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। আমার কাছে তখন ধর্মীয় ব্যাপারটাই বড়ো ; আমি তখন ধর্মের রহস্যময় জগতে প্রবেশ করেছি।

কারণ এই চাহারম, যার শব্দার্থ হলো চতুর্থ, কিন্তু মানের দিক থেকে সপ্তম এবং এর পরবর্তী শ্রেণী 'সুত্তম,' যার অর্থ তৃতীয় ও মান অষ্টম ; এ দুটি শ্রেণীর পাঠ্যের মধ্যে একটা অভিন্নতা আছে। এখানে এসেই আমরা কোরান হাদিসের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলাম। এছাড়া ইসলামী শাস্ত্র, ইসলামী শাস্ত্রের মূলনীতি, তর্কশাস্ত্র, আরবি সাহিত্য ইত্যাদির তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে যে একটা বিশালতা আছে তার স্বাদ পেলাম। তদুপরি এই দুটি শ্রেণীর পাঠ্যের উপরই 'আলিম' সেন্টার পরীক্ষাটি হয়ে থাকে। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার শ্রেণী বিন্যাসে এর স্থান সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সমতুল্য। এর পূর্বে 'দাখিল' নামে যে সেন্টার পরীক্ষাটি বর্তমানে চালু হয়েছে, তা আমাদের সময়ে ছিলো না। 'দাখিল' শব্দের অর্থ প্রবেশিকা অর্থাৎ এন্ট্রান্স। সুতরাং 'ফাজিল' এখন বি.এ, আর 'কামিল' অর্থাৎ টাইটেল এখন এম, এ পরীক্ষার সমতুল্য।

কিন্তু সে যাই হোক, এই ধর্মীয় শিক্ষার জগৎকে আমি রহস্যময় বললাম কেন! কারণ এখানে প্রবেশ করেই বুঝলাম, ধর্মীয় ব্যাপারে সরল বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। সেই যে উস্তাদজী এক শাগরেদকে অর্থসহ 'আমপারা' পড়াচ্ছিলেন, অর্থ বলতে বলতে

তিনি বললেন, 'এক রেণু পরিমাণ ভালো করলে, তাও দেখতে পাবে আর এক রেণু পরিমাণ মন্দ করলে, তাও দেখতে পাবে!'

একথা শুনে শাগরেদ আমপারা গুটাতে আরম্ভ করলো। উস্তাদজী বললেন, 'কী ব্যাপার, তুমি চলে যাচ্ছো কেন?'

শাগরেদ বললো, 'আর কী শেখার আছে উস্তাদজী। সবইতো বলে ফেলেছেন। এখন সময় নষ্ট না করে সেই ভালো মন্দের ব্যাপারটাই দেখতে থাকি!'

না, শাগরেদের এই সরল বিশ্বাসের স্থান মোটেও নেই। এ হল মতভেদ আর বাক্‌বিতন্ডার এক প্রকাণ্ড জগৎ। নামাজের মতো একটি সর্বজনমান্য ব্যাপারেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ষাটটি স্থানে মত পার্থক্য আছে। আবার মজার ব্যাপার এই যে, সবারই যুক্তি প্রমাণের উৎস এই হাদিস-কোরান। অন্যান্য ব্যাপারের কথা নাইবা বললাম। সেখানে তো কথার কচকচিতে মাথা ঘুলিয়ে যাবার যোগাড়!

আমিতো আগেই বলেছি, আমার স্বভাবের মধ্যে ছিলো সেই শাগরেদের সারল্য। এসব কচ্‌কচিতে আমি কেবলই আহত হয়েছি। আমার কেবলই মনে হয়েছে, একই উৎস থেকে উৎসারিত নদী এতো শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হলো কেন? পথের বাধা, উপ নদীর আকর্ষণ আর মজে যাওয়া অন্য নদীর খাতের টানেই কি স্রোতধারা এমন শতধা বিভক্ত হয়েছে? কিন্তু আমার এ সব প্রশ্নের উত্তরতো মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী বা তার পরিবেশে নেই। তাই সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

এরপরে সোনার উপর সোহাগার মতোই এসে দাঁড়িয়েছে আধ্যাত্ম তত্ত্ব। ও-কে তো বলেছিলাম নদী, কিন্তু এ হলো সাগর! এখানে 'কূল নাই, কিনার নাই, নাইকো দরিয়ার পাড়ি।' এখানে অতলে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। জাহেরীতে যুক্তিতর্ক আছে, কিন্তু বাতেনী তো যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। তাই তার রূপেরও যেমন শেষ নেই, ঢেউয়েরও তেমনি বিরাম নেই ; উঠছে আর পড়ছে!

ধর্মীয় বাদ বিসংবাদ আর তথ্য ও তত্ত্বের এই বিশ্বরূপ দর্শন কি তখনি আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো? না, তা হয়নি ; তবে হৃদয়তো উন্মুখ হয়েইছিলো, এরপর যতোই শুনেছি, যতোই দেখেছি ততোই চেতনা আন্দোলিত হয়েছে, চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছে আর আমার সরল বিশ্বাসের নৌকা কেবলই ফুটো হয়েছে। কতো সিঁচবো আমি নোনা জল! এর উপর আছে ঢেউয়ের ঝাপটা। এর ফলে কখন যে আমার নৌকা তলিয়ে গেছে, আমি বুঝতেও পারিনি। শুধু দেখলাম, আমি এক মহাসাগরে সাঁতার কাটছি!

কিন্তু সে কথা এখন থাক। এখন আমার বাস্তব জীবনের কথা বলি। বাইটকান্দি আমাকে ছেড়েছে, কিন্তু আমার অভাব আমাকে ছাড়েনি। শব্দার্থের উত্তেজনায় যতোক্ষণ মজে থাকি, ভালো লাগে ; কিন্তু এরপরই শুধু অর্থের জন্য মন খারাপ হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন আর দয়ালু জনের হাতে গুঁজে দেয়া অর্থের ব্যাপ্তিতো খুব বেশি নয়। তদুপরি কোনো উপলক্ষ ছাড়াতো তাদের কাছে আমার যাওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং আমার একটি অর্থের উৎস দরকার, যাতে করে আমার শব্দার্থ ও পরমার্থ খুঁজে বেড়াতে অসুবিধা না হয়।

হেকিম সাহেব ও লুঙ্গির কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সেখানে এমনি একটা স্থায়ী উৎসের কথাও ছিলো, সেটিই এবার বাস্তবায়িত হলো। একদিন জুম্মার নামাজ পড়তে শহরে গিয়েছি। হেকিম সাহেব দেখতে পেয়েই বললেন, 'মিয়াজী সুখবর আছে।'

আমি বললাম, 'আপনার মুখের হাসি দেখেই বুঝতে পারছি।'

তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমার এক ভাগ্নি জামাইর বড়ো ভাই মস্তবড় আলেম, তাঁর মাত্র দুটি মেয়ে; আমি ভাবছি, তাঁর সাথেই আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো। আমার মনে হয়, তাঁকে দেখলে আপনি খুশীই হবেন।'

এখানে বলে নেয়া দরকার যে, হেকিম সাহেব গ্রাম সুবাদে আমার ভাগ্নি জামাই হন। বাবার বন্ধু হলেও এই সম্পর্কের টানে তিনি আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন। পরে তিনি আমার নানা শ্বশুর হলেও পূর্বের সম্পর্কটিই বজায় রেখেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও সদিচ্ছার কোনো অভাব ছিলো না। এরই টানে আমার জন্য তিনি এই স্থায়ী উৎসের সন্ধান করেছিলেন। ইতিপূর্বে আমি অবশ্যি আমার সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকানোর কথা বলেছি। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলে কোনো বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান না করেই আমার এই আক্রমণ এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু বাবার স্মৃতিই তাঁকে তা করতে দেয়নি।

যাহোক, আমি কথা শুনেই খুশী হলাম, বললাম, 'আপনি কি তাঁর সাথে আলাপ করেছেন, আমার কথা বলেছেন?'

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'না করে, না জেনেই কি মিয়াজী সুখবর বলেছি!'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমি তাঁর সাথে দেখা করবো। কিন্তু কখন?

'চাইলে এখনি করা যায়।'

আমি চমকে তাঁর দিকে চাইলাম। তিনি বললেন, 'তিনি পাশের একটি দোকানেই আছেন ; সেখানেই তিনি দোকানদারি করেন।'

বললাম, 'তাহলে চলুন, দেখা করে আসি।'

হেকিম সাহেব তাঁর দাওয়াখানার দরজা লাগিয়ে আমার সাথে বেরিয়ে এলেন। দু'তিনটি দোকানের পরেই সেই দোকান। গিয়ে দেখি তিনি স্টোভে রান্না চড়িয়েছেন। আমি পা ছুঁয়ে সালাম করতে চাইলেই তিনি আমাকে ধরে ফেলে বললেন, 'আমি কিন্তু পা ছুঁয়ে সালাম করা পছন্দ করি না। আমাদের জন্য তো মুখের সালামই যথেষ্ট।'

আমি চমকে গিয়ে তাঁর মুখের পানে চাইলাম, দেখলাম, সেখানে সস্নেহ ভর্ৎসনামাখা একটি নির্মল হাসি। আমাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন; 'আপনার সব কথাই আমি শুনেছি, এমনকি কাতলাসেন মাদ্রাসাতেও আমি খবর নিয়েছি।'

আমি আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমি শুধু ভাবছিলাম, হেকিম সাহেব কিছু বলার আগেই আমাকে তিনি চিনলেন কী করে! মনে হলো, কথাবার্তা তাহলে অনেকদিন ধরেই চলছিলো ; সেই ছফিরের বোনাই যেমন বলেছিলেন-রাস্তায় দেখলেও

চিনতে পারতাম. এখানেও তাই হয়েছে। এমন কি নেপথ্যে দেখাও. বোধ হয়. ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এখন শেষ সিদ্ধান্তটিই যেন আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এছাড়া আর কীইবা আশা করতে পারি আমি। হেকিম সাহেবকে আমার পক্ষের মুরুব্বী মেনে নেয়া খুব একটা অন্যায় কিছু নয়। কারণ আমার নির্দিষ্ট কোনো মুরুব্বী নেই বলেই হিতাকাঙ্ক্ষীরা সবাই মুরুব্বী সেজেছেন। এজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। লজিং বাড়িতে ফিরতে ফিরতে পথের মধ্যে এসব কথাই ভাবছিলাম।

হঠাৎ মদনের চাচাজীর কথা মনে পড়লো। তাঁর সাথে বিচ্ছিন্নতা কি তাহলে অবধারিতই হয়ে গেলো? দোকানীর কথাটাকেই কি আমি সত্য বলে মেনে নিয়েছি! আর তাই যদি হয়, তা হলে বাইটকান্দিতো একই প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো। আর এখানে? না, এখানে এমন কোনো আভাস এখনো পাইনি। শুধু শুনেছি, দুটি মাত্র মেয়ে। সেদিক থেকে এখানকার ব্যাপরটা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু মদনতো স্পষ্ট হয়েও আমাকে টানতে পারলোনা। বাইটকান্দি তুলনামূলকভাবে আরো স্পষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু আমার মন ভরতে পারলো না। কিন্তু এখানে? এখানে আমার সব কিছু জানার কথা শুনেছি আর দেখেছি একটি ভৎর্সনা মাখা হাসি। 'পা ছুঁয়ে সালাম করা আমি পছন্দ করিনা।' তাইতো! ইসলামী শিক্ষায় এমন কিছুতো নেই! কথাটার মধ্যে কেমন একটা যুক্তিবাদিতার রেশ আছে। আর সেই যুক্তির পিছনে আছে একটা জ্ঞানসমৃদ্ধ সচেতন হৃদয়। সেখানে আরো অনেক কিছুই বোধ হয় আছে। কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম!

কারণ আমি ইতিপূর্বে আমার স্বভাবে এই যুক্তিবাদিতার প্রভাবের কথা বলেছি। প্রচলিত যা আছে, তাকে নির্বিবাদে মেনে নেয়া তাই আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখানেও তেমনি একটা আভাস ফুটে বেরুচ্ছে। অবস্থা ব্যবস্থার কথা জানিনা, যে দোকান দেখলাম, সেখানেও সচ্ছলতার এমন কোনো পরিচয় নেই। সুতরাং এখানে একটি দিক কম হলে অন্য দিকটি বেশি হওয়ার কথা! যা হোক, আগামী বৃহস্পতিবারে যাবার কথা বলে এসেছি। শুক্রবারে গ্রামের বাড়িতে যাবো। সেখানে আরো পরিচয় পাওয়া যাবে। অনেক অজানা সূত্র নতুন চিন্তার খোরাক নিয়ে বেরিয়ে আসবে।

আপাততঃ লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করলাম। আমার একটি অভ্যাসের কথা বলতে ভুলে গেছি। নতুন পাঠ্য হাতের কাছে আসা মাত্রই আমি তার আগাগোড়া একবার চোখ বুলিয়ে নিতাম। বুঝি, বা না বুঝি, ওর রহস্যটা আমার কাছে উম্মুক্ত হোক, এই ছিলো আমার আগ্রহ। বাস্তা থেকেই এই অভ্যাসটি আমার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। ডবল প্রমোশনের টানেই এ কাজটি আমি করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এর মধ্যে অবশ্যি অন্য একটা ব্যাপারও আমার এই অভ্যাস গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে, সে হলো আমার ভাষা জ্ঞান। আরবি ফারসী উর্দু তিনটি ভাষাই আমি তখন মোটামুটি বুঝতে পারি। বিশেষ করে আরবি ভাষার যে ব্যাপারটা অন্য শিক্ষার্থীর পথে বাধার সৃষ্টি করে-ব্যাকরণ জ্ঞান,

সেটি আমার আয়ত্তে ছিলো। কারণ ব্যাকরণ না জানলে আরবি পাঠ করা যায় না, পাঠ করলেও তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। না, আরবিতে লিখা কিতাব আর কোরান শরীফের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ কোরানে ব্যাকরণ সিদ্ধ উচ্চারণটি স্বরচিহ্নের সাহায্যে দেয়া আছে, কিন্তু কিতাবে এর কোনো বালাই নেই। সুতরাং ব্যাকরণ জ্ঞান না থাকলে ফারসী বা উর্দুর মতো আরবি পাঠ করা সহজ নয়, সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সংস্কৃতের সাথে এর মিল আছে।

কিন্তু সে কথা থাক। আমি আবার শব্দার্থের মধ্যে ডুবে গেলাম। মাস খানেক লাগবে আমার ধাতস্থ হতে। তারপর প্রয়োজন হলে ছাত্র শিক্ষক সবাইকে চমকে দিতে পারবো। না, অন্য কিছু নয়, শুধু এ ব্যাপারটা আমি মোটামুটি জানি। সুতরাং আমাকে ফাঁকি দিয়ে যা তা বুঝানো যাবে না। আমি প্রশ্ন করে সেই পথে বাধার সৃষ্টি করবো। আমার মনে পড়ে, কাতলাসেনে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিলো সামাদ সাহেবকে নিয়ে। এই সামাদ সাহেব পরে কাতলাসেনের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি একেবারেই নতুন। ক্লাসে আমার এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সে কী গলদঘর্ম অবস্থা তাঁর। শেষটায় তিনি রেগেই গেলেন। একেতো কাতলাসেনের লোক, তদুপরি শিক্ষক ; কাজেই সহপাঠীরা আমার দুরবস্থার কথা চিন্তা করতে লাগলো। কিন্তু আমিতো জানি, আমি অন্যায় কিছু বলিনি। প্রশ্ন করে জেনে নেবার অধিকার আমার অবশ্যি আছে। কোনো শিক্ষক সে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে আমি কী করবো! না, সামাদ সাহেব এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেননি।

আজতো আমিও একজন শিক্ষক। কিন্তু সেদিনের কথা মনে পড়লে ছাত্রদের অনাগ্রহের দৃশ্য দেখে দুঃখ হয়। মেধাবী ছাত্র যে আজ নেই, তাতো নয় ; কিন্তু কোনো কিছু জানবার বুঝবার, শিক্ষকদেরকে প্রশ্ন করবার সেই ধারাটাই যেন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে ভালো ছাত্র যে কম জানে, সে কথা বলা যাবে না। বরং যারা জানে, তারা আমাদের সে সময়ের তুলনায় বহুগুণ বেশিই জানে। তবু মাদ্রাসার ছাত্রদের সম্পর্কে কি একথা বলতে পারবো ; তারা কি এমনি বহু গুণের অধিকারী হতে পারছে?

থাক, সে কথা থাক। শুধু মনে পড়ে শিক্ষকদেরকে মাঝে মাঝে কী নাজেহালই না করেছি। বাস্তায় অবশ্য এ ব্যাপারটি ছিলো না। সেখানে উৎসাহ উদ্দীপনা আর সস্নেহ ভর্ৎসনার মধ্যেই সময় কেটে গেছে। তথ্য বা তত্ত্ব নিয়ে শিক্ষকদেরকে উত্ত্যক্ত করার ক্ষমতাই তখন জন্মেনি। কিন্তু কাতলাসেন ভিন্ন পরিবেশ নিয়ে আমার সম্মুখে দেখা দিয়েছে। এজন্যই এখানে আমীর উদ্দিন মিস্কীর মতো শিক্ষক আমি পাইনি। কেউ আমাকে তাঁর মতো তৃপ্তি দিতে পারেননি।

এ কারণেই হয়তো কাতলাসেনের শিক্ষকদের কারোর স্মৃতিই আমাকে তেমন ভাবে আকর্ষণ করে না। কারী সাহেব, হাসান সাহেব, কুমারগাতার মৌলবী সাহেব, অছিম উদ্দিন মাস্টার সাহেব, হাফেজ সাহেব, রউফ সাহেব-এঁদের সবারই স্নেহ ও ভর্ৎসনা লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে ; কিন্তু কেউই আমার হৃদয়কে ভরে দিতে পারেননি।

এর কারণ, মিল্কী সাহেবের মধ্যেও যুক্তিবাদিতার যে রেশ আমি পেয়েছিলাম, এঁদের কারোর মধ্যেই তা ছিলো না। অথচ আমার জন্য তখন আবেগের তরলতার চাইতে যুক্তির কাঠিন্যই অধিকতর কাম্য। কারণ আমিতো শুধু পড়ার জন্য পড়িনি ; আমার শিক্ষা, আমার জীবন, আমার বিশ্বাস ও চেতনাকেও সেই পড়ার সাথে মিলিয়ে নিতে চেয়েছি। এর ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চাইতে আমার প্রশ্ন বেশি, আমার উত্তরের আকাঙ্ক্ষাও অধিকতর। এ কারণেই আমার তৃপ্তি হয়নি, আমি তৃপ্তি পাইনি।

না, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তাহলে আমার শিক্ষকরা কি আমার চাইতে কম জানতেন? অবশ্যি না। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধারায় আমার চাইতে বহুগুণ বেশিই জানতেন। কিন্তু সেই জানা যদি আমাকে তৃপ্তি দিতে না পারে, তবে তার দোষ তো তাঁদের জানার নয় বরং আমার সর্বগ্রাসী অতৃপ্তির। সেই অতৃপ্তির জ্বালা তাঁদের মধ্যে ছিলো না। তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে তৃপ্তির মধ্যেই ছিলেন ; অন্ততঃ আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। আমার দুর্ভাগ্য যে, তাঁদের সেই আপাত দৃশ্যমান তৃপ্ত অবস্থা আমার মধ্যে কোনো আকর্ষণের সৃষ্টি করতে পারেনি।

অথচ শিক্ষক না হয়েও যে শিক্ষক হওয়া যায়, তারই একটা শিহরণমূলক ঘটনা ঘটলো এ সময়েই। আমি পূর্বেই বলেছি যে, কাতলাসেন মাদ্রাসায় একটি লাইব্রেরী ছিলো। সময় পেলেই আমি এর সদ্ব্যবহার করেছি। হঠাৎ একদিন আলমারীর কোনায় একটি প্রবন্ধ পুস্তক খুঁজে পেলাম। নাম 'সমস্যা ও সমাধান'। তারপর পুরো একটি রাত্রি সেই বইয়ের মধ্যে কীভাবে যে তন্ময় হয়ে রইলাম, তা বলে বুঝাতে পারবোনা। মৌলানা আকরাম খাঁ এমন কতোগুলি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হলেন যে, আমি তাঁর যুক্তি প্রমাণে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে হলো, আমি যেন একজন শিক্ষকের উত্তরে তৃপ্তি পেয়েছি।

হ্যাঁ, এখানেই শিক্ষকতার তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। এমনি শিক্ষকরাই ছাত্রকে ছত্রের মতো ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করেন। না, অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা আমি বলছি না ; সে তো লাকড়ীর দোকানে স্তূপীকৃত লাকড়ী, মন দরে বিক্রি হয়, তার ক্রেতাও আছে। আমি বলছি, সেই লাকড়ীতে জ্বালানো আগুনের কথা, যার উত্তাপে আমার দেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়, যার আলোতে আমি খুঁজে পাই পথের দিশা!

তেমনি শিক্ষক খুব সহজলভ্য নয়। তবু আমার সৌভাগ্য বলতে হবে, তাঁদের দেখা আমি পেয়েছি। না, শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যত্রতত্র। এ ভাবেই কাজী আব্দুল হালিম, আব্দুল্লাহ মুখার্জী, আমীরউদ্দিন মিল্কী, আকরাম খাঁ, এমন কি আমার পিতা আব্দুল করিম কোরায়শী আমার শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন। আরো আছেন, তাঁরা পণ্ডিত নন শিক্ষিত নন ; কিন্তু তাঁদের আচার-আচরণ, কথাবার্তার মধ্যেও সেই আগুনের ফুলকি ছিলো, যা আমাকে উদ্দীপিত করেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই বৃহস্পতিবার চলে এলো। আমি লজিং থেকে দু'দিনের ছুটি নিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে শহরে এসে পৌছলাম। নানা কারণে দেরী হওয়ায় সেদিন আর নদী

পার হলাম না। আমার শ্বশুরের সাথে দোকানেই রইলাম। না, তখনো তিনি আমার শ্বশুর হননি। কিন্তু পরে যিনি একবার নয়, দু'বার শ্বশুর হয়েছেন, তাঁকে এখন থেকেই শ্বশুর বললে খুব একটা অন্যায় হবে না। তাঁর নামটি অবশ্যি ছোট, মৌলানা ইব্রাহিম : লিখতে অসুবিধা নেই। তবু হঠাৎ করে যখন শ্বশুর বলেই ফেলেছি, তখন তাই চলুক!

সকাল বেলা তাঁর সাথে নদী পার হলাম। কোনাকুনি চর ঈশ্বরদিয়া পার হতেই সামনে পড়লো 'জ্ঞানের ঘাট'। সুন্দর একটি নাম। ছোটখাটো একটি বাজারের মতো, বেশ কয়টি দোকান আছে। এরপরে পড়লো গোবিন্দপুর, এরপর ভবানীপুর। আর এই ভবানীপুরের মাঝামাঝি গিয়ে যখন ডানদিকে রাস্তা থেকে নামবো, তখনই সামনে পড়লো 'শয়তানের দোকান'। আরেকটি চমকে দেয়ার মতো নাম। রাস্তার পাশেই একটি দোকান ঘর, তার চারদিকে আকন্দের বেড়া। তার মধ্যে কয়েকটি কাঁঠালের চারা বড়ো হয়ে উঠছে। না, রহস্যজনক কিছু নেই। তবে নাম দুটিই মনকে নাড়া দেয়।

পরবর্তীকালে এই শিহরণের টানেই জ্ঞানের ঘাটে যেমন জ্ঞান খুঁজে পাইনি, তেমনি শয়তানের দোকানেও শয়তানের দেখা মিলেনি। তার বদলে পেয়েছি একজন করিৎকর্মা লোককে। সে এই বালুর চরের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে ফসল ফলাবার চেষ্টা করছে। আর এ জন্যই তার নাম হয়েছে শয়তান। তার সাথে চটকরে যে কথাটি মনের কোণে ভেসে উঠেছে, সেটি এখানে বলে ফেলা দরকার। তা না হলে কথার ভীড়ে তা হারিয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই অনেক কথা এভাবে হারিয়ে গেছে।

কথাটি হলো, শয়তান সম্পর্কে আমাদের লৌকিক ধারণা। সে ধারণারই একটা জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ যেন এই লোকটি। সে স্বভাবে একান্তই অমায়িক, পারতপক্ষে কারো কোনো ক্ষতি করে না, রাত দিন সে নিজের চড়কাতেই তেল দিচ্ছে। কিন্তু তার এই অমানুষিক পরিশ্রমই তাকে মানুষের কাছে শয়তান বানিয়ে ছেড়েছে। তখন হাদীস পড়ছি, একটি হাদীসের কথা মনে পড়লো ; সেখানে একটি লোককে তার পোষা কবুতরের পিছনে দৌড়াতে দেখে হজরত বলেছিলেন, 'এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছনে দৌড়াচ্ছে'। না,কথাটির মধ্যে কোনো দোষারোপ বা ভর্ৎসনা ছিলো না। বরং আমরা যেমন ছেলেমেয়েরা দুষ্টুমি করলে বলি, শয়তানি করিস না কিংবা দুষ্ট ছেলেমেয়েকে বলি, আস্ত একটা শয়তান ; এও অনেকটা তেমনি। না, এ শয়তান পৌরাণিক শয়তান নয়, এ নিতান্তই লৌকিক। এর মধ্যে একটা হালকা রসিকতার সাথে দক্ষতার স্বীকৃতি জড়িয়ে আছে। শয়তান আর যাই হোক, করিৎকর্মা এবং পরিশ্রমী।

যাহোক কোণাকুণি পথে আমরা দুটি নামা জায়গা পেরিয়ে গিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছলাম। গ্রামটির নাম চরখরিচা, বাড়িটির নাম কাজীবাড়ি। সে বাড়িতে সাকুল্যে চার পাঁচটি টিনের ঘর, একটি ছনের বৈঠকখানা, তার সামনে একটি নলকূপ। ব্যস, এটুকুই দেখতে দেখতে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। আমার শ্বশুর চলে গেছেন বাড়ির মধ্যে। একটু পরেই দেখলাম, দু'তিনটি ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে, আমাকে দেখছে। ওর মধ্যে পাঁচ ছয় বছরের একটি মেয়ে, 'গারো'দের মতো গোলগাল চেহারা,

পরনে খাকী হাফপ্যান্ট. মাথায় বাবরী চুল ; আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। আমি হাত নেড়ে ডাকতেই সে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। এখানে জনান্তিকে একটা কথা আপনাদের কাছে বলে রাখি ইনিই আমার বর্তমান সহধর্মিনী। সুতরাং 'শানজর' বলতে যা বুঝায়, সেটি তখনই তাঁর সাথে আমার হয়ে গিয়েছিলো। সময়টা খুব খারাপ নয়, শুক্রবার, বেলা নয়টা।

তা, থাক সে কথা। একটু পরেই আমার শ্বশুর এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সাথে এলেন তাঁর চাচা শ্বশুর বিখ্যাত কাজী সাহেব। তাঁর নাম কাজী জলিল উদ্দিন। কিন্তু লোকে বলতো, জালিম উদ্দিন কাজী। তিনি ইউনিয়ন বোর্ড পত্তনের সময় থেকেই সিরতা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। সুতরাং তাঁর চোখে শাণিত দৃষ্টি, চলনে-বলনে গাম্ভীর্য। কিন্তু এবার আর আমি পা ছুঁয়ে সালাম করার ভুল করলাম না, মুখেই সালাম দিলাম। তিনি আমার পাশেই চৌকিতে বসলেন। বেশ গম্ভীর হয়েই এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এই মাদ্রাসার কথা, আমার পাঠ্য কিতাবের কথা ; আর তা বলতে বলতেই পীর মুরীদির কথা এসে পড়লো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কোনো কথা বলার আগেই আমার শ্বশুর বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু কাজী সাহেব আমার সাথে জমে গেলেন। এক সময় গোছল করে তাঁর সাথে বসেই আহার করলাম এবং সময় হলে তাঁর সাথেই মোড়ল বাড়ির মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে গেলাম। আমার শ্বশুর গিয়েছিলেন কিনা মনে পড়ছেনা। তাই কাজী সাহেবের আবদারে জুম্মার খোতবাটি আমাকে বাংলা করে বুঝাতে হলো। এর ফলে তিনি এতোটা মুগ্ধ হলেন যে, বলতে গেলে আমার বন্ধু হয়ে গেলেন। বস্তুত ঃ সেই প্রথম সাক্ষাত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমার সাথে তাঁর আমার এই বন্ধুত্ব অটুট ছিলো।

জুম্মার নামাজের পর আমি আবার কাজী বাড়িতে ফিরে এলাম। দুপুরের খাবার খেয়ে কিঞ্চিৎ ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তন্দ্রার ঘোরেও বুঝতে পারলাম, আমাকে নানা দিক থেকে দেখে নেবার একটা চেষ্টা চলছে। এ কারণেই বারবার চোখের পাতা খুলে যাচ্ছিলো। তাছাড়া মাথার মধ্যে একটি কথা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিলো, 'তাহলে এটা আমার শ্বশুরের শ্বশুর বাড়ি। এ কথাটার মধ্যেও একটা চমক আছে। ধরুন, আমি যদি এখানে বিয়ে করি, তাহলে আমি হবো ঘর জামাইয়ের ঘর জামাই ; অনেকটা যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া!'

মনটা কেমন যেন চিলিক মেরে মেরে উঠছে। কিন্তু আমার শ্বশুরই বা এখানে ঘর জামাই থাকতে এলেন কেন? কারণ আমার নানা শ্বশুরেরও আমার শ্বশুরের মতো প্রথম দিকে দুই মেয়েই ছিলো। ইদানিং অবশ্য কয়েক বছর আগে তাঁর একটি ছেলে হয়েছে, কিন্তু তখন সে সম্ভাবনা ছিলো না। কারণ আমার নানী শ্বাশুড়ী রোগে গুঁজা হয়ে গেছেন, নুয়ে নুয়ে চলাফেরা করেন। কিন্তু শেষকালে এই গুঁজা বুড়িই সোজা মানুষের কাজ করে বসলো। এখন অবশ্যি সন্তানের সংখ্যা দুই-ই। কারণ আমার খালা শ্বাশুড়ী বিয়ের আগেই হঠাৎ মারা যান। কাজেই অনেকদিন আমার শ্বাশুড়ীই আমার নানা শ্বশুরের

একমাত্র সন্তান ছিলেন। এ কারনেই আমার শ্বশুর কাছেই নিজের পৈতৃক বাড়ি ফেলে রেখে এখানেই বসবাস করেছেন।

না, উঠে পড়তে হলো, আবার কাজী সাহেবের আক্রমণ! তাঁর সাথে আলাপ করতে করতে পূবদিকে মাঠের মধ্যে এগিয়ে গেলাম। তিনি দেখালেন, কোথায় তাঁদের প্রথম বাড়ি ছিলো। তখন এ এলাকার অবস্থা বেশ অনুর্বর। মানুষ জমি পত্তন নিতে চাইতো না। কেউ হাল বেয়ে এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে যেতে হলে লাঙ্গল মাথার উপর তুলে ধরতো। কারণ খিল জমিতে লাঙ্গলের রেখ পড়লেই জমিদারের পেয়াদা খাজনার জন্য এসে উপস্থিত হতো। এমনি ছিলো অবস্থা!

তখন বসতি ছিলো অনেক কম। মানুষ অনেক স্থানে দিনের বেলাতেই ভয় পেতো। রাতের বেলা ভূত-পেত্নীর উৎপাত ছিলো সাধারণ ব্যাপার। এইযে উত্তরের পাশের গাঙ্গিনাটা, এটা দিয়ে তখন বড়ো বড়ো নৌকা যাতায়াত করতো। তাঁদের বাড়ির সোজাই একটা পাকা বাঁধানো ঘাট ছিলো। এটা ছিলো একটা নীল কুঠির। তার ধ্বংসাবশেষ এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। মানুষ ইঁট নিয়ে না গেলে এতো তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যেতো না।

কথায় কথায় আরো জানলাম, তাঁর দাদার নাম রমাই মোড়ল, তাঁর পিতার নাম মালু কাজী। হঠাৎ পদবীর পরিবর্তন। কারণ তিনি একবার যাত্রাগানে কাজীর পার্ট করেছিলেন ; তাঁর ভূমিকাটি এমন ভালো হয়েছিলো যে, এর পরে লোকজন তাঁকে কাজী সাহেব বলেই ডাকতো। কারণ তখন তিনি বাস্তব সমাজেও কাজীর ভূমিকা পালন করছেন। এই এলাকার পঞ্চায়েতের তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা।

অবশ্য তাঁর পুত্র বর্তমান কাজী সাহেবও সেই তুলনায় কম যাননি। ইউনিয়ন বোর্ডের পত্তনকাল থেকেই প্রেসিডেন্ট হবার মর্যাদা পেয়ে আসছেন। নুরুল আমীন মুনায়েম খাঁদের সাথে স্কুলে পড়েছেন। ভালো ভাবেই মেট্রিক পাশ করেছিলেন। কিন্তু আর্থিক অনটনে আর পড়তে পারেননি। সাতাশ বছর প্রেসিডেন্টগিরি করেও আর্থিক সচ্ছলতা তাঁর হয়নি ; এমন কি নিজের বাড়িতে যাবার জন্য একটা ভালো রাস্তাও তিনি তৈরী করাতে পারেননি। তবে মানুষে যথেষ্ট সম্মান করে, এতেই তিনি সন্তুষ্ট।

তাঁর সাথে আলাপ করে খুব শান্তি পেলাম। খুব খোলামেলা স্বভাব, রেখে ঢেকে কিছু বলতে চান না, বলতে পারেন না। আমার কাছে পিতার পদবী লাভের ব্যাপারটি যেভাবে বললেন, তাইতে আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। একান্ত আপনজন মনে না করলে, তিনি কি আমাকে এতো সহজে এসব কথা বলতে পারতেন। কাজেই কাজী সাহেব নিজের গুণেই আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

সন্ধ্যার পর বাড়ির ভিতরে খেতে গেলাম। সেখানে 'বু'র সাথে দেখা হলো। তিনি আমার নানী শ্বাশুড়ী, নাত্‌নীরা 'বু' বলে ডাকে, তাই আমিও ডাকলাম। একটি মাদুরের পাশে ভাত ছালুন নিয়ে বসে আছেন। এবার আর মুখে সালাম করতে পারলাম না, পা ছুঁয়েই সালাম করলাম। তিনি মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন। প্রথম দেখাতেই তাঁর

সাথে খাতির হয়ে গেলো। ধীরে ধীরে কথা বলেন, কিন্তু কথার মধ্যে একটা মাধুর্য আছে। আমার ভালো লাগলো।

পরদিন ভোরবেলা নাশতা খেয়ে আমার শ্বশুরের সাথেই চলে এলাম শহরে। আসার সময় একবার সেই গোলগাল মেয়েটির কথা মনে হয়েছিলো, কিন্তু কোথাও তাকে দেখা গেলো না। মনের মধ্যে একটা তৃপ্তির ভাব নিয়েই শুধু শহরে নয়, লজিং বাড়িতেও এসে পৌঁছলাম। আসলে এই তৃপ্তিটা সেই স্নেহের পরশের তৃপ্তি। বিত্ত দিয়ে এই তৃপ্তির সৃষ্টি করা যায় না, এর জন্য চিত্ত ব্যবহার করতে হয়। এখানে বিত্ত না থাকতে পারে, কিন্তু চিত্তের সাক্ষাত আমি পেয়েছি। আর সেই যে বলেছিলাম, আমাকে পেয়ে যে ভাববে, একটা অমূল্য কিছু পেয়েছে, আমি তার কাছেই যাবো ; এখানে আচার আচরণে ও কথাবার্তায় সেই ভাবই বুঝি ফুটে বেরিয়েছে।

তবুও ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, সে চিন্তা আপাততঃ মুলতবী রেখে আমি কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম এই ভেবে যে, এর ফলে অন্ততঃ বিভিন্নজন ও আত্মীয় স্বজনের কাছে উঞ্ছবৃত্তি থেকে আমার মুক্তি ঘটবে। কিন্তু এর সাথে অন্য একটি কথাও মনে হলো, লেখাপড়ার প্রতি আমার আগ্রহ দেখে অনাত্মীয়রা যখন আমার ব্যাপারে নানান ভাবে উৎসাহী হচ্ছেন, তখন আমার আত্মীয়রা কী ধারণা পোষণ করে নির্বিকার বসে আছেন। বিশেষ করে আমার সচ্ছল ও নিঃসন্তান যে আত্মীয়টি একদিন আমার দ্বারা লেখাপড়া কিছু হবেনা বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, তিনিইবা এখন কী ভাবছেন! খুব সম্ভব, তাঁরা যেহেতু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তাই আমার এই 'ফকিরা পড়া'কে পাত্তা দিতে নারাজ। এ দিয়ে আর কী হবে! আমার বাবার বেলাতেইতো তাঁরা দেখেছেন, কীভাবে এই বিদ্যার অধিকারী আমার সেই বাবা আমাদেরকে দৈন্যের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেছেন। সুতরাং পুত্রের বিদ্যাও এর চাইতে বেশি আর কী সুফল প্রসব করবে! সংসার বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাই তাঁরা আর আমাকে কাছে টানতে পারেননি।

কিন্তু আমার এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে আমাকে অবাক করে দিলেন আমার নুরু ভাই। তিনি হঠাৎ করে কাতলাসেন মাদ্রাসায় এসে নহমে ভর্তি হলেন। ১৯৪৪ সনে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিক পাশ করেছিলেন। এরপর বাড়িতেই গৃহস্থির কাজ দেখতেন। হঠাৎ তাঁর মনে কী ভাবের উদয় হলো জানি না, একলাফে দহম ডিঙিয়ে নহমে পাড়ি জমালেন ; তাও আমার চোখের সামনে এই কাতলাসেন মাদ্রাসায়। তাহলে তিনি কি আমার লাফিয়ে লাফিয়ে ক্লাস ডিঙানো লেখাপড়ায় উৎসাহিত হয়ে ভেবেছিলেন যে, এই হাবাগোবাটা যখন একাজ করেছে, তখন আমার কাছে তা তো পানি ভাতের সামিল! কিংবা হঠাৎ তাঁর মনে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা গ্লানি এসে উপস্থিত হয়েছিলো, যার ফলে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে সেই গ্লানি দূর করতে চেয়েছিলেন। জানি না কী হয়েছিলো, তবে এই বয়সে তাঁর নহমে ভর্তি হওয়াটা আমার কাছে খুব বিসদৃশই

কেছিলো। কারণ যে নিষ্ঠা নিয়ে তিনি এই আরবি শিক্ষাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, সেটুকু ইংরেজি লাইনে খরচ করলে বেশি উপকার পেতেন বলে আমার ধারণা।

অবশ্যি সে ধারণা তাঁর কাছে প্রকাশ করার সুযোগ আমি কখনোই পাইনি। কারণ তিনি আমাকে কিছু না জানিয়ে যেমন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলেন, তেমনি আমাকে এড়িয়েই চলাফেরা করতেন। আর তা করাটাইতো স্বাভাবিক। কারণ ছোট ভাই যেখানে উচ্চ শ্রেণীতে পড়ে, লেখাপড়ায় যার সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, আর এই সেদিনও যাকে একটা আপদ বলেই মনে হয়েছে, প্রয়োজন হলেও তার পিছনেতো আর ঘুরে বেড়ানো যায় না। তবুও আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি তাঁর এই আগমন দ্বারা আমার একটি ভুল ধারণা দূর করে দিয়েছেন। তা না হলে আমার লেখাপড়া সম্পর্কে তাঁদের 'ফকিরা পড়া'র ধারণা আমার এতো সহজে দূর হতো না।

সে যাই হোক, কিন্তু আমার নুরু ভাই ছ'মাস না যেতেই যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে মাদ্রাসা ত্যাগ করে চলে গেলেন। সহপাঠীদের কাছে জানলাম, তিনি প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারির চাকরি পেয়েছেন, কাজেই এখন আর তাঁর পক্ষে ধর্মীয় শিক্ষার ছাত্র থাকা সম্ভব নয়। এ সংবাদে আমি খুশীই হয়েছি। কারণ তাঁর সহপাঠীরাই বলেছিলো যে, ইতিমধ্যেই মাদ্রাসার পরীক্ষায় তাঁর দূরবস্থা সূচিত হয়েছিলো। হবারই কথা ; সেই যে কথায় বলে, কাঁচা না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস্ ঠাস্। লেখাপড়ার একটা সময় আছে, সে সময়ে কিছু না করলে, পরে আর তা খুব সহজে হতে চায় না।

এ সময়ে বারুরীর আরেকটি ছেলের কথা মনে পড়ছে। ছেলেটি আমার সহপাঠী, নাম আব্দুস সালাম। সে হঠাৎ আমার পিছনে ঘুরতে আরম্ভ করলো। লেখাপড়ার প্রয়োজনে অনেক ছাত্রই আমার পিছনে ঘুরেছে, কিন্তু এর ঘোরাটা কেমন যেন ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে হলো। আমার লজিং বাড়ি থেকে চার পাঁচটি বাড়ির পরেই ওদের বাড়ি। এ কারণেই ওদের বাড়িতে ভালোমন্দ একটা কিছু রান্না হলেই আমাকে এসে ধরে নিয়ে যেতো। আর ওদের বাড়ির লোকেরাও আমাকে সস্নেহ সমাদরে খাওয়াতো। আমি ওর এই আচরণের কোনো কূল কিনারা পাইনি। অবশ্য আমার লজিং মাস্টার ঈমান আলী বলেছিলেন, বাবাজী, সাবধান! ওর কিন্তু একটা ছোট বোন আছে। কিন্তু বাস্তবে আমি ওর বোনের দেখা পাইনি। আল্লামালুম, এই সমাদরের উদ্দেশ্য কী ছিলো ; তবে তা না জানলেও গরীবের সংসার থেকে যখন জিহ্বা বিস্বাদ হয়ে উঠেছে, তখন ওদের বাড়িতে গিয়ে জিহ্বার স্বাদ বদলাবার সুযোগ পেয়েছি।

সে যাই হোক। এ সময়ে মাদ্রাসায় আরো একটি ঘটনা ঘটেছিলো, যা আমার কবিত্ব শক্তিকে হঠাৎ নাড়া দিয়েছিলো। ব্যাপারটি হলো, মাদ্রাসায় বোর্ডের পরিদর্শক আসবেন। এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছি। যথা সম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে সবকিছু ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রাখা হয়েছে। পরিদর্শনের দিন হঠাৎ একটি স্থানে সবার চোখ যেন আটকে গেলো। সে হলো আমাদের ইংরেজির

শিক্ষক আছিম উদ্দিন সাহেবের গোঁফ। ঠোঁট ছাড়িয়ে মুখের উপর এসে পড়েছে। অন্য শিক্ষকদের উৎকণ্ঠা দেখে মনে হলো, এই গোঁফ দেখলেই মাদ্রাসার মঞ্জুরী ঘ্যাচকরে কেটে দেয়া হবে। কী করা যায়, স্বেচ্ছাসেবকদের লীডার হিসাবে আমি দৌড়ে গিয়ে বাজারের দর্জির দোকান থেকে কাঁচি আনলাম এবং স্যারের গোঁফ কেটে সকলের দুশ্চিন্তা দূর করলাম।

কিন্তু ব্যাপারটি আমার কাছে কেমন যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হলো। এতটা না করলেও চলতো। যাহোক্, পরিদর্শক সাহেবতো এলেন এবং আমরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে তাঁকে সংবর্ধনাও জানালাম। কিন্তু হায় আল্লাহ্! তাঁর মুখে যে দাড়িগোঁফ কোনোটাই নেই। ব্যাপারটা আমাকে খুব উত্তেজিত করে তুললো। সেই উত্তেজনায় রাতে বসে একটা পদ্যই লিখে ফেললাম। ত্রিপদীতে রচিত পদ্যটি বেশ দীর্ঘ এবং তার নাম 'দাড়ি বিলাপ'। ভাবটা হলো, কোনো এক লোকের ঘরে আগুন লেগে দাড়িগোঁফসহ সব পুড়ে গেছে। আর সেই লোক অন্যসব কিছু ছেড়ে ইনিয়ে বিনিয়ে দাড়ির জন্য বিলাপ করছে। পদ্যটি দু'তিন জন সহপাঠীকে পড়ে শোনালাম ; ওরাতো হাসতে হাসতে বাঁচে না। কিন্তু ওদের সেই হাসির জন্যই হাসান সাহেবের বকুনি খেতে হলো। তিনি আমার পকেট থেকে সেই পদ্যটি উদ্ধার করে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। লেখাপড়া ছেড়ে এমনি বাজে কাজে সময় নষ্ট করলে ধরে পিটাবেন বলে হুমকি দিলেন। হাসান সাহেবকে আমি সত্যি ভয় পেতাম। কারণ তিনি আমাকে স্নেহ করতেন বলেই তাঁর শাসনের অধিকারকে আমি স্বীকার করে নিয়েছিলাম। কবিতাটির একটি কপি আছে।

সম্ভবতঃ এ কারণেই এবার রমজান মাসে সহপাঠীদের সাথে আমার লেখাপড়ার স্থান নির্ধারিত হলো গোপাল নগর, হাসান সাহেবের পাশের বাড়িতে। সে বাড়ির আমার এক সহপাঠীর নাম ছিলো সম্ভবতঃ শামসু। ওদের ওখানেই আমার খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হলো। এদিক সেদিকের প্রায় দশ বারোজন ছাত্র আমরা এক সঙ্গে পড়বো এবং মাঝে মধ্যে হাসান সাহেব তার তদারকি করবেন। আমি আগেও বলেছি যে, এ ধরনের পড়ায় শিক্ষকতার ভারটা ছিলো আমার উপরেই। এর ফলে উপকৃত হতাম আমিই সব চাইতে বেশি। তাই সহপাঠীদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে আমার উৎসাহের আর সীমা ছিলো না।

কিন্তু লেখাপড়ার কথা নয়, গোপাল নগরের যে ঘটনাটি আমার মনকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিলো, সে হলো একটি দুর্ঘটনা। আমার সহপাঠী শামসুদের বাড়ির পাশের বাড়ির একটি ছেলে হঠাৎ এসে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলো। সে যেমন বিনয়ী, তেমনি মেধাবী। তাই আমার সহপাঠীরা বললো যে, এবার ক্লাসে একটা ভীষণ প্রতিযোগিতা হবে। আমার দৌড় এবার দেখা যাবে। কারণ ছেলেটি এতোদিন নোয়াখালীর কোনো মাদ্রাসায় পড়ে একবারে তুখোড় হয়ে এসেছে। যদিও আমি তার এই তুখোড়পনার কোনো লক্ষণ খুঁজে পেলাম না। কারণ সে ক্লাসে আসতো খুবই কম, যা-ও আসতো অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকতো ; কারো সাথে কথাবার্তা বলারও তার খুব

একটা অভ্যাস ছিলো না। আমরা যখন দল বেঁধে গোপাল নগরে পাঠাভ্যাসে, তখন সে এমন এক অপকাণ্ড করে বসলো যে, তাতে শুধু আমার নয়, পুরো ছাত্র সমাজের মাথা হেট হয়ে গেলো। সে তার এক চাচাতো বড়ো ভাইয়ের বৌকে নিয়ে পালিয়ে গেলো। মেয়েটির কোলে তখন একটি এক বছরের বাচ্চা। কিন্তু সেই বাচ্চাসহই সে এমনভাবে উধাও হলো যে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেলো না। এর ফলে কয়েক দিন আমাদের লেখাপড়াই বন্ধ রইলো।

বন্ধ রইলো কারণ, সহপাঠীদের অনেকেই এই পলাতকের সন্ধানে গেছে। আর আমি কিছুটা মুষড়ে পড়েছি। আমার মনে হয়েছে, আমার মুখে চুনকালি মাখার জন্যই সে এই কাজটি করেছে। লেখাপড়ায় সে আমার সাথে টেক্কা দিতে পারবে না জেনেই এভাবে আমাকে যেন হারিয়ে দিয়েছে। সবকিছু ছাপিয়ে সেই এক বছরের শিশুটির টা টা কান্না যেন আমি আমার মনের মধ্যে শুনতে লাগলাম।

এ এমন একটি ভাব, যা অনেক সময়েই আমাকে বিমর্ষ করে তোলে। আমি অপরের দুঃখ কষ্টে খুব সহজেই আন্দোলিত হই এবং তাকে নিজের করে নিতে পারি। আমার মনে হয়, এটিও সেই সারল্যের ফসল। কিন্তু গোপাল নগরে আমার এ প্রকার বিমর্ষ হবার কী কারণ ছিলো! বরং ছেলেটি এভাবে উধাও হয়ে যাওয়ায় একজন সম্ভাব্য প্রতিযোগী বিদায় নিয়েছে ভেবে আমারতো খুশী হবারই কথা। কিন্তু তরুণ মনের রহস্য বুঝি আরো গভীরে লুকিয়ে আছে। আমার মনের কান্নাতো শিশুর নয়, সে আমারই নিজের কান্না ; শিশুটি এখানে একটা উপলক্ষ মাত্র। অবচেতনে ইতিমধ্যেই যে জৈবিক ক্ষুধা জাগ্রত হয়েছে, এ দুর্ঘটনা মূলতঃ তাকেই আলোড়িত করে তুলেছে। কিন্তু সেতো তার ক্ষুধা মেটাবার জন্য এমন কিছু করতে পারে না ; তাই অক্ষমতার জ্বালায় সে পড়ে পড়ে কাঁদছে।

কিন্তু না, এর কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সকাল বিকাল হাসান সাহেবের এখানে যেতে লাগলাম। নাশতা খাবার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর গম্ভীর উপদেশ শুনলাম। তিনি বললেন, 'এই দুর্ঘটনাটি হঠাৎ একদিনে ঘটেনি ; মানুষ হাউই নয় যে ধপ করে উপরে নীচে ছুটে যেতে পারে। তাকে ধাপে ধাপে উঠতে হয়, ধাপে ধাপে নীচে নামতে হয়। সে অনেক দিন ধরেই নামছিলো, এবার ডুবে গেলো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'একটা কথা, সামদানী! অনেক সময় আমি তোমার প্রতি রূঢ় আচরণ করি ; এই সেদিনও তোমার একটা পদ্য ছিঁড়ে ফেলেছি। কিন্তু কেন জানো, আমাদের এদিকে মাদ্রাসার লেখাপড়া কেমন হয় জানি না, তবে পরীক্ষার ফলাফল কুমিল্লা নোয়াখালীর ছেলেরাই নিয়ে যায়। অনেক দিন ধরে কাতলাসেনের ছাত্ররা কিছু পায়নি, এবার আমরা আশা করছি, তুমি আমাদের লজ্জা দূর করবে। সেজন্যই লেখাপড়া ছাড়া তোমার অন্য কাজে আমরা এমনভাবে রাগ করি। কারণ এর প্রস্তুতিও ধীরে ধীরে নিতে হয়, হঠাৎ করে হয় না।'

আমি উস্তাদের মুখের দিকে চেয়েছিলাম. অভিভূত হলাম তাঁর কথা শুনে। এই যে একটা আশাবাদ. এ তো মৃতসঞ্জীবনীর মতো অমোঘ ফলদায়ক। ধীরে ধীরে আমার চেতনার সেই কান্না থেমে গেলো. সেখানে জেগে উঠলো গিরি লঙ্ঘনে নিরত একজন অভিযাত্রীর প্রত্যয়ী মূর্তি। না, মুরুব্বীদের আশা আমাকে যেভাবেই হোক পূরণ করতেই হবে।

তবু আমি একথা লজ্জার সাথে স্বীকার করছি যে. এরপর লেখার ব্যাপারে তেমন কিছু না করলেও অপাঠ্য পুস্তক পাঠের লোভ আমি সংবরণ করতে পারিনি। বিশেষ করে উপন্যাস পেলে আমি কোনো বাঁধাই মানিনি। আমাদের মাদ্রাসা লাইব্রেরিতে কোনো ভালো উপন্যাস ছিলো না। সেখানে আমি নজিবর রহমানের আনোয়ারা মনোয়ারা জাতীয় কিছু উপন্যাসই দেখেছিলাম। সেগুলি পড়তেও খুব বেশি দেরি হয়নি। আমার মনে হয়েছে, এ যেন এক নতুন জগৎ। এখানে দুঃখ কষ্ট যেন তাত্ত্বিক খোলস ছেড়ে নিজ মূর্তিতে সামনে এসে দাঁড়ায়। এর ফলে মন যতোটা সহজে ব্যথিত হবার সুযোগ পায়, তেমনি আনন্দিতও হতে পারে। আর আমার মতো একজন জীবন যোদ্ধার জন্য তো এগুলির আমন্ত্রণ অদ্ভুত মাদকতাপূর্ণ। সেই কবে রামায়ন মহাভারতের গল্পের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, তখন কী এমন ভাবে আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম, মনে তো পড়ে না। কিন্তু এখন যদি পড়তাম! না, কোথাও তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর পেলেও কি তখনকার মতো মন ভরে উঠবে? মনে তো হয়না। কারণ এখন যে চাওয়া পাওয়ায় বাস্তবতা এসেছে।

সে যাই হোক, একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কাতলাসেনেই মাদ্রাসার পূর্বদিকে কোনো এক বাড়িতে বিয়ের বরযাত্রী হয়ে গিয়েছি। বাড়িটি উত্তরমুখী, সামনে পুকুর, তারপর ফুলবাড়িয়াগামী রাস্তা। বিয়ে কীভাবে হলো, তার কিছুই আমি বলতে পারবোনা। শুধু দেখলাম, সেই বিয়েতে উপহার হিসাবে আসা কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে আমি হেজাকের পাশে বসে আছি। ঘরটি বড়ো, বেশ অনেকখানি জুড়ে মাদুর পাতা ঢালাও বিছানা। সেখানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে ঘুমন্ত মানুষ। মাঝে মাঝে তাদের নাসিকা গর্জন, মশার গুণগুণ, কিন্তু আমার তন্ময়তা ভাঙেনি। ভোরের আজান যখন ধ্বনিত হলো, তখন দু'তিনটি উপন্যাস পড়ে শেষ করেছি। এই প্রেমের সমাধি, হাসানগঙ্গা বাহমনী, এমনি ধরনের উপন্যাস। কিন্তু কী নিরলস আগ্রহেই না একজন পাঠক এগুলির মধ্যে জীবনের মাধুর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে! কী পেয়েছে সে এসবের মধ্যে?

এ প্রশ্নের উত্তর এখন থাক। আমার বাস্তব জীবনের কথা বলি। ইতিমধ্যে আমি শহরে গিয়েছি। আমার শ্বশুরের সাথে দেখা হয়েছে। সেখানেই জানতে পারলাম যে. আমার শ্বাশুড়ী খুবই অসুস্থ। তাঁর এই অসুখের সংবাদ অবশ্যি আমি আগেই শুনেছিলাম। শ্বেতপ্রদরের রোগী, কখনো কমে, কখনো বাড়ে। ছোট মেয়েটির জন্মের পর থেকেই তিনি ভুগছেন। আর মেয়েটির কথা যখন এসেই পড়েছে, তখন শুধু ছোট মেয়েটির কথা কেন, বড়ো মেয়েটির কথাও বলতে হয়। বয়সের ব্যবধান ওদের মধ্যে

তিন চার বছরের। খুব সম্ভব চল্লিশের দিকে বড়োটির জন্ম। নাম ফজিলাতুন্নেসা। আর ছোটটির জন্ম তেতাল্লিশে, দুর্ভিক্ষের বছর। নাম সায়িদা খাতুন। তবে ছোটবেলা ওর একটি সুন্দর ডাকনাম ছিলো, 'বুটলু'। সম্ভবতঃ দেখতে বাঁটুলের মতো ছিলো বলেই এই ডাকনাম। তার চেহারার বর্ণনাতো ইতিপূর্বেই দিয়েছি। কিন্তু বড়ো মেয়েটির সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার তখনো হয়নি।

যাহোক, যা বলছিলাম। শ্বশুরের কাছেই জানতে পারলাম যে, আমার শ্বাশুড়ীর একটি ওষুধ তৈরীর জন্য কিছু শামুকের দরকার। চর অঞ্চলে এই জীবটি পাওয়া খুবই কঠিন। কাজেই কাতলাসেনের ওদিক থেকে যদি আমি কিছু শামুক সংগ্রহ করে দিই, তাহলে খুবই উপকার হয়। আমি সানন্দে সম্মতি জানিয়ে লজিং বাড়িতে ফিরে এলাম। এরপর সালামের সহায়তায় খুব সহজেই বারুরী থেকে কিছুটা দূরে পূবদক্ষিণ কোণার একটি বিলের মতো জায়গা থেকে এক থলি শামুক যোগাড় করে ফেললাম। পরদিন সেগুলি আমার শ্বশুরের হাতে তুলে দিয়ে এলাম।

কাজটা করে মনের মধ্যে বেশ একটা খুশির ভাব দেখা দিলো। মনে হলো, আমি শুধু গ্রহণই করি না, দিতেও পারি। কিন্তু শুধু ব্যক্তির জন্য নয়, সমাজের জন্যও যে আমার দেবার ক্ষমতা আছে, তারই পরিচয় পাওয়া গেলো কিছুদিনের মধ্যেই।

সে বছর কী হলো জানি না, জিন্নাহ সাহেবের অকাল মৃত্যুর কারণেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক, পাকিস্তানী ধার্মিকতার মধ্যে কেমন যেন একটা শৈথিল্য দেখা দিলো। যে ব্যাপারটি গত বছর সম্ভব হয়নি, সেটি এ বছর সম্ভব হয়ে উঠলো। বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলো যে, আগামী মাসের অমুক তারিখ থেকে দাপুনিয়া বাজারে 'দি নিউ প্রভাত অপেরা পার্টির' মন মাতানো যাত্রাগান আরম্ভ হবে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে যথানিয়মে ঈমান আলীর নামও ছাপা হয়েছে দেখতে পেলাম। বলা বাহুল্য, ঈমান আলী আমার লজিং মাস্টার।

মাদ্রাসায় গিয়ে দেখলাম, এ নিয়ে ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে বেশ উত্তেজনা। গত বছর বাধা দিতে হয়নি, এমনিতেই এ আপদ দূরে ছিলো। এ বছর নতুন উৎসাহে আবার মাথা বাড়াচ্ছে। এখনি এই মাথায় আঘাত করতে না পারলে সে জাঁকিয়ে বসবে আর এলাকার ধর্ম সম্পদ চরিত্র সবই ছিনিয়ে নেবে। এসব যুক্তিতে আমিও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আর সব সময় যা হয়, এখানেও তাই হলো, আমি যাত্রা প্রতিরোধ কমিটির একজন বড় লীডার হয়ে গেলাম।

আমরাও বিজ্ঞপ্তি তৈরী করলাম এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক হতে আহ্বান জানালাম। খেলা বেশ জমে উঠলো। আর আমি আসন্ন বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি ভুলে এই সমাজ সেবার মধ্যে জড়িয়ে গেলাম।

এ সময়ে একজন কাঠমিস্ত্রীর একটা মন্তব্য নিয়ে আমরা বেশ হাসাহাসি করেছিলাম। সে পাশের হোসেন আলী সরকারের বাড়িতে থাকতো। আমরা যখন যাত্রার বিরুদ্ধে তার সাথে কথা বলতাম, তখন সে এমনভাবে আমাদেরকে সমর্থন

করতো, যেন যাত্রা ব্যাপারটিই তার দু'চোখের বিষ। আবার ঈমান আলীর দলের সাথে সে উদ্যোক্তাদের একজন হয়ে যেতো। একদিন আমি তার এই দু'মুখো নীতি অর্থাৎ মোনাফেকী নিয়ে তাকে খুব চেপে ধরলাম। সে হেসেই বললো, 'ভাইসব, আমি দাড়ি ছাড়া মুসলমান, তদুপরি বিদেশী মানুষ, যে দলেই যাই মানিয়ে চলতে হয় আর তা পারিও। আমরা কাজ করে যেমন স্বার্থ আদায়ের জন্য মানুষকে খুশী রাখি, তেমনি কথা বলেও খুশী করতে হয়।'

তার এই কথাগুলি কেন জানি, এখনো আমার স্মৃতিতে আটকে গেছে। কিন্তু সে সময়ের এই কথা নিয়ে হাসাহাসি করলেও পরে তো দেখেছি, অল্প-বেশি সংসারের সব মানুষই এমনি এক স্বার্থপর চরিত্রের অধিকারী। এর ফলে অনেকে গাছেরটাও খায়, তলারটাও কুড়ায়।

কিন্তু তখন বিস্মিত হয়েছিলাম ঈমান আলীর ব্যবহার দেখে। আমিতো প্রথম কয়েকদিন শংকিতই ছিলাম যে, যাত্রা-বিরোধিতার জন্য কী জানি তিনি কি বলেন! কিন্তু একে একে চার পাঁচদিন চলে গেলো, তিনি কিছুই বললেন না। আমরা পরস্পর বিরোধী শিবিরের লোক। কাজের শেষে রাতের বেলা একত্রে মিলিত হই, কিন্তু বিরোধ নিয়ে কোনো কথাই হয় না। একদিন আমি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না, বললাম, 'এই যে আপনার বাড়ির ভাত খেয়ে আপনার কাজের বিরোধিতা করছি, এতে আপনার কি কিছুই বলার নেই? এ কাজটি কি আমার ভালো হচ্ছে?'

তিনি হেসেই বললেন, 'ভালো হবে না কেন, আপনার ধর্মের কাজ আপনি করছেন, আমার জীবিকার কাজ আমি করছি। আপনাকে কিছু বলার আমার দরকারই পড়ে না। কারণ এই যাত্রা তো আর আপনারা দেখবেন না। যারা দেখবে, তারা মুখিয়ে আছে ; আপনাদের বাধা তারা কোনোকালে মানেনি, এবারও মানবে না।'

আমি বললাম, 'আপনি ভাবছেন, আমরা কিছুই করতে পারবো না! যদি প্যাণ্ডেলের সামনে পিকেটিং করি, প্যাণ্ডেলের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিই!'

তিনি আবারও হাসলেন, বললেন, 'কাকে নিয়ে পিকেটিং করবেন আর আগুন ধরাবেন! কাজের সময় কাউকে খুঁজে পাবেন না।'

তাঁর কথা শুনে আমি কেমন থমকে গেলাম। কিন্তু ভিতরে পরাজয়ের একটা গ্লানি তখন কালকেউটের মতো ছোবল মারছে। আমি সেই ছোবলের জ্বালাতেই বললাম, 'তা সে যাই হোক, কিন্তু আমি এভাবে আর আপনার ভাত খেয়ে আপনার বিরোধিতা করতে পারবো না। হয় আপনি আপনার কাজ বন্ধ করবেন, নয়তো আমি অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবো।'

এবার আর তিনি হাসতে পারলেন না। এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললেন, 'সামদানী মিয়া, আপনি কেন যে এতো উত্তেজিত হন! এও কি বুঝতে পারেন না যে, আমি চলে এলেও এই যাত্রা বন্ধ হবে না। কারণ এটি আমার একার ব্যাপার নয়। মাঝখান থেকে আমার শেয়ারটাই শুধু মারা যাবে।'

কিন্তু আমি রাগে তখন ভিতরে ভিতরে ফুঁসছি। না, আর কিছুতেই এ বাড়িতে থাকতে পারবোনা। পরদিন মাদ্রাসায় গিয়েই কালীর বাজাইলের একটি বাড়িতে লজিং ঠিক করে ফেললাম। রাত্রে সেখানেই রইলাম। বাড়িটি দেওখলা বাজারের ঠিক পূব দিকের কিছুটা দূরে একটা খালের পাড়ে। মাদ্রাসা থেকে কোনাকুনি পথেও সে বাড়িতে যাওয়া যায়। খুবই দুঃখের ব্যাপার যে, সে বাড়ির কারোর নাম আমার মনে নেই। শুধু সে বাড়িতে টিনের চৌচালা দুটি ঘর, বৈঠকখানাটিও টিনের, বাড়ির দক্ষিণ মাথায় উঠানের ধারে একটি মোটা আমগাছ আর তার পরেই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একটি পুকুর ছিলো বলে মনে পড়ছে। এর একটি বাড়ি পরেই এক ভদ্রলোকের বাড়ি, সেখানে একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিলো। সেই যুবক ভদ্রলোকের নামটি ভুলে গেলেও তাঁর পাঠাগার থেকে নানা ধরনের পুস্তক পাঠের স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারিনি।

সে যাই হোক, এভাবেই ঈমান আলীর দুই বছরের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলো। তাঁর বাড়িতে থেকে আমি যতোটুকু কষ্ট পেয়েছি, তার চাইতে বহুগুণ বেশি কষ্ট দিয়েছি তাঁকে। তাঁর ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার কোনো তদারকি করিনি, তবু বেচারা এ নিয়ে কোনো কথা বলেনি। এ অবশ্য আমার পুরানো অভ্যাস। কারণ আমার লেখাপড়া নিয়ে আমি এতোটাই ব্যস্ত থাকি যে, কারো দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত থাকেনা। ঈমান আলী মিয়া এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই কোনোদিন আমার লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটাননি। কিন্তু সমাজ সেবার উম্মাদনায় আর নিমকহারামির আশংকায় আমি তাঁকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হলাম। কাজেই এই বাঁধন ছেঁড়ার ব্যথা আমার মনকেও পীড়িত করছিলো। বরং আমি তো বলবো, যেমন যাত্রার ব্যাপারে, তেমনিই লজিংয়ের ব্যাপারেও আমি ঈমান আলীকে হারাতে পারিনি। সে আমার নতুন লজিংয়ের নাম ধাম সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কাতলাসেনে আমি তাঁর এখানে ছাড়া অন্য কোথাও লজিং থাকিনি। এমনি হয়, এমনি ভাবে মানুষ একে অন্যকে হারিয়ে দেয়!

কিন্তু এ ব্যাপারে ঈমান আলীও যে কতোটা মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, তার পরিচয় পেলাম পরদিনই। সালাম গিয়ে উপস্থিত। কী ব্যাপার! না, ঈমান আলীই তাকে পাঠিয়েছেন, আমি যেন তাঁর সাথে অন্ততঃ একবার দেখা করে আসি। গেলাম, কিন্তু ধরা দিলাম না। বরং নিমকহারামির কূটতর্ক তুলে তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে, এভাবে আর চলতে পারে না। এবার তিনি শেষ চেষ্টা করলেন, তাঁর যে স্ত্রীকে আমি এই দুই বছরেও দেখিনি, তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি চাচীকে, বোধ হয়, আমার কথা বুঝাতে পারলাম। তিনি আর উচ্চবাচ্য করলেন না। আর ঈমান আলীও বুঝলেন যে, ছেলেটা নেহাতই ত্যাঁদড় ; একবার না করলে ও আর হাঁ করতে জানে না। আর শুধু কি ঈমান আলী, হোসেন সরকার, ইয়াদ আলী, রহমানসহ আরো অনেকেই আমার চলে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলেন।

এখন ভাবি, সেদিন এতোটা নিষ্ঠুর না হলেও বুঝি পারতাম। কারণ স্নেহের দানতো মুছে ফেলতে চাইলেও মুছে ফেলা যায় না, তেলের মতো কেবলই লেপটে থাকে। বারুরীর স্মৃতি তাই বাস্তার মতো সজীব হয়ে আছে। সে তুলনায় কালীরবাজাইল অনেকখানি নিষ্প্রভ। তবু সেখানকার বছরকালীন জীবন অন্য দিক থেকে স্মরণযোগ্য। অন্ততঃ শারীরিক অসুস্থতার জন্য এ সময়টা স্মরণীয় হয়ে আছে। অনেক কিছু বিস্মৃতির মূলেও এই অসুস্থতা কাজ করছে।

এই অসুস্থতার কারণ যেমন লজিং বাড়ির পরিবেশ, তেমনি আমি নিজেও। যাত্রা প্রতিরোধ করতে গিয়ে ঘোরাফেরার ফলেই হোক, কিংবা একটা কিছু করার খেয়াল খুশিতে হোক, আমি এ সময় ফুটবল খেলতে আরম্ভ করলাম। কাতলাসেনে মাদ্রাসায় তখন একটা ফুটবল টীম গড়ে উঠেছিলো, আমিও তাতে নাম লিখিয়ে নিলাম। দেওখলা বাজারের মাঠে কম্পিটিশানের খেলায় হোক বা ফ্রেণ্ডলি ম্যাচেই হোক, আমি তখন বলের গায়ে লাথি মারতে আরম্ভ করেছি। কোন শৈশবে জাম্বুরা দিয়ে এতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম। তারপর দীর্ঘদিন আর সে অভ্যাসকে তেমনভাবে রক্ষা করতে পারিনি। এ কারণেই বলের গায়ে এই নতুন লাথি মারা আমার স্বাস্থ্যের জন্য খুব সুফল বয়ে আনে নি।

এর উপর নতুন লজিং বাড়ির রান্না আমার পেট খুব সহজে হজম করতে পারেনি। যারা পারিবারিক পরিবেশে একই রান্নায় জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদের পক্ষে এই অসুবিধার কথা খুব সহজে বুঝা সম্ভব নয়। তদুপরি আমি এমনিতেই পেট নরম মানুষ ; সে কথা পূর্বে বলেছি। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই আমাশয়ে আক্রান্ত হলাম। উস্তাদের বচন শোনার পরিবর্তে আমি মাদ্রাসার পায়খানায় বসে কাঠ পিঁপড়ার সংখ্যা গুনছি, এ দৃশ্যই সাধারণ হয়ে উঠেছিলো। সেটা একটু কমলো তো একদিন দাস্তবমি হয়ে খুব কাহিল হয়ে পড়লাম। অগত্যা ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হলো। ইয়াসীন ডাক্তারের কাছে মল পরীক্ষা করালাম। তাতে হুকওয়ার্মের নিদর্শন পাওয়া গেলো। যা হোক ডাক্তারী ওষুধে এটি সারলো, কিন্তু এবার দেখা দিলো বাতের প্রকোপ। হাত পায়ের এখানে সেখানে ফুলে উঠে ব্যথা করে। আবার ময়মনসিংহ শহরের ইয়াসীন ডাক্তারের এখানে গেলাম, এবার বেরিং ইনজেকশান, ফল ভালোই হলো। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই দাঁতের ব্যথা। আহ্, এ-সব রোগ কী মারাত্মক ভাবেই না আমার পিছু লেগেছিলো!

এজন্যই এ সময়ের অনেক স্মৃতিই ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের কথা মনে পড়ছে। এটিও চাঁদা তোলার জন্যই করা হয়েছিলো। কিন্তু অসুস্থতার জন্যই আমি এর উদ্যোগ আয়োজনে জড়িত হতে পারিনি। শুধু মহ্ফিলের দিন কানা হাফেজ সাহেবের ওয়াজ শুনতে এসেছিলাম। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ, বলার ভঙ্গি ভালো লেগেছে ; কিন্তু বিষয়বস্তুর মধ্যে আমার জন্য আর্কষণীয় কিছু ছিলো না। বাস্তার মতো এখানে নতুন কোনো শিহরণ নেই।

এর চাইতে কালীরবাজাইলের লজিং বাড়িতে উড়ে বেহারার গান শুনে একদিন শিহরণ অনুভব করেছিলাম। ওরা ছাতু খাওয়ার পর বিশ্রামের সময় ভাঙা গলায় এইগান গাইছিলো। গানের কথাগুলি এখনো মোটামুটি স্মরণ করতে পারছি—‘ বালামুয়া হো রাম, জাগালে না জাগে।’ অর্থাৎ হায় রাম, আমার প্রিয় তো জাগালেও জাগে না। এই কলিটি বারবার ঘুরে ফিরে আসছিলো অনেকটা ধুয়ার মতো। এর সাথে, ‘কেহো খালা হালুয়াপুরী’ খিরতা লাগাইকে, কেহো খালা ছাতাউয়া সঙ্গ নিমকা মিলাইকে।’ অর্থাৎ কেউ খেলো হালুয়া পুরী ঘি লাগিয়ে আর কেউ খেলো শুধু ছাতু লবন দিয়ে। এরপর- ‘কেহো চলে ভুইয়া ভুইয়া চিউটি পরাইখে, কেহো চলে হাতীয়া পর ছাতাউয়া লাগাইকে।’ অর্থাৎ কেউ চলে মাটির দিকে চেয়ে পিঁপড়া বাঁচিয়ে আর কেউ চলে হাতির পরে ছাতি টাঙ্গিয়ে। এভাবে আরো অনেক কথা। আমি ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করে এগুলির অর্থ উদ্ধার করেছিলাম।

একে তো অসুস্থ শরীর, তদুপরি এদের এইসব কথা আমার দুরবস্থাকেই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো। সংসারে ধন বৈষম্যের চেতনা লোকজ ঐতিহ্যে কী করুণ আর্তি নিয়েই না ছড়িয়ে আছে! আমার চেতনা তাই বিদেশী ভাষার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে শিহরিত হয়েছে। আমি যেন নতুন করে এই চেতনায় আবিষ্ট হয়েছি!

অথচ এমনি মানসিক ও শারীরিক অবস্থার মধ্যেই সামনে এগিয়ে আসছে আলিম সেন্টার পরীক্ষা। অসুস্থতা নিয়েই বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছি ; ফল পূর্বের মতোই হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার যেমন আর কোনো ঔৎসুক্য নেই, তেমনি অন্যদেরও। এ-তো জানাই যে, আমিই প্রথম হবো। কিন্তু সেন্টারতো আর কাতলাসেনের মাদ্রাসার মতো ছোট নয়, সেখানে সারা দেশের ছাত্ররা একত্র হবে। সুতরাং মনে মনে বেশ দুশ্চিন্তা পোষণ করতে আরম্ভ করলাম। তবে আশার কথা এই যে, এখনো এক বছর সময় আছে। এর মধ্যে নিশ্চয় শক্তি সঞ্চয় করতে পারবো।

সে কথাই বললো লুৎফর। সেই যে যার সাথে পাঞ্জমে ভর্তি হয়েছিলাম। সে তার ভগ্নিপতির এখানে থাকে। এবার আমার কাছাকাছি চলে এলো। আর এসেই আমার কাঁথা বালিশ মশারী নিয়ে পড়লো। তার পিতা একজন হেকিম, তাই সে আমার উপর হেকিমি ফলাতে আরম্ভ করলো। আমার কাঁথা আর মশারীর মধ্যেই নাকি রোগের জীবাণু ছড়িয়ে আছে। তাই লজিং বাড়ির পুকুরে সে নিজেই গেলো এগুলি কেচে দিতে। সে আছড়িয়ে আমার কাঁথা মশারী কাচছে আর আমি পুকুর পাড়ে বসে আছি—এই দৃশ্যটি এখনো চোখের সামনে ভাসছে।

কী যে হয়, আমি যখন নিঃসঙ্গ বোধ করি, তখনই এক একটা ছেলে এসে আমাকে মাতিয়ে দেয়। কেউ সহায়তা দিয়ে, কেউ বিরোধিতা দিয়ে আমার চেতনাকে নাড়া দিয়ে যায়। মালেক নেই, জলিল দূরে সরে পড়েছে, ছফিরও তাই, সালামও কয়েকদিন ঘোরাফেরা করে এখন ফেরার। এবার লুৎফর এসে উপস্থিত। সে শুধু কাঁথা বালিশ নয়, আমার মনকেও পরিষ্কার করার চেষ্টা করলো। আমাকে টেনে নিয়ে গেলো তার

ভগ্নিপতির দোকানে। তিনিও আলেম, দেওখলা বাজারে দর্জির কাজ করেন। গেলেই কড়ামিঠা উপদেশ ঝাড়েন। ভালোই লাগে। তারই টানে একদিন তাঁদের বাড়িতেই গেলাম। সেখান থেকে জসিমউদ্দিনের বাড়ি। দেওখলা বাজারের বেশ দক্ষিণে রাস্তার পাশেই সেই বাড়ি। জসিম কাবাডির একজন তুখোড় খেলোয়াড়। এ ব্যাপারে এ অঞ্চলে তার নামও ছিলো। আর শুধু কি কাবাডি, গোল্লা খেলাতেও সে নাম করেছিলো। আমার মনে হয়, এখানকার গোল্লা খেলা আর কোথাও নেই। একটা পিতলের কলসীর মুখটা ফেলে দিয়ে মাটি ভর্তি করে সেই মাটিসহ মুখের স্থানটা ঝালাই করে তৈরী হয় গোল্লা। সেটি নির্দিষ্ট দিনে মাঠের মাঝখানে এনে রাখা হয়। তারপর জোয়ানেরা গোল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি করে যেদিকে যারা নিয়ে যেতে পারে এবং নিজেদের সীমার মধ্যে ধরে রাখতে পারে, তাদেরই জিৎ। কিন্তু সেটি করতে গিয়ে কতো যে হাত পা ভাঙে, ক্ষেতের ফসল আর বাড়ি ঘরের ক্ষতি হয়, তার আর ইয়ত্তা নেই। কারণ গোল্লার সাথে শতেক যুবক অনবরত ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামনে যা কিছু পড়ছে, তা-ই সমান করে তারা পাগলের মতো ছুটছে। সে কী মাতাল উম্মাদনা!

এমনি উম্মাদনা দেখেছি গরুর চঙ্গ দৌড়ে। সেখানেও প্রতিযোগিতা আছে, হার জিৎ আছে। কিন্তু আজ বোধ হয়, এর কোনোটিই আর অবশিষ্ট নেই। মানুষের সেই উদ্যম উদ্দীপনা হারিয়ে গিয়ে আজ শুধু অর্থের লোভে দুই চোখ চক্‌চক্ করছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

এখন আমার লেখাপড়ার কথা বলি। না, খুব কড়া পাহারা! শিক্ষকরা যেন চীনা জোঁকের মত চারদিক থেকে বেড় দিয়ে ধরেছেন। তাই এবার ঠিক হয়েছে, সামাদ সাহেবদের পাশের বাড়িতেই আমি রমজানে থাকবো। সেখানে মাদ্রাসা সুপার হাবিবুল্লাহ সাহেব আছেন, রউফ সাহেব আছেন, হাফেজ সাহেব আছেন ; তাঁরা সবাই আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং প্রয়োজন হলে সাহায্য করবেন। না, এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই ; সাত আটজন সহপাঠী নিয়ে আমাদের পাঠের মহড়া বেশ ভালোভাবেই চলছে। মাঝে মধ্যে বিকালে এদিক সেদিক বেড়িয়ে আসি। তারপর চোখে আর মুখে যতোক্ষণ কুলায়,পাঠাভ্যাস চালিয়ে যাই।

তবু, এতো করেও, বদনাম আমার দূর হলো না। ঐ অমুকের মতো নিষ্ঠা না থাকলে কিসের আবার ছাত্র! সত্যি একথা শুনতে শুনতে হিংসা হলো। তা অমুককে তো আমি বহু আগে থেকেই চিনি। বারুরী থেকে মাদ্রাসায় যেতে বড়ো রাস্তায় উঠার আগেই ডান পাশের একটা বাড়িতে থাকেন তিনি। সারা দিনরাত কিতাব কোরান তাঁর সামনে মেলানো। পথ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে দেখতাম তাঁর সেই পাঠাভ্যাসের দৃশ্য। সত্যি নিষ্ঠা আছে তাঁর। কিন্তু এতো করেও তিনি আমাদের সাথে তৃতীয় বারের মতো আলিম পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছেন। অথচ তাঁকেই বার বার আমাদের সামনে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হয়!

নাম জানিনা, হয়তো জানতাম, এখন আর মনে নেই। একদিন গেলাম তাঁর এখানে, বললাম, 'আপনার নাম শুনতে শুনতে তো কান ঝালাপালা হয়ে গেলো! রাতদিন এতো পড়েন কী করে। ভালো লাগে আপনার!'

শুনে কেমন এক উদাস ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি, বললেন, 'ভালো লাগে কী সাধে! সারারাত মাছ মেরে মনে করি খালুই ভরে উপচিয়ে পড়লো বুঝি। কিন্তু সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি খালুই শূন্য, একটিও মাছ নেই।'

হ্যাঁ, এটিই তাঁর রোগ। তাঁর নিষ্ঠা ছিলো, কিন্তু মেধা ছিলো না। তিনি সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু ধরে রাখতে পারেন নি। আলাপ করে বুঝলাম, তাঁর জানাশোনা ভালোই, বুঝেনও সব কিছু ,কিন্তু প্রয়োজনের সময় আর খুঁজে পান না!

না, করার কিছু নেই। কারণ বুদ্ধি ও মেধা আমাদের সহজাত। আমরা সাথে করে যেটুকু নিয়ে আসি, সেটুকুই আমাদের পুঁজি। সেই পুঁজি দিয়ে যেটুকু ব্যবসা করা যায়, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। না, মাথা কুটে মরলেও এর বাইরে কিছু হবার নেই। অনেকের ধারণা ভালো খাওয়াদাওয়া করলে মেধা বাড়ে ; এ হলেতো ধনীর দুলালরা সবাই মেধাবী হতো। না, তা হয় না। পৃথিবীতে তাই অনাথ এতিমরা অনেক কীর্তি কাণ্ড করে গেছেন। বুদ্ধির ব্যাপারটিও তেমনি, ঘষলে মাজলে যেটুকু আছে, সেটুকু ধারালো হয় মাত্র ; বাড়ে না। জ্ঞানেও বুদ্ধি বাড়ে না। তাই অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি অনেক জ্ঞানীর চাইতে বুদ্ধিমান।

না, সেই ভদ্রলোকের কাছে এই তত্ত্বকথা আওড়াইনি। তখন সব কথা যে জানতাম, তাও নয়। কিন্তু বর্তমানের জ্ঞান দিয়েইতো অতীতকে উদ্ধার করতে হয়। তাই সেই ভদ্রলোকের জন্য যেমন আক্ষেপ হয়েছে, তেমনি হিংসাও হয়েছে। আহা, তাঁর নিষ্ঠা যদি পেতাম। কিন্তু মেধা না থাকলে পেলেই বা কী লাভ হতো! যাক্, যার যা আছে, তাই নিয়ে আমরা পথ চলছি ; এর বেশি কিছু নয়।

তাইতো হয়, তা না হলে সেই ভদ্রলোক নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করলেন না কেন! না, তিনি তাঁর খালুইর শূন্যতা এখানকার ছাত্র শিক্ষককে দেখাতে চান না ; যা হয় আড়ালেই হোক। অনর্থক আগে থেকেই দুশ্চিন্তার বোঝা বাড়িয়ে কী লাভ!

যাহোক, আমরা দশ-বারো জন সেন্টারের জন্য নির্বাচিত হলাম। আরো কয়েকজন আছে, তারাও শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথী হবে। পরীক্ষা দিতে হবে হয়বত নগর কেন্দ্রে। সেই হয়বতনগর, যেখানে আমি ভর্তি হতে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হবার ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আমার সাথীদের কথা আমি স্মরণ করতে পারছিনা কেন! যারা একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো, তাদের মধ্যেও দু'চার জন ছাড়া আর সবাই হারিয়ে গেছে।

এ ব্যাপারটিও বেশ রহস্যজনক। স্মৃতি অনেক সময় অনেক তুচ্ছ ব্যাপারও ধরে রাখে, আবার অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও বেমালুম ভুলে যায়। কোন্‌টি সে বহন করবে, আর কোন্‌টি করবে না, তা নিয়ন্ত্রিত হয় কোন মাপকাঠিতে! আমারতো মনে হয়, ব্যক্তিগত রুচি আর তার চাহিদাই এখানে সঞ্চয় নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে

মানুষের স্মৃতির সঞ্চয় দিয়েও তার ব্যক্তিত্বকে অনেক সময় নিরূপণ করা যায়। তার অতীতই বলে দেয়, সে প্রত্যয়ী না সংশয়ী, সংযমী না সংগ্রামী!

কিন্তু জানি না, কোন রুচির কবলে পড়ে সহপাঠীদের নাম এমনভাবে হারিয়ে গেছে। তা না হলে তিন বছর যাদের সাথে কোরান কিতাবের পাতা উল্টালাম, তারা জীবনের পাতা থেকে চিরদিনের জন্য সরে গেলো কেন! আত্মকেন্দ্রিকতার ত্রুটিতো আমার অবশ্যি ছিলো, আর সেটি একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডিতেই ঘুরপাক খেয়েছে। কাতলাসেনে আমার ভূগোল পূবে গোপালনগর, পশ্চিমে মাদ্রাসা, উত্তরে গোষ্ঠা জনাব আলী ডাক্তারের বাড়ি, আর দক্ষিণে দেওখলা বাজারের মধ্যেই যেমন সীমাবদ্ধ রয়েছে, তেমনি আমার মানস প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতামূলক পঠনপাঠন আর আত্মপ্রকাশের মধ্যেই নিয়োজিত রয়েছে। এ এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারেও বহুলাংশে আমার নির্লিপ্তি লক্ষণীয়। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে আব্দুল করিম খান, জনাব আলী ডাক্তার, আবুল ফাত্তাহ খান, এমনি দু'চার জনের নামই আমি মনে করতে পারি। সুতরাং আমার স্মৃতির বলয় খুবই সংকীর্ণ!

তবু কাতলাসেন মাদ্রাসা, তার ছাত্র শিক্ষক, আমার দুই লজিং বাড়ি, আমার বন্ধু বান্ধব, জানা অজানা সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁরা বিচিত্রভাবে আমার স্মৃতির সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাতলাসেনে আমার ছাত্র জীবনের কাল পরিধি ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। এখন আমি আমার পাঠ্যসূচীর উপর চোখ বুলানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছি। আমার উপর কাতলাসেনের অনেক আশা ভরসা। তাই অপাঠ্য পুস্তক থেকে আমি অনেক দূরে। আত্ম প্রকাশের তাগিদ আমি আর অনুভব করি না। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, বিপদতো সেই বস্তু, যার কোনো পা নেই। সে নিঃশব্দে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই এই কাতলাসেনের গৌরব এমন ব্যস্ততার মধ্যেও কবিতা রোগে আক্রান্ত হলো। যখন শিক্ষকরা তা জানতে পারলেন, তখন একটা খাতার অর্ধেক ভরে গেছে।

আমাদের পাঠ্যসূচীতে তখন শুধু আরবি সাহিত্য নয়, কিঞ্চিৎ ফারসী ও উর্দু সাহিত্য পঠনেরও ব্যবস্থা ছিলো। সেই সুবাদে 'মুসদ্দসে হালী' পড়ছিলাম। ইসলামের গৌরব ও লজ্জা এই দীর্ঘ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে অপূর্ব আবেগে বিধৃত হয়েছে। সেই আবেগ খুব সহজেই আমাকে বিচলিত করলো। আমিও ভাবাবেগ আক্রান্ত হলাম এবং বাংলায় এই ষট্‌পদী কবিতার অনুকরণ রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু সহপাঠীদের বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ করতে দিলোনা। তারা যথারীতি হাসান সাহেবকে জানালো এবং তিনি আমার পকেট থেকে সেই খাতাটি উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করলেন। তারপর সেটি আর আমি ফেরৎ পাইনি।

আমি আজ আর স্মরণ করতে পারছি না যে, আমার এই হারিয়ে যাওয়া কবিতাটির বিষয়বস্তু কেমন ছিলো ; কীভাবে শুরু হয়েছিলো, কীভাবে অগ্রসর হয়েছিলো। শুধু ষোল মাত্রার প্রথম চারটি ছত্রে একই ধরনের অন্ত্যমিল এবং শেষ দুটি ছত্রে ভিন্ন ধরনের

অন্ত্যমিল নিয়ে সে খাকী মলাটের অভ্যন্তরে অতি সন্তর্পণে ফুটে উঠছিলো মাত্র। হায়, কী কুক্ষণেই আমি সেটি পকেটে রেখেছিলাম! তা না হলে হয়তো, কাতলাসেনের আমার ধূসর স্মৃতি আরো সজীব ও বাঙ্‌ময় হয়ে উঠতে পারতো!

কিন্তু যা গেছে, তাতো গেছেই, তা নিয়ে আর আক্ষেপ করে কী লাভ! তবে সেই যে, বড়শী থেকে যে মাছটি ছুটে যায়, সেটি বুঝি বড়োই থাকে! সে মাছতো আর পাওয়া যাবে না, শুধু আক্ষেপ নিয়েই ঘরে ফিরতে হয়। কারণ এই আক্ষেপটিইতো না পাওয়ার স্মৃতি চিহ্ন। এটি না থাকলে তো সবই হারিয়ে যেতো, উল্লেখ করারই কিছু থাকতো না।

যাহোক, আমরা হাসান সাহেব আর রউফ সাহেবের নেতৃত্বে হয়বতনগর রওনা হলাম। সেখানে দেওয়ান বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আরো অনেক মাদ্রাসার ছাত্র এসে জুটেছে সেখানে। সেই ছাত্রদের মধ্যে সালাম নামের একটি ছাত্রের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো। শুনেছিলাম, সে মেধাবী এবং পরীক্ষায় ভালো করবে। সুতরাং মেধা বিশিষ্ট সবাইকে সবাইর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে করে এই সেন্টারেও একটা প্রতিযোগিতার ভাব দেখা দেয়। এ অনেকটা নাড়াইর জন্য ষাঁড়কে উত্তেজিত করার মতো। এতে আমি কিছুটা উত্তেজিত হয়েছিলাম বৈকি!

কিন্তু সেই যে কথায় বলে ভাঙা পা-ই আগে গর্তে পড়ে, আমারও হয়েছে সেই ব্যাপার! যাবার পরদিনই আমি আবার পেটের অসুখে আক্রান্ত হলাম। ওষুধ খেয়েও কোনো ফল হলো না। মেছের রান্নার মধ্যে যে ঝাল ছিলো, তা আমার পেট কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না। তবু আমি মরণপণ চেষ্টা করলাম। দু'ঘণ্টার পরেই আমি বেরিয়ে আসতাম। শিক্ষকরা আমাকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কিন্তু আমার করার কিছু ছিলো না। কারণ দু'ঘণ্টাতেই আমার উত্তর শেষ হয়ে গেলে আমি বসে থাকবো কোন প্রয়োজনে! তাই একজন না একজন শিক্ষক প্রায় সারাক্ষণই আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমার লেখার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। এতে দুটোই হতো, আমি নকল করি কিনা তা যেমন দেখা যেতো, তেমনি আমি কী লিখছি, তাও তাঁরা বুঝে নিতে পারতেন। আমার জন্য এতে সুবিধা হলো এই যে, আমার খাতা দেখে আর কারো লেখার আর সুযোগ রইলো না।

কিন্তু যেদিন উর্দু পরীক্ষা দিচ্ছি, সেদিন আমার পেটের অবস্থা এমনি খারাপ যে, আমি ভালো করে বসতেও পারছিনা। হঠাৎ পেটটা মোচড় দিয়ে আমার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। আরো মুশকিল হলো এই যে, সেদিন কেন জানি না, আমার সামনে কেউ দাঁড়ানো নেই। কাজেই আমার পক্ষে কাউকে ডাকা বা অনুমতি নেয়াও সম্ভব হলো না। আমি প্রায় দৌড়ে গিয়ে পাশের একটি পাট ক্ষেতে বসলাম। পেটটাও প্রায় এক সঙ্গে তার ভার হালকা করে আমাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করলো। কিন্তু আমি ফিরে এসে হলে ঢুকতে যাবো, অমনি একজন নিরীক্ষক আমার পথ আটকে দাঁড়ালেন। আমি বিনা অনুমতিতে বাইরে গিয়েছি, কাজেই আমাকে সার্চ করে দেখা হবে। দেখাও হলো,

আমার পকেট থেকে বেরুলো উর্দুতে লেখা একটি পত্র। নিরীক্ষক আমাকে নিয়ে আমার খাতার কাছে গেলেন এবং পত্রটির সাথে আমার লেখা মিলাবার চেষ্টা করলেন। এরফলে আমার লিখতে বসতে দেরী হলো। কিন্তু ততোক্ষণে আমার সামনে প্রায় ভীড় জমে গেছে। এমন কি হল সুপার নিজে চলে এসেছেন। কারণ আমি খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছি বলে সবার ধারণা। আজ যদি নকলের কারণে আমি আউট হয়ে যাই, তা হলে লজ্জায় সবার মাথা কাটা যাবে!

যাহোক, আমি জানতাম না যে, যারা আমাকে প্রতিদিন লক্ষ্য করছিলেন, তারা সবাই আমার সুহৃদ ছিলেন না। কোনো ছুতায় আমাকে বের করে দিতে পারলে তারা খুশীই হতেন। এমন কি যে পত্রটি আমার পকেটে পাওয়া গেছে, সেটিও পরীক্ষার হলে আসার সময় একজন শিক্ষিকই আমাকে দিয়েছিলেন। তাতে আমার জন্য জরুরী কী সব কথা ছিলো। কিন্তু আমি সেটি পড়ার সময় না পেয়ে পকেটেই রেখে দিয়েছিলাম। কাজেই তার সাথে বিষয় বস্তুর মিল থাকার কথা নয়, ছিলোও না। সুতরাং খুব অনায়াসে আমার ফাঁড়া কেটে গিয়েছিলো। আর আমি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সেদিন পুরো তিন ঘণ্টাই পরীক্ষা দিয়েছিলাম।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে শিক্ষক ছাত্রদের কাছে এই পরীক্ষার ব্যাপারে রেষারেষির যে সংবাদ শুনলাম, তাতে আমার মনটাই বিষিয়ে উঠলো। এমন কি ঐ পত্রটিও একটি ফাঁদ ছিলো বলে অনেকে মন্তব্য করলেন। যাহোক আমাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তাই এ নিয়ে আর করবারও কিছু ছিলো না। শুধু আলেম সমাজের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা দেখে বিস্মিত হলাম। হয়বতনগর সত্যি আমাকে হয়বতের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো!

এবার বাড়ি ফেরার পালা। কিন্তু আমি প্রথমেই মায়ের কাছে যাবার কথা চিন্তা করলাম। আমি তাঁর হতভাগা পুত্র যে আলিম পরীক্ষা দিয়ে আলেম হয়ে উঠেছি। এ সংবাদ প্রথমে মাকেই জানানো দরকার। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যরা জানবেন। সুতরাং গাড়িতে উঠে আঠারবাড়ি স্টেশনে এসে নামলাম। আমার সাথে অন্য একজন ছাত্রও নামলো এবং অবাক কাণ্ড, আমাকে মামুজী বলে ডেকে পা ছুঁয়ে সালাম করলো। আমি পরিচয় নিয়ে জানলাম, সে আমার বিপিতা চাচাজির সম্পর্কে নাতি হয়। সে আমার খোঁজে হয়বতনগর গিয়েছিলো। সে আমার কাছে একটি উপহার চায়, সেটি হলো আমার লেখার ঝর্ণা কলম। তার ধারণা আমার এই কলমটির মধ্যেই যাদু আছে। তাই আমি এতো ভালো পরীক্ষা দিতে পারি।

হায় আল্লাহ্! আমাদের এদেশে কুসংস্কার যে কতোটা গভীর, তা এই আলেমপ্রায় ছেলেটির ধারণা দেখেই বুঝা যায়। যাহোক, আমি বিনা দ্বিধায় তাকে কলমটি দিয়ে দিলাম এবং তার কিনে আনা একটি সুন্দর কলম আমি এর বদলে গ্রহণ করলাম।

যাহোক, আমি গোগ, কাউরাট, কোনাপাড়া, মদন, আমুদপুর, ধারাকান্দি গ্রামের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বেড়িয়ে প্রায় দেড়মাস কাটিয়ে দিলাম। এরপর এলাম

চরখরিচায়। এখানেই পরীক্ষার ফল না বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে মনস্থ করলাম। খরিচার সাথে এবার আমার নবতর পরিচয়ের সুযোগ হলো।

এসে দেখলাম, চাঁদপুরের একজন মৌলবী সাহেব বৈঠকখানায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। তিনি বাড়ির ছেলেমেয়েদেরকে আরবি কায়দায় আমপারা পড়ান। তাই আমি থাকার ব্যাপারে বাড়ির মধ্যে প্রমোশন পেয়ে গেলাম। সেখানে খাটের উপর আমার নানা শ্বশুরের সাথে শুই। আমার নানা শ্বশুর কাজী সাহেবের ছোট ভাই। লেখাপড়া খুব একটা জানেন না। কিন্তু যেমন সদালাপী, তেমনি স্নেহপ্রবণ। মেয়ে দুটির ডাকের ধারায় আমি তাকে 'ভাই' বলে ডাকি। তাই কাজী সাহেব হয়ে গেলেন আমার বড়ো ভাই এবং সেই সাথে বন্ধু!

কিন্তু সময়তো আর কাটতে চায় না! ফুটবল খেলে, পাটক্ষেতে বড়শী দিয়ে কৈ মাছ মেরে, গাছের আম পেড়ে আর কাজী সাহেবের সাথে রাজ্যের তত্ত্ব আলোচনা করে কোনো প্রকারে দিনরাত্রি পার করে দিলাম। তবে এ যাত্রায় একটি লাভ হলো এই যে, সেই মেয়েটিকে কাছে টানতে পারলাম। সে এখন আর আমাকে দেখলে দৌড়ে পালায় না। তবে তার খাকী হাফ প্যান্টটি তখনো আছে এবং ছেলেদের সাথে ফুটবল খেলতে সে উস্তাদ। তবু 'বুটলু' বলে ডাকলেই সে এসে উপস্থিত হয়।

এভাবেই আমার পরীক্ষার ফল বেরুবার সময় হয়ে এলো। যথাসময়ে খবর পেলাম আমি আলিম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে অষ্টমস্থান অধিকার করে পাস করেছি। খবরটি আনন্দের সন্দেহ নেই ; তবু খুব একটা তৃপ্তি পেলাম না।

দশম তরঙ্গ ॥

আমার জীবন কথাতো সিন্ধুর এক বিন্দু মাত্র। তবু সেই বিন্দুর মধ্যেও বিস্তার খুব কম নয় ; তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে সে এ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। যদিও তার এই তরঙ্গ বিক্ষোভ মোটেও নির্বাধ ছিলো না। জীবনের উপল খণ্ডে বারবার তা আহত হয়েছে।

জীবনকে পরিপূর্ণভাবে কিসের সাথে তুলনা করা যায় ? আমিতো তাকে নোনাজলে ভরা সিন্ধুর সাথেই তুলনা করে ফেলেছি। আর সেই সিন্ধুর সঞ্চয়ও অশ্রু ও ঘামেই এমন ব্যাপক হয়ে উঠেছে। হয়তো এ আমার অভিজ্ঞতারই এক বাণীমূর্তি। তবু সেই নোনা জলের তরঙ্গ শীর্ষে সূর্যের কিরণ যেমন ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠেছে, তেমনি তৃপ্তির বৃষ্টিধারাও ঝরে পড়েছে!

কাতলাসেনের আমার এক শিক্ষক হাসান সাহেব বলেছিলেন, মানুষের জীবনতো হাউই নয় যে হুট্ করে উপরে বা নীচে চলে যাবে। সে যেখানেই যাক, ধাপে ধাপে যায়। আমিতো দেখেছি, আমার জীবন কীভাবে ধীরে ধীরে উপরে উঠে এসেছে। নতুবা আজ আমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, পঁয়তাল্লিশেও তা ছিলো কল্পনার অতীত। আজ উনিশ শ'পঞ্চাশের এই মধ্য ভাগে এক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আমার সমগ্র চেতনাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কাতলাসেনের সংকীর্ণ পরিবেশ আজ আর আমার মধ্যে কোনো আকর্ষণের সৃষ্টি করতে পারছে না। আজ আমার চেতনা আরো বৃহৎ পরিবেশের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, আমি ঢাকা যেতে চাই। ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হতে চাই। কারণ শিক্ষক ছাত্র নির্বিশেষে সকলের আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, এ অঞ্চলের ছাত্রদের প্রতি অবিচার করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে যেহেতু একটা বিশেষ এলাকার লোকজন বিরাজ করছে, তাই তারা অন্যান্য এলাকার ছাত্রদেরকে খুব একটা পাত্তা দিতে চায় না। তাঁদের ধারণা, আমি ঐ বিশেষ এলাকার হলে আরো ভালো ফল করতে পারতাম। কিন্তু তাই বলে আমার পরীক্ষার ফল যে খুব একটা খারাপ হয়েছে, তা নয় ; কিন্তু তাতে আমিও তৃপ্তি পাইনি। এবার এর কেন্দ্রস্থলে আঘাত করে দেখতে চাই আমার ইপ্সিত ফল লাভ করা যায় কিনা। তাই আমি ঢাকা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

কিন্তু আমার প্রস্তুতি দেখে আমার শ্বশুর কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন। প্রথমে বললেন, 'বাপু, আমিতো খুব সচ্ছল নই, আমি কি ঢাকার খরচ যোগাতে পারবো ?' পরে আবার বললেন, 'যাই হোক, ঢাকা কি খুব ভালো জায়গা ?'

কিন্তু আমি তাঁর কোনো কথাই শুনলাম না, বরং রাগ দেখিয়ে বললাম যে, অবস্থা যাই হোক, আমি যাবোই। আর যদি সেখানে যেতে না পারি, তাহলে কাতলাসেনেও

যাবো না। লেখাপড়াই ছেড়ে দেবো। আমার এ প্রকার রাগ দেখে আমার শ্বশুর বিস্মিত হয়েছিলেন নিশ্চয় ; তাই তিনি আর কিছু বললেন না।

এবার আমি তাঁর মুরুব্বী আমার নানী শ্বাশুড়ীকে গিয়ে ধরলাম। তিনি বোধ হয় আমার রাগারাগির কথা আগেই শুনেছিলেন, আমাকে বললেন, 'দেখো, যেতে চাও যাও। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, বেডার গোস্বায় বাদশা আর বেডির গোস্বায় বেশ্যা ; এখন তুমি কোনটা হবে কে জানে!'

আমি হেসে বললাম, 'আমিতো বেডা, তাই বাদশাই হবো।'

আমার নানী শ্বাশুড়ী একান্ত স্নেহের টানেই কখনো আপনি কখনো তুমি বলে আমাকে ডাকেন। তবে তুমি বলার মধ্যে তাঁর স্নেহের আধিক্যটাই প্রকাশ পায়। এবারও তাই হলো ; আমি তাঁর অনুমতি পেয়ে গেলাম। এখন আমার শ্বশুর আর ট্যাঁ ফুঁ কিছুই করতে পারবেন না। গুঁজা বুড়ীর কথা না মেনে তাঁর উপায় নেই।

কিন্তু অনুমতি তো পেলাম, এর পর ঢাকায় গেলেইতো হবে না, থাকবো কোথায় ? অবশ্যি এ ব্যাপারে আমি আগেই হেকিম সাহেবের সাথে আলাপ করে রেখেছিলাম, তিনিও দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এবার শেষ পর্যায়ে তাঁরই দ্বারস্থ হলাম। তিনি বললেন, 'আমি ব্যাপারটা প্রায় ঠিকই করে এসেছি, তবে কাল দাওয়াখানার ওষুধপত্র আনতে যাবো, তখন শেষ কথাটা জেনে আসবো।' তাই হলো, দু'দিন পরে তিনি আমার লজিং ঠিক করে ফিরলেন।

হেকিম সাহেবের গ্রামের বাড়ি গৌরীপুরের কাছে কোণাপাড়া। তার পাশের গ্রাম কাউরাটের স্বনামধন্য উকিল আকবর আলী সাহেব তখন মুসলিম লীগ সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী। তাঁর ওখানেই আমাকে থাকতে হবে। তিনি নাকি বাবার খুব ভক্ত। তাই দিন দুই পরে তাঁর এই ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করার জন্য হেকিম সাহেবের সাথে আমি ঢাকায় গিয়ে পৌঁছলাম।

আকবর আলী সাহেব তখন বখশী বাজার চন্দ বাড়িতে থাকেন। বিরাট বাড়ি, তার মাঝখানের অংশের একতলা দোতলা মিলিয়ে তাঁর থাকার জায়গা। কিন্তু সেখানে শুধু আমি একা নই, আঠারবাড়ির ওদিকের আবদুল জব্বার এবং নেত্রকোণার আব্দুল হামিদও থাকেন। একজন ওকালতি আর অন্যজন ডাক্তারী পড়েন। তাঁদের সাথে আমি আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্রও যোগ দিলাম। অবশ্যি এ ছাড়াও আকবর আলী সাহেবের তখন অনেক পোষ্য। নিজের সন্তান সন্ততিও কম নয় ; চার ছেলে তিন মেয়ের কথাতো আমিই মনে করতে পারছি। বড়ো ছেলে বদর উদ্দিন এখন ডাক্তার, তার ছোট আফাজ উদ্দিন সরকারী চাকুরে, তার ছোট মিসবাহ উদ্দিন তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, পরে গৌরীপুর কলেজসহ বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছে। মেয়েদের খবর সবটুকু আমি জানি না, তবে উপরে উল্লেখিত আবদুল জব্বার খুব সম্ভব তাঁর বড়ো মেয়েকে বিয়ে করেছেন। তিনি এখন ময়মনসিংহ বারের স্বনামধন্য উকিল। তেমনি কথিত আব্দুল হামিদও নেত্রকোণায় ডাক্তারী করছেন। সুতরাং এই পোষ্যবর্গের মধ্যে আমারও ঠাঁই

হলো. এতেই আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর স্মৃতিতে বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কতোটা গভীর!

আমি যথেষ্ট সংকোচ নিয়েই এমনি সব আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ওঁদের ব্যবহারে আমার সংকোচ দূর হয়ে গেলো। হামিদের সাথেই আমার অন্তরঙ্গতা জমলো বেশি। একদিন আকবর আলী সাহেব আমাকে ডেকে বলে দিলেন, আমি যেন ছোট ছেলেমেয়েগুলির লেখাপড়ার দিকে একটু দৃষ্টি রাখি। এর ফলে মিসবাহ্ ও মেয়ে দুটি আমার সামনে বইপত্র নিয়ে বসতে লাগলো। এদের মধ্যে মিসবাহ্র বোধ হয়, আমার এই তদারকি খুব ভালো লাগেনি। কারণ আমি তার অপাঠ্য পঠনে বাধা দিতাম। তাই সে তার ইংরেজি বাংলা দিয়ে আমাকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করতো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার দক্ষতা ছিলো, সহপাঠীদেরকে পড়িয়ে আমার অন্ততঃ এইটুকু ক্ষমতা জন্মেছিলো যে, বিষয়বস্তু যাই হোক, তা দিয়ে ছাত্রদের মন ভোলাতে পারতাম। আর ইংরেজি বাংলাটা আমার খুব অপরিচিত ছিলো না। কিন্তু মিসবাহ্ বোধ হয় জানতো না যে, অংক নিয়ে এলেই আমি কুপোকাৎ হয়ে যেতাম। সম্ভবতঃ সে নিজেও অংকে কাঁচা ছিলো বলে এ নিয়ে আর আমাকে ঘাটাতে সাহস করেনি। কিন্তু মিসবাহকে ঠেকানো গেলেও ছোট মেয়েটিকে কিছুতেই ঠেকানো যেতো না। সে বড়ো হয়ে মধুবালা কিংবা সুরাইয়ার মতো একজন ফিল্মস্টার যে হবেই, সে আকাঙ্খা সে নানা ভাবেই ব্যক্ত করতো। জানি না, পরবর্তী কালে সে কী হয়েছে! কিন্তু তখন একজন মাদ্রাসার ছাত্রের সামনে এসব কথা বলে ওরা বোধ হয়, খুব মজা পেয়েছে। শুধু ওরা জানতো না যে, ওদের ওই মধুবালা সুরাইয়াকে আমি ওদের চাইতেও বেশি করে জানি। কারণ তখন পর্যন্ত আমার দেখা সিনেমার সংখ্যা কম ছিলো না।

সে যাই হোক, কিন্তু আমি তো চন্দবাড়ি নিয়েই মেতে আছি, মাদ্রাসা আলীয়া সম্পর্কে কথা বলারই সুযোগ পাচ্ছি না। এর কারণও অস্পষ্ট নয়। কারণ ঢাকায় যাবার পর আমার স্মৃতি অধিকতরভাবে এই চন্দবাড়ি নিয়েই প্রথমে ব্যাপৃত থেকেছে। শুধু উর্দু রোড, চকবাজার, বেগম বাজার, আরমানীটোলা, ইলিংশ রোড, ভিক্টোরিয়া পার্ক ঘুরে 'ডাফরিন হোস্টেল বিল্ডিং'-এ যাওয়া ছাড়া আর খুব বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। কারণ বাইরের দিক থেকে আলীয়া মাদ্রাসা তখনো দর্শনীয় বা আকর্ষণীয় কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ বছর খানেক পূর্বেই সে কোলকাতা ছেড়ে এসে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের এই হোস্টেলটিতে আশ্রয় নিয়েছে। তখনো তার আসবাবপত্র এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

আর সেই ১৯৫০ সনে ঢাকার অবস্থা তেমন একটা কিছু নয়। যে পথটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেটিও গলি ঘুঁজিতে ভরা। একমাত্র ফাঁকা জায়গা আরমানীটোলা ময়দান। আবার মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে ইসলামপুর হয়ে গেলেও দৃশ্যের খুব ইতর বিশেষ নেই। শুধু নবাবপুর হয়ে এগিয়ে গেলে রেললাইন পেরুনোর পর

ডানদিকে লাট ভবনের সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়তো। গুলিস্তান বিল্ডিং এখন যেখানে, সেখানে একটা ফলের দোকান, ডানদিকে বৃটিশ ইনফরমেশনের একটি চৌচালা টিনের ঘর, বামদিকে তল্লাবাঁশের চাটাই দিয়ে ছাওয়া লম্বা লম্বা ব্যারাক, মোড়ের কাছে মাঠের পাড়ে একটি পরিত্যক্ত সিনেমা ও কিছু নতুন দোকান পার হয়ে হাইকোর্ট, কার্জন হলের সামনে পৌঁছলে মনে হতো, না, ঢাকা নিতান্তই বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলির শহর মাত্র নয়। তারপর নাজিম উদ্দিন রোড হয়ে জেলখানার মাঝখান দিয়েই আমি চন্দবাড়িতে গিয়ে উঠতাম। কাজেই না পথ, না প্রতিষ্ঠান, কোনোটাই তখনো মনে দাগ কাটতে পারেনি।

ঢাকা আলীয়ায় শিক্ষকের সংখ্যা তখন অনেক। প্রিন্সিপাল ছিলেন জিয়াউল হক নামে ক্লিনসেভ এক ভদ্রলোক। প্রধান মৌলবী জাফর আহমদ থানবী। এরপর আব্দুর রহমান কাশগরী, সৈয়দ আমিমুল এহসান, আবুল কালাম আবদুল্লাহ, মমতাজ উদ্দিন, আবদুল্লাহ্ নদবী, আব্দুস সাত্তার, আবদুল হক, ওয়াজিহুল্লাহ, শফি আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান এমনি কিছু নাম মনে পড়ছে। তবে তখনি সবার সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি।

প্রথম যিনি আমার পরিচয় গ্রহণ করে আমাকে প্রায় চমকে দিলেন, তিনি হলেন মৌলানা মমতাজ উদ্দিন। বর্তমানে স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ মওদুদ আহমদের পিতা। তাঁর কাছে আমরা বিখ্যাত আরবি কবি ইমরুল কায়েসের কবিতা পড়তাম। ইমরুল কায়েসের জীবন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করেছিলাম আমি। তিনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো আমাকেই প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। শেষে বললেন, 'কৈ, ময়মনসিংহ এলাকার ছেলেরাতো এ ধরনের প্রশ্ন কোনো সময়েই করে না।'

আমি বললাম, 'অতীতে করেনি বলে এখনো যে করবে না, এমন তো কথা নেই!'

পড়ানোর মাধ্যম যদিও উর্দু, তবু আমাদের প্রশ্নোত্তর বাংলাতেই হয়েছিলো, আর এর মধ্য দিয়েই আমি তাঁর স্নেহ লাভ করেছিলাম। এরফলে একদিন নাজিম উদ্দিন রোডের তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান অফিসের পিছনে একটি দালানে তাঁর বাসায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। তিনি সেদিন নাশতা খাইয়ে আমাকে নানান বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তিনিই বলেছিলেন যে, আমি যেন লজিং ছেড়ে হোস্টেলে চলে আসি।

কিন্তু তখনো আমার হোস্টেলে আসার কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। কারণ আমার শ্বশুর তখনো আমার ঢাকা আসার ব্যাপারে সংশয়মুক্ত হতে পারেননি। এর একটা কারণ সম্ভবতঃ ঢাকায় থেকে আমি অন্য কোথাও হারিয়ে যাই কিনা, সেই সন্দেহ। দ্বিতীয়ত ঃ তিনি আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষার ধারাকে তখনো মেনে নিতে পারেননি। কারণ এই ধারায় শিক্ষিত আলেমদেরকে তিনি দেখেছেন। তারা না জানে লেখাপড়া, না শিখে আমল আখলাক! এর প্রমাণ, আমার শ্বশুর পীর মাজারের বিরোধী হলেও এই সব আলেমরা বিভিন্ন স্থানে এটিকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাই তাঁর মনোগত

বাসনা ছিলো, আমি যেন খারেজী লাইনে লেখাপড়া করি। দেশ বিভাগ না হলে তিনি আমাকে নির্ঘাৎ দেওবন্দ সাহারানপুর পাঠিয়ে দিতেন। কারণ তিনি নিজেও সাহারানপুরে লেখাপড়া শিখেছেন। দেশে ফিরে এসে এইসব বেদাতী আলেমদের সাথে তাঁর ঝগড়া ঝাটিও হয়েছে। এমন কি তাদের বিরোধিতার মুখেও তিনি নিজের বাড়ির পাশে গড়ে উঠা একটি মাজার ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এসব কারণে তাঁর ধারণা হয়েছে, তিনি যাকে পুত্র স্নেহে লালন করতে চাইছেন, সে যেন এমনি বেদাতী আলেম না হয়ে ওঠে!

আমার শ্বশুরের এই যে যুক্তিবাদী পরিচয়, এই আমি প্রথমেই তাঁর একটি কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম। পরবর্তীকালে নানাভাবে তাঁর অন্যান্য পরিচয়ও আমার কাছে পরিস্ফুট হয়েছে। কারণ তিনি নিজে ছিলেন স্বল্পভাষী-গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বিনা কারণে গালগল্প করতে তাঁকে কখনো দেখিনি। এ কারণেই আমি তাঁকে যতোটা জেনেছি, তিনি আমাকে ঠিক ততোটা জানতে পারেননি। শুধু জানতেন আমি একজন ভালো ছাত্র। কিন্তু আমিও যে পীর মাজার বিরোধী, এটা তিনি বুঝতে পারেননি। তা না হলে আলীয়ার শিক্ষা নিয়ে তিনি এমনভাবে বিচলিত হতেন না, বাধা দিতেন না।

সুতরাং লজিং বাড়িতেই আমার সময় কাটতে লাগলো। তবে অসুবিধার কিছুই ছিলো না। বদর আফাজদের সাথে মিলেমিশে আমি প্রায় ঘরের ছেলেই হয়ে উঠলাম। একবার আকবর আলী সাহেব গেছেন হাটহাজারীতে মাইজভাণ্ডারের উরস করতে। কারণ সেই বার্ষিক উরসের তিনিই ছিলেন সেক্রেটারী। আর তাঁর স্ত্রী, ছোট ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে গেছেন দেশের বাড়িতে। আমি, বদর, আফাজ, হামিদ এই কয়জনই বাসায় থাকি। কিন্তু প্রায় দিনই আমাকে একাই দিনের বেলা বাসা পাহারা দিতে হয়েছে। একটা বই সামনে নিয়ে শুয়ে বসে সময় কাটিয়ে দিয়েছি। এর বদলে ওরা আমাকে নানান ধরনের উপহার দিয়েছে। কোনো দিন সিনেমা, কোনোদিন হোটেলে বিরিয়ানী, আবার কোনো রাতে নাটক দেখতে যাওয়া। এমনি একরাতে কার্জন হলে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভীড়ের ঠেলায় সে নাটক আর দেখা হয়ে ওঠেনি।

আকবর আলী সাহেব তখন ফিরে এসেছেন। আমি তখনো দোতলার বড়ো কোঠাতেই শুই। এক রাতে হঠাৎ হৈ চৈ শুনে জেগে দেখি জানালায় গামছা বেঁধে ইয়া মোটা এক কালো চোর শিক বাঁকাতে চেষ্টা করছে। আর ওদিকে বদরু বন্দুকে গুলি ভরছে। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার আগেই চোর বেটা গামছা ফেলে রেখেই চম্পট। কিন্তু তার সাহস আর শক্তি দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। এক ইঞ্চি মোটা লোহার গরাদ সে গামছা বেঁধে পিঠে লাগিয়ে প্রায় বাঁকিয়ে ফেলেছিলো আর কি!

মাঝে মধ্যে গৌরীপুরের লেবু মিয়া গিয়ে উপস্থিত হতেন। তিনি গেলেই চাকর চাকরানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যেতো। ভদ্রলোক যাবার বেলা ওদেরকে মোটা বখশিশ দিতেন। একদিন আমার সামনেই এক রিকসাঅলাকে পাঁচ টাকা দিয়ে ফেললেন। অথচ আমরা ফুলবাড়িয়া থেকে চন্দবাড়ি পর্যন্ত এক টাকাই দিতে চাইতাম না। এমনি দরাজ

হাত ছিলেন ভদ্রলোক। এর কারণও ছিলো, মুসলিম লীগের সহায়তায় ঠিকাদারী করে তিনি প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছিলেন।

কখনো হাটহাজারীর পীর মৌলানা আবদুল কুদ্দুসের নাতি এসে উপস্থিত হতো। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র এই যুবকটির চেহারা ছবি পোশাক আশাক দেখে আমি বিস্মিত হতাম। মনে হতো পীরের ব্যবসাতে আর যাই থাক, পয়সাকড়ি মন্দ নয়। কায়দা মত জমাতে পারলে ভালোই আয় হয়।

এভাবেই আমার চন্দবাড়ির জীবন কেটে যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যেই মৌলানা মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। তিনি আমার সাহিত্য প্রীতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নিজেও সাহিত্য ভালোবাসেন। তাঁর একটি পুস্তক তখন প্রকাশিত হয়েছে, নাম 'জামালউদ্দিন আফগানী'। সেই বিখ্যাত ইসলামী বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রবক্তাদের একজন, তাঁর জীবন কাহিনী। সুতরাং মোস্তাফিজ সাহেবের সাথে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠলো। বস্তুতঃ তিনিই বলতে গেলে আলীয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরীটি সম্পর্কে আমাকে খোঁজ দিলেন। সেটি তখন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের একটি কক্ষে এলোমেলোভাবে ছড়ানো। এর ফলেই এই সমৃদ্ধ পাঠাগারটির অনেক বই-ই বলতে গেলে অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে। তবু আমি সময় পেলেই সেই বইয়ের স্তুপ নাড়াচাড়া করে দেখেছি।

কিন্তু এ সময়ে আমার অপাঠ্য পাঠের বা আত্মপ্রকাশের কোনো স্পষ্ট স্মৃতি নেই। শুধু হামিদের একটি ঠাট্টার কথা মনে পড়ে। আমি মাঝে মাঝে চন্দবাড়ির সামনের অন্ধকার সিঁড়ির একপাশে বসে থাকতাম। তখন জীবন যৌবন ধনমান ইত্যাদি নিয়েই আমি হয়তো কিছু ভাবতাম। আর চোখের উপর অন্ধকারের এক কোমল পরশ উপভোগ করতাম। কিন্তু আমাকে এমনি অবস্থায় দেখলেই হামিদ বলতো 'কি হে অন্ধকারের কবি!' কিন্তু আমি যে কবিতা লিখি বা লিখতে পারি, একথা হামিদ জানলো কী করে! তা হলে কি এসময়ে আমার কোনো লেখা তার চোখে পড়েছিলো? আমার কিন্তু কিছুই মনে পড়ছেনা।

তবে এ কথা সত্যি যে, চন্দবাড়িতে যতো আরামই থাক, আমার নিবিষ্ট সাধনার ক্ষতি হচ্ছিলো। কারণ ঢাকায় এসেছি বলেই আমার প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে, এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং তুলনামূলকভাবে প্রতিযোগিতা এখন বেড়েছে। এখানে যারা লেখাপড়া করছে, তারা সবাই প্রায় ভালো ছাত্র। তা ছাড়া সামনে 'ফাজিল' অর্থাৎ জমাতে উলার সেন্টার পরীক্ষা। সেখানে সারা দেশের ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। সুতরাং আমার এভাবে সময় নষ্ট করার সময় মোটেও নেই।

শেষ পর্যন্ত আমার সব কথা লিখে আমার শ্বশুরকে একটি পত্র দিলাম। পত্রটির ভাষা আরবি। হঠাৎ কেন যে আরবিতে লিখার ইচ্ছা হলো বুঝতে পারলাম না। কিন্তু শুরু করে দেখলাম, ভালোভাবেই শেষ হলো। দীর্ঘ এক পৃষ্ঠা ব্যাপী সেই আরবি ভাষার

পত্রে কী জাদু ছিলো জানি না, কিন্তু ওতেই কাজ হলো! পরে শুনেছি, আমার এই পত্রটি আমার শ্বশুরকে এতোটা বিচলিত করেছিলো যে, তিনি এটি তাঁর বন্ধু বান্ধব পরিচিতজন সবাইকে দেখিয়েছিলেন এবং কিছুটা গর্বও অনুভব করেছিলেন।

ইতিমধ্যে রমজানের বন্ধ এসে উপস্থিত হলো। আমি এবার চরখরিচা গিয়ে রমজান মাস কাটাবো বলে স্থির করলাম। কারণ আলীয়ায় সহপাঠীদের সাথে পঠন পাঠনে রমজান কাটানোর মতো পরিবেশ এখনো গড়ে উঠেনি। আর গড়ে যে উঠবে, তারও কোনো স্থিরতা নেই। কারণ এটা গ্রাম নয়, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী।

খরিচা যাওয়ার পথে হেকিম সাহেবের সাথে দেখা হলো। তিনি আমার কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করে বললেন যে, আমার হোস্টেলে যাওয়া এবার সম্ভব হবে। আমার পত্রের কথাও তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম। শ্বশুর সাহেব গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর মুখ দেখেও বুঝতে পারলাম বরফ এবার গলতে আরম্ভ করেছে।

তাছাড়া আমার প্রয়োজনওতো তখন খুব বেশি ছিলো না। আমি পঁচিশ টাকার একটি বৃত্তি পেয়েছি। এছাড়া হাজী মোহাম্মদ মহসীন প্রদত্ত 'মুসলিম এডুকেশন ফাণ্ড' থেকে পাঁচ টাকার একটি বৃত্তি পাবো বলেও আশ্বাস পেয়েছি। সুতরাং আর কুড়ি পঁচিশ টাকা হলেই আমার ঢাকার খরচ চলে যেতে পারে। কারণ মাদ্রাসায় আমার কোনো বেতন দিতে হয় না। কিতাবপত্র কর্জ হিসাবে মাদ্রাসা লাইব্রেরী থেকেই পেয়েছি। শুধু হোস্টেলের খোরাকী জুটিয়ে কিছুটা হাত খরচ হলেই হয়। হোস্টেলের খোরাকীও খুব বেশি নয়। সর্বসাকুল্যে মাসে ত্রিশ বত্রিশ টাকা হলেই চলে যায়।

কাজেই আলাপ আলোচনায় ব্যাপারটা স্থির করতে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। আমার 'বু' মানে নানী শ্বাশুড়ীর এক কথাতেই আমার শ্বশুর কাৎ হয়ে গেলেন। এর ফলে আমি অনেক দিন পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলাম। কিন্তু একটা কথা ভেবে এখনো বিস্মিত হই যে, আমার শ্বশুরের এমনি বাধাদান আমার মনকে বিরূপ করে তুললো না কেন! আমিতো বীতশ্রদ্ধ হয়ে অন্য কোনো উৎসেরও সন্ধান করতে পারতাম। তা না করে এমনভাবে অপেক্ষা করে আমার শ্বশুরের মন জয় করার চেষ্টা করলাম কেন! আমার মনে হয়, এখানেও সেই স্নেহের পরশের রহস্যটি লুকিয়ে আছে। এই পরশের মায়া যে সহজে কাটানো যায় না।

না, শ্বশুরের কন্যাদের সম্পর্কে কোনো ঔৎসুক্য তখনো আমার মনে জাগ্রত হয়নি। কাতলাসেন থাকতে সেই মদন বাইটকান্দি মিলে আমার মনে বসন্তের একটা বাতাস বইয়ে দিয়েছিলো বটে, তখন দুয়েকটা ফুল ফোটার দৃশ্য, ভ্রমরের গুঞ্জনের শব্দ দেখেছিলাম, শুনেছিলাম, তাও ঠিক ; কিন্তু এর পরেই গ্রীষ্ম বর্ষা যেভাবে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তাতে বসন্তের সেই আমেজটুকু উবে গিয়েছিলো। গোপালনগরে থাকার সময় আমার মনে একটি শিশুর কান্নার কথা আমি বলেছি। সেই কান্নার মধ্যেই বর্ষার প্রবল প্রতাপ লক্ষ্য করা যায়। এরপর পরীক্ষার অবসানে একটা ঋতু পরিবর্তনের সুযোগ

ঘটেছিলো। কিন্তু ঢাকা যাওয়ার শীতের জাড্যতা তখন আমাকে পেয়ে বসেছে। সেই শীতের প্রকোপ এখনো বলতে গেলে কমেনি।

তবুও এই হোস্টেলে যাওয়ার সুযোগটি এমন এক তাপের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে মনে হলো, শীতের বরফ বুঝি গলতে আরম্ভ করেছে। মনের এমনি অবস্থা নিয়ে গেলাম উত্তর পাড়া বেড়াতে। তারাকান্দা থেকে তিন চার মাইল উত্তর পূবে অবস্থিত বাট্টা উত্তর পাড়া গ্রামে আমার নানা শ্বশুরের শ্বশুর বাড়ি। তাঁর শ্যালকের নাম নৈমউদ্দিন সরকার। সেখানে কার সাথে গিয়েছিলাম, ঠিক মনে নেই; কিন্তু তাতে পরিচয়ের অসুবিধা হলো না। দেখলাম, আমার পরিচয় আমি যাবার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে।

নৈমউদ্দিন সরকার মোটা সোটা সদালাপী বেশ হাসিখুশী মানুষটি, আমাকে আপন জনের মতোই গ্রহণ করলেও তাঁকে ভাই বলে ডাকতে লাগলাম। তাঁদের বাড়ির উত্তরের হিস্যায় তাঁর চাচাতো ভাই জলিল ভাইয়ের সাথেও পরিচয় হলো। বেশ রসিক লোক এই জলিল ভাই। আমাকে বুঝি তিনিই প্রথম 'নাতিন জামাই' বলে সম্বোধন করলেন। আমিও সে ভাবেই তাঁর ঠাট্টা তামাশা হজম করতে লাগলাম।

সেখানে কয়দিন ছিলাম, মনে পড়ছে না। কিন্তু একদিন দুপুর বেলা বাড়ির সামনের আম গাছতলায় বসে জলিল ভাইয়ের সাথে খোশগল্প করছি, হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, 'কিন্তু একটা কথা বলি, নাতিন জামাই, বিয়ে যদি করোই, তা হলে বড়ো মেয়েটিকেই করা উচিত। তাকে তো তুমি দেখোনি, অদ্ভুত সুন্দরী!'

আমি তাঁর এ কথা শুনে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলাম। কিন্তু জলিল ভাই তাঁর কথার ধারা থামালেন না। এরপর যেসব কথা বললেন, সেগুলি এমন ভাবে আর কোথাও শুনিনি। ছোট মেয়েকেই আমার কাছে বিয়ে দেবেন বলে তারা স্থির করেছেন। কারণ ততো দিনে আমার লেখাপড়ারও শেষ হবে এবং মেয়েও উপযুক্ত হয়ে উঠবে। এখন তাই বড়ো মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্য জামাই খোঁজা হচ্ছে।

আমি শুনে মনে মনে ভাবলাম, ব্যাপার তা হলে অনেক দূর গাড়িয়ে গেছে, অথচ আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারিনি। মনটা কেন জানি বেশ খারাপ হয়ে গেলো। ছোট মেয়েটিতো এখনো মাটির সাথে কথা বলে। কোন দিন বড়ো হবে, কে জানে! ততোদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। মনে হলো, যেন কোনো এক অজানা অপরাধে আমার বেশ কয়েক বৎসরের জেল হয়ে গেছে।

মনের এমনি অবস্থা নিয়ে ফিরে এলাম চরখরিচায়। জলিল ভাই হঠাৎ একী করলো, আদমসন্তানকে এমন ভাবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের সন্ধান দিলো কেন! জানতাম না, সেইতো ছিলো ভালো। কিন্তু জেনে ফেলে এখন কেবলই মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধেছে, নড়তে গেলেই খচ্ করে লাগে; কিন্তু কিছুতেই তা খুলে ফেলতে পারছিনা। বাঁশে-কাঠে ঘুন ধরলে যেমন বাইরে থেকে কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মেদ মজ্জা কুরে কুরে ঝুর্ঝুরে করে দেয়, আমারও কি সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে!

এমনিতে ঘুরে বেড়াই, মাছ মারি, ফুটবল খেলি, গালগল্প করি, বড়ো ভাইয়ের সাথে তত্ত্ব আলোচনাতেও যোগ দিই; কিন্তু কিছুতেই যেন স্বস্তি পাচ্ছিনা। ইতিপূর্বে বলেছিলাম, হোস্টেলে যাবার সুযোগ সংবাদে মনের বরফ গলতে আরম্ভ করেছিলো, এখন সেই বরফ শুধু গললো না, ঝর্‌ঝর করে এলেমেলো পাথরের উপর ঝরেও পড়তে লাগলো। আর আমি সেই ঝর্ণার গানে কেমন তন্ময় হয়ে গেলাম।

বড়ো মেয়েটির নাম ফজিলত। আমি তাকে দেখিনি, তার সৌন্দর্যের কথা এর আগে কারো কাছে শুনিওনি। ছোট মেয়েটিতো এখন ধারে কাছেই থাকে। তার সাথে তার মামাটিও আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। এদের চেহারা ছবিতে তেমন কোনো লাবণ্যের ছাপতো নেই। তাহলে হঠাৎ সে এমন লাবণ্যময়ী হয়ে উঠলো কী করে। একবার দেখতে পারলে হতো। কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ করে উঠতে পারছিনা।

এর মাঝে একদিন 'বুটলু' আর তার প্রায় সমবয়সী মামা একটা বড়ো সাদা কাগজ নিয়ে এলো। এর মধ্যে তাদের পাঠ্য বইয়ের একটি কবিতা বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে দিতে হবে। আমি লিখতে বসে নিজেই একটি কবিতা রচনা করে লিখে ফেললাম। সেই কবিতার ভাব ভাষা কোনোটাই আজ আর মনে নেই; কিন্তু তার মধ্যে আমার মনের একটা আবেদন, বোধ হয়, তুলে ধরতে পেরেছিলাম। তবে আমার এই আবেদন নাম ঠিকানাবিহীন চিঠির চাইতে বেশি কিছু নয়। এমনি চিঠি প্রাপক কোনো দিনই পায় না, এতে শুধু প্রেরকের একটি নিস্ফল কামনাই পথে পথে ঘুরতে থাকে।

যাই হোক, যেমনি হোক, এই-ই আমার জীবনের একমাত্র প্রেমপত্র। আমার বয়স তখন বাইশে পড়েছে। এই বয়সে কাউকে ভালোবেসে একাধিক প্রেমপত্র রচনা করা এমন কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে তেমন কোনো সুযোগই দেখা দেয়নি। অনবরত পথের বাধা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে এসেছি আমি। কাউকে ভালোবাসার, তাকে চিঠি লিখার অবসরই ছিলো না আমার। কিন্তু আজ কি তেমন অবসর হয়েছে? না, আজও হয়নি। যার সাথে জানাশোনা দেখা সাক্ষাত কোনোটাই হয়নি, শুধু নাম শুনে দূর থেকে তাকে হয়তো ভালোবাসা যায়, কিন্তু চিঠি পত্র কিছুতেই লিখা যায় না। আমি সে চেষ্টা করিও নি। শুধু আমার নাম না জানা সেই বেদনাকে প্রকাশ করার জন্যই আমি এই পদ্য পত্রটি রচনা করেছিলাম। যদি তার উপর কারো দৃষ্টি পড়ে, ভালো; যদি না পড়ে, তাহলেও আমার আক্ষেপ করার কিছুই নেই। কারণ এর চাইতে বেশি আমি আর কী আশা করতে পারি। অক্ষমের মনের ফুলতো গোপনে ফোটে আর গোপনেই ঝরে পড়ে।

কিন্তু আমাকে এভাবে অক্ষম বলে সান্ত্বনা দেয়া কি ঠিক হচ্ছে? আমাকেতো এমনি একটা কিছু ভাববার, করবার জন্য, বলতে গেলে, আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। হয়তো তাঁদের সেই পরিকল্পনা ভিন্নতর, কিন্তু তাই বলে মনোভাব প্রকাশে বাধা কোথায়। আমিতো পত্র লিখে তাঁদের সেই পরিকল্পনাকে উলটপালট ও করে দিতে পারি। কারণ সে পরিকল্পনাতো আমার সম্মতি নিয়ে গড়ে ওঠেনি।

না, তা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারণ আমার যুক্তিবাদী চেতনা ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধকে তখন লালন করতে আরম্ভ করেছে। কাজেই আমি সুযোগ পেলেই আশ্রয় দাতার অসুবিধা সৃষ্টি করে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারিনা।

তবু জীবনের চাওয়া পাওয়াকে তো একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাই নাম ঠিকানা বিহীন পত্র রচনা করি, তাকে একবার স্বচক্ষে দেখার সুযোগ খুঁজি, আর সে সুযোগ সফলও হয়। কিন্তু এই অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে আমি বুটলুর চোখে ধরা পড়ে যাই এবং সে আমার আড়ি পেতে দেখার সংবাদ যথাস্থানে পৌঁছে দেয়।

এভাবেই হঠাৎ যেন একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আর আমি এই অদৃশ্য যোগসূত্রকেই আমার সাফল্য ভেবে উল্লসিত হয়ে উঠি। আমার হৃদয় ঝর্ণার কূলে কূলে বসন্তের বাতাস বইতে আরম্ভ করে, গাছে গাছে ফুল ফুটতে থাকে আর তার চারদিকে অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জণ ধ্বনি তুলে ঘুরে বেড়ায়।

আমি জানিনা, আমার তৎকালীন মনের অবস্থা আমি তুলে ধরতে পেরেছি কিনা। যদি এই অবস্থাকে প্রেম বলা যায়, তাহলে বলতে হবে, আমি তার প্রেমে পড়েছি। তা যে যাই বলুক, এ যেন একটা প্রচণ্ড নেশার মতো আমাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে। আর আমি সেই নেশার আনন্দ শিহরণে কেমন এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করছি।

কিন্তু হঠাৎই যেন সময় ফুরিয়ে গেলো। আর কোথায় আনন্দ শিহরণ। আমি এক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঢাকায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

এবার চন্দবাড়ি থেকে বিদায় নিতে হবে। আকবর আলী সাহেবের কাছে সে কথা বলতেই তিনি কেমন যেন চমকে উঠে বললেন, 'কেন, তোমার কি খুব অসুবিধা হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'না, অসুবিধা কোথায়। আমিতো বাড়ির মতোই এখানে আছি। তবে আমার যে প্রতিযোগিতার ব্যাপার। আলিমে অষ্টম হয়েছি, ফাজিলে আরো ভালো করা দরকার। হোস্টেল ছাড়া সে সুযোগ পাওয়া যাবে না।'

'কিন্তু তোমার হোস্টেলের খরচ চলবে কী করে?'

তখন আমি সবিস্তারে আমার বৃত্তির কথা, আমার হবু শ্বশুরের কথা, তাঁদের ইচ্ছার কথা তাঁর কাছে বললাম। আর তিনি সব কিছু শুনে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

যাহোক, আমি আমার তল্পিতল্পা গুটিয়ে আলীয়া মাদ্রাসার মোগলটুলির হোস্টেলে গিয়ে উঠলাম। এই হোস্টেল বাড়িটি দোতলা এবং দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে চারদিকে ঘোরানো কোঠা আর দ্বিতীয় খণ্ডে একটা লম্বা দালানের এক টেরে থাকেন হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আবুল কালাম আবদুল্লাহ্ সাঁহেব। তিনি স্বনামধন্য শহীদুল্লাহ কায়সার ও জহির রায়হানের পিতা, নোয়াখালীর অধিবাসী।

ইতিমধ্যে মাদ্রাসায় তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছে। তিনি আমাদেরকে কী পড়াতেন, ঠিক মনে পড়ছেনা। তবে বেশ রাশভারী অমায়িক ভদ্রলোক। কথা বলতেন খুব কম, কিন্তু যা বলতেন, তার প্রতিটি মনে রাখার মতো। আমরা তাঁকে খুব সমীহ করতাম।

আমি তাঁর বাসস্থান সংলগ্ন একটি বড়ো কক্ষে আরো তিনজন ছাত্রের সাথে থাকতাম। তাঁর ছেলেরা আমাদের সামনে দিয়েই যাতায়াত করলেও আমাদের সাথে আলাপ পরিচয় হয়নি। কারণ তারা সবাই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করছে। পিতা মাদ্রাসার শিক্ষক হলেও মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে এড়িয়ে চলতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি যে, প্রখ্যাত আলেম, এমন কি পীরদের অধিকাংশই তাঁদের সন্তান সন্ততিকে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। এর কারণ অবশ্যি তাঁদের তিক্ত অভিজ্ঞতা। আর সে অভিজ্ঞতা আর্থিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই হতে পারে। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক দিকটিকে লালন করে তাঁরা যে আর্থিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাতে করে নিজ সন্তান সন্ততিকে আর সে পথের পথিক করতে চাননি। এ ব্যাপারে তাঁদের আচরণ গ্রামের সাধারণ মানুষের সেই 'ফকিরা পড়া'র ধারণার উর্ধে উঠতে পারেনি। সমাজ বিজ্ঞানীদের তাঁদের এ প্রকার আচরণ সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিত বলে মনে করি।

তবে সমাজ বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে ভাবুন আর নাই ভাবুন, এ বিষয়টি আমার চিন্তা ধারায় প্রায় তখন থেকেই একটি মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। আমিতো দেখেছি, গ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ থেকে আরম্ভ করে শহরের সাক্ষর উচ্চশিক্ষিত মানুষ পর্যন্ত প্রায় সবাই এই আলেম, পীর, মোল্লা শ্রেণীটিকে যুগপৎ করুণা ও ঘৃণার পাত্র বলেই মনে করেন। ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যেও ইকবাল থেকে আবুল হাশিম পর্যন্ত সবারই বক্তব্য এই মনোভাবেরই পরিপোষক। আর স্বয়ং আলেম পীর মোল্লাদের আচরণও যে এরই সহায়ক হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। সব দেখে শুনে আমার শুধু মনে হয়েছে, সমাজ যদি এই ধর্মীয় শিক্ষার যথাযথ মর্যাদাই দিতে না পারে, তা হলে এই ভড়ং চালু রাখা কেন, একে বন্ধ করে দিলেই পারে।

কিন্তু থাক সে কথা। আমি শুধু আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ হিসাবেই এই কয়টি কথা বলে রাখলাম। এ নিয়ে বিস্তারিত বলার সময় এখনো আসেনি। কারণ এখন আমি মাদ্রাসা আলীয়ার 'জমাতে দুয়াম' এর ছাত্র। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, সেই পরীক্ষায় যদি আমি আমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারি, তাহলে আমার ঢাকায় আসা, এমন কি লজিং ছেড়ে এই হোস্টেলে আসা, সব কিছুই নিস্ফল বলে প্রমাণিত হবে। তাই বর্তমানে আমি আমার পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ব্যস্ত। কারণ এতোদিন লজিং-এ থাকার ফলে পাঠ্যপুস্তকের সাথে আমার খুব একটা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হতে পারেনি। আর পাঠ্যওতো কম নয়, —হাদীস, তফসীর, ফেকা, অসুলে ফেকা, মন্তেক, হেকমত, আকায়েদ, অসুলে হাদীস, অসুলে তফসীর, ইসলামের ইতিহাস, আরবি, উর্দু, ফারসী, ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি মিলে এক বিরাট ব্যাপার।

অবশ্যি ইতিমধ্যে কোনো প্রকার পরীক্ষা যে হয়নি, তা নয়। শিক্ষকরা নিজ নিজ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিয়েছেন এবং পরীক্ষার খাতায় নিজ নিজ মন্তব্যও লিপিবদ্ধ করেছেন। এ অনেকটা টিউটারিয়েল ধরনের; এগুলির তাই কোনো সামগ্রিক রূপ নেই।

একমাত্র বার্ষিক পরীক্ষাতেই পুরো চেহারাটা ধরা পড়বে। তাই আমি সেই চেহারা দেখানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। কিন্তু সেই যে কথায় বলে, গাঙ্গ মরলেও তার রেখ থাকে, আমারও হয়েছে সেই অবস্থা। অপাঠ্য পুস্তকতো আছেই, এর সাথে এবার আমি অন্য একটি বিষয়েও জড়িয়ে গেলাম।

আমাদের এই মাদ্রাসা হোস্টেলটিতে প্রায় সারা দেশের ছাত্ররা একত্রে বাস করি। সাধারণভাবে আমরা বাংলাতে কথা বললেও আমাদের মাতৃভাষা কিন্তু এক নয়। এখানে মাতৃভাষা বলতে আমি কথ্য ভাষার কথাই বলছি। কারণ এটিই অকৃত্রিম খাঁটি ভাষা। আমাদের লেখ্য ভাষা তারই উপজাত একটি কৃত্রিম মাধ্যম। কিন্তু তখন এতো কথা না জানলেও এই বিভিন্ন ভাষার রহস্য তখনি আমার মনকে আকর্ষণ করেছে। তাই আমার কী খেয়াল হলো, আমি একটি ভাষা সম্মেলনের আয়োজন করলাম। ছাত্রদের মধ্যেও দেখলাম, এ নিয়ে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে সন্ধ্যার পর আমরা হোস্টেলের ছোট হল রুমটিতে একত্র হলাম। সভাপতি হলেন সহকারী হোস্টেল সুপার। আচার আচরণ ও কথাবার্তায় তিনি আমাদের খুব প্রিয় ছিলেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, আমি তাঁর নামটি মনে করতে পারছিনা। ইসমাইল হোসেন কি ?

যাই হোক, সম্মেলনে আমাদের কর্মসূচী হলো, বিভিন্ন কথ্য ভাষার একজন প্রতিনিধি পাঁচ মিনিট ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার উপর তার নিজ কথ্য ভাষায় বক্তৃতা করবেন। যিনি ভাব ভাষা ও উপস্থাপনে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন, তিনি একটি পুরস্কার পাবেন। বলা বাহুল্য, প্রতিনিধিদের নাম আগেই সংগৃহীত হয়েছিলো এবং আমার নেতৃত্বে তিনজন ছাত্রের বিচারকমণ্ডলীও তৈরী করেছিলাম। ব্যাপারটি ছিলো নিতান্তই একটি খামখেয়ালীর ফসল। কিন্তু প্রতিনিধিরা তা এমন ভাবেই জমিয়ে তুললো যে, সে রাতে অনেক ক্ষণ ধরে আমরা এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। অনুষ্ঠানটি সবারই ভালো লেগেছিলো। বলা বাহুল্য, বিচারক মণ্ডলীর রায়ে নোয়াখালীর প্রতিনিধিই ঘোষিত পুরষ্কারটি লাভ করেছিলো।

এই অনুষ্ঠানটির দুটি পরোক্ষ ফলও আমরা পেয়েছিলাম। এর একটি অবশ্যি আমার ব্যক্তিগত পরিচিতি আর অন্যটি বিনোদনের একটি নতুন ক্ষেত্রে। কারণ মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য এই চিত্তবিনোদনের বড়োই অভাব। নৃত্য গীত নাটক সাহিত্য কোনোটাই তাদের জন্য করণীয় নয়। তারা একত্র হয়ে বড়ো জোর মিলাদ পড়তে পারে, এর বাইরে তারা আর কোথায় যাবে! একারণেই সম্ভবত: এরা লুকিয়ে ছাপিয়ে সিনেমা দেখতে এমন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আমার নিজেরও সে অভ্যাস গড়ে উঠেছিলো। এজন্য হোস্টেলের দেয়াল টপকে সিনেমা হলে যাওয়া---আমার সেই স্মৃতি কোনোদিন ভুলবার নয়!

যাহোক্, এমনিভাবে পাঠ্য অপাঠ্যের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে শ্বশুর কন্যার প্রতি আমার চিত্ত চাঞ্চল্যের ব্যাপারটি প্রায় ভুলে গেলাম। একদিন হঠাৎ আমার মনের এই অবস্থা আবিষ্কার করে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। ব্যাপারটা তখনই আমার কাছে মনে

হয়েছিলো একটি মোহ। যে জৈবিক চেতনাটি আমাদের মনে এমনি মোহের সৃষ্টি করে, তার অত্যন্ত সরল নাম 'কাম' প্রবৃত্তি। এজন্যই এসব ক্ষেত্রে স্মৃতিচারণের চাইতে আনন্দ লিপ্সা এমন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কারণ স্মৃতিই যদি যথেষ্ট হতো, তা হলে প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের সান্নিধ্য এমন ব্যাকুলভাবে কামনা করতো না। আমার মনেও কি সেই সান্নিধ্যের কামনা প্রবল হয়ে ওঠেনি? তবু একটি বিশেষ দেহকে ঘিরে মনের এই যে আকুতি, তার একটি বিশেষ মূল্য আছে। এর উপরই আমাদের দাম্পত্য তথা পারিবারিক জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। এ কারণেই মনে হয়, এমনি মোহসৃষ্টির প্রয়োজন আছে। তবে তা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ অনিয়ন্ত্রিত মোহ অনিয়ন্ত্রিত আগুনের মতোই ; আলো দেয়ার চাইতে সে বেশি মাত্রায় পুড়িয়েই মারে।

এ সব তত্ত্বকথা এখন থাক। কারণ বাস্তব জীবনে আমরা এসব তত্ত্বকথাকে অক্ষমের সান্ত্বনা বলেই মনে করি। আমিও তো তেমনি একজন অক্ষমই ছিলাম! না, দৈহিক অক্ষমতার কথা বলছি না ; বরং এ অক্ষমতা ছিলো পারিবারিক ও আর্থিক। অথচ বাস্তুহারার মতো আস্তাকুঁড় ঘেটে বেড়ানোর অভ্যাসও আমার গড়ে ওঠেনি। এ কারণেই তত্ত্ব কথার সান্ত্বনা আমাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করেছে।

সম্ভবতঃ এমনি তত্ত্ব চর্চার কারণেই এ সময়ের ঢাকার বাস্তব জীবন আমার স্মৃতিতে তেমনভাবে ধরা পড়েনি। হোস্টেলের জন্য পালা অনুসারে বাজারে যাওয়া কিংবা সময় পেলে সদরঘাটে নদীর পাড়ে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া বাইরেও খুব একটা বেশি যাইনি। তাই এ সময়ে পুরানা পল্টন ময়দানে কমলা সার্কাসের তাঁবুর একটা ঝাপসা স্মৃতি থাকলেও সে সার্কাস দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তেমনি রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়ার দৌড় দেখতে গিয়েছি বলেও মনে করতে পারছি না।

মনের এই অন্তর্মুখিনতা এখন নানা কারণেই দেখা দিয়েছিলো। এজন্যই পাঠ্য পুস্তকের তত্ত্ব উদ্ধারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে অপাঠ্য পুস্তকে এসে নিঃশ্বাস ফেলেছি কিংবা সিনেমা হলে গিয়ে বসে থেকেছি। এর বাইরে উদাস দৃষ্টি মেলে প্রকৃতির শোভা দর্শন যেমন ছিলোনা তেমনি এ সময়ে নিজের আত্মপ্রকাশের কোনো তাগিদও অনুভব করিনি। কেমন একটা বিষন্নতা যেন সমস্ত তনুমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এই বিষন্নতার কারণ অবশ্য একান্তই দুর্নিরীক্ষ্য নয়। জৈবিক চেতনার সাথে এর একটা অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক আছে।

আমার এমনি মানসিক অবস্থায় এ সময়ের একটি স্বপ্ন আমাকে যেমন কষ্ট দিয়েছিলো, তেমনি ভাবিয়েছিলোও প্রচুর। আমি আগেই বলেছি, হোস্টেলে আমি একটি চার সিটের রুমে ঠাঁই পেয়েছিলাম। রুমটি বলতে গেলে তিনদিক থেকে বদ্ধ। শুধু পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে কিছুটা আকাশ, দুতিনটি বাড়ির ছাদ আর 'পাসিং শো' সিগারেটের একটি বিরাট সাইনবোর্ড দেখা যেতো। রুমের দরজাটি পুবদিকের করিডোরে বেরিয়ে গিয়ে নীচের তলায় নামার সিঁড়ির সাথে এর সংযোগ করে দিয়েছে।

আমি শিক্ষাবর্ষের শেষ দিকে হোস্টেলে এসেছিলাম বলেই এমনি একটি রুমে ঠাঁই নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এর ফলে আলো বাতাসের অভাবে খুব কষ্ট পেতে হয়েছে।

সে রাতে পাঠ্যপুস্তকের পাতা উল্টাতে উল্টাতে বোধ হয় আমি এলোমেলো ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি আমি যেন দক্ষিণ দিকের ভাঙা আসবাবপত্রে ঠাঁসা একটি রুমে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে একটা কিছু খুঁজছি, এমন সময় হাত খানেক লম্বা একটা বামন দৈত্য এসে হাজির। তার গায়ে কিছু নেই, শুধু মাথায় ইয়ামোটা একটা টিকি। সে আমার সামনে এসে আমাকে আগলে দাঁড়িয়েছে। আর আমি ভড়কে গিয়ে লাফ মেরে একটা টেবিলের উপর উঠে পড়েছি। কিন্তু সেই দৈত্যটাও আমাকে ধরবার জন্য টেবিলে উঠার চেষ্টা করছে। কী বিপদ! ঘরের আবছা আলোতে কেমন ভয় ভয় করছে আমার। হঠাৎ চীৎকার করে উঠতেই আমার ঘুম ভেঙে গেলো। জেগে দেখলাম, আমার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে!

হঠাৎ এমন একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখলাম কেন আমি! বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে চোখ মুখে পানি দিলাম। তারপর বিছানায় শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। হঠাৎ মনে হলো, আরে এ যে সেই আংটির দৈত্য! ক'দিন আগেই 'আলাদিন ও জাদুয়ে চেরাগ'বই টি দেখেছি। সেখানে চেরাগের দৈত্যটি বিরাট আকৃতির। কিন্তু ওর সাথে এই বামন দৈত্যটিও ছিলো। চেরাগ হাতছাড়া হয়ে গেলে এই বামন দৈত্যটি নানাভাবে আলাদিনকে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু হিন্দী ছবির সেই বামন আমাকে এমনভাবে আক্রমন করতে এলো কেন! সমস্ত দৃশ্যটা মনের মধ্যে এমন কেটে কেটে বসে গেছে যে, কিছুতেই তাড়াতে পারছি না।

স্বপ্ন যে এর আগে আমি দেখিনি, তা নয়। তবে সবগুলিই যেন কেমন এলোমেলো, পুরো কোনো ব্যাপার নয়। ঘুম থেকে জাগলে অনেক সময় মনে করাই মুশকিল হতো। আবার অনেক সময় টুকরো টুকরো কিছু দৃশ্য চোখের সামনে ভেসেই মিলিয়ে যেতো। ভয় পাবার মতো স্বপ্নও দেখেছি। হঠাৎ নওপাড়ার কথা মনে পড়লো। তাদের বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে আছি, আচমকা কেউ একজন এসে আমাকে জাগিয়ে দিলো। কী হয়েছে ; না, আমাকে নাকি 'বোবায়' ধরেছিলো আর আমি ঘুমের ঘোরে গোঁ গোঁ করছিলাম। কিন্তু তখনতো আমি কোনো কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছেনা। শুধু সেই মফিজ খাঁ নানার ছোট মেয়ে ফেরদৌস খালার পাগলা স্বামীর বাড়ির সেই লোকটি আমাকে বলেছিলো যে, বোবা নাকি এক ধরনের ভূত, সে বুকের উপর বসে মানুষের গলা চেপে ধরে। এর ফলে ঘুমন্ত মানুষ বোবার মতো গোঁ গোঁ করতে থাকে। কেউ জাগিয়ে না দিলে এভাবে মানুষের মৃত্যুও হয়। আমি এসব কথা শুনে ভয় পেয়েছিলাম। কারণ তখন আমার বয়স অল্প। কিন্তু আজকের এই স্বপ্নতো বোবার ব্যাপার নয়, এ যে স্পষ্ট বামন দৈত্যের ব্যাপার!

বাকী রাত আর ভালো ঘুমই হলোনা। পরদিন 'খাবনামা' জাতীয় একটি বই খুব উলটে পালটে দেখলাম। কিন্তু বামন দৈত্যের নাম সেখানো ছিলো না। তবে সাপ

বাঘের নাম থাকলেও সেগুলি দেখার কোনো কারণ বিশ্লেষণ করা হয়নি। সব দেখেশুনে আমি কোনো তৃপ্তিই পেলাম না। আমার মনের প্রশ্ন মনেই রয়ে গেলো। অথচ লজ্জায় এই বামন দৈত্যের স্বপ্ন আমি কোনো উস্তাদের কাছেও বলতে পারলাম না। কারণ এর উৎসটি যে একটি সিনেমা, কথায় কথায় সেটি বেরিয়ে পড়তে পারে। তাই স্বপ্নের ব্যাপারে আমার প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে নিতে হয়েছে।

কিন্তু সেকথা এখন থাক। এখন শুধু স্বপ্ন রহস্যের কোনো কিনারা করতে না পেরে আমার বিষণ্ন মনে একটা উদাসীনতার মাত্রা যোগ হলো। পাঠ্যপুস্তকের পাতা থেকে সে কেবলই দূরে চলে যায়, উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় যায়? তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে! তার পাখা লাগে না, এমনকি চাকাও লাগে না ; হুট্ করে সে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু কোথাও সে দুদণ্ড বসে জিরিয়ে নেবার আমন্ত্রণ পায় না। না, পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলেতো তাকে কেউ আমন্ত্রণ জানায়নি!

কী বিষণ্ন সেই উদাসীনতা, নীড় খুঁজে ফেরার সে কী ব্যর্থ প্রয়াস! এর মাঝেই একদিন আমার কোনো এক রুমমেটের নিকট রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি দেখতে পেলাম। কিন্তু কার কাছে ? না, রুমমেটদের কারোর নামধাম পরিচয় আমার স্মৃতিতে নেই। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার! একথা ঠিক যে তখনো সহপাঠীদের কারোর সাথে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় জন্মেনি, তবু দিবারাত্র যাদের সাথে একত্রে বাস করেছি, তারাও কী করে জানি আমার স্মৃতির বাইরেই রয়ে গেলো। তবু তাদের কারোর হাতে এই *নৌকাডুবির* উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে, তারা একেবারে ফেলনা ছিলো না!

ইতিপূর্বে আমি এলোমেলো ভাবে বঙ্কিম, শরৎচন্দ্রের কিছু উপন্যাস পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এই প্রথম। সুতরাং উপন্যাসটি অতি সহজেই আমার দৃষ্টি কেড়ে নিলো। হোস্টেলের নিয়মে রাত্রি এগারোটার পর বিজলী বাতি নিভে গেলে আমি আমার ছোট হারিকেনটা জ্বালিয়ে নিলাম এবং প্রসারিত হাদীস গ্রন্থের উপর নৌকাডুবির কাহিনী পাঠ করতে আরম্ভ করলাম। ভোরের আলো যখন ফুটে বেরুলো, তখন আমি বইয়ের শেষ পৃষ্ঠাগুলির উপর চোখ বুলাচ্ছি। কী এক গভীর তন্ময়তা যেন আমার সমগ্র চৈতন্যকে এ কাহিনীর উত্থানপতনের সাথে জড়িয়ে ফেলেছিলো! দীর্ঘ রাত্রি জাগরণে আমার কোনো কষ্ট হয়েছে বলে মনেই হলো না।

এই উপন্যাস পাঠের প্রত্যক্ষ ফল হলো এই যে, সহসাই আমি আমার পাঠ্য পুস্তক পাঠে তন্ময়তা খুঁজে পেলাম। আমার পরীক্ষার প্রস্তুতি এরপর নির্বিবাদে এগিয়ে গেলো। পরীক্ষাও দিলাম আমি, ফলও আশা অনুরূপই হলো। আলীয়া মাদ্রাসার এই প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় আমি প্রথম হয়ে পাস করলাম। কিন্তু শিক্ষকদের ভৎর্সনা এড়াতে পারলাম না। বিশেষ করে সাত্তার সাহেব আমার পরীক্ষার খাতাটি আমার সামনে ছুঁড়ে দিয়ে খুব রাগ দেখালেন, বললেন,—তোমার এই টেলিগ্রাম মার্কা লেখা দিয়ে ফাইনাল পরীক্ষায় মোটেই ভালো করতে পারবে না।

আমি তাঁর মারমুখী ভঙ্গি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। উলটিয়ে দেখলাম, তিনি কোথাও কালির কোনো দাগ দেননি। দু'পৃষ্ঠাব্যাপী আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর তাঁর ভালো না লাগলেও তিনি আমাকে উনসত্তুর দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর অভিযোগটি অবশ্যি আমিও স্বীকার করি। তিনি আমাদেরকে ফেকাশাস্ত্রের গ্রন্থ 'হেদায়া' পড়াতেন। হেদায়ার পরীক্ষার খাতাই তিনি দেখেছেন। আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হেদায়ার ভাব ও ভাষাই অবিকল ব্যবহার করেছি। এর ফলে আমার উত্তর যেমন প্রাসঙ্গিক হয়েছে, তেমনি সংক্ষিপ্তও হয়ে গেছে। না, তাতে আঁচড় কাটার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু পরীক্ষকরা এতে তৃপ্তি পান না। তাঁরা ভালো ছেলেদের নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গির প্রকাশ দেখতে চান। আর তাও দেখতে চান তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম উর্দুভাষার দ্বারা। কারণ এ ভাষাতেই তাঁরা গ্রন্থাদির পাঠ বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, আমি প্রতি গ্রন্থের নিজস্ব ভাষাতেই আমার উত্তর দিয়ে থাকি। বাস্তা, কাতলাসেনে এভাবেই আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আর এর ফলে আমার নিজস্ব ভাষা গড়ে উঠার সুযোগ পায়নি। এ কারণে রাগ দেখালেও আমার পক্ষে হুট্ করে ভিন্নতর কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

তবু একটা তৃপ্তি এই যে, এসব সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে পরীক্ষায় প্রথম করেছেন। কাজেই ফাইনাল পরীক্ষায় একেবারে ফেলে দিতে পারবেন না। যাক্, আপাততঃ ঢাকায় আসার প্রথম উদ্দেশ্য সফল হলো, উন্নাসিকতার এই কেন্দ্রকে আমি জয় করতে পেরেছি। এরপর আমার চিন্তা মাদ্রাসার জন্য তাঁদেরকেও করতে হবে।

সুতরাং এই তৃপ্তির ভাব নিয়ে আমি ময়মনসিংহ চলে এলাম। কারণ পরবর্তী শ্রেণীর পাঠদান শুরু হতে এখনো বেশ কিছুদিন দেরী।

এসে দেখলাম আমার শ্বশুরের দোকানটি স্থানচ্যুত হয়েছে। মসজিদের দক্ষিণ দিকের মক্তব ঘরটির বারান্দায় সেটি স্থান পেয়েছে। কারণ তখন মসজিদের দোকানগুলি নতুন ভাবে তৈরী করা হচ্ছে। হেকিম সাহেবের দোকানটিও একই কারণে বন্ধ। কিন্তু দোকানের চাইতে অন্য বিষয় নিয়ে আমার শ্বশুর ব্যস্ত। বড়ো মেয়ের একজন সম্ভাব্য বর তিনি খুঁজে পেয়েছেন। সে একজন হেকিম। দিল্লীর তকমিলুল তিব কলেজ থেকে পাশ করে এসেই এই শহরেই তকমিলী দাওয়াখানা দিয়েছে। বিকালে কেওয়াটখালির এখানে তাঁর সেই দাওয়া খানা দেখতে গেলাম। শ্বশুর সাহেবই আমাকে নিয়ে গেলেন। ভাবটা অনেকখানি এরকম যেন ছেলেকে মেয়ের হবু জামাই দেখাচ্ছেন। তার পছন্দ হলে অনেক দিক থেকেই স্বস্তির কারণ হতে পারে। হাবভাব দেখে মনে হলো, তাঁর পরিকল্পনায় ভাঙন ধরিয়ে তাঁর স্নেহের পাত্র যে ইতিমধ্যেই বড়ো মেয়ের দিকে তাক করে বসেছে, তা তিনি বুঝতে পারেন নি।

যাহোক, হেকিম সাহেবকে দেখলাম। নাম আফতাব উদ্দিন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছিই একটা কিছু হবে। বাড়ি আমার পৈতৃক বাড়ির কাছেই গাগলা ছিলুমপুরে। সেই ছিলুমপুর, যেখানে লজিং থেকে আমি কাঁঠালিয়া মাইনর স্কুলে পড়তাম। দেখলাম,

আমার শ্বশুরকে ইতিমধ্যেই ভক্তিশ্রদ্ধা দিয়ে সে মাতিয়ে ফেলেছে। এমনকি আমাকেও সে ছোট ভাইয়ের মতোই স্নেহের পাত্র বলে মেনে নিয়েছে।

বস্তুতঃ তাঁর এই ব্যবহারটিই আমাকে কাহিল করে তুললো। কারণ মনে মনে তাঁর আবির্ভাবকে আমি একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হিসাবেই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু সে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমার দেখা সেই জাদুয়ে চেরাগের দৈত্যের কথাই মনে হলো। সে যেন সেই বিরাট আকৃতির দৈত্য। আর আমি তাঁর তুলনায় আংটির দৈত্যের মতোই বামন। তবু প্রতিযোগিতায় নামতে আমি রাজী ছিলাম। কিন্তু সে যেভাবে জাদুর চেরাগ জ্বালাতে আরম্ভ করেছে, তার আলোতে তো আমার আংটি নজরেই পড়বে না। খরিচায় গিয়েও দেখলাম, ইতিমধ্যেই সেখানে তাঁর এই জাদুর ছোঁয়া লেগেছে। সে অবলীলাক্রমে আমার খাট, বু, এমন কি ভাইকেও দখল করে বসেছে। সে যেভাবে মধুর কণ্ঠে আমার সম্বোধন গুলি উচ্চারণ করছে, আমি শতবর্ষ চেষ্টা করলেও তা আয়ত্ত করতে পারবো না।

সব দেখেশুনে আমার মনে হলো, তাঁর আচরণের মধ্যে কোথায় যেন একটা আতিশয্য আছে। কেমন যেন চোখ ভোলানো মন দোলানো বাড়াবাড়ি। তা না হলে সে এমন আপ্রাণ চেষ্টায় মাতাল হয়ে উঠতো না। এই মাতলামো দিয়েই সে তাঁর সেই ফাঁকিটা ঢেকে রাখতে চায়। কাজেই যতোটা সম্ভব তাঁর সাথে মিশতে হবে ; শত্রুতা নয়, বন্ধুতাই হবে তাঁর সেই ফাঁকি আবিষ্কারের একমাত্র পথ!

কিন্তু আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। তাকে পরীক্ষা করার জন্য আমি এখানে থেকেতো আমার ক্লাস কামাই করতে পারি না! এ কারণেই অনেকটা ভারাক্রান্ত মন নিয়েই আমি ঢাকায় চলে এলাম। জৈবিক প্রতিযোগিতা থেকে সরে এসে বাধ্য হয়ে আমাকে আমার পুরানো নৈষ্ঠিক প্রতিযোগিতায় নেমে যেতে হলো। কিন্তু এবার মনের একাংশ পড়ে রইলো ময়মনসিংহে চরখরিচায়। অবশ্য চৈতন্যের এই দ্বিধা বিভক্তির পরোক্ষ ফল হলো এইযে, সে মনের অন্তর্মুখিনতাকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দিতে আরম্ভ করলো। এরই ফলে আমি হোস্টেলের জমিয়তে তোলাবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলাম। বাস্তা বা কাতলাসেনে এমন কোনো উদ্যোগের সম্মুখীন আমি হইনি। সম্ভবতঃ এটাই আমার কোনো সংগঠনের নিম্নতম পর্যায়ের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রথম যোগদান। কিন্তু এর রাজনীতি তখনো আমার কাছে স্পষ্ট নয়। কারণ তখন দেশে আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্ভব শেষে সেই নাম থেকে মুসলিম শব্দ বিতাড়নের উদ্যোগ চলছে। অথচ জমিয়তে তোলাবা তখন দৃশ্যতঃ মুসলিম লীগের লেজুড় বৃত্তিতে নিয়োজিত। আমার সাথে তাই এদের মন মানসিকতার কোনো মিল নেই কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি তখন বিরোধী রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছি ; বরং সত্যি বলতে গেলে আমার মধ্যে তেমন কোনো রাজনৈতিক চেতনাই গড়ে উঠেনি। তবু যে হোস্টেলের ছাত্ররা ধরে বেঁধে এমনিভাবে আমাকে গাছে তুলে দিয়েছে, তার কারণ আমার সেই ভাষা সম্মেলনের পরিচিতি আর আমার পরীক্ষার ফলাফল। তারা ভেবেছে.

এসব ব্যাপারে যখন তার দক্ষতা আছে, তখন অন্য ব্যাপারেও তার দক্ষতা বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু তাদের সেই ধারণা অনুসারে আমার রাজনীতি জ্ঞানের দক্ষতা বাড়েনি। এর একটি কারণ সম্ভবতঃ যারা তখন জমিয়তে তোলাবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ছিলো, তাদের বক্তব্য বা চরিত্র কোনোটাই আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তবে এর ফলে আমার মধ্যে একটা ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছিলো নিশ্চয়। যাতে করে আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নবাবপুর রোডের মিছিলের শ্লোগান শুনেছি এবং মাঠে ময়দানে আয়োজিত জনসভাতেও শ্রোতা হিসাবে যোগ দিয়েছি।

সময়টা তখন ১৯৫২ সনের প্রথম দিক। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একুশে ফেব্রুয়ারি তখন আসন্ন প্রায়। তার বিভিন্ন উপকরণ তখন জড়ো হচ্ছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি একদিন পল্টন ময়দানে গেলাম নাজিম উদ্দিন সাহেবের বক্তৃতা শুনতে। এর আগে ছে'চল্লিশে নেত্রকোণায় তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। কিন্তু আজকের বক্তৃতায় সেদিনের সেই রসকষ কিছুই ছিলোনা। কারণ এখন তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কাজেই তাঁর স্বরে গাম্ভীর্য আর বক্তব্যে হুমকিরই প্রাধান্য। কিন্তু তাঁর ভাষা সেই ভাঙা বাংলা। সেই ভাষাতেই তিনি পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়দে আজমের একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবার বক্তব্যকে আবার তুলে ধরলেন। এর ফলে শ্রোতাদের একাংশের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হলো, 'শেইম শেইম' শব্দও শোনা গেলো। আমার পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা বয়স্কব্যক্তি ; কিন্তু তাঁরাও উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে পারেননি। তাঁদের মুখেই শুনলাম, 'নাজিম উদ্দিন এবার মীরজাফরে পরিণত হলো।'

তাঁদের এমনি মন্তব্যের কারণ সম্পর্কে তখন না জানলেও মীরজাফর নামটির তাৎপর্য আমার জানা। কাজেই খুব একটা মারাত্মক কিছু ঘটার সম্ভাবনা আন্দাজ করে আমি সভাস্থল ত্যাগ করে চলে এলাম। কারণ এখানে সেখানে পুলিশের পাঁয়তারা আমার কাছে মোটেই ভালো লাগছিলো না।

যাহোক হোস্টেলে ফিরে এসে ছাত্রদের মধ্যে এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা শুনতে পেলাম না। পরদিন মাদ্রাসায় গিয়েও কিছু বুঝা গেলো না। ছাত্ররাতো রীতিমতো ক্লাস করছে। কিন্তু আমি কিছুটা উৎকর্ণ ছিলাম বলেই সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার গোলমালের কথা শুনে ফেললাম। সুতরাং ক্লাস রেখেই বেরিয়ে গেলাম সেইদিকে। আমার সাথেই আরো কিছু সংখ্যক ছাত্র বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু পথেই কে একজন বললো, 'এভাবে দল বেঁধে যেয়োনা, ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে!'

এই ১৪৪ ধারার ব্যাপারটিও বলতে গেলে আমার কাছে নতুন। শুনলাম, এতে চারজনের বেশি দল বেঁধে যাওয়া যায় না। গেলেই পুলিশে ধরে। কিন্তু কেন এ রকম একটা আদেশ জারী হলো, তার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। এর ফলে এসব ব্যাপার জানা আর এসব দৃশ্য দেখার জন্য আমার ঔৎসুক্য ক্রমেই বাড়ছিলো। এভাবেই

আলীয়া মাদ্রাসার এই ভালো ছাত্রটিকেও বায়ান্ন তার উত্তেজনার মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো। না, তাই বলে কোনো মিছিলে আমি যোগ দিইনি, আমি ছিলাম কিছু কিছু ঘটনার নীরব দর্শক মাত্র।

পরদিন তাই আলীয়া মাদ্রাসায় ক্লাস হলো কি হলো না, তার খোঁজ না নিয়ে আমি গেলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখলাম, হাসপাতালের পাশের সেই পুরানো ক্যাম্পাসের আমতলায় বিরাট জটলা। কাছে গিয়ে দেখলাম বক্তৃতা হচ্ছে। কে এক যুবক মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথায় যেন আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে। পরে শুনেছিলাম, ইনিই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেই বিখ্যাত শামসুল হক। কিন্তু বেশিক্ষণ আমি সেই সভায় থাকতে পারিনি। কারণ বাইরে পুলিশের আনাগোনা আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলো। কারণ আমিতো দর্শকমাত্র। নিরাপদ দূরত্বে থেকে দেখাই আমার কর্তব্য, হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়া নয়। তবু মনের মধ্যে কোনো উত্তেজনার যে সৃষ্টি হয়নি, তাতো নয়। কিন্তু সেই উত্তেজনার স্বরূপকে খুব স্পষ্ট করে তোলা আজ আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কারণ ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তখন আমার মনে হয়তো ঔৎসুক্য আছে, কিন্তু মাতৃভাষার মর্যাদা সম্পর্কে তখনো সম্যক অবহিতি জন্মেনি। আমিতো মূলতঃ তখন আরবি উর্দু ভাষা নিয়ে কারবার করছি। আর শ্লোগান ও বক্তৃতাও মূলতঃ এ দুটি ভাষার বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হচ্ছে। আরবি হরফ আরবি ভাষা তখন এক হয়ে গেছে, আর এই আরবি হরফেই যেহেতু উর্দু ভাষা লিখা হয়, তখন তার বিরুদ্ধে বলাটাওতো আরবি ভাষার বিরুদ্ধে যায়। আর এই বিরোধিতার মূল লক্ষ্যটিকে ধর্মের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে, তা আর বুঝার বাকী থাকে না। আমার চতুর্দিকে তখন এমনি ধরনের যুক্তির প্রাবল্য ছিলো। তবে এর দ্বারা আমি খুব একটা প্রভাবিত হয়েছি বলে মনে হয় না। কারণ তা হলে আমতলার সভায় গিয়ে উপস্থিত হতাম না। কিংবা পরদিন গোলাগুলির সংবাদ শুনে মেডিক্যাল কলেজের সামনে অকুস্থল দেখতে যেতাম না। গিয়ে দেখলাম, এখানে সেখানে জটলা আর বাঁশের চাটাই দিয়ে ছাওয়া লম্বা ব্যারাকের বারান্দায় রক্তের দাগ। এখানেই নাকি ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজছিলো আবুল বরকত। আচমকা গুলি লেগে পড়ে যায়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাকে এলাকা ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিলো। কারণ পুলিশ আবার তৎপর হয়ে উঠেছে।

এভাবেই বায়ান্নর টুকরো টুকরো স্মৃতি মনের কোণে সঞ্চিত হয়েছে। পরদিনের স্মৃতি আরো উজ্জ্বল। এই দিন মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে লাল কালিতে ছাপা সাপ্তাহিক সৈনিকের একটি বিশেষ সংখ্যা কিনেছিলাম। এই পত্রিকাটিতে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, তার বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয় রক্তাক্ত ছবিসহ ছাপা হয়েছিলো। ঐদিনই আরো এগিয়ে গিয়ে জগন্নাথ হলের পাশে তৎকালীন পরিষদ ভবনের আশেপাশে 'পুলিশের কর্ডন' নামক লোহার কাঁটা তারের খাঁচাগুলি দেখতে দেখতে সলিমুল্লাহ হলের সামনে গিয়ে পৌঁছি। তখন সেই হল থেকে মাইকে সংগ্রামের

আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে। সারা রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার নাম গন্ধও নেই। শুধু স্থানে স্থানে পুলিশ আর পুলিশের গাড়ি যেন ওৎ পেতে আছে।

সেদিন সারা বিকাল ও রাত্রি পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকাটি বার কয়েক উলটিয়ে পালটিয়ে পড়ে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আমি মোটামুটি ধারণা সৃষ্টি করতে পারলাম। এর ফলে আগের সেই দোদুল্যমান ভাবটা যেন কমে আসতে লাগলো। সুতরাং পরদিন নবাবপুর রোডে গুলিবর্ষণে একটি ছেলে নিহত হলে আমি খুবই উত্তেজিত হয়েছিলাম। অবশ্যি উত্তেজনা তখন ঢাকার রাজপথসহ অলিগলির সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে আর ঢাকার কুট্টি ছেলেরাই রাস্তার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। মিছিলেও তাদেরই সংখ্যাধিক্য।

এ ভাবেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন সেদিন আমার চেতনাকে উদ্দীপিত করেছিলো। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে, আমি এলোমেলো ভাবে হলেও এই আন্দোলনের কিছু রক্তাক্ত দৃশ্য আমার চেতনায় ধারণ করতে পেরেছিলাম। তা না হলে পরবর্তীকালে আমার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ঔৎসুক্য ভিন্ন খাতেও প্রবাহিত হতে পারতো। কারণ তা না হলে যে রক্তমাখা সৈনিক সেদিন আমাকে ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক জ্ঞান দান করেছিলো, সেই সৈনিকের সাথে যুক্ত তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা এমন ভিন্নধর্মী হয়ে উঠবে কেন!

কিন্তু সে আলোচনা এখন থাক। ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম যে, এই ঘটনা কীভাবে আমার চেতনার দ্বিধাবিভক্তিকে দূরীভূত করে আমাকে মাতিয়ে রেখেছিলো। কাজেই তার প্রভাব যখন কিছুটা কমলো, তখনই আমি আবার কয়েকদিনের জন্য ময়মনসিংহে ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, সেখানে অবস্থার বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। আমার শ্বশুরের দোকান বর্তমানে যেখানে আছে, সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই হেকিম সাহেব সগৌরবে দুর্গাবাড়ি রোডের যে দালানটিতে বর্তমানে ফয়েজ উদ্দিন সাহেবের ছেলেরা প্রবাসী গেষ্ট হাউস পরিচালনা করছে, সেখানে তাঁর তকমিলী দাওয়াখানা পেতে বসেছেন। আমি দুদিনেই তার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই কোথায় যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে মনে হলো। কারণ বেচারা আমার সাথে সারা দুনিয়ার আলাপ করলে ও খরিচা সম্পর্কে কোনো কথা বললো না। মনে হলো, আমার শ্বশুরের আনাগোনাও যেন আগের চাইতে অনেক কমে গেছে।

ব্যাপার কী! আমি যাকে পরাজিত করার জন্য ছুটে এসেছি, সে কি তার আগেই পরাজিত হয়ে বসে আছে নাকি! খরিচায় একটু খোঁজ নিতেই বু'র একটি মন্তব্যের মধ্যে তাঁর পরাজয়ের আভাস পেলাম। ফজিলতের পায়ে ফোঁড়ার মতো কিছু একটা হয়েছিলো। সে জোর করে সেখানে হেকিমী ফলাতে গিয়ে যে আদিখ্যেতা প্রদর্শন করেছে, তাতে বু'র মন বিগড়ে গেছে। আর এর ফলে তিনি যক্ষের ধনের মতো তাঁর

নাতিনকে আগলে রেখেছেন। আর এই বুড়ীর কথা শুনেই আমার শ্বশুর ও তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। কাজেই আগের সেই উৎসাহ লোপ পেয়েছে।

অবশ্যি উৎসাহ লোপ পাওয়ার জন্য অন্য একটি কারণও তখন দেখা দিয়েছিলো। আমার শ্বশুর একটি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। যে দোকানটি তিনি নতুন স্থানে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন, সেটি এক সময় নিয়াজ আলী মাস্টার নামে শেহরার এক ভদ্রলোকের সাথে শেয়ারে শুরু করেছিলেন। এরপর সেটি স্থানচ্যুত হয়ে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু উক্ত নিয়াজ মাস্টার এর কোনো পর্যায়েই কো-শেয়ারার হিসাবে তাঁর কর্তব্য পালন করেন নি। আমার শ্বশুর যখন বিড়ালের বাচ্চার মতো দোকানকে নিয়ে এঘর ওঘর করে তৎকালীন মসজিদের মোতাওয়াল্লী জব্বর আলী সাহেবের সহায়তায় এই ঘরে এসে ঠাঁই নিলেন, কেবলমাত্র তখনই নিয়াজ আলী সাহেব অংশীদারিত্বের দাবী জানিয়ে মামলা ঠুকে দিলেন। আমার শ্বশুরকে তিনি চুক্তি ভঙ্গের দায়ে দায়ী করলেন। এ ব্যাপারটি আমার শ্বশুরের জন্য অর্থহানির চাইতে অধিকতরভাবে সম্মান হানির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এ সময়ে বড়ো মসজিদের তৎকালীন ইমাম সাহেব, এমনকি হেকিম জাফর আহমদও খুব ভালো ভূমিকা পালন করতে পারেননি। শেষোক্ত জন বলে বেড়াতে আরম্ভ করলেন যে, আমার শ্বশুর নাকি তাঁর দোকানটি দখল করে বসেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা, শেষ পর্যন্ত আমার শ্বশুরের সততারই জয় হলো। কারণ নিয়াজ মাস্টার সাহেব তাঁর কথিত চুক্তির কোনো প্রমাণ দাখিল করতে পারলেন না। তিনি মামলা না ঠুকে যদি আপোষে শেয়ারের দাবী করতেন, তাহলে আমার শ্বশুর হয়তো তা মেনেও নিতে পারতেন। কিন্তু মামলার ফলে তাঁর দাবী এমন ভাবে নস্যাৎ হবার উপক্রম হলো যে, আমার শ্বশুরের আর কিছু করার রইলো না। পরে অবশ্যি জব্বর আলী সাহেবের মধ্যস্থতায় নিয়াজ মাস্টারের সাথে একটি আপোষ মীমাংসা হয়েছিলো এবং আমার শ্বশুর তাঁর দাবীকৃত সমুদয় টাকা পরিশোধ করে দিয়েছিলেন।

এমনি ব্যাপারে আমার শ্বশুর জড়িয়ে পড়ায় তিনি যেমন হেকিম আফতাবের ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, তেমনি হেকিমও হয়তো তার হবু শ্বশুরের এমনি দুর্গতি দেখে থমকে গিয়েছিলো। যে কোনো কারণেই হোক, পরিস্থিতি এখন আমার অনুকূলে বলেই মনে হলো। সুতরাং আমি সানন্দেই আবার আমার হোস্টেলে ফিরে গেলাম। কিন্তু এর ফলেই এবার আমার চিত্ত চাঞ্চল্য কিছুটা বৃদ্ধি পেলো। এই জৈবিক প্রতিযোগিতা জয়ের সম্ভাবনাতেও আমি উৎসাহী হয়ে উঠলাম। এ কারণেই বায়ান্নর মধ্যবর্তী সময়ের ঢাকার ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার স্মৃতির সঞ্চয় খুবই নগণ্য। কারণ আমার অন্তর্মুখিনতা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ কারণেই আমি ঘন ঘন যেমন ময়মনসিংহ আসতে আরম্ভ করলাম, তেমনি ঢাকাতেও চকবাজারে গিয়ে আমার শ্বশুরের সাথে দোকানের মাল কিনাতে সহায়তা করতে লাগলাম। আর ময়মনসিংহ এলে আমি অধিকাংশ সময় দোকানেই অবস্থান

করতাম। এর ফলে কিছু দিনের মধ্যেই আমি দোকনদারির কাজও শিখে ফেললাম। কারণ দোকানে থাকাটা তখন আমার জন্য খুবই সুবিধাজনক হয়েছিলো। কেননা তখন সেই প্রেসিডেন্ট কাজী সাহেবও মেছুয়া বাজারে একটা চালের আড়ৎ দিয়েছিলেন। সুতরাং এতে করে আমার পক্ষে আফতাব হেকিম ও বড়ো ভাই কাজী সাহেবের সাথে আলাপ করার সুযোগ হতো।

এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়েই দেখলাম হেকিম সাহেব আবার আক্রমন করার পাঁয়তারা করছে। বড়ো ভাই যেভাবে সকাল বিকাল হেকিমের ওখানে আড্ডা জমাচ্ছেন, যেভাবে বুড়ো হেকিম জাফর আহমদ চেংড়া হেকিমকে নিয়ে দিব্বী কলেজ করার আয়োজন করছেন, তাতে আমার ঘাবড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। কারণ এ দুজন মুরুব্বীকে কুপোকাৎ করতে পারলে এবার তাঁর জয় সুনিশ্চিত। কারণ আমার বু'র মুরুব্বীও যে এই বড়ো ভাই; ভাসুরের কথা তিনি ফেলতে পারবেন না।

কিন্তু রাখে আল্লা, মারে কে! যে আশংকা আমাকে নতুন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো, তা আপনি থেকেই নিরসন হয়ে গেলো। এতোদিন পরে থলির সত্যিকার বিড়াল বেরিয়ে পড়লো। তকমিলী সাহেব দিল্লীতে যে বাড়িতে লজিং থাকতেন, সেই বাড়ির মালিক তাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন তাঁর নামে পূর্ব পাকিস্তানে একটি দোকান ভাড়া করতে । যাতে করে তিনি এখানে এসে তকমিলীর সহায়তায় ব্যবসা ফাঁদতে পারেন। কিন্তু তকমিলী সাহেব সেই টাকা দিয়ে নিজের নামেই ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। ভদ্রলোক অপেক্ষা করতে করতে তার খোঁজে এসে সব কিছু দেখে অবাক হলেন এবং 'নিমকহারাম' গালি দিয়ে দিল্লীতে ফিরে গেলেন। আর এ কাহিনী দুর্গন্ধের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং তকমিলী সাহেবের বেলুনও বলতে গেলে চুপসে গেলো।

এ ঘটনার কথা আমি কিছুদিন পরে এসে শুনতে পেয়েছিলাম। আমি কিন্তু এর পরও তকমিলীর ওখানে যাওয়া ত্যাগ করিনি। কারণ সে যে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে, তখনো এ বিশ্বাস আমার হয়নি। কারণ জাদুয়ে চেরাগের দৈত্যের মতো সে আবার নতুন কোনো খেল দেখায় কে জানে! কারণ ইতিমধ্যে সে আমার কাছে স্বীকার করেছে যে, অন্যত্র সে হয়তো বিয়ে করতে পারে, কিন্তু এমন অমায়িক ভালো মানুষ শ্বশুর খুবই দুর্লভ। সুতরাং মেয়ের জন্য নয়, শ্বশুরের জন্যই তার বড়ো লোভ। তাঁর এ কথার মধ্যে যেমন সত্য আছে, তেমনি আমার জন্য আশংকার উপকরণও আছে। কারণ বলা যায় না, আবার কখন সে শ্বশুর জয়ের সংগ্রামে নেমে পড়ে!

এমনি আশংকা আর দোদুল্যমানতার মধ্য দিয়ে আমার বায়ান্ন প্রায় শেষ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। এবার দেখলাম নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন হচ্ছে। সে গ্রামেরই ছেলে, আমার শ্বশুরের খুবই প্রিয় হাফেজ নিজাম উদ্দিন। বর্তমানে সে ময়মনসিংহ গাঙ্গিনার পাড় মসজিদের স্বনামধন্য ইমাম। তবে তাঁর আবির্ভাব দেখে আমি খুশীই হলাম। কারণ এর অর্থ হলো, তকমিলী হেকিম একেবারেই গেছে! আর সেই যদি তার

জাদুয়ে চেরাগ নিয়ে পরাস্ত হয়ে থাকে, তা হলে নিজাম ডাকাত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া হয়েই ফিরে যাবে, আমার সাথে প্রতিযোগিতা করার সাধ্যও তাঁর নেই।

তাই হলো, এবার আমি সরাসরি দুর্গ জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। আমি দেখলাম, আর দেরী নয়, এই ফাঁকে এমন এক স্থানে আমার মনোভাব প্রকাশ করতে হবে, যার হাতে এই দুর্গদ্বারের চাবি আছে। তিনি আর কেউ নন, আমার বড়ো ভাই কাজী সাহেব। এক রাতে তাঁর চালের আড়তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার মনোভাব ব্যক্ত করতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি অনেক আগেই কথা বলেছি, কিন্তু আপনার শ্বশুরের মত নেই। তাঁর ধারণা এখন বিয়ে দিলে আপনার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'না দিলেও তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

তিনি শুয়েছিলেন, উঠে বসে পড়লেন, বললেন, 'বলেন কী! আপনাকে তো আমি একজন নীতিবাগীশ যুক্তিবাদী বলেই মনে করতাম। অপনার তা হলে হৃদয় বলেও একটা কিছু আছে! মাদ্রাসার ছাত্রের জন্য একী মানাবে!'

আমি বললাম, 'মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে আপনারা যতোটা রাবিশ বলে মনে করেন, তারা মোটেও তা নয়। কাজেই তাঁরা ব্যর্থ প্রেমিক যেমন হতে পারে, তেমনি ব্যর্থ প্রেমিকের মতো আচরণও করতে পারে।'

তিনি স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যাপারটা সামান্য আঁচ করেছিলেন, তবে তা যে এতোদূর গড়িয়েছে, তা তিনি কখনো কল্পনাও করেননি। আমি বললাম, 'মোটেও গড়ায়নি, আমি শুধু আমার কথাই বলছি, অন্যের কথা জানিনা। আর আপাততঃ জানতেও চাইনা।'

এবার তিনি কিছুটা বিস্মিত হলেন, বললেন, তা হলোতো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নতুন করে ভাবতে হয়। আমিতো ভেবেছিলাম, 'মিয়া বিবি রাজী তো কিয়া করেগা কাজী।'

আমি হেসেই বললাম 'বরং উল্টো, এখন কাজীর হাতেই সবকিছু।'

আমি বোধ হয়, ঠিকই বলেছিলাম। কারণ এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি আমার জন্য বন্ধু হয়েই উঠে পড়ে লেগেছিলেন, কাজীর কাজই তিনি করেছিলেন।

কিন্তু আমার সামনে তখন ...র্বাচনী পরীক্ষা। আমি কাজীর উপর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ঢাকা চলে গেলাম। বলা বাহু... ...র্বাচনী পরীক্ষা ভালোই হলো। কারণ চিত্ত চাঞ্চল্যের এই নতুন পর্যায় আমার মানসি... ...ক নতুন করে জাগিয়ে দিলো। আমার মনে হলো, সর্বত্র আমার জন্য জয় অবধারিত হয়ে আছে।

সুতরাং নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল বেরুনো মাত্র পরীক্ষার ফরম জমা দিয়ে কয়েকটি কিতাব বগলদাবা করে আমি খরিচায় চলে এলাম। এসে দেখি ইতিমধ্যেই কাজী সাহেব দুর্গের দ্বার খুলে ফেলেছেন। আমার শ্বশুর একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনার পড়ার কথা চিন্তা করেই আমি বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু সবাই যখন

বলছেন, তখন আর দ্বিমত করে কী হবে; যা কপালে আছে, তাই হবে। তবে আমি আপনার আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলতে চাই।'

আমি বললাম, 'যদি একান্তই কিছু বলার দরকার মনে করেন, তবে আমার কাউরাটের কুলীন আত্মীয়দেরকে বলতে পারেন। বাকী সবাইকে আমি বললেই হবে। আমুদপুর, ধারাকান্দি, দইলা আমি নিজেই বলে আসতে পারবো।'

তিনি হেসে বললেন, 'না, আমি আপনার মায়ের সাথে দেখা করতে চাই, তিনিই তো আসল মুরুব্বী। তাঁর দোয়া ছাড়া আমি এ কাজ করতে পারবো না।'

তাঁর কথা শুনে আমি ভীষণভাবে চমকে উঠলাম, লজ্জা পেলাম। হায়, এ কথাতো আমারই আগে ভাবা উচিত ছিলো। আমার দুঃখিনী মাকে আমিও বুঝি ভুলে গেছি। কিন্তু আজ যিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাঁর প্রতি আমি কোনো ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো।এজন্য তকমিলী হেকিম আমার চাইতেও বেশি করে তাঁকে চিনেছিলো। সত্যি,এই একটি মাত্র কথায় আমার সকল ক্ষোভ দূর হয়ে গেলো।

আমার শ্বশুরকে নিয়ে মায়ের কাছে গেলাম, খালাদের বাড়ি, বোনের বাড়িও ঘুরলাম এবং আমি একা গিয়ে আমুদপুর ধারাকান্দি, দইলা বলে আসলাম। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার আমার বিয়ের সময় মোগল ভাই ছাড়া আর কেউ এলো না। কাউরাটের কেউ এলো না বলে আমার ভগ্নিপতিও আসতে পারলো না।

যাহোক, আমার বিয়ের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেলো। আমি কাঁচিঝুলির এক দরজী, খুব সম্ভব, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আবদুল জব্বারের পিতার হাত দিয়ে এই প্রথম একটি শেরোয়ানী বানালাম। মনে আছে, সেই শেরোয়ানী পেতে দেরী হওয়ায় আমরা রাতের বেলা নৌকা করে দশ বারো জন নদী পার হলাম। নদীতে তখন ভাসান পানি। আমার সাথে চকবাজারের মনসুর, রউফ, মোল্লাজী, এমনি আরো অনেকেই ছিলেন। বড়ো মসজিদের আগের মোয়াজ্জেন মোল্লাজী দরাজ গলায় কেরাত পড়ছিলেন, আর আমরা, বরযাত্রীরা তা তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। জ্ঞানের ঘাটে নৌকা পৌছালে আমরা দল বেঁধে খরিচা গিয়ে যখন পৌছলাম, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

কনের গায়ে অনেক আগেই হলুদ দেয়া হয়ে গেছে, এবার বরের গায়ে হলুদ দিতে এসে বুটলু পা পিছলে ধরাম করে পড়ে গেলো; সে এক হাসির কাণ্ড! একটু পরেই শোনা গেলো, সে বড়ো ভাইদের ঘরের বারান্দায় এই রাতের বেলাই ঝুলন খেলতে গিয়ে আছাড় খেয়ে বেহুশ হয়ে গেছে; সে কী দুশ্চিন্তা। এমনি ভাবে বুটলু নামের এই মেয়েটা কেবলই বাধার সৃষ্টি করছিলো। তবু এক সময় জামাই এসে বৈঠকখানায় বসলো। সেখানে কোরান পাঠ হলো, জামাই নিজেও সেই কোরান পাঠে অংশ নিলো। তারপর 'এজিন' বা কনের সম্মতি এনে বিয়ে পড়ানো হলো। বিয়ের 'কাবিন' আগেই রেজেষ্ট্রী হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং জামাইকে এবার বাড়ির ভিতরে নেবার পালা। গিয়ে দেখি বুটলু অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরের দিন ঘরের পোষা একটা বিরাট খাসী জবাই করে আত্মীয় স্বজন বরযাত্রী সবাইকে খাওয়ানো হলো। রাতের বেলাও সেই খাওয়া চললো। হৈ চৈ হলো, কিন্তু বুটলুকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেলোনা। এর কারণ রাতের বেলা 'শা নজর' এর সময় পূবের বাড়ির বু মানে আমার নানা শ্বশুরের বোন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'এল গাছের বেল, মাউগ থইয়া জেওয়াশ লইয়া গেল।' বুটলু বুঝি পরে কীভাবে সেই কথা শুনেছিলো, তারপরই সে ভেগেছে। আমার আশে পাশেও আর আসেনা।

তারপর বু'র বিছানায় বাসর শয্যা। গরমে ভিজে যাওয়ার উপক্রম। পাখার বাতাস দিয়েও কূল পাওয়া যায় না। আষাঢ় মাসের ভ্যাপসা গরম।

কিন্তু কীভাবে যে পরীক্ষার সময় এসে গেলো, তা আমরা কেউই বুঝতে পারলাম না। দিন পনেরো আগে কোনো প্রকারে হোস্টেলে গিয়ে ঠাঁই নিলাম। লেখাপড়াতো হয়নি; তবে বিশ্বাস আছে একবার চোখ বুলাতে পারলেই হয়। তাই হলো; পরীক্ষা দিলাম, তারপর আবার খরিচা ফিরে এলাম।

এবার মুসলিম ইনস্টিটিউটের পাঠাগারটির সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটলো। সেখান থেকে সপ্তাহে দুবার করে বই আনি আর সেগুলির মধ্যে যতোটা সম্ভব তন্ময় হয়ে থাকি। এছাড়া পাখার গায়ে লতাপাতা আর ফুল আঁকা, সেগুলিকে নানা বর্ণের সুতা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা, এসব কাজও যে আমি ভালো জানি, সেটারও পরিচয় এ সময় প্রকাশ পায়। এভাবেই দেখতে দেখতে কখন যে তিন মাস ফুরিয়ে গেলো, টেরই পেলাম না। মনে হলো, দিনরাত যেন পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে রাজকন্যার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছে, সাত সমুদ্র তেরো নদী অবলীলায় পার হয়ে যাচ্ছে।

যাহোক, এরই মধ্যে একদিন ফাজিল তথা জমাতে উলা পরীক্ষার ফল বেরুলো। দেখা গেলো, আমি সকলের আশংকা দূর করে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছি।

একাদশ তরঙ্গ ॥

আমার মাদ্রাসা শিক্ষার শেষ পর্বে আমি এসে প্রবেশ করেছি। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৪, এই দশ বছর আমি মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ব্যয় করেছি। সে তুলানায় আমার প্রাইমারী শিক্ষায় সময়ের দৈর্ঘ্য বেশি, ১৯৩৫ থেকে ১৯৪১, ছয় বছর। তখন পারিবারিক বিপর্যয়ে বারবার শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়েছে। একচল্লিশ ও পঁয়তাল্লিশের মাঝের তিনটি বছরও এমনি গোলযোগের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আমি যদি পারিবারিক সহায়তা অব্যাহতভাবে পেতাম, তা হলে মাদ্রাসা শিক্ষা ১৯৪৬-এ এবং সাধারণ শিক্ষা ১৯৫০-এ শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু এ উভয় ধারা পর্যায়ক্রমে শেষ করতে গেলে আমার আরো দুবছর বেশি লাগতো।

এ হিসাব আমি এজন্যই টেনে আনছি যে, পারিবারিক সহায়তা একটি শিশু বালক কিশোরকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, যেভাবে এদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে, তা অন্যত্র সুলভ নয়। কারণ এ বয়সে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম শুধু দৈহিক দৈন্য নয়, মানসিক দৈন্যকেও প্রকটিত করে তোলে। এজন্যই পরিবারের আবেষ্টনী শিশু বালক কিশোরের জন্য এতোটা প্রয়োজনীয়। কারণ এর ফলে শুধু দেহ বাড়ে না, মনও বিকশিত হয়।

তবু আমি মানুষের এই সমাজের কাছে কতৃজ্ঞ যে, তাঁদের অকৃত্রিম সহায়তার ফলেই খুব কম সময়েই আমি আমার দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। যারা আমার এই জীবন কথা পড়বেন, তাঁরা খুব সহজেই লক্ষ্য করবেন যে, কী অমানুষিক পরিশ্রমই না আমি করেছি। কিন্তু পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দয়ালু ব্যক্তির সহায়তা না হলে কি আমার এই পরিশ্রম সফল হতে পারতো। কিংবা আজ আমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখানে এসে দাঁড়াতে পারতাম! এজন্যই মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি আমি কখনো বিশ্বাস হারাইনি। এখনো আমার সে বিশ্বাস অটুট আছে। এ কারণেই, এমনকি বৈষয়িক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস দেখে অন্যেরা বিস্মিত হয়, কিন্তু আমি বিস্মিত হইনা। কারণ আমি বিশ্বাস করি, মানুষ মূলতঃ মানুষ। পরিবেশের অনিবার্য চাপেই সে পশুতে পরিণত হয়। আবার সেই পরিবেশকে অতিক্রম করেই সে মানুষ হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ এখানেই আমাদের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা।

আমি কি সে পরীক্ষায় পাস করতে পেরেছি? কে জানে, অনাগত কালই তার বিচার করবে। আপাততঃ আমি ফাজিল পরীক্ষায় পাস করেছি। একে সাধারণভাবে জমাতে উলা বলে এবং এই পরীক্ষায় যারা পাস করে, তাদেরকে আমরা 'মৌলবী' বলি। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা বিন্যাসে একে 'ফাজিল' বলা হয় কী জন্য, তা আমার ভালো করে জানা নেই। কারণ এর আগের পরীক্ষা, 'আলিম' মানে জ্ঞানী। এরপর 'ফাজিল' মানে

গৌরবান্বিত। এরপর 'কামিল' মানে পূর্ণ। আমি এবার গৌরবান্বিত হয়ে পূর্ণতা লাভের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। চুয়ান্ন সনেই এই পূর্ণতা লাভ ঘটবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমি শুধু পরীক্ষায় নয়, জীবনের মুখ্য ক্ষেত্রেও গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছি। কারণ আমার স্ত্রীর নাম ফজিলত। এই ফজিলত আর ফাজিল শব্দ দুটির মূল ধাতু রূপ এক, 'ফজল'; সুতরাং অর্থও খুব কাছাকাছি। এর কারণ মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী এবং সেই সঙ্গে সহজ ও সরল। আমার সেই চিঠি সে পড়েছিলো কিনা, জানিনা কিন্তু তার হাবভাব দেখে মনে হলো, আমার জন্যই সে অপেক্ষা করছিলো।

অবশ্য নিজের স্ত্রীর প্রশংসা করা খুব সুবুদ্ধির লক্ষণ নয়। কারণ কোনো বুদ্ধিমানই এ কাজটি করতে চাননা। কারণ, তাঁদের ধারণা, এতে নাকি স্ত্রৈণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে স্ত্রীর প্রশংসাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কারণ এতে শুধু ভালোবাসা নয়, দাম্পত্য বন্ধনও দৃঢ় হয়। বিয়ে করলেই স্ত্রী কারো দাসী হয়ে যায় না, বরং তার দাস হয়েই তাকে দাসীতে রূপান্তরিত করতে হয়। এ সত্যটি আমরা অনেক সময় ভুলে যাই বলেই দাম্পত্য কলহ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, আমি আমার স্ত্রীকে ভালো করে ভালোবাসা বা তার সাথে দাম্পত্য কলহে রত হবার আগেই সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। সম্ভবতঃ তার স্মৃতি এ কারণেই এতোটা মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে আছে।

অবশ্যি আমার আত্মীয়জনরা এই মাধুর্যকে উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা তাকে ভেবেছিলেন, এক ঘরজামাইয়ের মেয়ে, তাকে বিয়ে করে আমি আরেক ঘরজামাই হতে চলেছি। সেই যে বলেছিলাম, গোদের উপর বিষ ফোঁড়া, ঠিক তেমনি। তাই তাঁরা এই বিষ ফোঁড়ার বিয়েতে উপস্থিত হননি। শুধু আমার সহোদর বড়ো ভাইয়ের দোস্ত মোগল ভাই এসেছিলেন। তাও বোধ হয় আমার মাওইর কথায়। কারণ আমি পূর্বেই বলেছি যে, এ জীবনে যে কয়জন মহিলার স্মৃতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, মাওই তাঁদের একজন।

কিন্তু এ সময়ে হঠাৎ কী করে যে, আমার সহোদর বড়ো ভাই আমার শ্বশুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তা আজো আমার কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে আছে। কারণ এই ঘরজামাইয়ের ঘরজামাই দেখতে আসায় তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। আবার আমার বৌ দেখে তিনি এতোটাই খুশী হয়েছিলেন, আমিও বুঝি এতোটা খুশী হতে পারিনি। বিয়েতে বর পক্ষের আত্মীয় স্বজন না এলে মেয়ের মনে একটা দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তার মনে হতে পারে যে, তাকে বোধ হয় তাঁদের পছন্দ হয়নি। আমার স্ত্রীর মনে তেমন কোনো দুঃখ জন্মেছিলো কিনা, আমি জানিনা,যদি জন্মেও থাকে, তা হলে বড়ো ভাই যেন দুহাত দিয়ে সেই দুঃখ মুছে নিলেন। আমি যাদেরকে যা ডাকি, তিনিও তাঁদেরকে তাই ডেকে দুদিনেই আপন হয়ে গেলেন। আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরাও বুঝতে পারলো যে, আমিও একেবারে যাতা একটা ফেলনা নই।

আমার বড়ো ভাই সব চাইতে বেশি অবাক হয়েছিলেন আমার শ্বশুর বাড়ির বড়ো ভাই অর্থাৎ কাজী সাহেবের জনপ্রিয়তা দেখে। আমরা তিনজন মিলে বালিখার বাজারে যাচ্ছি.পথে যাতায়াতকারী লোকজন কাজী সাহেবকে দেখে যেভাবে শ্রদ্ধার সাথে সালাম করছে, তা তাঁর কাছে এক বিস্ময়। তাঁর ধারণা কোনো মিলিটারী জেনারেলকেও বুঝি সাধারণ সৈন্যরা এমন নিষ্ঠার সাথে স্যালুট করে না। বলা বাহুল্য, আমার বড়ো ভাই তখন মিলিটারী অফিসার। এর উত্তরে আমি কাজী সাহেবের দীর্ঘকাল ধরে প্রেসিডেন্টগিরি ও জনসেবার বরাত দিলাম এবং তাঁর উদার হৃদয়ের পরিচয় তুলে ধরলাম।

বস্ততঃ আমার বড়ো ভাই এমনি আরো অনেক কিছুর মধ্যেই আমার প্রতি তাদের বদান্যতা ও অশেষ স্নেহের নির্দশন খুঁজে পেয়েছিলেন। এর ফলে যাবার বেলা তিনি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেছেন। একটি অনাথ ছেলেকে যে তাঁরা এভাবে আশ্রয় দিয়েছেন, আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করেছেন, তার তিনি ভুয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এর ফলে আমার নানী শ্বাশুড়ী বু তাঁর প্রতি এতোটা মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি চলে যাবার বহু বছর পরেও তাঁকে আবার দেখার কথা বারবার বলেছেন। কিন্তু বড়ো ভাই আর আসেন নি।

এখানে আমার সহোদর বড়ো ভাইয়ের কথা যখন এসেই পড়েছে, তখন তাঁর সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলা দরকার। আমাদের এই দুই সহোদরের সম্পর্ক বড়ো অদ্ভুত। বয়সে আমার বড়ো ভাই আমার চাইতে সাত বছরের বড়ো। আমাদের পারিবারিক চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পরে সেই যে তিনি রাগ করে যুদ্ধের ময়দানে চলে গিয়েছিলেন, এর পর দীর্ঘ দশ বছর পরে এই তাঁর মা ভাই বোনের কথা মনে পড়েছে। তাঁর এভাবে চলে যাবার পর আমি আক্ষেপ করেছিলাম, তাঁর কাছে কিছু পাইনি বলে অনুযোগ করেছিলাম। কিন্তু এবার তিনি যেভাবে তাঁর স্নেহের ভাণ্ড উজাড় করে দিলেন, তাতে অতীতের সমস্ত শূন্যতা ভরে গিয়ে উপচে পড়তে লাগলো। শুধু কি আমার শ্বশুর বাড়িতে, মায়ের ওখানে, কাউরাটে, আমুদপুরে সর্বত্র তিনি তাঁর বৌমার কথা, আমার আদর যত্নের কথা বলে বেড়ালেন। এই বলার মধ্যে তাঁর যেমন একটা গর্ববোধ ছিলো, তেমনি নিজের দায়িত্ব এড়ানোর ফলে যে গ্লানি তাঁর মনের মধ্যে জমে উঠেছিলো, তা মোচন করার একটা ভাবও ছিলো। অর্থাৎ দেখো, আমরা কিছু না করলে কী হবে, আমার অনাথ ভাই কেমন করে তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছে,আর কীভাবেই না সেই যোগ্যতাকে এই সব অনাত্মীয় মহৎ মানুষেরা মর্যাদা দিয়েছে। এ কারণে তাঁর এই উচ্ছ্বাস আমার আত্মীয় স্বজনের তেমন ভালো লাগেনি। সম্ভবতঃ আমার নুরু ভাই আমার শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকবেন; আমি তখন ছিলাম না, আমার বড়ো ভাই তা শুনে এতোটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, আমার বিপিতা চাচাজী মধ্যবর্তী না হলে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেতে পারতো। এ সবই ছিলো তাঁর উদার স্নেহের পরিচয়।

অথচ তখনো তিনি নিজে বিয়ে করেন নি। কারণ মায়ের পরগৃহে যাত্রার সংবাদ শুনে তিনি তাঁর কর্তব্যে অবহেলা জনিত গ্লানিবোধে এতোটাই পীড়িত হয়েছিলেন যে, তিনি ছন্নছাড়ার জীবন যাপন করেন এবং এক পর্যায়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন। এসব কথা ইতিপূর্বেও আমি বলেছি। সুতরাং আমার পাঠাভ্যাস, আমার এই বিয়ে সব কিছুকেই তিনি তাঁর ছন্নছাড়া জীবনে আশার আলো বলে গণ্য করেছেন। এ সময়ে আমুদপুরে, আমাদের পশ্চিমের বাড়িতে বড়ো ভাইয়ের জন্য একটি বিয়ের আলাপ হয়, কাণ্ডু ভাইয়ের বোনের সাথে এই বিয়ের কথা আমি শুনেছিলাম। কিন্তু কনে পক্ষ মেয়েকে নিয়ে মিলিটারী কোয়ার্টারে চলে যাবার ব্যাপারে কিছুটা আপত্তি করায় সে বিয়ে হয়নি। বড়ো ভাই এর ফলে কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ হয়েই নিজ কর্মস্থলে চলে যান। এর পর দীর্ঘকাল আর তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়নি। কোনো চিঠিও তিনি লিখেননি।

বড়ো ভাইয়ের কথা কিছুটা বিস্তারিত আকারেই আমাকে লিখতে হলো। কারণ আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য প্রধানতঃ তাঁকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তাঁর প্রতি আমার বিশেষ কোনো ক্ষোভ নেই। কারণ যা পাবার ছিলোনা, তা পাইনি, তাই বলে যা পেয়েছি, সেই আক্ষেপে তাকে আর আবিল করে তুলি কেন!

নুরু ভাইয়ের ব্যাপারটি কিন্তু একটু ভিন্ন রকমের। আমার দুই খালার মধ্যে এই একটিই পুত্র সন্তান। সুতরাং আমাদের ব্যাপারে তাঁর আরো কিছুটা সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত ছিলো। অতীতে যাই করে থাকুন, আলোচ্য সময়ে তিনি নিজেও বিয়ে করেন নি। সেদিক থেকে ছোট ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে তিনি আরেকটু সংযত হতে পারতেন। অথচ কুলিয়াটী গ্রামে স্কুল মাস্টারী করার সময় তিনি তৎসংলগ্ন নাসির পুরের লজিং বাড়িতে এক সুন্দরীর প্রেমে পড়েন। মনে পড়ে, আমাকে তিনি সেই বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করার জন্য কিংবা আমাকে তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকজনকে দেখাবার জন্য কিংবা তাঁর হবু স্ত্রী যে আমার স্ত্রীর চাইতেও সুন্দরী, এ ব্যাপারটি বুঝাবার জন্য তিনি আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আমি তার কোনো কাজেই লাগিনি। কারণ তখন তাঁর লজিং বাড়ির লোকেরা তাঁকে আর সহ্য করতে পারছে না।

অথচ পরবর্তী এক পর্যায়ে তিনি আমার শ্বশুর বাড়িতেও আসেন এবং আমার স্ত্রীকে দেখে যান। কারণ আমার বড়ো ভাই যেসব কথা বলেছিলেন, তা তিনি নির্বিবাদে মেনে নিতে পারেননি। পরে যখন তিনি তাঁর সেই প্রিয়তমা জয়নব নাম্নী মহিলাকে বিয়ে করতে সক্ষম হন; তখন তাঁকে এমন পর্দানশীন করে তোলেন যে, আমাদের সামনেও তাঁকে বের হতে দিতেন না। কারণ ইসলামের পারিবারিক ঐতিহ্যে দেবরকে যমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধের অন্যান্য ব্যাপারেও তিনি হঠাৎ এমন কট্টর গোঁড়া হয়ে পড়লেন যে, আমার যুক্তিবাদিতাকে তিনি মূর্খতা বলেই মনে করতেন। তাঁর এ প্রকার গোঁড়ামির মধ্যে একটা প্রচণ্ড গোঁয়ার্তুমি ছিলো।

আসলে তাঁর এ ধরনের পরিবর্তনের ইতিহাস আমি জানি। ভোগের তপ্ত পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মুখ পুড়ে গেলে যা হয়, এখানেও তাই হয়েছে। জীবনকে এমনি লোকেরা

খুব সহজ ভাবে নিতে পারে না, কখনো উন্নাসিকতায়, কখনো হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়ে কেবলই সংকুচিত হতে থাকে। পরে এই সংকোচন ফাঁসির রজ্জুর মতো তাদের করুণ পরিণতিকেই নিয়ে আসে। নুরু ভাই সম্পর্কে আমার এই বিশ্লেষণের কারণ আছে। পরবর্তীকালে তাঁর করুণ পরিণতির সাথে এটি মিলিয়ে দেখলে অনেক রহস্যই উন্মোচিত হতে পারবে।

কিন্তু আমার জীবন কথায় আমি নুরু ভাইকে এতোটা গুরুত্ব দিচ্ছি কেন? এর কারণ তাঁর নিকট থেকে আমি কেবল আঘাতই পেয়েছি। অথচ ছোট ভাই হিসাবে আমি তাঁর স্নেহের ভাগও দাবী করতে পারি। কিন্তু তিনি তা দিতে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন।

আমি আরো একাধিকবার বলেছি যে, আমি বড়োই স্নেহের কাঙাল। পারিবারিক পরিবেশে একত্রে সব স্নেহ পাইনি বলেই পথে পথে আমাকে স্নেহ কুড়িয়ে বেড়াতে হয়েছে। যারা অকাতরে সেই স্নেহ দিতে পেরেছেন, তাঁরা সবাই আমার আত্মীয় ছিলেন না। অথচ তাঁরাই আজ আমার জীবন স্মৃতির পাতায় অনেক আত্মীয়ের চাইতেও উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

এই তরঙ্গের প্রথমেই এমন সব বিষয়ের আলোচনা এসেছে, যা আমাকে আমার মূল প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এর কারণও আছে, আমার এবার ঢাকা যাবার সময় অনেকখানি পিছিয়ে গেছে। না, এতে ফজিলতের কোনো দোষ নেই। আসলে যে পরিবারের সাথে আমি জড়িয়ে গেছি, তাঁদের সমস্যাদি থেকে আমি আর দূরে সরে থাকতে পারি না। আর এই সমস্যার মূল কেন্দ্র যদি আমার শ্বশুর হন, তা হলে তো কথাই নেই। কারণ এই একটি মাত্র লোক, যাঁর স্নেহের টানেই আমি এই পরিবারের একজন হয়ে উঠেছি।

ঘটনাটি ঘটেছিলো বেশ দূরে। আমার এক চাচা শ্বশুরের বিধবা পত্নী, তার বিয়ের ব্যাপারে আমার শ্বশুর অহেতুক একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন। তিনি নিজের দায়িত্বে তার নিকে দিলেন তাঁরই এক ভাতিজী জামাইর সাথে। অবশ্য সেই ভাতিজী জামাইও বিপত্নীক এবং সম্পর্কটিও দূরের। তবু এটিই ভাতিজা-চাচীর বিবাহ সংকটে পরিণত হলো। আমার বড়ো ভাই সেই কাজী সাহেব এই নিকে নিয়ে অকারণে আমার শ্বশুরের উপর চড়াও হলেন। এতে নাকি সমাজের ইজ্জত নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রমে আমার শ্বশুরের চরিত্র সম্পর্কেও নানান কথা বলা হলো, এমন কি তাঁর পদস্খলন ঘটেছে, এমন কথাও আমাকে শুনতে হলো। বলা বাহুল্য, আমি তখন আমার শ্বশুরের একমাত্র সহায় স্থল। ছেলে হই আর জামাই-ই হই, আমাকেই তখন তাঁর পাশে দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে অনেক কুকথার জবাবও দিতে হয়েছে।

এ সংসারে একটা ব্যাপারে আমরা প্রায় সব সময় ভুল করে থাকি। একটি মানুষ, সে যতো বড়ো শিক্ষিত আর জ্ঞানীই হোক না কেন, তাঁর একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে। সেখানে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতোই জৈবিক চেতনার অধীন।

সর্বজন মান্য পীর সাহেবেরও যে এ ব্যাপারে প্রয়োজন আছে, সে কথা আমরা বুঝতে চাইনা। এর ফলেই অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

আমার শ্বশুরের সমস্যাটিও এমনি ধরনের। বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমার শ্বাশুড়ী অসুস্থ থাকায় আমার শ্বশুরের জৈবিক প্রয়োজন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। অথচ এ নিয়ে তিনি ভিন্নতর কোনো চিন্তা ভাবনা করেননি। কিন্তু করার মতো তাঁর ক্ষমতা ও সঙ্গত কারণ উভয়ই ছিলো। কারণ ইসলামের একাধিক বিবাহের ব্যাপারটি এক্ষেত্রেই সঙ্গতভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এতোদিন আমার যে শ্বশুর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন, এমনি সব ব্যাপারে অহেতুক উত্ত্যক্ত হয়ে সেই ধৈর্য স্থৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তিনি বিয়ে করার বন্দোবস্ত করলেন।

তাঁর এই উদ্যোগ একদিক থেকে আমাকেই বেশি আঘাত করার কথা। কিন্তু আমার চাইতেও বেশি করে এতে আহত হলেন আমার শ্বাশুড়ী, আমার বু, আমার বড়ো ভাই কাজী সাহেব। তাঁদের এ প্রকার অসহিষ্ণুতা আমার ভালো লাগেনি। এ কারণেই এই ব্যাপারে আমার শ্বশুরকে আমি সাহায্য করতে আরম্ভ করলাম।

তিনি বিয়ে নয়, নিকে করলেন, ফুলপুরের নিকটে কাজিয়াকান্দার মৌলবী খেদমত আলীর ভাতিজীকে। তাঁর নিকের সব ব্যাপারেই আমাকে অংশ নিতে হলো এবং বলতে গেলে আমি এই বুড়ো ছেলের মুরুব্বী সেজে সব কিছু নিষ্পত্তি করলাম। অবশ্যি এর ফলে অন্যরা যে আমাকে কিছু বলেছিলেন, তা নয়। কারণ আমাকে বলা খুব সহজ ছিলো না। কেননা আমি অন্যায় কিছু করিনি। বরং আমার এই ভূমিকা কিছুটা উদার প্রভাবেরই সৃষ্টি করেছিলো।

কিন্তু আমার নতুন শ্বাশুড়ীকে আমার পছন্দ হয়নি। কারণ মেয়েটি দেখতে যেমন কালো, তেমনি বেঁটেখাটো। আমার সুপুরুষ শ্বশুরের সে মোটেও উপযুক্ত ছিলো না। তবু তিনি যখন পছন্দ করে বসলেন, তখন আমার পক্ষে আর না করা সম্ভব হলো না। নিকে হবার পর আমার নতুন শ্বাশুড়ী বাপের বাড়িতেই রইলেন। ক্রমে এমন একটা সম্ভাবনা দেখা দিলো যে, আমার শ্বশুর হয়তো নতুন শ্বশুর বাড়িতেই নতুন সংসার পাতার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমি এর ঘোর বিরোধী ছিলাম। এর ফলে তা আর সম্ভব হয়নি। কারণ আমার শ্বশুরের পৈতৃকবাড়ি খুব একটা দূরে নয়, চরখরিচারই পশ্চিম পাড়ায়। প্রয়োজন হলে তিনি সেখানেই নতুন সংসার পাততে পারেন। এ ব্যাপারে অসুবিধাটা হবার কোনো কারণ ছিলো না।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। আমার বারংবার তাগাদার ফলেই আমার শ্বশুর আমার নতুন শ্বাশুড়ীকে তাঁর পুরানো শ্বশুর বাড়িতে আনতে গেছেন। কিন্তু বেশ কয়েক দিন হয়ে গেছে, তাঁর কোনো খোঁজ খবর নেই। রাস্তা ঘাটও হঠাৎ বন্যায় জলমগ্ন হয়ে গেছে। সে বছর বন্যা ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলো। এর ফলে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি সেই বন্যার জল ভেঙে ফুলপুর গেলাম এবং সেখানে জানতে পারলাম যে, আমার শ্বশুর নৌকাযোগে রওনা হয়ে

গেছেন। তখন আমি সেই দিনই আবার পানি ভেঙে খরিচায় ফিরে এলাম। সেদিনের এই বন্যার পানি সাঁতরিয়ে পথ চলা একটি বিপদ সংকুল অভিযানের মতোই আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। জলমগ্ন পথ আমার মনে সেই কিবরিয়াকে নিয়ে বাস্তা যাবার স্মৃতি নতুনভাবে জাগ্রত করে দিয়েছিলো। কিন্তু পথে তখনকার মতো কোনো বিপদ ছিলো না।

এভাবে আমার ঢাকা আসার পথে কেবলই বাধার সৃষ্টি হচ্ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি আবার ঢাকায় ফিরে এলাম। এবার হোস্টেলে আমার জন্য একটি নতুন রুম বরাদ্দ হলো। রুমটি দোতলায় এবং পূব দিকে বারান্দাসহ বেশ খোলামেলা। সুতরাং আমি বেশ সুখেই হোস্টেলের জীবন আরম্ভ করলাম। আমার রুমমেট হলো আবদুল বাকী নামে একটি ছেলে। আমি জানতে পারলাম, এই রুমেই কিছুদিন আগে মুসা আনসারী নামে একজন ছাত্র থেকে গেছেন, যিনি কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাস করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসাতেও, বলতে গেলে, আমার পরিচিতিও খ্যাতি আমাকে নতুন সুযোগ সুবিধা এনে দিলো। সেই সঙ্গে খুলনার আবদুল কাদির, যে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে এবং চট্টগ্রামের আবদুস সোবহান, যে দ্বিতীয় হয়েছে, তারা দুজনও আমার সাথে আলীয়ায় এসে ভর্তি হলো।

এ সময় যেন শিক্ষকদের সাথেও নতুন করে পরিচয় হতে আরম্ভ হলো। এতোদিন যারা দূরে ছিলেন, তাঁরা কাছে এলেন; যারা উন্নাসিক ছিলেন, তাঁরা অমায়িক হয়ে উঠলেন। কারণ বোর্ডের পরীক্ষায় আমার স্থান যাই হোক, আলীয়া মাদ্রাসায় আমিই সব চাইতে ভালো ছাত্র। কাজেই বিভিন্ন ব্যাপারে আমার অংশ গ্রহণ তখন একটা অবধারিত ব্যাপার। এর ফলে আমি যেমন হোস্টেল জমিয়তে তোলাবার ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলাম, তেমনি আলীয়া মাদ্রাসা জমিয়তে তোলাবারও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে গেলাম। এর পিছনে অবশ্যি মৌলানা জাফর আহমদ থানবীর ইচ্ছা কাজ করেছিলো। কারণ তিনি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হবার ফলে এই জমিয়তের ব্যাপারটি দেখা শোনার দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি জমিয়ত নেতৃবৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে জমিয়ত ফাণ্ডের অর্থ নিয়ে তাদের ছিনিমিনি খেলা তাঁর মোটেও ভালো লাগছিলো না। তাই তিনি আমাকে ডেকে এই দায়িত্ব নিতে বললেন। হাবিবুল্লাহ, মান্নান, আমিনুল ইসলাম নামে কয়েকজন ছাত্রের একটা চক্র ছিলো। তারা আমার বিরোধিতা করেও কিছু করতে পারলো না। আমি বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলাম। কিন্তু আমি এই জমিয়ত চালানোর যোগ্য ছিলাম না। কারণ আমার প্রতিযোগিতার স্থান ছিলো অন্যত্র। সুতরাং আমার কবলে পড়ে জমিয়ত ফাণ্ডটিই শুধু রক্ষা পেলো, জমিয়তের অন্য কাজ খুব একটা কিছু হলো না।

সে সময়ের ছাত্রদের মধ্যে, আমার সহপাঠী না হলেও যাদেরকে প্রতিশ্রুতিশীল মনে হয়েছিলো, তাদের কয়েক জনের নাম মনে পড়ছে; যেমন শিবলী ফোরকানী,

আজিজুল ইসলাম, মহিউদ্দিন খান, আমিনুল ইসলাম, ছফির উদ্দিন প্রমুখ। তাদের অনেকেই এ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। আমার সহপাঠীদের মধ্যে, আমার জানামতে, একমাত্র সালামই অধ্যাপনায় নিয়োজিত। এখন সে সরকারী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। এই সালামই হয়বতনগরে আমার সাথে আলিম পরীক্ষা দিয়েছিলো। সে নেত্রকোণো কলেজে ছিলো, এখন বোধ হয় আনন্দ মোহন কলেজে আছে।

আলীয়ার শিক্ষকদের মধ্যে আমার সবচাইতে প্রিয় ছিলেন জাফর আহমদ থানবী সাহেব। আমি তাঁর কাছে বোখারী শরীফ পড়েছি। বিষয়ের দিক থেকে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো অসাধারণ। এর সাথে তাঁর গাম্ভীর্যমণ্ডিত অথচ অমায়িক ব্যক্তিত্ব মিলে মিশে সত্যিই তাঁকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলো। পণ্ডিত শিক্ষক হিসাবে আবদুর রহমান কাশগরী, আমিমুল এহসান, শফি আহমদ, মমতাজ উদ্দিন প্রমুখও ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। শিক্ষক হলেও ওয়াজিহুল্লাহ সাহেবকে নিয়ে আমরা প্রচুর আমোদ করেছি। এর একটা উৎস ছিলো তাঁর পোশাক। তাঁর দীর্ঘ পাঞ্জাবীর হাতাগুলি ছিলো প্রায় দেড় হাত প্রশস্ত আর মাথার টুপিটি ছিলো তালুর উপর এক টুকরো কাপড়। এর ফলে ক্লাসে পড়ানোর চাইতে বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর দিতেই তিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত থেকেছেন। এমনিভাবে আবদুল্লাহ নদবীও হাসির খোরাক যুগিয়েছেন প্রচুর। মাঝে মধ্যে তিনি পাগলামিও করে বসতেন।

আমি টাইটেলে হাদীস শাখার ছাত্র ছিলাম। এ শাখার টাইটেল বা পদবী ছিলো 'মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন'। এ ছাড়াও তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষার ধারায় টাইটেলে আরো তিনটি শাখা ছিলো, তফসীর, ফেকাহ্ ও আদব। তবে হাদীস শাখাতেই ছাত্রের সংখ্যা ছিলো সর্বাধিক। অন্য তিন শাখা মিলিয়ে এর ছাত্র সংখ্যার এক দশমাংশও হতো না।

আমরা হাদীস শাখায় ঠিক কতো জন ছাত্র ছিলাম, বলা মুশকিল। কারণ অনেক ক্লাস আমরা করতামও না। এই আমরা মানে ফাজিল পরীক্ষার সেরা ছাত্র তিনজন। আমরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে চায়ের দোকানে আড্ডা দিতাম। শুধু থানবী, কাশগরী, আমিমুল এহসান, আবদুল্লাহ নদবী, এঁদের ক্লাস ফাঁকি দেয়া যেতো না। তাঁরা ক্লাসে আমাদের খোঁজ করতেন এবং না পেলে লোক পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনতেন।

শফি আহমেদ আমাদেরকে 'বায়জাবী' পড়াতেন। এটি কোরানের একটি প্রসিদ্ধ তফসীর। একদিন কোরানের তকদির বা ভাগ্য সমস্যা নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা হলো। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন'-এই কথাটিতে আমি প্রশ্ন তুললাম যে, তাই যদি হয়, তা হলে এর জন্য বান্দাকে দোষী করা যায় না। কারণ আল্লাহ্ই তাকে গোমরাহ্ করে রেখেছেন। তবে আয়াতটির ব্যাখ্যা যদি এভাবে করা যায় যে, এখানে 'ইয়াশাও' ক্রিয়াপদটির কর্তা তৎপূর্বস্থিত 'মান' সর্বনাম আর কর্মটি এখানে উহ্য, সে হলো 'হেদায়েত' ; তাহলেই কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কারণ তাহলে আয়াতটির অর্থ হয়, 'আল্লাহ্ তাকেই হেদায়েত করেন, যে সেটি চায়'।

তিনি মনোযোগ দিয়ে আমার বক্তব্য শুনলেন। শেষে বললেন, 'তোমার বক্তব্যে যুক্তি আছে, তবে এ ব্যাখ্যাটি নতুন নয় ; আহলে কোরান গোষ্ঠির আলেমরা এভাবেই কোরানের ব্যাখ্যা করেন।'

পরদিন তিনি করাচী থেকে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'তুলুয়ে ইসলাম' নামে একটি পত্রিকার কয়েকটি কপি আমাকে পড়তে দিলেন। এটিই আহলে কোরান গোষ্ঠির মুখপত্র। এতে ঠিক এই ব্যাখ্যাটি না থাকলেও এ ধরনের কথাবার্তা আছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, আহলে কোরান হাদীসের বিশুদ্ধতা মানতে নারাজ। তাদের মতে একটি ছাড়া কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই। অতএব আমার ব্যাখার যৌক্তিকতা স্বীকার করেও তিনি তা মানতে পারলেন না।

এমনি এক ব্যাপার ঘটেছিলো আমিমুল এহসান সাহেবের সাথেও। আমাদেরকে তিনি 'অসুলে হাদীস ও অসুলে তফসীর' পড়াতেন। একদিন মিলাদ নিয়ে তাঁর সাথে বিতর্ক হয়ে গেলো। তিনি মিলাদের পক্ষপাতী আর আমি বিরোধী। আমার যুক্তি হলো, মিলাদের আসরে হজরতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নামে অলীক কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে এবং কিয়াম নিয়ে আলেম সমাজের মধ্যে অশোভন মারামারি দেখা দিয়েছে। একটি নফল বিষয় যদি এমনভাবে ক্ষতিকর উপাদানের আকর হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ইসলামী আইন অনুসারে তাকে ত্যাগ করাই সর্বোত্তম। কিন্তু এই যুক্তিতে একটি প্রতিষ্ঠিত প্রচার মাধ্যমকে তিনি ত্যাগ করতে রাজী নন ; বরং সংস্কারের পক্ষপাতী। সুতরাং আমার যুক্তি মানলেও আমার সিদ্ধান্ত তিনি মানতে নারাজ।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই যে, এমনি সব আলোচনা আর বিতর্কে শিক্ষকদের চাইতে আমার সহপাঠীরাই আমার প্রতি অধিকতর বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলো। তাদের ধারণা হলো, আমি একটা কালাপাহাড়ী মনোভাব নিয়ে ধর্মের প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও আচার আচরণকে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে আমি একটি প্যাণ্ট বানিয়েছিলাম, সেটি পরে ক্লাস করতে থাকায় আমার প্রতি তাদের ধারণা আরো বেশি করে পাকাপোক্ত হয়ে উঠলো। এ কারণে কাশগরী সাহেবের সাথে যেদিন আমার ঝগড়া হয়ে গেলো, সেদিন দেখলাম তারা খুব খুশী হয়েছে। কারণ যুক্তিতর্কে আমার সাথে তাদের এঁটে উঠা সম্ভব ছিলো না। সুতরাং এবার কাশগরী সাহেবের রাগ দেখে তারা ভাবলো, আমার পতন আসন্ন। কারণ কাশগরী অত্যন্ত রাগী মানুষ। কাজেই কাশ্‌শাফের পরীক্ষায় আমার ভাগ্যে গোল্লা ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। দল বেঁধে তারা সে কথাই বলে বেড়াতে লাগলো।

কাশগরী সাহেব আমাদেরকে 'তফসীরে কাশ্‌শাফ' পড়াতেন। এটি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বিখ্যাত মনীষী জমখশরীর রচনা। এর ভাষা ও বিষয় উভয়ই বেশ কঠিন। কারণ কোরান ভাষ্যের প্রচলিত বিষয় ছাড়াও এতে ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'আহলুল সুন্নত ওয়াল্ জামায়াতকে' এই তফসীরে 'আহলুল্ হাশবে ওয়াল জাওয়ায়েদ' অর্থাৎ 'বোগাস পার্টি' বলে নিন্দা করা হয়েছে। তবু সংশ্লিষ্ট

বিষয়ে এটি একটি অদ্বিতীয় রচনা বলেই আহলে সুন্নত অর্থাৎ সাধারণ মুসলমান সমাজ তথা এ দেশের সুন্নী মুসলমানরা এটিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।

যা হোক, কাশগরী সাহেব এই বিখ্যাত গ্রন্থটির ক্লাস নিতেন খুবই হেলাফেলা করে। দায় সারা গোছের কিছু কথা বলেই তিনি দায় শেষ করতেন। আমি একদিন এ ব্যাপারেই আপত্তি জানালাম এবং যথাযথভাবে এই গ্রন্থটির আলোচনা করতে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি খুব রাগ করলেন। তাঁর রাগ দেখে মনে হলো, আমি যেন তাঁকে অপমান করেছি। কিন্তু আমার আপত্তির হেতুটি তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। শুধু রাগ দেখিয়ে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর এ ব্যবহারে আমি খুবই মনোক্ষুণ্ন হয়েছিলাম। কিন্তু পরদিন তিনি হোস্টেলে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আলীয়ার বাংলাবাজারস্থ হোস্টেলের সুপার ছিলেন। তিনি প্রথমেই আমাকে চা-নাশতা খাওয়ালেন। তারপর তাঁর 'আল মুফিদ' নামে একটি আরবি-বাংলা অভিধানের পাণ্ডুলিপি দেখালেন এবং আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। এভাবে অগ্রসর হয়ে এবার তিনি বললেন, 'তোমার কথায় আমি রাগ করেছি, কারণ কথাটা এমনভাবে এসেছে যে, যেন আমি ইচ্ছা করেই ছাত্রদেরকে ফাঁকি দিচ্ছি! কিন্তু তুমিই বলো, আমার সামনে যারা বসে থাকে, তাদের কজন তফসীরটির যথাযথ আলোচনা বুঝতে পারবে?'

আমি তাঁর এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারিনি। কারণ উত্তর দেয়ার উপায় ছিলো না। আমার সহপাঠীদের খবরতো আমার জানা। তারা চিনির বোঝা বহনকারী সেই গাধার মতোই শুধু কিতাবের বোঝা বহন করে চলেছে!

এসব কথা আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি শুধু এই একটি কথাই বুঝাতে চাই যে, আমার যুক্তিবাদিতার যে ধারাটি বহু পূর্বেই আমার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছিলো, তা এই পরিবেশে কোনো তৃপ্তিই খুঁজে পায়নি। এর ফলে আমি যেমন নিজে বিরক্ত হয়েছি, তেমনি আমার সহপাঠীসহ শিক্ষকদেরকে বিরক্ত করেছি। সব দেখে শুনে আমার কেবলই মনে হয়েছে, ইসলামে যুক্তিবাদিতার ধারা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। এক সময়ে এই যুক্তির প্রাবল্য অবশ্যি ছিলো, তা না হলে এতো মতামত, এতা তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারতো না। সব দেখে মনে হয়, সেই যুক্তি একটি বিশাল রাজপথকে বহু সংখ্যক কানাগলিতে রূপান্তরিত করে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ তাই শুধু চর্বিত চর্বনের পালা ; এর বাইরে কিছু করার নেই, বুঝার নেই, কোথাও যাবার নেই!

অবশ্যি মাদ্রাসা শিক্ষার তৎকালীন ধারাটাই এমন ছিলো যে, তাতে চিন্তা করার সুযোগ ছিলো খুবই কম। আজকাল সে ধারার কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা জানি না। তবে সে সময়ে টাইটেল ক্লাসের পাঠ ছিলো বিরাট। ছয়টি হাদীসের গ্রন্থ, দুটি তফসীরের অংশ বিশেষ, অসুলে হাদীস ও তফসীর এবং ইসলামের ইতিহাস। এই কারণেই ক্লাসে হাদীসের পঠন চলতো তুফান মেইলের বেগে। ছাত্ররাই তা পড়তো

এবং আমাদের ক্লাসে আমিই ছিলাম অধিকাংশ সময়ের পাঠক। 'কালা, কালা' বলে ছুটে চলেছি, হঠাৎ থামিয়ে দিলেন শিক্ষক ; ব্যাখ্যা করলেন, বিরোধের মীমাংসা করলেন, প্রশ্নের উত্তর দিলেন, ব্যস্। তারপর আবার সেই ছুটে চলা। এভাবে চলতো পঠনপাঠন। আর এভাবে পাঠ্যসূচী শেষ করতে করতেই সময় শেষ হয়ে যেতো। ফালতু চিন্তার অবকাশ কোথায়! তবু সিমেন্টের মেঝের ভাঙা ফাঁক দিয়ে যেমন করে কচি ঘাসের ডগা গজিয়ে ওঠে, তেমনি করে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। অবশ্যি এমনি প্রশ্নের অভ্যাস আগে থেকে ছিলো বলেই ছুটতে ছুটতেও আমি প্রশ্ন করেছি, তর্ক করেছি এবং সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছি। কিন্তু সাধারণ অবস্থাতো তা নয়, সেখানে প্রশ্নও নেই, উত্তরও নেই ; যেমন আছে তেমনি।

কিন্তু আমি এই নির্বিকার যেমন আছে তেমনি অবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এর ফলে আমাকে বাইরের দিকে তাকাতে হয়েছে। সেখানে চোখে পড়েছে বিভিন্ন ধর্ম, বিচিত্র ধ্যান ধারণা। সব কিছুকে একত্র করে আমি হিসাব মিলাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে চেষ্টাতে আমার তৃপ্তির চাইতে নিজের ত্রুটিই বড়ো হয়ে ধরা পড়েছে। না, আমিতো অন্যকে তেমন ভাবে জানি না। অন্যের মুখের শোনা কথা দিয়ে আর যাই হোক্, বিচার করা চলে না। কীভাবে আমি পরকে জানবো? সে পথে যে এক প্রচণ্ড ঘৃণা দুর্ভেদ্য দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার যা আছে, একমাত্র তাই সত্য ; আর অন্যের সব কিছু মিথ্যা,—এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে শুনতেই তো এতোদূর এগিয়ে এসেছি। এবার জানতে গেলে সে দেয়াল ভাঙতে হয়। কী দিয়ে ভাঙবো? শ্রদ্ধার শাবল দিয়ে, ভালোবাসার হাতুড়ী দিয়ে।

কবে সেই চল্লিশের দিকে রামায়ণ মহাভারত পড়েছিলাম। এরপর এলোমেলো ভাবে পড়েছি নানা ধরনের উপন্যাস। সেখানেই জীবনের বিচিত্র দিকের সাথে জড়িয়ে আছে ধর্মীয় ধ্যান ধারণা, আচার আচরণ। এভাবেই বিভিন্ন ধর্মের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। টুকরো টুকরো কথা আর দৃশ্য দিয়ে সে সম্পর্কে আমার ধারণার মালা গেঁথেছি আমি। সেখানে ঘৃণার চাইতে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সুতোই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। হোস্টেলেরই কোনো এক কক্ষে আমরা কয়েকজন ছাত্র মিলে ইসলামের দৃষ্টিতে কুকুর পোষার ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ইসলামও কুকুর পোষার অনুমতি দেয়, তবে শিকার, পাহারা ইত্যাকার কিছু বিষয়েই তা সীমাবদ্ধ। এ সত্ত্বেও কুকুরের অপবিত্রতা সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন। কারণ যে ঘরে কুকুর থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

যাহোক, আমাদের আলোচনা চলতে চলতে পাশ্চাত্য জগতে গিয়ে প্রবেশ করলো এবং একজন ছাত্র খৃষ্টানদের কুকুর পোষা নিয়ে এক বিদ্‌ঘুটে মন্তব্য করে বসলো। তার ধারণা, খৃষ্টান নারীরা তাদের যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্যই কুকুরকে এমনভাবে ঘরে দোরে ঠাঁই দিয়ে থাকে। আমি তার এ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলাম। ফলে কথা কাটাকাটি হয়ে হাতাহাতির উপক্রম হলো এবং আমার উত্তেজনাই ছিলো বেশি। সুতরাং

আমার বিরুদ্ধে হোস্টেল সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হলো যে, আমি অন্যায় ভাবে সেই ছাত্রটিকে মারতে গিয়েছি। হোস্টেল সুপার আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কৈফিয়ত তলব করলেন। আমি বললাম যে, আমি যদি মারতেও গিয়ে থাকি, তাহলেও তাতে কোনো অন্যায় হবার কথা নয়। কারণ সে যে জঘন্য মন্তব্য করেছে, তাতে তার উচিত শাস্তি হওয়া দরকার।

আমার এ উত্তরে সুপার কিছুটা মনোক্ষুণ্ন হয়েই বললেন, 'কিন্তু তোমার এ মন্তব্য শুনে উত্তেজিত হবার দরকার কী?' তুমিতো আর খৃষ্টান নও!'

আমি তাঁর এ মন্তব্যে বেশ উত্তেজিত হয়েই বললাম, 'আপনিও এ কথা বলছেন! এই কি তা হলে ইসলামের শিক্ষা?'

হোস্টেল সুপার আমার রাগ দেখে আর কথা বাড়ালেন না। সেই ছেলেটিকে ডেকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমার রাগ তাতে কমলো না। বস্তুতঃ সুপারের মন্তব্যটিও আমার মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কারণ সেখানেও সেই একই ইঙ্গিত আছে, সেই ঘৃণার ইঙ্গিত অর্থাৎ খৃষ্টানদেরকে এমনি কিছু বলা যায়, তাতে অশোভন কিছু হয় না। আর আমি ভাবছিলাম ভিন্ন কথা। আমার ধারণা, আমি মুসলমান হয়েও যেমন মানুষ, সে খৃষ্টান হয়েও তেমনি মানুষ। বিধর্মী হলেই যে অমানুষ হয়, এ আমি মানিনা বলেই এই জঘন্য মন্তব্যে এমনভাবে রাগ করেছি। কারণ আমি মনে করি, কোনো মানুষের পক্ষেই এমন কিছু করা সম্ভব নয়।

এই ঘটনাই হঠাৎ আমাকে যেন সচেতন করে দিলো। আমি দেখলাম, আমার অলক্ষ্যে আমার চেতনা ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা ভালোবাসার শাবল হাতুড়ী দিয়ে সেই ঘৃণার দেয়াল ভেঙে ফেলেছে! আমার সমস্ত মন এক অনাবিল আনন্দে যেন চীৎকার করে উঠলো!

আমার এই মুক্তি আমাকে এতোটা প্রভাবিত করেছিলো যে, এ সময়ে আমি পর পর দু'টি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। একটি স্বপ্ন হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সেই ভাষণের দৃশ্য, যা তিনি বিদায় হজ্ব উপলক্ষে দিয়েছিলেন। একটি উঁচু টিলার উপর হজরত দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সম্মুখে বহুলোক এবং, তাঁদেরই একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন হজরত আলী (রাঃ)। তিনি যেন হজরতের বক্তব্যকেই আরো দূরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখেছি। না, কোনো বক্তব্য আমার কানে পৌছেনি। কিন্তু সমগ্র দৃশ্যটি একটা উজ্জ্বল ছবির মতো আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি একটি কর্দমাক্ত রাস্তার দৃশ্য। তার দু'পাশে দু'জন শুভ্র বেশধারী মহাত্মা এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার ধারণা হলো, এঁদের একজন হজরত মুহম্মদ (সঃ) এবং অন্যজন হজরত ইসা (আঃ)। কাদার জন্যই যেন তাঁরা একত্র মিলিত হতে পারছেন না। আমি তাই হাত দিয়ে সেই পথের কাদা পরিষ্কার করতে শুরু করেছি। সেই কর্দমাক্ত পথ, তাঁদের দুজনে সেই দণ্ডায়মান অবস্থা, আর ত্বরিত হস্তে আমার সেই কাদা দূর করার চেষ্টা এখনো যেন চোখের সামনে ভাসছে।

আমি জানি না, আমার এ প্রকার স্বপ্ন দেখার পিছনে তৎকালীন কোন বিশেষ চিন্তা কাজ করেছিলো। কিন্তু এ দু'টি স্বপ্নের তাৎপর্যে আমার মানস চেতনার দু'টি দিক অত্যন্ত স্পষ্ট। এর একটি ইসলামের সত্য প্রচার এবং অন্যটি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মিলন সাধনের প্রচেষ্টা। আজ আমার মানস চেতনা যেখানে এসেই উপস্থিত হয়ে থাকুক না কেন, আমারতো মনে হয়, এ দু'টি স্বপ্নের প্রভাব সে এখনো অতিক্রম করতে পারেনি। এ কারণেই আমি একান্ত অকপটে স্বীকার করি যে, এই পৃথিবীতে আমি যে কয়জন মহামানবকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি, হজরত মুহম্মদ (সাঃ) তাঁদের অন্যতম। সেই তুলনায় কম হলেও হজরত ইসা (আঃ)-এর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই।

কিন্তু এই দু'টি স্বপ্ন আমি কোথায় দেখেছিলাম? যদ্দূর মনে হয়, একটি ঢাকায় আর অন্যটি ময়মনসিংহে। আমার দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য সম্পাদনের ফাঁকে ফাঁকেই আমার চেতনা এভাবে নতুন দিগন্তের মুখোমুখি হয়েছে। আমার দৈহিক ও মানসিক আনন্দই এমনি স্বপ্ন দর্শনের পটভূমি তৈরী করেছে। যেহেতু হজরত বলেছেন 'আমাকে যে স্বপ্নে দেখে, সে সত্যিই দেখে ; কারণ শয়তান আমার মূর্তি ধারণ করতে পারে না।' সেজন্যই এসব স্বপ্নের প্রভাব হয়েছে সুদূঢ় প্রসারী। এ কারণেই—অত্যাসন্ন দেহ-মনের চরম বিষন্নতাকেও সে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। হ্যাঁ, এসময়েই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এক বিপর্যয় নেমে এসেছিলো আমার জীবনে। সে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর অকাল তিরোধান!

আমি তখন আসন্ন বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এমন সময় একদিন সন্ধ্যা বেলা একটি টেলিগ্রাম গিয়ে উপস্থিত—'ওয়াইফ সিরিয়াস, কাম শার্প'—পড়া মাত্রই আমার মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো। আমার দৃষ্টি গিয়ে ঠেকলো রুমের দেয়ালে। সেখানে ভেসে উঠলো ফজিলতের হাস্যোজ্জ্বল একটি মুখ। তারপর সেটি মলিন হয়ে মিলিয়ে গেলো। আমার দু'চোখ পানিতে ভরে উঠলো।

আমি তখনই রেল স্টেশনে ছুটে এলাম, কিন্তু কোনো গাড়ি নেই। মাঝরাতের মেইলে চড়ে শেষরাতে এসে ময়মনসিংহ স্টেশনে পৌছলাম। নদী পেরিয়ে খরিচা পৌছতে পৌছতে আটটা বেজে গেলো। মুমূর্ষু স্ত্রীর শয্যা পার্শ্বে এসে দাঁড়ালাম। আমার ব্যাকুল ডাকে একবার সে আমার দিকে চোখ মেলে তাকালো মাত্র। তারপর তার অক্ষিতারকা চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে গেলো। তার নিঃশ্বাস কমে আসতে লাগলো, ক্রমে তাও শেষ হয়ে গেলো। মনে হলো, সে একটিবার আমাকে শেষ দেখা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমি স্থান-কাল-পাত্র ভুলে তার বুকের উপর কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

হঠাৎ কারা যেন জোর করে আমাকে সরিয়ে দিলো। আমি তার কারণ বুঝতে পারলাম, কেননা এইমৃত লাশ আর আমার স্ত্রী নয়, তাকে আর আমি স্পর্শ করতে পারবো না। কিন্তু এ কেমন কথা! জীবিত অবস্থায় যে আমার স্ত্রী ছিলো, মৃত্যুর পর সে কী করে পরস্ত্রী হয়ে গেলো? আমার বেদনার অশ্রু এবার এক নিদারুণ অভিমানের

তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে আরম্ভ করলো। মনে হলো, আমার সবকিছু যেন শূন্য হয়ে গেছে!

কিন্তু দিনের বেলা তারা তাকে আমার নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেও রাতের বেলা ধরে রাখতে পারলো না। হঠাৎ সে এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়ালো। আমি উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরতেই সে আমার বুকের উপর কান্নায় ভেঙে পড়লো। কিন্তু সময় যে নেই, দুবাহু মুক্ত করে আমি তাকে বিদায় দিলাম। তার সাথে সাথে এগিয়ে যাবার জন্য যেই পা বাড়াবো, অমনি ঘুম ভেঙে গেলো, আমি উঠে বসে দু'হাতে মুখে ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলাম।

স্বপ্ন যে এতো স্পষ্ট, এতো সজীব হতে পারে, এ যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তাই আমার মনে হলো, আমি এখনো দৌড়ে গেলে তাকে কবরের বাইরেই পেয়ে যাবো! সে তো কবর থেকেই শেষ বিদায় নেবার জন্য উঠে এসেছিলো, তাই এখনো বোধ হয় কবরে পৌছতে পারেনি। কিন্তু তার দেহে তো কাফনের কাপড় নয়, সেই ঝলমলে শাড়িটি ছিলো। তবে?

এর উত্তর দেবার কি প্রয়োজন আছে? যে কোনো মনস্তত্ত্ববিদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলবেন যে, এ আমার অবচেতেনর চেতনায় সঞ্চারণ ; এ আমারই অবরুদ্ধ বাসনার বহিঃপ্রকাশ। এভাবেই তো আমাদের সকল স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। বাস্তবে যা সম্ভব নয়, স্বপ্নে তাই সম্ভব হয়। কিন্তু এই ব্যাখায় তো মন ভরে না, হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ হয় না।

আমারও পূরণ হয়নি! কী এক অনির্বচনীয় উদাসীনতায় আমার সকল চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেলো! আমি এক নিদারুণ অস্বস্তিতে ছটফট করতে করতে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, পানিতে নামতে লাগলাম, গাছে উঠতে লাগলাম। এমনি ভাবে কবরখানার লিচু গাছে উঠতেই ঘটলো বিপত্তি। আমি জানতাম না যে সেখানে বোলতার চাক আছে। ওরা আমাকে বেড় দিয়ে ধরলো। আমি দু'হাত দিয়ে ওদেরকে তাড়াতে গিয়ে গাছ থেকে নীচে পড়ে গেলাম। হঠাৎ গায়ে সুড়সুড়ি লাগতেই চেয়ে দেখি আমি ফজিলতের কবরের পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি আর বুটলু আমার গায়ের বোলতার কামড়ে চুন মাখিয়ে দিচ্ছে!

কিন্তু বুটলুর ডাক্তারি সত্ত্বেও আমার নাক মুখ হাত গা ফুলে গেলো। আর তখনই মনে হলো পৃথিবীটা আগের মতোই ঘুরছে এবং ঢাকায় আমার জন্য একটা পরীক্ষা অপেক্ষা করছে। তাই কিছুটা সুস্থ হওয়া মাত্রই আমি ঢাকায় ফিরে গেলাম এবং পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করলাম। এই পরীক্ষায় আমার স্থান হলো দ্বিতীয়। আর যে ছেলেটি ফাজিল পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছিলো, সে প্রথমকেও হারিয়ে দিয়ে প্রথম হয়ে গেলো!

আমার পরীক্ষার ফল আমার চোখে নতুন করে জল নিয়ে এলো। আমার কেবলই মনে হতে লাগলো, আমার শক্তি যেন অর্ধেক হয়ে গেছে। কিন্তু এখনই যদি এই অবস্থা

হয়, তাহলে সামনে তো মূল পরীক্ষাই পড়ে আছে, তখন কী হবে! নাহ্, কিছুই ভাবতে পারছি না। ঢাকায় আর ভালোও লাগছেনা। তাই বের হয়ে গেলাম মায়ের সাথে দেখা করতে গোগে। দুঃসংবাদ আগেই জানিয়েছিলাম, এবার গেলাম মায়ের নিকট থেকে সান্ত্বনা লাভ করতে। কিন্তু কী সান্ত্বনা দিবেন তিনি! এসব ব্যাপারে যথার্থ সান্ত্বনা নিয়ে আসে সময় ; বলতে গেলে সময়ই আমাদের দুঃখ হরণ করে। তবু এভাবে মা, খালা, বোন, সবার বাড়িতে সময় কাটানোর ফলে কিছুটা অন্যমনস্কতা দেখা দিয়েছিলো বৈকি! এও হয়তো সময়েরই দান। তাই একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে!

ঘটনাটি ঘটেছিলো কাউরাট মসজিদে। সেখানে সারা গাঁয়ে একটি মাত্র মসজিদ। সে জন্যই শুক্রবারে বেশ বড়ো জামাত হয়। সারা গাঁয়ের মুসুল্লীরা এসে নামাজের আগেই মসজিদে ভিড় জমান। সে দিন গিয়ে দেখি, সেই ভীড়ের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কের বিষয়, আসহাবে কাহাফের কুকুর! সেটি বেহেশ্‌তে যাবে কিনা, তাই নিয়ে তারা সমস্যায় পড়েছেন। একদল বেহেশ্‌তে যাবার পক্ষে আর অন্য দল এর বিরুদ্ধে। আমাকে দেখতে পেয়ে সবাই খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তাদের ধারণা আমি এর একটা মীমাংসা করে দিতে পারবো। সুতরাং তাদের উৎসাহের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে আমাকে একটি ছোটখাটো বক্তৃতাই দিয়ে ফেলতে হলো।

কিন্তু আমার বক্তৃতায় কেউই খুব একটা খুশী হতে পারলেন না। কারণ এতে বিষয়টির গুরুত্বই নষ্ট হয়ে গেলো। কেননা তাঁরা জানতে পারলেন যে, ব্যাপারটি আসলে কিছু সংখ্যক খৃষ্টীয় সাধুসন্তের এবং কুকুরটি তাদেরই সহচর হিসাবে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের বহু আগেই এই ঘটনাটি ঘটেছিলো আর কোরানেও এটি ধর্মের জন্য কষ্ট স্বীকারের একটি উদাহরণ হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ঘটনাটি ধর্মীয় বিশ্বাসের এমন কোনো পর্যায়ে পড়ে না যে, এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া শোভন বলে বিবেচিত হতে পারে!

এর ফলে অনেকে বললেন যে, আমি মূল বিষয়টি এড়িয়ে যাবার জন্যই এসব কথা বলেছি। আবার অনেকে এটি খৃষ্টানী ব্যাপার বলায় মনোক্ষুণ্ণও হলেন। মনে হলো, তাদের ধারণা ছিলো এটি একটি ইসলামী ব্যাপার। কারণ কোরানে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবইতো ইসলামী। আমাদের আলেম সমাজই সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধারণার যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নির্বিচারে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ঘৃণারও সৃষ্টি করে রেখেছেন। ফলে এ সকল বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্বগত ঐতিহাসিক গুরুত্ব একেবারেই লোপ পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে দৃষ্টির প্রসারতাও ঘুচে গেছে।

এ ধরনেরই এক আলোচনার সম্মুখীন হয়েছিলাম গোগে। সেখানে এক পীর সাহেব এসেছেন। তিনি মুরীদদেরকে নামাজের মধ্যে 'হুজুরে কলব'-এর গুরুত্ব বুঝাচ্ছেন। হাদীসে এসেছে, হুজুরে কলব ছাড়া নামাজ হয় না। শব্দটির অর্থ হলো নিবিষ্ট চিত্ততা, একাগ্রতা। কিন্তু তিনি এমন বাহ্যজ্ঞান রহিত একাগ্রতার কথা বুঝাচ্ছেন, যা প্রায় কোনো নামাজীরই হওয়া সম্ভব নয়। কারণ নামাজতো সমাধি নয়, এখানে নিয়ত থেকে আরম্ভ

করে সালাম পর্যন্ত কতোগুলি বক্তব্য আউড়াতে হয়। আর এটি যথাযথ করতে গেলে অন্যদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং পীর সাহেবের কথিত হুজুরে কলব কোনো নামাজীর পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই নামাজীকে বলা হয়েছে. তুমি নামাজে দাঁড়ালে মনে করবে, তুমি যেন আল্লাহ্‌কে দেখছো, আর তা যদি না পারো, তবে ভাববে, তিনিই তোমাকে দেখছেন। ব্যস, এটুক মনে করতে পারলেই যথেষ্ট।

সমবেত মুরীদের পাশে বসে আমি এসব কথাই তাঁকে বলেছিলাম। তিনি চোখ মুদলেন, চোখ খুললেন, আমার দিকে তাকালেন, উপরের দিকে দেখলেন, তারপর 'হুম্' শব্দ করে বললেন, 'এসব জাহেরী ব্যাপার, আমি বাতেনী নামাজের কথা বলছি।'

বাস, এ কথাতেই আমার সব যুক্তিতর্ক আউট হয়ে গেলো!

কিন্তু এবার আমার কী যে হয়েছে, কেবলই নানা ধরনের বিতর্ক এসে সামনে পড়ছে। আসলে এভাবে এর আগে আমি এসব বিষয়ের সংস্পর্শে আসিনি। এক সময়ে যোগ্যতা ছিলো না, পরে সময় ছিলোনা বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেছি। কিন্তু এবার যোগ্যতা ও সময় দুটিই বুঝি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। কারণ তাড়াহুড়ো করে ছুটে যাবার কোনো আকর্ষণ ছিলো না কোথাও। তাই আমুদপুরে এসেও এমনি এক ব্যাপারে জড়িয়ে গেলাম।

আমাদের পাড়ায় শমশের ভাই নামে এক বয়োবৃদ্ধ মুরুব্বী ছিলেন। তিনি নামাজ রোজার চাইতে তামাক পানের ভক্ত ছিলেন বেশি। অন্যপাড়ায় এক পীর সাহেব এসেছেন। তিনি তামাক খাওয়া হারাম এবং হাফপ্যান্ট পরা 'মকরুহ' বলে ফতোয়া জারী করেছেন। কাজেই হাফপ্যান্ট পরা বালক বালিকাসহ তামাকখোর বৃদ্ধরা খুবই বিপদে পড়েছেন। আমি সিগারেট খাই দেখে শমশের ভাই খুব খুশী হলেন। রাতের বেলা আমাকে নিয়ে সেই পীর সাহেবের এক ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁর আগ্রহ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, আমাকে সেখানে কিছু বলতে হবে। আমরা মজলিসে যাবার আগেই ওয়াজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। আমরা গিয়ে শুনলাম, তিনি তাঁর সেই ফতোয়ার কথাই বলছেন। মাঝখানে ওয়াজ থামিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদেরকে দুরুদ পড়তে দিয়ে তিনি কী যেন মুখে পুরলেন। আমি দূর থেকে তাঁর কৌটা দেখেই বুঝেছিলাম, এ আর কিছু নয়, তামাক পাতা। ব্যস, আমি আমার আক্রমণ ধারা রচনা করে ফেললাম। এবার পীর সাহেব ওয়াজ শুরু করতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'হুজুর আমার একটা কথা আছে।'

একথা শুনে হুজুর কেমন থমকে গেলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকেই আমাকে চেনেন। তাই আমাকে দেখে তাদের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেলো। কেউ কেউ আমাকে এগিয়ে গিয়ে হুজুরের পাশে বসার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু আমি সেখানে দাঁড়িয়েই আমার কথা বলতে আরম্ভ করলাম। কারণ হুজুরের নীরব থাকার মধ্যেই আমি আমার অনুমতি পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মোট কথাটা ছিলো, হুজুর তামাক হারাম করার জন্য যেসব কারণ উল্লেখ করেছেন, তা হলো, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এবং অহেতুক অপব্যয়। আমি এর সবগুলিই স্বীকার করি। কিন্তু কথা হলো, তামাক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার পশ্চাতে 'নিকোটিন' নামে যে বিষটি বিদ্যমান, তা তামাকের শুকনো পাতাতেও আছে ; তদুপরি তা চিবুলে যেমন মুখে দুর্গন্ধ হয়, তেমনি তা পয়সা দিয়ে কেনাও অপব্যয়। সুতরাং তামাক হারাম হলে তামাক পাতাও হারাম হওয়া উচিত। কাজেই হুজুর নিজে যেহেতু তামাক পাতা খান, তাই তাঁর মুখে তামাক হারাম হওয়ার ফতোয়া কেমন যেন বেমানান।' ব্যস, এতোটুকু বলেই আমি দম নিলাম।

কিন্তু না, কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমি উৎসাহিত হয়ে হাফপ্যান্ট সম্পর্কে বলতে যাবো, এমন সময় শমশের ভাই উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, না আর কিছু বলতে হবে না, চলো আমরা বেরিয়ে যাই।' একথা বলে তিনি আমাকে টানতে টানতে সভার বাইরে নিয়ে এলেন। আরো বেশ কয়েকজন বেরিয়ে এলেন সেই সঙ্গে। তারপর রাস্তায় আমাকে মাথায় তুলে নাচেন আর কি! বললেন, 'খুব ঠুকেছো তুমি, যাহোক্!'

আমি বললাম, 'তাই বলে তামাক খাওয়াতো আর ভালো ব্যাপার নয়!'

তিনি হাসতে হাসতেই বললেন, 'তা না হোক, তবু এই ব্যাটা হারাম বলবে কেন!'

এ সময়ের আরো একটি জিকির মাহফিলের কথা মনে পড়ছে। তখন এই ময়মনসিংহ অঞ্চলে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মুরীদের সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিলো। এর ফলে মাথায় বাবরী চুল, গায়ে লম্বা পাঞ্জাবী আর হাতে কাঁধ সমান বাঁশের লাঠি নিয়ে রাতের বেলা জিকিরের মাহফিল প্রায়শই জমে উঠতো। এমনি এক মাহফিল জমলো বৈকুরহাটীর বাজারে। ফকির বাড়ির মৌলবী সাহেবের আগ্রহে আমি সেই মাহফিলে যোগ দিয়েছিলাম। উক্ত মৌলবী সাহেবই ছিলেন এই এলাকার খলিফা। তাঁর কাঁদো কাঁদো গলায় নিজেদের পাপের বর্ণনা, তারপর সেই পাপের জন্য জিকির করতে করতে ক্ষমা প্রার্থনা করা, এই-ই ছিলো মাহফিলের মূল করণীয়। আমি এর নীরব দর্শক ছাড়া কিছু হতে পারিনি। কারণ পুরো ব্যাপারটিই আমার কাছে কেমন যেন আদিখ্যেতা বলে মনে হয়েছে। পরে তবলিগী জামাতেও এ ধরণের ব্যাপার দেখেছি। কিন্তু এখন সে কথা থাক।

এভাবেই পথে পথে তর্কবিতর্ক করে আর পাপীদের আহাজারি দেখে মনের ভার অনেকটা কমিয়ে ফেলে আমি খরিচা এসে পৌছলাম। কারণ পথে যতো দেরীই করি, এখানে আমাকে আসতেই হবে। কিন্তু যে কারণে দেরী করেছিলাম, আসা মাত্রই তার সম্মুখীন হলাম। দেখলাম, আমার শ্বশুর যেন শুকিয়ে আধেক হয়ে গেছেন। কেমন ছন্নছাড়া হাবভাব। আমিও বুঝি ফজিলতের জন্য এতোটা ব্যথিত হতে পারিনি। তাছাড়া আমার নতুন শ্বাশুড়ীও সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। তিনি কিছুতেই এখানে মানাতে পারছেন না। আমার শ্বাশুড়ী আরো কাহিল হয়ে পড়েছেন। আমার নানা শ্বশুর শয্যাশায়ী, মুমূর্ষু

অবস্থা। যে বাড়িটি কিছুদিন আগেও আনন্দে ভরপুর মনে হতো, সেখানে আজ চারদিকেই নিরানন্দ, হাহুতাশ!

সুতরাং আমার মন আবার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, বুটলু সারাক্ষণ আমার পিছে পিছে আছে। একবার সে আমার গায়ে হলুদ দিতে এসে আছাড় খেয়েছিলো, কিন্তু এরপর চুন দিতে এসে সে জড়িয়ে গেছে। আমি যখন নীরব হয়ে বসে থাকি, তখন অদূরে দাঁড়িয়ে সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে দেখে, আমি কাঁদছি কিনা। আমি যখন কাগজ কলম নিয়ে কিছু লিখতে থাকি, তখন সে উঁকি মেরে দেখে নেয়, আমি আত্মহত্যার আগে লেখার মতো কোনো চিঠি লিখছি কিনা!

ফজিলতের সাথে সেও বুঝি টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিলো, কিন্তু ভালো হয়ে গেছে। এর ফলে মনে হয়, সে যেন বেশ কিছু লম্বা হয়ে গেছে। বয়সতো আর কম নয়, নয় পেরিয়ে দশে পড়েছে। ইতিমধ্যেই হাফপ্যান্ট ছেড়ে সে সেলোয়ার কামিজ পরতে আরম্ভ করেছে। কাজেই এখন আর তাকে বুটলু বলে ডাকা সম্ভব নয়। তার নাম সায়িদা, সৌভাগ্যবতী।

কিন্তু এবারতো আমাকে ঢাকায় ফিরতে হয়। কারণ শেষ প্রতিযোগিতায়তো আমাকে নামতেই হবে। সুতরাং ক্লাস যেমনই করি, প্রস্তুতির ধারা অব্যাহত রাখতেই হবে। বলতে ভুলে গেছি, আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র হয়েও আরো একটা ব্যাপারে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মৃত্যুর টেলিগ্রাম এসে আমাকে এমনই ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো যে, সে কথা বলার আর সময় পাইনি। আমি ইউ.ও.টিসিতে যোগ দিয়েছিলাম। আমার সাথে মাদ্রাসার আর কোনো ছাত্র এতে যোগ দিয়েছিলো কিনা, এখন আর মনে পড়ছেনা। সেই যে আমার ফুলপ্যান্ট পরে ক্লাস করার কথা বলেছিলাম, ওর সাথে এই ব্যাপারটির একটা যোগসূত্র আছে।

মাদ্রাসার নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দেখে নেহাৎই খেয়াল খুশিতে গিয়ে রিক্রুটিং লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ রিক্রুটিং অফিসারের হাতে বুকে থাপ্পড় খেয়ে আর মুখে 'সাবাশ' শব্দ শুনে কেমন উত্তেজনা অনুভব করলাম। মনে মনে বললাম, দেখা যাক্না, রাইফেল দিয়ে গুলি ছোঁড়ার আনন্দতো অন্ততঃ পাওয়া যাবে! কিন্ত এতো রীতিমতো মিলিটারী ট্রেনিং। তাই আটঘাট বেঁধে অগ্রসর হতে হলো। এখন যেখানে 'এটমিক এনার্জি সেন্টার', সেখানেই আমরা পা চালনা শিখলাম। এরপর স্ত্রীর মৃত্যুর ফলে কিছুদিন আমার ব্যাঘাত হলো। কিন্তু রেকর্ড ভালো ছিলো বলেই ময়নামতীর এ্যানুয়াল ক্যাম্পে যাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। কিন্তু গিয়ে বুঝি বিপদেই পড়ে গেলাম। হঠাৎ করে মিলিটারী কায়দার ক্যাম্প জীবন। সকাল সাড়ে চারটায় উঠে বিছানাপত্র সব গুছিয়ে প্রাতঃক্রিয়া সেরে হাত মুখ ধুয়ে পাঁচটায় ফল্ইন। তারপর ডিম কলা সহযোগে এক মগ চা খেয়ে পিটি করতে যাওয়া। সেখান থেকে ফিরে খেয়ে ক্লাসে যোগদান। দুপুরের পর গা ধুয়ে খেয়ে ঘুম। বিকালে বেড়ানো। সন্ধ্যার পর ফল্ইন। তারপর খেয়েদেয়ে দশটার সময় বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়া।

নিতান্তই ছকবাঁধা ব্যাপার। কাঁটায় কাঁটায় নির্দেশমতো সব কিছু করতে হবে। তারপর এলো লংরোড মার্চ, বুটপট্টি সহ পনেরো মাইল যাওয়া ও ফিরে আসা। নাইট মার্চ, রাতের অন্ধকারে গড় খাদ ভেঙে পাইলটের পিছুপিছু এগিয়ে চলা ; বিড়ি সিগারেট নেই, উহ্ আহ্ শব্দ নেই। মক্ ফাইট, রীতিমত যুদ্ধের মহড়া ; উঁচু থেকে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়া কিংবা ক্রলিং করে এগিয়ে গিয়ে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। সব শেষে শুটিং, নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা টারগেটের উপর রাইফেল থেকে গুলি ছোঁড়া। এ সবের মধ্যে ধমক খেয়েছি, ডবল মার্চ করেছি এবং নিজের ইচ্ছায় গোছল করতে গিয়ে কোয়ার্টার গার্ডও খেটেছি-বুটপট্টিসহ চব্বিশ ঘণ্টার পাহারাদারি।

এর মধ্যেই দেখলাম যে, ব্রেন, স্টেন, রাইফেল চালনা ও এদের মেকানিজম বেশ কিছুটা শিখে ফেলেছি। কিন্তু এ সবের জন্য পনেরো বিশ দিনে পরিশ্রম যা করতে হয়েছে, তাকে অমানুষিক আখ্যা দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। শেষের একরাতে 'ক্যাম্প ফায়ার' হলো। তৎকালীন সিএন সি মেজর জেনারেল আইউব খান ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে সেই ক্যাম্প ফায়ারে যোগ দিলেন। রাত দুটা পর্যন্ত হৈ হৈ আর আমোদ স্ফুর্তি করে কাটলো। তারপর ঢাকায় ফিরে এলাম।

সাথীদের মধ্যে কারোর নামই আজ আর মনে নেই তবে আরেকজন গোলাম ছামদানী এবং এক বেঁটে খাটো সাথীকে 'লিলিপুট খায় বুট' বলে খেপানোর কথা মনে পড়ছে। এই ট্রেনিং নানা কারণেই আমার জীবনে আনন্দ বেদনার উৎস হয়ে আছে। জীবনের একটা বিশেষ দিক দেখার আনন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে স্বাস্থ্য ভঙ্গের বেদনা। তা না হলে হয়তো এই ট্রেনিং আমি আরো দীর্ঘদিন অব্যাহত রাখতে পারতাম।

কিন্তু ঢাকায় ফিরে এসে মনে হলো, আমি যেন দেহমনে নিঃশেষ হয়ে গেছি। মনতো আগেই গিয়েছিলো, এবার দেহটিও গেলো। খেয়ালের বশে কেন যে রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে গিয়েছিলাম! তেমনি মনে হলো, গোয়ার্তুমি করে কেন যে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম!

রুমে বসে এসব নিয়েই বাকীর সাথে আলাপ করছিলাম। সে বললো, 'তুমিতো বৌকে দেখতেই দিলে না। দেখার আগেই লুকিয়ে ফেলেছো। চলো, তার কবরটাই জিয়ারত করে আসি।'

এই আরেক ছেলে, নোয়াখালী বাড়ি। কিন্তু বারবার তাঁর আন্তরিকতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। যেন কাতলাসেনের সেই লুৎফুর। জড়িয়ে ধরে মন প্রাণ ভরিয়ে দেয়। তাই তাকে নিয়ে খরিচা আসতে বাধ্য হলাম। এসে দেখি আমার নানা শ্বশুর লোকান্তরিত হয়েছেন। আমি ময়নামতি থাকায় জানতে পারিনি। আমার শ্বাশুড়ী আগের চাইতেও কাহিল হয়ে পড়ায় এবার তাঁর অপারেশন করানোর ব্যাপারে আলাপ হচ্ছে। আমার নতুন শ্বাশুড়ী বাপেরবাড়ি গিয়ে আর ফিরেনি। শুধু সায়িদাকে দেখলাম নতুন রূপে। সে শাড়ী পরে একাদশী হয়েছে। আমার সামনে আসতে তার রাজ্যের লজ্জা!

মাত্র মাস খানেক আগে যাকে দেখে গিয়েছিলাম বালিকা এবং যে নির্বিবাদে আমার সাথে গিয়ে ময়মনসিংহ শহরে পূজার মণ্ডপ দেখে এসেছে, সে এখন কিশোরী হয়ে উঠেছে!

অবশ্যি ইতিমধ্যে আমি 'বিয়ে করবো না, বিয়ে করবো না' বলে এমন সব প্রতিজ্ঞা করেছি, যার অর্থ সে ঠিকই বুঝতে পেরেছে। এর ফলে তার ছোট্ট মনটিতে অভিমান হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ ইতিপূর্বে তার সাথেই আমার বিয়ের কথা হয়েছিলো। সে তখন নিতান্তই বালিকা। তবু এই জন্য সে পারতপক্ষে আমার ছায়া মাড়ায়নি। এরপর আমি তাকে ফেলে তার বড়ো বোনকে বিয়ে করলাম। তখনো সে শালীর দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়নি। যতোটা সম্ভব দূরে দূরেই থেকেছে। এরপর বড়ো বোন হঠাৎ চলে গেলো। এর ফলে দুলাভাই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলো। তার বালিকা মন এই বিয়োগ ব্যথা যে বুঝতে পারেনি, তাতো নয়। তাই সে সহানুভূতি নিয়ে কাছে এগিয়ে এসেছিলো, কিন্তু দুলাভাই বোনের স্মৃতিতে এমনি মগ্ন যে, তার দিকে ভালো করে ফিরে তাকায়নি। সে তার অনেক আবদার রক্ষা করেছে, তবু সে বারবার বলেছে বিয়ে করবে না। কাজেই সেকি এমনি নির্লজ্জ যে এরপরও হ্যাংলার মতো তার পিছু পিছু ঘুরবে!

না, মেয়েরা এ ব্যাপারে বড়ো সচেতন। আর আমার বু অর্থাৎ নানী শ্বাশুড়ীও বুঝি তার মন কিছুটা নষ্ট করে দিয়েছেন। কারণ বু'র ধারণা, আমি অন্য কারো প্রেমে পড়েছি। সে কাছেই হোক বা দূরেই হোক, কোথাও না কোথাও আছে। তা না হলে যে বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে এমনভাবে শিকার ধরতে অস্বীকার করবে কেন! এ নিয়ে বু'র সাথে আমার কথা কাটাকাটিও হয়েছে। সায়িদা এ সব কথা যে শুনেনি, তা নয় ; কাজেই তার মন বিগড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

যাহোক, বাকীর সাথে এসে আমি এইসব কাণ্ড দেখে অবাক। যদি সে সহজভাবে আমার সামনে আসতো, কথা বলতো, তাহলে আমি এমনভাবে ভাবতাম না। কিন্তু তার এই হঠাৎ পর্দানশীন হওয়ার ব্যাপারটাই আমাকে ভাবিয়ে তুললো। আর আমার শ্বশুরও সেই ভাবনাকেই বাড়িয়ে তুললেন। তিনি হঠাৎ আমার নামে ও সায়িদার নামে এক সাথে কিছুটা জমি কিনে বসলেন। আমি বোধ হয়, আগের যাত্রায় আমার বৃত্তির দেড়শ টাকা তাঁর হাতে এনে দিয়েছিলাম, সেই দেড়শ'ই দেড় হাজার হয়ে জমি কেনা হয়ে গেলো।

কিন্তু আমি এর ফলে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঢাকায় ফিরে গেলাম। এ এক নতুন চিন্তা; আমার শ্বশুরের ইচ্ছা এর চাইতে স্পষ্ট আর কী হতে পারে! বড়ো ভাই মানে কাজী সাহেব একদিন ঢাকা এসে সে কথাই আমাকে বুঝিয়ে গেলেন। আমি মহাভাবনায় পড়লাম, কী করবো আমি! শুনেছি আমার নতুন শ্বাশুড়ী অন্তঃস্বত্তা। সেখানেই বা কী অপেক্ষা করছে, কে জানে! কিন্তু যাই হোক একটা সিদ্ধান্ত আমাকে নিতেই হবে এবং যথা সম্ভব শীঘ্রই।

কিন্তু তিপান্নর এই শেষ পর্যায়ে ঢাকা শহর বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। নানা স্থানে সভা সমিতি হচ্ছে। একদিন গেলাম আরমানিটোলা ময়দানে শেখ মুজিবের বক্তৃতা শুনতে। নামতো আগেই শুনেছিলাম, কিন্তু বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য হয়নি। বেশ উদাত্ত কণ্ঠস্বর, বক্তব্যে নাটকীয় ভঙ্গি আছে। কিন্তু পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতাই ছিলো সব চাইতে আকর্ষণীয়। আবেগে তেজস্বিতায় সে সব বক্তৃতা তৎকালে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগ হয়েছে এবং যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে মুসলিম লীগের বিরোধিতার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে।

এসব বক্তৃতা শোনার মাধ্যমে আমার অন্তর্মুখিনতা তখন অনেকাংশে দূর হয়ে গেছে। এ সময়ের দুয়েকটা ঘটনা তাই আমার স্মৃতিকে বেশ আলোড়িত করেছিলো। একদিন নবাবপুর রোড দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি সামনে একটা জটলা। কে একজন বললো, হজরত আলী (রাঃ)-র ছবি বিক্রি করছিলো, পুলিশে ধরেছে। সামনে এগিয়ে গেলাম, হজরত আলীর ছবিটা অন্ততঃ দেখা দরকার। গিয়ে দেখি একটি লোক, খুব সম্ভব বিহারী হবে, তার হাতে কয়েকটি ছবি। দুজন পুলিশ মূলতঃ তাকে জনতার হাত থেকে রক্ষা করছে। আমি ছবিটি দেখতে চাইলে পুলিশ দুজন কী মনে করে আমাকে তা দেখালো। দেখলাম, নীচে লেখা আছে 'পাক পাঞ্জাতন'। আমি বললাম, আলীর ছবি কোথায়, এযে পাক পাঞ্জাতনের ছবি। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝতে নারাজ। কারণ ছবিগুলিতো মানুষের ছবির মতোই দেখাচ্ছে।

আসলে পাক পাঞ্জাতন বলতে হজরত মুহম্মদ (সঃ), হজরত আলী (রাঃ), হজরত ফাতেমা (রাঃ) এবং ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) কে বুঝায়। তবে যেহেতু হজরত আলীই শিয়া সম্প্রদায়ের মূল নেতা, তাই তাঁর গুরুত্ব বেশি। আমি যে ছবিটি দেখেছিলাম, সেটি ঠিকই পাক পাঞ্জাতনের। কিন্তু মেঘের উপর ভাসমান হজরত আলীর একটি ছবিও সেখানে ছিলো। শেষ পর্যন্ত পুলিশ দুজন সেই লোকের কোমরে দড়ি বাঁধলো এবং ওয়াইজ ঘাটের সুরক্ষিত পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো। জনতার পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করার জন্য আমাকে নির্বাচিত করা হলো। আরো দুজন লোক সাক্ষী হিসাবে আমার সঙ্গে গেলো। জনতাও চললো আমাদের পিছু পিছু। কারণ তারা এমনি অনৈসলামিক কাজ এদেশে হতে দেবে না।

লোকটিসহ ফাঁড়িতে আমরা কজনই ঢুকলাম। ওসির সাথে আলাপ হলো। তিনি সব শুনে একটি জিডি এন্ট্রি করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর সেই খাতাটিসহ বাইরে এসে আমাদের সামনেই জনতাকে সম্বোধন করে মামলা দায়ের এবং শাস্তির কথা বললেন। আপাততঃ আসামীকে হাজতে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো। কারণ বাইরে গেলে জনসাধারণের হাতে নিঃগৃহীত হবার সম্ভাবনা। এরপর আমাদেরকে চা খাইয়ে তিনি বিদায় দিলেন। জানি না, এ ব্যাপারে পরে কী হয়েছিলো!

বস্তুতঃ এ ধরনের ঘটনা এদেশে প্রচুর ঘটেছে এবং আসামীরা জেল হাজতের মধ্যদিয়ে জান বাঁচিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। অথচ পশ্চিমারা কায়দা পেলেই এদেশের

মুসলমানদের হিন্দুয়ানী আচরণ নিয়ে বিষোদ্‌গার করেছে। শুধু কি ধর্মবোধ, জাতীয়তা-বোধ, দেশাত্মবোধ সবকিছু নিয়েই তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। পরেও এ জাতীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি এবং যথাসম্ভব প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছি।

অন্য ঘটনাটি অবশ্য ভিন্ন ধরনের। একদিন মাদ্রাসায় যাবার পথে শুনলাম, এক লোককে ধরে আনা হয়েছে,সে নাকি নামাজ পড়ে না, নামাজ করে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সে কাছাড়ীর বারান্দাতেই আছে। গেলাম তার কাছে। মাথায় বাবরী চুল, পরণে আলখেল্লা, অল্পবয়সী একজন পীর সাহেব। কয়েকজন শাগরেদও তার সাথে বসা। আমি তাকে নামাজ করার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বেশ বিনয়ের সাথেই বললেন, 'আমরা দোয়া করি, ওটাই আমাদের নামাজ।'

আসলে এধরনের বুজুরকি গ্রাম বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এগুলি মূলতঃ লৌকিক ধর্ম। ইসলামের শব্দাবলী ছাড়া তার গূঢ়ার্থের সাথে এসব ধর্মের কোনো মিল নেই। আবহমান কালের লোক চেতনাই এগুলির উৎস। এগুলির সাথে তাই সেই বিহারীর ছবির ধর্মের যেমন মিল নেই, তেমনি পার্থক্যও নেই। অনেক সময় মনে হয়েছে, এমনি সব ধর্মমতের স্বরূপ যদি সংগ্রহ করা যেতো, তা হলে ইসলামের নামে প্রচলিত বিচিত্র ধর্মের একটি কোষ গ্রন্থই সংকলন করা সম্ভবপর হতো।

কিন্তু এই সামান্য ঔৎসুক্য ছাড়া তখন আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিলো না। কারণ আমার আলীয়ার ছাত্রজীবন তখন শেষ হয়ে আসছে। মওলানা জাফর আহমদ উসমানী থানবী আলীয়া মাদ্রাসা ছেড়ে হায়দরাবাদের টেফুল্লা ইয়ার মাদ্রাসায় চলে গেছেন। এই শেষ বয়সে তিনি একটি বিয়ে করেছেন। সে বিয়েও নাকি ফোনের মারফতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এজন্যই তাঁর সাদাপ্রায় দাড়ি মেহেদী রঞ্জিত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু যাই হোক, আমার হয়েছে অসুবিধা। অনেক কিছু আমার জানার প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার আগেই তিনি চলে গেছেন।

চলে যাচ্ছেন অধ্যক্ষ জিয়াউল হকও। কাশগরী সাহেব তাঁর বিদায় সংবর্ধনা জানিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটির ভাষা আরবি। কিন্তু প্রয়োজনীয় আবেগ তাতে ভাষা পেয়েছে। আবদুল্লা নদবী সাহেব সেই কবিতা পাঠ করার জন্য আমাকে ট্রেনিং দিচ্ছেন। কারণ যথাযথ আবৃত্তি করতে না পারলে ভালো দেখায় না। এভাবে একটা উত্তেজনার মধ্যে আমরা মাদ্রাসার শেষ দিনগুলি কাটাচ্ছি।

ইতিমধ্যে মাদ্রাসার বার্ষিক স্পোর্টস এসেও উপস্থিত হলো। আমি এসব ব্যাপারে খুব একটা উদ্যোগী ছিলাম না। কারণ আলীয়ায় এসে আমি কোনো খেলাতেই যোগ দিইনি। কিন্তু ক্রীড়ার দিনে মাঠে একটা গ্রামোফোন এনে ছাত্ররা এর সাথে আমাকে জড়িয়ে ফেললো। কারণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গ্রামোফোন যাতে না বাজে, সেই কাজে আমি নিয়োজিত হলাম। কেননা এ নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিলো। আমি তারই তদারকি করতে গিয়ে উঠলাম মাঠের পাশেই এক গাছে। কিন্তু উঠা মাত্রই ডাল ভেঙে প্রপাত ধরণীতল। বামহাতে খুব চোট পেলাম। তারই আঘাতে

বমি করে ফেললাম। তারপর মাঠ ছেড়ে সোজা হোস্টেলে। রাতে বা-হাতের কনুই ফুলে ঢোল হয়ে উঠলো এবং বেদনায় আমি ঘুমাতে পারলাম না। বাকী আমার কনুইতে জলপট্টি বেঁধে দিলো এবং রাত জেগে সেবা শুশ্রূষা করলো। কিন্তু সকালে উঠে আশংকাকাতর চিত্তে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতলের আউটডোরে গিয়ে পৌছলাম। সেদিন আউট ডোরের চার্জে ছিলেন ডাঃ লুৎফুর রহমান। তিনি সম্পর্কে আমার মামা হন। কারণ তাঁর বাড়ি সেই কাউরাট, যেখানে আমার মাতুল বাড়ি। আমার ছোট খালুর তিনি খালাতো ভাই। সুতরাং তিনি আমাকে চিনতেন। সব শুনে হাসলেন, বললেন, 'তাহলে গাছে উঠার অভ্যাস এখনো আছে!'

আমি বললাম, 'নেহাৎই প্রয়োজনে উঠেছিলাম, কিন্তু গাছ আমাকে সহ্য করলো না।'

যাহোক, টেনেটুনে দেখে তিনি এক্সরে করানোর নির্দেশ দিয়ে আপাততঃ কিছু ওষুধ লিখে দিলেন এবং সিদ্দিক বাজারে তাঁর শ্বশুরালয়ে যাবার কথা বললেন। তিনি লায়লা আরজুমান্দ বানুর ছোট বোন মালেকা পারভীন বানুকে বিয়ে করেছিলেন।

এভাবে আমি হাত ভেঙে পড়ে থাকায় কবিতা পাঠ থেকে বাদ পড়লাম। কিন্তু ঠিক হলো অধ্যক্ষ সাহেবের বিদায় সংবর্ধনায় আমি ছাত্রদের পক্ষ থেকে কিছু বলবো। প্রধান মৌলবী তখন আমিনুল এহসান সাহেব। তিনি আমার বক্তব্য রাখার সময় হঠাৎ আরবি ভাষার কথা বলে বসলেন। জানিনা তাঁর মনে কী ছিলো, কিন্তু আমি দায়সারা গোছের কিছু বলে সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলাম। তবে একটা ব্যাপার হাড়ে হাড়ে টের পেলাম যে, অনভ্যাস মানুষের পাণ্ডিত্যকেও অকেজো করে দেয়। তা না হলে আমি পরীক্ষার খাতায় এমনভাবে আরবি লিখতে পারি, কিন্তু বলতে গেলে এমন আড়ষ্ট হয়ে উঠি কেন! তার কারণ আরবি বলার অভ্যাস আমার ছিলো না। আচমকা তাই একে একটা আঘাত বলেই মনে হয়েছে।

যাহোক, জিয়াউল হক সাহেব বিদায় হলে এবার অধ্যক্ষ হয়ে এলেন শরফুদ্দিন সাহেব, তিনি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আবদুল্লাহ আল-মুতীর পিতা। তখন তিনি জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আলীয়া মাদ্রাসার এই পদটি সরকার সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

এ সময়ে আমাদের নির্বাচনী পরীক্ষা হয়েছিলো কিনা মনে পড়ছেনা এবং হয়ে থাকলেও তার ফলাফল কেন জানি আমার স্মৃতিকে এড়িয়ে গেছে। এর কারণ এ সময় আমার চেতনায় একটি কিশোরীর পদচারণা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। সে যতোদিন অস্পষ্ট ছিলো ভালোই ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ সে স্পষ্ট হয়ে উঠায় বিপদে পড়ে গেলাম। কারণ তাকে না পারলাম পুরোপুরি তাড়িয়ে দিতে আর না পারলাম পুরোপুরি গ্রহণ করতে। সে আমার কণ্ঠদেশ ধরে ঝুলতে লাগলো।

আমাদের হোস্টেলে বাঁদরে প্রায়ই উৎপাত করতো। পুরানো ঢাকায় এ উৎপাত এখন আছে—কিনা জানি না। কিন্তু তখন অনেক এলাকাতে কাকের চাইতেও বেশি

করে এদের আনাগোনা দেখা যেতো। একদিন দেখলাম একটি বানরী তার শিশুর লাশ এক হাতে চেপে ধরে অন্য হাতে দেয়ালের কার্নিশ বেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। বাচ্চাটি কবে মরে গেছে তার খেয়াল নেই, ঘাড়টা প্রায় ছিঁড়ে গেছে, তবু ফেলে দেয়নি। আমিও বুঝি তখন এমনি করে ফজিলতের স্মৃতি বহন করছি। কিন্তু এই কিশোরীটি সেই স্মৃতি ধরে টানাটানি করছে। ঘাড়ছেঁড়া সেই স্মৃতিকে সে ফেলেই দেবে বুঝি।

হ্যাঁ, তাই হলো। তবে স্মৃতিতো এমনিতেই পুরানো হয়ে আবর্জনা স্তূপে ঠাঁই পায়। কিন্তু তা যে এতো তাড়াতাড়ি হবে, তাই বুঝা যাচ্ছিলো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বু'র সেই কথাই ঠিক হলো, যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে শিকার না ধরে থাকতে পারে না। কারণ মানুষের অভ্যাসই অনেক সময় তার প্রভু হয়ে দাঁড়ায়।

আয়োজনের খুব একটা বালাই ছিলোনা। সবই বলতে গেলে আছে, এমন কি কাবিনটি পর্যন্ত। ফজিলততো কিছুই সাথে নিয়ে যায়নি। সুতরাং আমি আবার আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে আমার অনিবার্যতার কথা বলে সবাইকে উপস্থিত থাকতে বললাম। এবার তাঁদের কী মনে হলো জানি না, তাঁরা প্রায় সবাই এসে উপস্থিত হলেন। পাছপাড়ার খালু, নয়াবাড়ির নুরু ভাই, গোগের চাচাজী, আমার ভগ্নিপতি এবং আমুদপুরের মোগল ভাই সবাইকে এক সাথে পেলাম এই বিয়েতে। আরেকটি বাড়তি আপদও জুটলো। গ্রামে তখনো রেডিও গিয়ে পৌছেনি। আমার মামা শ্বশুররা মাইকসহ একটি রেডিও ভাড়া করে নিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য, এতে আমার সায় ছিলো। বাইরে বাড়ির উত্তর দিকে সেটি ফিট করা হলো এবং সে খবর গান ইত্যাদি শুনিয়ে কিছু সংখ্যক শ্রোতার মনোরঞ্জন করলো। কিন্তু আমার শ্বশুরের মামাতো ভাই মৌলানা মিয়া হুসেন, খরিচার মৌলানা নুরুদ্দিন প্রমুখ অনেকেই এর বিরোধিতা করে বিয়ের আসর থেকে উঠে চলে গেলেন। আমার শ্বশুর, এমনকি আমি তাঁদেরকে অনুরোধ জানালাম, কিন্তু তাঁদের এককথা, যে বাড়িতে রেডিও বাজিয়ে গান বাজনা শোনা হয়, সেখানে কোনো অনুষ্ঠানে তাঁরা যোগ দিতে পারেন না। আমি, এখনি সব বন্ধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম, কিন্তু তাঁদের পবিত্রতা কিছুতেই এই অপরাধ ক্ষমা করতে পারলোনা। হায়, আজকেতো ঘরে ঘরে রেডিও বাজছে, আজ তাঁরা কী ভাবে কী করছেন, আমি জানি না।

যাহোক, মৌলানা সাহেবরা দল বেঁধে চলে গেলেও বিয়ে আটকালোনা। যথা সময়ে সায়িদা খাতুনের সাথে আমার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হলো। সেই যে প্রথম দেখার দিন বলেছিলাম, তার সাথে আমার 'শা নজর' হয়ে গেছে, অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সেটুকুই বুঝি সত্যে পরিণত হলো। আমার একমাত্র শ্যালিকা আমার স্ত্রী হলেন।

বস্তুতঃ ওর বিয়ের অন্য সব দিক এখন আর মনে পড়ে না। যদ্দূর মনে হয়, খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে বুঝি আমি ওগুলি অনুভবও করিনি। প্রথম বিয়ের উত্তেজনাতো বছর খানেক আগেই চলে গেছে। আমার শ্বশুর বাড়ি তখন একটা আধমরা মেয়েকে বুঝি আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলো, আমি ধরতে না ধরতেই সেটি টুপ করে ঝরে পড়ে

গেলো। এবার সেই ক্ষতিপূরণ পুষিয়ে দিতেই এই মেয়েটিকে গছিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই এর জন্য একটা পৃথক কাবিন করার কথা পর্যন্ত কেউ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি। না, আমার শ্বশুর পর্যন্ত এনিয়ে কোনো কথা বলেননি। তাই আমি সব শেষ হলে আমার নির্ধারিত বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। অনেক রাত্রে ভীরু পায়ে একটি কিশোরী এসে সেখানে প্রবেশ করলো, সে আর কেউ নয়, আমার প্রিয় শ্যালিকা।

কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম, সায়িদা মানে সৌভাগ্যবতী। সত্যি মেয়েটির সৌভাগ্য আছে বলতে হবে। আমার শ্বাশুড়ী এতোদিন ধরে রোগ ভোগ করছিলেন, এবার ডাঃ মুখলেসুর রহমানের হাতে অপারেশনের মাধ্যমে তিনি রোগমুক্ত হলেন। আমার নতুন শ্বাশুড়ী অন্তঃস্বত্তা ছিলেন, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেলেন। আর আমি, আমিও বুঝি—না, সে কথা এখন থাক। যথা সময়েই তা বলা যাবে।

এদিকে আমার ফাইনাল পরীক্ষার মাত্র এক সপ্তাহ বাকী। ফজিলতের বিয়ের সময় অন্ততঃ দু-চারটি কিতাব ছিলো সাথে। কিন্তু এবার তাও নাই। কারণ ইয়া বড়ো বড়ো হাদীসের গ্রন্থ সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো খুব সহজ নয়। এ কারণেই আমার এই দিনগুলি কিতাবের সাহচর্য ছাড়াই কেটে গেছে। তবে ফলাফল যাই হোক, পরীক্ষাতো দিতে হবে।

হোস্টেলে গিয়ে তো পৌছলাম। কিন্তু এই কয়দিনে কী যে করতে পারবো, কিছুই বুঝতে পারছিনা। তবু আর কিছু নয়, শুধু পাঠ্যসূচীর আগা পাছতলা একবার চোখ বুলিয়ে যাওয়া। কিন্তু একদিন একরাত যেতে না যেতেই আমার মাথা কেমন যেন গরম হয়ে উঠলো। কিতাবের পাতায় চোখ খোলা আছে ঠিকই, কিন্তু মাথায় কিছুই ঢুকছেনা। ঘুমাতে চাইলাম, তাও আসছেনা। কিছুক্ষণ পরে মনে হলো, মাথাটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আমি নিরুপায় হয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। বাকী বোধ হয় ঘুমাবার চেষ্টা করছিলো। আমার কান্না শুনে উঠে এলো। তারপর আশেপাশের রুম থেকে আরো দুচারজনকে ডেকে এনে শেষতক আমার মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করলো। বেশকিছুটা আরাম পেলাম। মাথা মুছিয়ে বাকী আমার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলো। ক্রমশ আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন থেকে খুব সাবধানে গা বাঁচিয়ে কিতাবে চোখ বুলাতে আরম্ভ করলাম। এরপর আর কিছু বলতে পারবোনা। ক'দিন যে পরীক্ষা হয়েছে, আর কীই যে আমি পরীক্ষা দিয়েছি, কিছুই আমার মনে নেই। যে দিন পরীক্ষা শেষ হলো, বাকীকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'বিদায়, বন্ধু। অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে, মনে রেখো।'

আমি আবার চরখরিচা ফিরে এলাম। করার মতো কাজ কিছুই নেই। দোকানে একজন কর্মচারী আছেন, নাম হাফেজ কোব্বাদ। তবু সেখানে মাঝে মাঝে বসি। আর মুসলিম ইনস্টিটিউট থেকে তিন চারটা করে বই নিয়ে আসি। অধিকাংশই উপন্যাস, জীবনের বিচিত্র দিক উদ্‌ঘাটিত হয়। মাঝে মাঝে বড়ো ভাই এসে যোগ দেন। একবার তো 'স্বয়ং সিদ্ধা' নামের একটি উপন্যাস শুনতে আমার শ্বশুরও এসে যোগ দিলেন।

নতুন একজন পাঠিকা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছিলো, কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষা দেবার আগেই সংসারে ঢুকে পড়েছে। তবে উপন্যাস ভালোই পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই তার শ্রোতার একটি দল গড়ে তুলেছে। কাজী বাড়ির বুড়ো বুড়ীরা যে উপন্যাস শুনতে এতো ভালোবাসে তা আগে জানা ছিলো না। এবার নতুন পাঠিকার উদ্যোগে তাঁদের আগ্রহে যেন বান ডাকলো। সেই বানে আমিও ভেসে গেলাম।

আসলে এ সময়ে এমনি উপন্যাসের পঠন পাঠন ছাড়া অন্য কোনো তত্ত্ব পুস্তক যেমন আমি পড়তে পারিনি, তেমনি আমার আত্মপ্রকাশের কোনো তাগিদও আমি অনুভব করিনি। হায় রে, আজ ভাবি, কোথায় গেলো সেই পাঠক! কী নিরলস একাগ্রতা নিয়েই না একেকটি উপন্যাসের জীবন চিত্র সে আত্মস্থ করেছে! তথ্য ও তত্ত্ব পুস্তকের নিরস নিরুত্তাপ বক্তব্যের চাইতে এ যেন জীবনের সজীব হাসি কান্নায় ভরপুর। এখানে যে তত্ত্ব নেই, তথ্য নেই, তাতো নয়; বরং যতোটুকু প্রয়োজন, ততোটুকুই আছে। তাই এই তত্ত্ব বা তথ্য সত্তার চেতনার উপর ভার চাপিয়ে দেয়না; বরং সহজপাচ্য খাদ্যের মাতোই তা অতিসহজে চেতনার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। আমার এই উপন্যাস পাঠের আনন্দ তাই আমার চেতনার দিগন্তকে কেবলই সম্প্রসারিত করেছে। আমি সর্বধর্মের মানুষকে জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি, তাদের সাথে একাত্ম হতে পেরেছি।

আরো একটি ব্যাপার এখানে উল্লেখ না করে পারছিনা। আমি তো আলীয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। তাই আমার এই উপন্যাস পাঠ যে অর্থে আমার শ্বশুরের নিকট একটা গর্হিত কাজ বলে গণ্য হতে পারতো, দেখলাম, তিনি সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নির্বিকার। বরং আগেই বলেছি, তিনি কোনো কোনো সময় শ্রোতার দলেও আসন গ্রহণ করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর রুচি ও উদারতার পরিচয় বলে আমি মনে করি। ইতিপূর্বেও আমি তাঁর মধ্যে এর পরিচয় পেয়েছি। আমার প্যান্ট সার্ট পরা চানপুরের মৌলবী সাহেবের কাছে গর্হিত বলে মনে হলেও আমার শ্বশুর এনিয়ে কোনো কথা বলেননি। সায়িদার বিয়ের দিন রেডিও নিয়ে আলেমরা বিচিত্র সব কথা বললেও তিনি এর বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করেননি। শুধু এর খরচের টাকা দিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। এর ফলে তাঁরা অর্থাৎ আমার মামা শ্বশুররা খুবই মনোক্ষুন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু তা হলেও তাঁকে সেই গোঁড়া আলেমের দলে কিছুতেই ফেলা যায় না। আজ তিনি জীবিত নেই, থাকলে আমার বর্তমান অবস্থাকে তিনি কীভাবে নিতেন, আমি জানিনা। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি আমার স্বাধীন চলাফেলায় হস্তক্ষেপ করতেন না। কারণ উদারতা আর গোঁড়ামির ধর্মই পৃথক্; একটি প্রসারিত হয়ে অন্যের ঠাঁই করে দেয়, আর অন্যটি সংকুচিত হয়ে নিজেকেই বিপন্ন করে তোলে। কারণ এ সংসারে অন্যকে ঠাঁই না দিলে নিজেরও ঠাঁই হয় না।

এ প্রসঙ্গে কাজী সাহেবের কথাও বলতে হয়। তিনিও এমনি উদার রুচির অধিকারী ছিলেন। তিনি আলেম নন, ইংরেজি শিক্ষিত; কিন্তু দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্টগিরি করে জীবনের বিচিত্র দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ধর্মীয় চেতনায় পীরভক্তির

একটা টান ছিলো, কিন্তু আমার সাহচর্যে এসে সে দিকে তিনি আর যেতে পারেননি। আমি যেদিন তাঁকে জালালখাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি শোনালাম, সেদিন তিনি অবাক হয়ে গেলেন। উক্তিটি হলো, 'আয়নায় যারে চাইয়া দেখো, সেইতো তোমার পীর।' তিনি বললেন, ঠিকই তো, আয়নাইতো আমাকে বলে দেয়, আমি মানুষ, আমাকে মানুষের মতো চলতে হবে। এ সত্ত্বেও তিনি পাক্কা নামাজী ছিলেন। আমার বর্তমান অবস্থা তিনি কিছুটা দেখে গেছেন, তবু তাঁর কোনো বিরূপ মন্তব্য ছিলো না। কারণ আমার সংস্পর্শে এসেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পৃথিবীটা আমাদের সাধারণ ধারণার চাইতে অনেক বড়ো, অনেক জটিল। এই যে তাঁর উপলব্ধির ক্ষমতা, এর মধ্যেইতো তাঁর চিত্তের উদারতার প্রমাণ রয়েছে।

সে তুলনায় আমার নানা শ্বশুর ছিলেন নেহাৎই সরল সোজা ভালো মানুষ। নামাজ রোজা নিয়ে তাঁর যেমন কোনো আদিখ্যেতা ছিলো না, তেমনি তিনি কোনো অন্যায় করার প্রশ্রয়ও দিতেন না। তাঁর এই একগুঁয়ে সরলতাকে তাঁর বড়ো ভাই কাজী সাহেব পর্যন্ত ভয় করতেন। অন্যদিকে স্ত্রীর প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতা ছিলো দর্শনীয়। দীর্ঘকাল এই গুঁজা বুড়ীকে নিয়ে তিনি জীবন কাটিয়ে গেছেন; ঘুনাক্ষরেও অন্য বিবাহের কথা বলেননি।

এমনি একটা ব্যক্তিত্বের পরিবেশ আমার স্বাধীন চিন্তার বিকাশে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেছে, তা না হলে এমন ভাবে আমি বদলে যেতে পারতাম না। বাধা আসতো, কুৎসা প্রচার হতো, কতো কিছুইতো হতে পারতো। কিন্তু তাঁদের উদারতাই আমাকে আমার ব্যাক্তিত্বের পূর্ণতা সাধন করতে দিয়েছে। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এভাবেই আমার মাদ্রাসা জীবনের অন্তিম কাল এসে উপস্থিত হলো। আর আমি সকলকে অবাক করে দিয়ে 'মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন' টাইটেল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হলাম। শিক্ষক ইসমাইল হোসেন সাহেবের লেখা একটি পোস্টকার্ড এই আনন্দ সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো। আমার শ্বশুর তখন আমার পাশেই ছিলেন, আমি পোস্টকার্ডটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি প্রথম লাইনটি পড়েই চীৎকার করে উঠলেন, 'সায়িদা, সায়িদা।' সত্যি মেয়েটি সায়িদা, সৌভাগ্যবতী।

দ্বাদশ তরঙ্গ ॥

আমার জীবন কাহিনী একটা মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৫-এ অন্য এক মোড় থেকে যে পথে সে যাত্রা শুরু করেছিলো, এখন এই মোড় থেকে অন্য পথে তার যাত্রা শুরু করতে হবে। এই পথ ইংরেজি শিক্ষার পথ, আধুনিক শিক্ষার পথ। যেভাবে জীবনকে আমি এতোদিন দেখেছি, যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, সেই যেন নির্দেশ দিচ্ছে, এখানে থামলে চলবে না। এগিয়ে যাও, শিক্ষার এই ধারাটাও তোমাকে দেখে নিতে হবে। জীবন সম্পর্কে যে প্রশ্ন তোমার মর্মমূলকে নিষ্পেষিত করছে, তার উত্তর তোমাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াতে হবে। সুতরাং চরৈবেতি ঃ- এগিয়ে যাও।

কিন্তু এই মানসিক তাগিদের সাথে অন্য একটি বাস্তব তাগিদও ছিলো, সেটি অর্থনৈতিক। কারণ আমি যে লেখাপড়ার পাট এই মাত্র চুকিয়েছি, তাকে সাধারণ ভাবে 'ফকিরা পড়া' বলেই ডাকা হতো। কারণ এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা প্রায় ফকিরের মতোই মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকে। অবশ্যি আমার কথা স্বতন্ত্র। কারণ আমার সার্টিফিকেটের বাজার মূল্য ভালোই আছে। ইচ্ছা করলে আমি আলীয়া মাদ্রাসাতেও ঠাঁই করে নিতে পারি। কিন্তু সাধারণ অবস্থাতো তা নয়। আর জীবনের চাহিদাতো শুধু এতোটুকুতেই শেষ হয়না। তার চাওয়া অফুরন্ত আর পাওয়া অতৃপ্তিকর।

তাছাড়া শিক্ষার্থীর পথ চলাতো কখনো শেষ হয় না। তার চলার পথ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠান পেরিয়ে চলে গেছে দূর দিগন্তের দিকে। শিক্ষার্থীই তার চাহিদা মতো সে পথে এগিয়ে যায়। অভিভাবকরা শুধু তার পাথেয় সংগ্রহ করে দিতে পারেন। কিন্তু পথ চলতে হয় শিক্ষার্থীকেই। সেই ইচ্ছা যদি থাকে, তাহলে পাথেয়ের অভাব হয় না। আর সে ইচ্ছা না থাকলে, কেবল পাথেয়ের বোঝাই সার হয়, পথ চলা আর হয়না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই আমি এই সত্য উপলব্ধি করেছি। আমার অবস্থাই বলে দিচ্ছে, এই-ই সত্যি।

সুতরাং আমার নতুন পথ চলায় আমার অভিভাবকের কোনো আপত্তি ছিলো না। আর তিনি আপত্তি করবেনই বা কেন। জোর করে ঢাকায় গিয়ে আমিতো ভালোই করেছি; কাজেই এবারও আমি যে পথে যাচ্ছি, সেখানে ভালোই হবে। তাছাড়া ইংরেজি লেখাপড়া ; না, তাঁর সে বিষয়ে কোনো আপত্তি হবার কথা নয়। কারণ আলীয়ার শিক্ষায় যে কারণে তিনি ভয় করেছিলেন, তা ভিন্ন প্রকৃতির। আমি তাঁর সেই আশংকা কাটিয়ে উঠেছি। আমার প্রকৃতি দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছেন, এ আম জাঁক দিয়ে পাকিয়ে লাল করতে হয় না, গাছেই পেকে লাল হয়ে উঠে।

অবশ্য এ সময়ে আমাকে নিয়ে তাঁর ভাববার কিছু ছিলোনা। কারণ আমি আর কোনো সমস্যা নই। বরং তিনি নিজেই তখন সমস্যায় ভুগছেন। নতুন সংসার তাঁকে

কোনো ফসলই দেয়নি। পুরানো সংসার সংস্কার করে নিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। কারণ আমার শ্বাশুড়ী দীর্ঘরোগ ভোগের পর এখানো স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেননি। তাই আমার শ্বশুর এ সময়ে তৃতীয়বার বিবাহ করার সমস্যায় ভুগছেন। কিন্তু তা এতো সন্তর্পনে যে আমি কিছুই জানতে পারিনি। তাঁর মৃত্যুর পর এ কথা আমার গোচরে আসে এবং আমি কিছুটা অবাক হই।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক করেছে সায়িদা। সে হঠাৎ তাঁর শ্বাশুড়ীর কাছে যাবে বলে বায়না ধরেছে। কতোই বা তার বয়স, কিন্তু পাকা গিন্নীর মতোই গুছিয়ে কথা বলে। আমি জানিনা, এই পাকামো তার উপন্যাস পাঠের ফল কিনা। কিন্তু বায়না যখন ধরেছে, তখন পূরণ করতেই হবে। কিন্ত 'কনে যাবে শ্বশুর বাড়ি, সঙ্গে যাবে কে? ঘরে আছে হুলো বিড়াল কোমর বেঁধেছে।' এই হুলো বিড়াল আমাদের বড়ো ভাই—কাজী সাহেব।

তাই হলো, কাজী সাহেব, আমি, সায়িদা ভাটি অভিযানে রওনা হলাম। রেলে করে নেত্রকোণা, সেখান থেকে নৌকায় কাউরাট-গোগ। কেরায়া নৌকা চলছে, আর আমরা গল্প গুজব করে সময় কাটাচ্ছি। সামনেই মদনপুরের দরগা। বড়ো ভাই বললেন, 'চলুন, দেখে যাই।' আমি অবশ্য আগেই দেখেছি, তবু তাঁদের সাথে চললাম। পায়ে জুতা, কিন্তু কিছুদূর এগুতেই একজন লোক বললো, 'এখানে জুতা খুলে যান।'

'কেন, মাজারতো এখনো কিছুটা দূরে'—আমি বললাম।

লোকটি বললো, 'না, এখান থেকেই মাজারের স্থান আরম্ভ হয়েছে।'

আমি বললাম, রাস্তার পাশেতো দেখছি পায়খানা করে রেখেছে, তাতে মাজারের পবিত্রতা নষ্ট হয় না, আর এই কাদার মধ্যে জুতোর পরশেই তা নষ্ট হয়ে যায়।'

লোকটি হঠাৎ বলে উঠলো, 'আপনাদের মতো লোকেরাই এই বাহ্যি করেছে।'

না, এর সাথে তর্ক করে কোনো ফল নেই। মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেলো। আমি রাগ করে নৌকায় ফিরে এলাম। সাথে বড়ো ভাই আর সায়িদার জুতাও নিয়ে এলাম। তাঁরা মাজার দেখতে গেলেন। কিন্তু আমার জন্য সেখানে বাড়তি কোনো আকর্ষণ ছিলো না।

এই মাজার দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। শাহ সুলতান মুর্জরদ রোমী এই মাজারের পীর। তিনি নাকি শাহ জালালের সাথে এ দেশে এসেছিলেন। সেই তিনশ' ষাট আউলিয়ার একজন। ব্যাপারটা অদ্ভুতই বটে। আউলিয়ারা যেন দল বেঁধে এসে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আবার তাঁদের এই আগমন ও প্রতিষ্ঠা অহিংস ছিলোনা। এখানেও শাহ সুলতান মদন কোচকে তাড়িয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তুলেছিলেন। তবু স্থানটির নাম কেন যে মদনপুরই রয়ে গেলো, সুলতানপুর হয়ে উঠতে পারলোনা, এও এক রহস্য।

মাজারের স্থানটি চারদিক থেকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আমি যে স্থান থেকে জুতা না খোলার জন্য ফিরে এলাম, সেটি এই দেয়াল থেকে বেশ দূরে। তবু এখানকার লোকেরা

অহেতুক মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করে। কারণ এটি তাদের ব্যবসায়ের অংশ। আশে পাশের বেশ কটি গাঁয়ের লোক এই মাজারের আয় ভোগ করে। আগে একটা ধারা ছিলো, এখন নাকি যার লাঠির জোর আছে, সেই এই আয়ের অংশ দাবী করে।

মাজারের আয়ও খুব কম নয়। খাসী গরু মোরগ হাঁস কবুতর আসে মানতের খাত থেকে। লোকে নানান ব্যাপারে এসব মানত করে থাকে। দেয়ালের উপর ইঁটের আধলা আছে, মানতের নিয়ত করে সেই ইঁট উলটিয়ে রাখতে হয়। একই ইঁট হয়তো দশজনে উলটায়, কিন্তু মানততো মনের ব্যাপার, তা পূরণ হলেই মানতের জন্তুটি এসে হাজির হয়। মাজারের সামনেই একটি গোলকুয়ার মতো স্থান আছে, সেখানে হাঁস মুরগী সবাই ছুঁড়ে দেয়। এছাড়া শিন্নী আসে, নগদ টাকা পয়সাও কম দেয়না। মাজারের গেইট পেরিয়ে একটা বাঁধাই পথ দিয়ে বসে বসে মূল মাজারে যেতে হয়। সেখানেই চাঁদোয়ার উপরে অনেকে টাকা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে আসে। এছাড়া আছে লাখেরাজ সম্পত্তি। সুতরাং এসবের লোভেই মাজারের পান্ডারা সাধারণ মানুষকে পারলে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে। কারণ মানুষকে শোষণ করতে হলে শাসনও করতে হয়।

না, কাজী সাহেব ও সায়িদা ফিরে এসেছেন। পথে পথে মাজারের আলাপই বেশি হলো। ইসলামে এই মাজারের অবস্থান ও মূল্যমান নিয়ে আমি অনেক কথা বললাম। ইকবাল এটিকেই মুসলমানদের সুখ্যাতির উৎস বলে ঠাট্টা করেছেন, 'তোমাদের যতো সুখ্যাতি, সেতো মাজারের ব্যবসা করার জন্যই'—'হো জো নেকুনাম তো মাজারোঁকে তেজারত করকে।'

সন্ধ্যার আগেই আমরা গোগে পৌঁছে গেলাম। মা-তো আহলাদে আটখানা হয়ে উঠলেন। তাঁর পুতের বৌ তাঁকে স্মরণ করে এতোদূর ছুটে এসেছে, এর কী কোনো তুলনা আছে। চাচাজী যাকে বলে শ্বশুরের আদর, তাই দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। সায়িদাও, দেখলাম, সবার সাথেই একান্ত আপনজনের মতো মিশে গেছে। যেন বহুদিনের পরিচিত সব ব্যাপার। কাউরাটেও একই ব্যাপার। যেখানেই যায়, সবাইকে মাতিয়ে তোলে। আমার সেইকেলে নানীর সাথে এমন ভাবে মিশে গেলো যে, মনে হলো, অনেক দিন ধরে একজন আরেকজনকে খুঁজছিলো। তাছাড়া দুজনের চেহারা ছবি রং সুরতের মধ্যেও তো কিছুটা মিল আছে।

এখানে নেপথ্যে একটা কথা বলে রাখি, আমার এই দ্বিতীয় ঘরণী কিন্তু তার বোনের ঠিক উল্টো পিঠ। তাকে যদি পূর্ণিমা বলা যায়, তা হলে একে বলতে হবে অমাবশ্যা। কিন্তু হাবভাব এমন যে, সেই অমাবশ্যার অন্ধকারেও আলোর ঝলকানি দেখতে পাবেন আপনি। এ কারণেই আমার আত্মীয়-স্বজনরা খুশীই হয়েছেন। তাছাড়া প্রকৃতির নিয়মই বুঝি এই, এক দিক কম হলে অন্যদিক দিয়ে সে পুষিয়ে দেয়। দিনের আলো আছে বলেই রাতের অন্ধকার আছে; তা না হলে আলো আঁধারের কদরই আমরা বুঝতে পারতাম না।

যাহোক, আবার আমরা খরিচায় ফিরে এলাম। ভর্তি হলাম নাসিরাবাদ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। অধ্যক্ষ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ সাহেবের সাথে আগেই পরিচয় ছিলো, তিনি খুব খুশী হয়েই আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। শুধু শর্ত এই যে, আগামী বছরই ইংরেজি অংক দুটি বিষয় পরীক্ষা দিয়ে হাই মাদ্রাসার পর্যায়টি অতিক্রম করতে হবে। তা হলেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অংশ নিতে আর কোনো বাধা থাকবেনা।

এবার আমি ময়মনসিংহেই থাকি, দোকানের দিকেও আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। আমার শ্বশুর কোনো কাজই আগের উৎসাহ নিয়ে করতে চান না, করতে পারেন না। সব কিছু হারিয়ে তিনি যেন কেমন নিঃস্বের মতো হয়ে গেছেন। আমি একদিন তাঁকে হজ্ব করে আসার কথা বললাম। তিনি বললেন, 'আমার উপরতো হজ্ব ফরজ হয়নি, কারণ আমার প্রয়োজনীয় রাহা খরচ নেই। তাছাড়া আমারও যাবার তেমন উৎসাহ নেই। আল্লাহ্‌র বাড়ি যে মক্কা নয়, সে আমি দৃঢ় ভাবেই বিশ্বাস করি। তবু সামর্থ থাকলে একটা কথা ছিলো।'

আমি তাঁকে জমি বিক্রি করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তিনি এভাবে জোর করে মক্কা যাবার পক্ষপাতী নন। আল্লাহ্‌ চাইলে প্রয়োজনীয় সচ্ছলতা তাঁকে দিতে পারবেন। সত্যিই তিনি যদি কাউকে টানেন, তা হলে তাঁর পথের খরচ আপনিতেই হাতে এসে যায়। কিন্তু তাঁর এমনি বক্তব্যের দ্বারাই আমি তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝে নিয়েছিলাম। কেমন নির্জীব হয়ে পড়েছেন। আমি এসেও তাঁর চোখে মুখে যে সজীবতা দেখেছিলাম, তার কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই।

ইতিমধ্যে আমি আরো একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম। বড়ো মসজিদের ইমাম ফয়জুর রহমান সাহেব জমিয়তে উলামা ও নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন। আমার পরীক্ষার ফল দেখে আমার সম্ভাবনা তাঁদেরকে উৎসাহিত করলো এবং তাঁরা আমাকে সভা সমিতিতে টানতে লাগলেন। তাঁদের সাথে একদিন ফুলবাড়িয়া গেলাম। মাদ্রাসার সামনে বিরাট জনসভা। বক্তৃতা করলাম। মৌলানা হামিদের সাথে পরিচয় হলো। তাঁর কাছেই জানলাম, বক্তৃতা ভালোই হয়েছে, তবে আরো সহজ হলে ভালো হয়। কারণ ইসলামের চাইতে এখানে রাজনীতির প্রয়োজনই বেশি। তবু আরেক দিন বুরর চরে যেতে হলো। নৌকায় করে গেলাম। সাথে ইমাম সাহেব, মওলানা দৌলত আলী, মওলানা লুকমান ছিলেন। দৌলত আলী যে এতো রসিক, এর আগে জানতে পারিনি। এমনিতে দেখতে গম্ভীর মনে হয়, একটা ছোটখাট পাহাড়ের মতো। কিন্তু সেই পাহাড়ের পাথরের নীচে ছিলো হাসির একটা ঝর্ণা। আস্তে আস্তে কথা বলেন; কিন্তু সে সব কথা যেন একেকটা রসগোল্লার মতো রসাল।

যাহোক, বুররচরেও বক্তৃতা করলাম। কিন্তু আমার ধারা ঠিকই রইলো। তাঁদের রাজনীতি নয়, বরং ইসলামী মূল্যবোধ নিয়েই কথা বলতাম আমি। বোধ হয়, আমার এই বক্তব্যের ধারা দেখেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, একে সহজে পথে টানা

যাবেনা। এরপর তাঁরা আর আমাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেননি। আর করার উপায়ও নেই; কারণ আমি ছাত্র।

না, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা নিয়ে আমি চিন্তা করছিনা; বরং আমার চিন্তা পথের বাধা অংক ইংরেজি নিয়ে। বিশেষ করে অংকের ব্যাপারে আমি দুর্বল। ছোট বেলা থেকে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে কী হতো বলতে পারবোনা; কিন্তু তত্ত্ব চিন্তা আমার মাথায় যতোটা সহজে ঢুকে, এই অংকের হিসাব ততোটাই জটিল বলে মনে হয়। সেই তুলনায় ইংরেজি অনেক সহজ। তাই অংক প্রাইভেট পড়তে হবে। কলেজের পশ্চিম দিকেই কারো বাসায় সেই প্রাইভেট পড়ার দৃশ্য আমার মনে পড়ছে। এসময়ে তাই আমি হোস্টেলে ঠাঁই নিয়েছিলাম। কলেজের তখন দুতিন রুমের একটি হোস্টেল ছিলো। এর একরুমে আমি থাকতাম। আর অন্যরুমে থাকতো নুরুদ্দিন। বাড়ি কোথায় ঠিক মনে পড়ছেনা। দেখতে মোটাসোটা, গোরা, ছবি আঁকায় হাত ছিলো। সে খুব সম্ভব আমাদের পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে অষ্টম স্থান অধিকার করেছিলো।

আমার এক সহপাঠী ছিলো সিদ্দিক, মুনীর উদ্দিন মুনশীর ছেলে। সে প্রথম বিভাগে হাই মাদ্রাসা পাস করেছে, এবার ইন্টারমিডিয়েটে আরো ভালো করার আশা আছে। হঠাৎ এ সময়ে কলেজ ছাত্রসংসদের নির্বাচন এসে উপস্থিত হলো। সিদ্দিক ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবে, আগে থেকেই সব ঠিকঠাক; এর মধ্যে একদল ছাত্র আমাকে এসে ধরলো তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। কী জানি, কী ভেবে আমিও মত দিয়ে বসলাম। সম্ভবতঃ সিদ্দিকের আহমিকাবোধ আমাকে কিছুটা পীড়িত করে থাকবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বরাবর যা হয়, তাই হলো। আমি দাঁড়ালাম, কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্যানভাস করার কোনো উদ্যোগ নিলাম না। কারণ এ দাঁড়ানো আমার স্বেচ্ছায় হয়নি, যারা দাঁড় করিয়েছে, তারাই এ কাজ করবে। কিন্তু এর ফল হলো এই যে, তারা শেষ পর্যন্ত সিদ্দিকের দলে ভীড়ে গেলো। আমি পরাজিত হলাম। কিন্তু হাবভাব আচার আচরণে আমি পরাজয়কে স্বীকার না করে এমন ভাব দেখালাম যে, আমারই জয় হয়েছে। কারণ গণতন্ত্রের বিজয়ই আমার বিজয়।

অনেকেই আমার এ প্রকার ব্যবহার দেখে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু তারাতো জানেন না, এছাড়া আমার লজ্জা ঢাকবার আর কোনো আচ্ছাদন ছিলো না। কারণ এ নিয়ে মুখ গুমরা করে বসে থাকটা আরো লজ্জার ব্যাপার হতো। আমার এভাবে দাঁড়ানোই উচিত হয়নি। পরের কথায় নাচতে যাওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতার ফল এমনি হয়।

এ সময়েই আরেকটি মজার ব্যাপার ঘটেছিলো। একদিন বিকালে কলেজ প্রাঙ্গণে আমরা ভলিবল খেলছি, এমন সময় দুজন লোক এলেন আমার খোঁজে। তারা আমাকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, 'আছে, বাইরে গেছে; তবে সন্ধ্যার সময় অবশ্যি ফিরে আসবে, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।'

তারা অপেক্ষা করলেন এবং খেলা শেষ হলে হঠাৎ বলে বসলেন, 'আপনি যে ভলিবল খেলছেন, এ কি জায়েজ?'

আমি বললাম, 'কেন জায়েজ হবে না, নির্দোষ খেলা, শারীরিক ব্যায়াম।'

তারা গোলাম সামদানীর কথা বলে আমাকে ভয় দেখালেন, যেন তাঁর সামনে একথা বললে তিনি আমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতেন। আমি বললাম, ঠিক আছে, চলুন, তাঁর কাছে যাই।

রুম খোলাই ছিলো। আমি বললাম, 'এই তাঁর রুম। আপনারা বসুন, আমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখি সে কোথায় গেলো।'

এমন সময় নুরুদ্দিন এসে উপস্থিত হলো। আমার অনুপস্থিতিতে সে রহস্যটি ফাঁস করে দিলো। আমি পেশাবখানা থেকে ফিরে এসে দেখি সে আমার রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার আমাকে দেখেই তারা কেমন যেন চমকে উঠলেন। তবু তাদেরকে বসতে বলে আমি মসজিদের পাশের দোকানে চায়ের অর্ডার দিতে গেলাম। কিন্তু ফিরে এসে আর তাদেরকে পাইনি। তাদের একজন স্বনামধন্য ক্বারী শরীয়ত উল্লাহ্‌র ছোট ভাই এবং অন্যজন তাদের বাড়িরই কেউ ছিলেন। একথা পরে আমি জানতে পেরেছিলাম। প্রথম জনের সাথে এখনো রাস্তাঘাটে দেখা সাক্ষাত হয়, কিন্তু যথাসম্ভব এড়িয়েই যাতায়াত করেন তিনি।

এমনি এড়িয়ে চলার ব্যাপারটি আরো অনেকের জন্যই বাস্তব হয়ে উঠেছে। এর মূল কারণ অন্য কিছু নয়, প্রত্যাশার অপমৃত্যু। যে গোলাম সামদানী ভলিবল খেলাকে নাজায়েজ বলবে বলে আশা করি, সেই যখন নিজে ভলিবল খেলে, তখন সত্যি দুঃখ না হয়ে পারে না। সেই দুঃখে আমার অনেক আত্মীয় আলেমও আমার ছায়া মাড়ান না।

প্রত্যাশার অপমৃত্যু সত্যিই একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। এর ফলে আপনজনও শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আমার জীবনে এ ব্যাপারটিরও অভাব ঘটেনি। আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এমন কি শিক্ষক পর্যন্ত এ কারণে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন। কিন্তু এজন্য আমার কিছু করণীয় নেই। শুধু বারংবার একটি কথাই মনে হয়, তাঁরা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, কেন আমি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি? আমারতো যোগ্যতার অভাব ছিলো না, তবু কেন আমি তাঁদের মনের মতো হলাম না। আমি তাঁদের কাছে কি এই বিচারের প্রত্যাশা করতে পারি না?

কিন্তু আমার জন্য অন্য এক মৃত্যুও যে খুব নিকটেই অবস্থান করছিলো, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি তখন এই হোস্টেলেই আছি, হঠাৎ খরিচা থেকে খবর এলো আমার শ্বশুর মৃত্যু শয্যায়। আমি যেন একজন ডাক্তার নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে যাই। আমি ডাঃ ইয়াসীনকে জানতাম। আমার শ্বশুর অনেকবারই তাঁর দ্বারা চিকিৎসা করিয়েছেন। সুতরাং ডাক্তার সাহেবও আমার শ্বশুরকে খুব ভালোভাবে চিনেন। কাজেই তাঁকে সাথে নিয়েই আমি খরিচায় পাড়ি জমালাম। কিন্তু মুমূর্ষু শ্বশুরের শয্যা পার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হলাম মাত্র, কিছুই করতে পারলাম না। এর আগের রাত্রেই তাঁর স্ট্রোক হয়েছে। বাহ্যি করার জন্য বাইরে যাবার বেলায় অন্ধকার উঠানে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। অনেকক্ষণ পরে তাঁর খোঁজ হয়। সেই থেকে তিনি অচেতন হয়ে আছেন। না,

বাঁচার কোনো আশা নেই। কারণ চোখ দুটিতেও রক্ত জমাট বেঁধে গেছে, গলা দিয়েও জমাট রক্ত বেরিয়ে আসছে। ডাক্তার সাহেব কোরামিন ইনজেকশান দিয়ে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সচেতন হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। শুধু জোরে জোরে শ্বাস ফেলা ছাড়া প্রাণের আর কোনো লক্ষণ নেই। সবাই তাঁর এই অবস্থা দেখে হতবাক। এর আগে মাথা ঘোরার কথা মাঝে মধ্যে বলতেন। কিন্তু ব্লাড প্রেসারের সন্দেহ করোরই হয়নি।

আমিতো একদিন আগেই বাড়ি থেকে গিয়েছি। একটি জমি কেনার চেষ্টার কথা তিনি আমাকে বলেছেন। কিন্তু তখনতো এমন কোনো বিপর্যয়ের কথা বুঝতে পারিনি। কী যে হয়, আমি যার খবরই শুনি, একবারে মুমূর্ষু অবস্থায় এসে তার মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শী হই। ফজিলতও এভাবে চলে গেলো। এবার, যার স্নেহের টানে আমি এই পরিবারের সাথে যুক্ত হয়েছিলাম, যার অভিভাবকত্বকে আমি আমার জীবন পথের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম, তিনিও আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ফজিলতের বদলে আমি সায়িদাকে পেয়েছি, কিন্তু তাঁর বদলে আমি কাকে পাবো, কে সেই স্থান দখল করবে?

আমার সমস্ত চিত্ত জুড়ে হাহাকারের ঢেউ অনবরত আছড়ে পড়ছে; কিন্তু বাইরে নির্বিকার। কারণ আমি কাঁদতে আরম্ভ করলে সায়িদাকে সান্ত্বনা দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তবু মাঝে মাঝেই চোখের কোণে পানি উছলে পড়ছে। আমার পিতার মৃত্যুর সময় আমি কেঁদেছিলাম কিনা, মনে পড়ছেনা। ফজিলতের মৃত্যুর সময় আমি হুঁ হুঁ করে কেঁদেছি। কিন্তু আজ কান্নাও বুঝি শুকিয়ে যেতে চাইছে। কারণ আমি যে এখনো পথিক, আর পথের শেষ প্রান্ত যে এখনো অনেক দূরে। সেখানে পৌছতে হলে এখনো যে অনেক পাথেয়ের দরকার। সে পাথেয় নিয়ে কে আমার জন্য এগিয়ে আসবে।

কিন্তু আমাদের প্রত্যাশাতো প্রকৃতিও পূরণ করে না। সে তার নিয়মের চাকাই ঘুরাতে থাকে। সেই চাকার টানে আমি উপরেই উঠি আর নীচেই তলিয়ে যাই, তাতে তার কিছু আসে যায় না। আমাদের সমবেত আর্ত চীৎকারের মাঝেই রাত দশটার দিকে চব্বিশ ঘণ্টা পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আমার শ্বশুর। সায়িদা শুধু নয়, আমিও আবার অনাথ হয়ে গেলাম।

পরদিন তাঁর লাশ নিয়ে বাধলো গোলমাল। তাঁর গোষ্ঠির লোকেরা নিজস্ব কবর খানায় কবর খুঁড়ে ফেলেছে, এখানেও তাঁর প্রিয় মেয়ের কবরের পাশে কবর খোঁড়া হচ্ছে। কোথায় কবর হবে, তা নিয়ে রশি টানাটানি চলছে। শেষ পর্যন্ত আমাকেই মধ্যস্থতা করতে হলো। আমিই বললাম, 'তাঁর একমাত্র সন্তানের যেখানে মত, সেখানে কবর হবে। কারণ লাশের উপর তার দাবীই সর্বাধিক।'

আমার এ প্রস্তাব মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। কারণ লাশ নিয়ে লাঠালাঠি করা কোনো মতেই উচিত নয়। কিন্তু সায়িদার সিদ্ধান্ত তার গোষ্ঠির বিরুদ্ধেই গেলো। সে ফজিলতের কবরের পাশেই কবর দিতে বললো। এর মূলেও কিছুটা ক্ষোভ আছে। কারণ গোষ্ঠির লোকেরা খুব কাছে থাকলেও ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বুঝায়, তা তাঁদের সাথে

জন্মেনি। তা না হলে আজিম শেখের এই গোষ্ঠি কম নয়। খরিচায় কাজী বাড়ির সাথে তাঁরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কিন্তু কাজী বাড়ি তাঁদের ঘনিষ্ঠতা দিয়েই এ ব্যাপারে জিতে গেলো।

এই-ই হয়, সংসারের এই-ই নিয়ম। এ জন্যই বোধ হয়, সে সময় থেকে সায়িদাকে তার গোষ্ঠির লোকেরা খুব সুনজরে দেখেনা। কারণ সে গোষ্ঠির বিরদ্ধে রায় দিয়েছে। সে দিক থেকে বরং আমার কথা তাঁরা বেশি মাত্রায় শুনে। বর্গাদারি হোক, বা অন্য ব্যাপারে হোক, আমি যা বলি, তাই হয়। অন্য কারো কথা তাঁরা তেমন শুনতে চায় না। এর মূলে শুধু আমার ব্যক্তিত্ব নয়, সেই পরাজয়ের গ্লানি তাঁরা এখনো ভুলতে পারেনি।

একারণেই আমার শ্বশুরের মৃত্যুর পরেই তারা জমির ওয়ারীশ দাবী করে বসলো। জমি অবশ্য তাদের হাতেই ছিলো, তারাই বর্গা করতো; তবু ভাগ করে দেবার দাবী নিয়ে তারা পাগল হয়ে গেলো। বিশেষ করে আমার শ্বশুরের বৈমাত্রেয় ছোট ভাই, কছিম উদ্দিন চাচাই ছিলেন, এব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য। আমি আমার লেখাপড়ার কথা তাঁদেরকে বলেছিলাম। কিন্তু না মানায়, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে আমি একাই সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে দিলাম।

এই ব্যাপারটি আমার নানা শ্বশুর বাড়িতে এক তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করলো। এ ব্যাপারে সব চাইতে বেশি মনোক্ষুন্ন হলেন আমার বড়ো ভাই সেই কাজী সাহেব। কারণ আমি তাঁর পরামর্শ ছাড়া কিছুই করি না। কিন্তু এমন একটা বিরাট ব্যাপার তাঁকে কিছু না জানিয়েই কীভাবে শেষ করে দিলাম। তাছাড়া আমার এখন লেখাপড়ার খরচের দরকার। কাজেই লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তাঁরা সম্পত্তি ভাগ করে নিতে পারেন না। এসব কথা বলে বড়ো ভাই যেন বাঘের মতো গর্জন করতে লাগলেন। কিন্তু আমি নীরব হয়েই রইলাম। কারণ আমি যা করেছি, ঠিকই করেছি। কারো অনিচ্ছা দত্ত সাহায্য নিয়ে আমি কিছু করতে চাইনা না, জোর করে যখন আমার আপন আত্মীয়দেরকে আমি নিজের জন্য ব্যবহার করিনি, তখন এঁদেরকে কেন জোর করতে যাবো। ব্যস, তাঁদের প্রাপ্য নিয়ে যদি তাঁরা সুখী হন, তাতেই আমার সুখ; কারণ আমি কোনো ঝামেলা পছন্দ করি না। আমার স্বভাব যেমন খোলামেলা, তেমনি আমার সহায় সম্পদও হবে নিষ্কন্টক ও নির্বিবাদী।

আমারতো মনে হয়, এর মূলেও তাঁদের সায়িদার প্রতি বিরাগই অধিকতর ভাবে কাজ করেছে। কিন্তু এর চাপ পড়েছে আমার উপরেই বেশি; সায়িদার কিছুই হয়নি। কারণ তাঁরা জানে না যে, মেয়েটা সত্যি সৌভাগ্যবতী। সে আজ তাঁদের চাইতে অনেক বেশি সচ্ছল, অনেক বেশি সুখী। না, এ সংসারে তার পাওয়ার আর চাওয়ার খুব বেশি কিছু নেই। সে সাতটি সন্তানের জননী, সেই আনন্দেই সে মেতে আছে। না, আমার স্ত্রী বলেই বলছিনা, সারাদিন ও যে খাটুনি দেয়, মনের মধ্যে কোনো আনন্দ না থাকলে এমনভাবে খাটতে পারতো না। আর এ আনন্দের কারণ তার অল্পে সন্তুষ্টি। যা পায়,

তাই পরে, যা জুটে, তাই খায়; এর চাইতে বেশির লোভ সে কখনো করেনি। সোনা দানা শাড়ী বাড়ির দাবী তার কোনো কালেই ছিলোনা। আমি তার পৈতৃক সম্পত্তি যখন ভাগ করে দিয়ে দিলাম, তখন বড়ো ভাই রাগ করেছেন সত্যি; কিন্তু সেখানে আমার কল্যাণ কামনা ছাড়াও তাঁর অভিভাবকত্বের অমর্যাদার ব্যাপারটি জড়িত ছিলো। কিন্তু সায়িদা কিংবা আমার শ্বাশুড়ী, তাঁদেরইতো এই সম্পত্তি; কিন্তু আমার আচরণে তাঁরা টু শব্দটিও করেননি। কেউ বলতে পারে যে, এমন শিক্ষিত স্বামী, এমন মেয়ের জামাই পেলে কেইবা কথা বলতে চায়। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখনতো আমি এতোটা শিক্ষিত ছিলামনা; বরং তাঁদের উপরই নির্ভরশীল ছিলাম। তবু তাঁদের নিলোর্ভ আত্ম সমর্পণ ও সন্তুষ্টিই আমাকে আমার কথা রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। তেমনি আজও আমার আয় এবং দোকান ও জমির আয় আমি কী ভাবে খরচ করি, তা তাঁরা ফিরেও দেখেন না। এই যে অর্থ সম্পদের লালসা থেকে তাঁরা নিজেদেরকে দূরে রাখতে পেরেছেন, এর ফলেই তাঁদের মনে এমন একটা অনাবিল আনন্দ আছে, যা লক্ষ টাকা দিয়েও কেনা যায় না। একমাত্র আত্মতুষ্টির মধ্যেই এই আনন্দ লাভ করা যায়। সেজন্যই বলছিলাম, আমার স্ত্রী সেই আনন্দের অধিকারিণী। তার একমাত্র কাজ তাই 'রাধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা'। এভাবেই তার জীবনের পঁয়ত্রিশ বছর এক চাকাতে বাঁধা হয়ে গেছে। মনে হয়, এর থেকে তার নিস্কৃতি নেই।

কিন্তু এই অবস্থাতো একদিনে সৃষ্টি হয়নি; অনেক ত্যাগ অনেক তিতিক্ষার বিনিময়েই এমন কিছু লাভ করা গেছে। সে সব কথা যথা সময়ে আসবে। আপাততঃ আমার শ্বশুরের মুত্যুতে আমি অভিভাবকহীন হয়ে পড়লাম। আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, সব কিছুইতো সামনে পড়ে আছে। দোকানের অবস্থা খুব ভালো নয়। জমিও খুব বেশি ছিলো না, কিন্তু ভাগ করে দিয়ে তা আরো কমিয়ে ফেলেছি। এমতাবস্থায় আমার পড়ার খরচ সংগ্রহ করাই ছিলো সমস্যার ব্যাপার। আমার নানা শ্বশুরতো আরো আগেই মারা গেছেন। আমার মামা শ্বশুর এখনো নাবালক। সুতরাং এ সংসারে একমাত্র আমিই তখন বয়স্ক, যার পক্ষে উপার্জনশীল হওয়া সম্ভব। তাঁদের প্রয়োজন যে ছিলোনা, তা নয়; কিন্তু ঘুনাক্ষরেও তাঁরা আমার কাছে তাঁদের কোনো প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেননি। আমি একবার নয়, দুবার বিয়ে করেছি, আমি এক ধারা নয়, দুধারায় শিক্ষা লাভ করতে উদ্যোগী হয়েছি। কিন্তু বৃত্তির কয়টি টাকা ছাড়া আমার আর কী সম্বল ছিলো? এ সময় তাঁরা যদি আমার উপর চাপ সৃষ্টি করতেন, তাহলে আমি অগ্রসর হতে পারতাম না। এজন্য আমার ইচ্ছাই শুধু নয়, তাঁদের নির্লোভ সহায়তারও একান্ত প্রয়োজন ছিলো। সেই সহায়তার পথে তাঁরা কোনো বাধার সৃষ্টি করেননি।

এখানে আরো একজন মহিলার কথা বলবো; সেই যে আমার প্রথম বিয়ের সময় যিনি 'মাউগ থুয়ে জেওয়াশ নিয়ে' যাবার ঠাট্টা করেছিলেন, সেই পুবের বাড়ির বু এ সময়ে অদ্ভুতভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁর যে স্নেহ পেয়েছি, সে সময়ে তাঁর

ছেলেরাও তা পায়নি। সে সময়ের দোকানের পুঁজি বলতে গেলে এই বু'রই অবদান। তিনি, যখন যা চেয়েছি, বিনা দ্বিধায় আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। এর বিনিময়ে আসল ছাড়া কোনো লাভ আমি তাঁকে কখনো দিইনি। আমার কাছে আজো অবাক লাগে, কোন লোভে এই মুখরা রমণী আমাকে এমনভাবে সাহায্য করেছিলেন।

তিনি আমার নানা শ্বশুরের ছোট বোন। পাশের বাড়িতেই বিয়ে হয়েছে। মুখের উপর উচিত কথা বলতে তাঁর জুড়ি নেই। ভালো না লাগলে অনুচিত কথাও তাঁর মুখ দিয়ে অবিরল ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। মহিলার নিজের তিন ছেলে। তিন জনেই উপার্জনশীল; পৃথক করে দিয়েছেন। কিন্তু সংসারের মূলকর্ত্রী তিনিই। এসব টাকা তাঁর নিজস্ব 'জোলা'। এর ভাগ তাই ছেলেরা পায়নি। তাঁর লুকিয়ে রাখার ধারাটিও ছিলো অদ্ভুত। যখনি আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলেছি, বু, হাজার কিংবা পাঁচশ' টাকার দরকার। তিনি চালের বাতা, উগারের খুঁটি, ডুলির তলা থেকে টাকা আমার সামনে বের করে নীরবে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছেন। একবার জিজ্ঞাসাও করেননি যে, এই টাকা আমি কখন দেবো কিংবা আদৌ দেবো কিনা। তাঁর এই ব্যবহারে আমি সত্যি অবাক হয়েছি।

কিন্তু কেন তিনি আমাকে এভাবে সাহায্য করতেন? আমি যদ্দূর ভেবে দেখেছি, প্রথমতঃ তিনি তাঁর জোলা সংরক্ষণের জন্যই এভাবে তাঁর টাকা আমার কাছে গচ্ছিত রাখতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর ছেলেরা কেউই লেখাপড়া শিখেনি; একটি ছেলে, সে যেই হোক, লেখাপড়া শিখছে, তাকে সাহায্য করে তিনি একটা তৃপ্তি অনুভব করতেন। তিনি নিজেও নিরক্ষর, কিন্তু শিক্ষার মর্যাদা তিনি বুঝতেন এবং এর প্রতি একটা আগ্রহও তাঁর ছিলো। এই শেষের কারণটি যদি সামান্যও সত্য হয়, তা হলেও এটিই তাঁকে অসামান্য করে তুলেছে। এক তাল লোহা যেমন পরশ পাথরের ছোঁয়ায় নিমেষে সোনা হয়ে যায়, তেমনি এর পরশে তিনি তাঁর মুখরা চরিত্র ও কঠোর প্রকৃতিকে অতিক্রম করে এক মহিয়সী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যান। আমি তাঁর এই মহিয়সী রূপের প্রতি যথার্থই শ্রদ্ধা পোষণ করি, আমি কৃতজ্ঞ।

সুতরাং এখানে আমাকে ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছা হয়, 'হে পথিক! তুমি কি পথ চলতে চাও? যদি সে ইচ্ছা তোমার থাকে, তা হলে পাথেয়ের জন্য চিন্তা করোনা। হজরত মুসা যেমন তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করে পাথরের বুকে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলেন; মহামতি রাম যেমন তাঁর পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যাকে নারীতে রূপান্তরিত করেছিলেন, তেমনি তুমিও অভাবনীয় স্থান থেকে তোমার পাথেয় সংগ্রহ করতে পারবে। আর যদি সে ইচ্ছা না থাকে, তবে শত পাথেয়ের আয়োজন থাকলেও তার বোঝা নিয়েই তুমি পথের মাঝে মুখ থুবড়ে পড়বে। গন্তব্যে তুমি কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না। জানো তো, ইচ্ছাই ফলবতী হয়।'

হ্যাঁ, আমার একান্ত ইচ্ছাই ফলবতী হয়েছে; আমার একাগ্র সাধনাই সাফল্য লাভ করেছে। সাহায্য সহায়তা শুধু পথের কষ্ট লাঘব করেছে, কিন্তু পথ চলতে হয়েছে আমাকেই। হ্যাঁ, আমিই—এভাবে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার সাথে আমার ইংরেজি, অংক

পরীক্ষা দিলাম। অধ্যক্ষ সাহেব মাদ্রাসারই একজন শিক্ষককে আমার খাতা দুটি দেখে দিতে বলেছিলেন; তিনি দেখে বললেন যে, আমি পাস করে যাবো।

এ সময়ে দোকানের কর্মচারী কোব্বাদ মিয়া হঠাৎ চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং দোকানের ভারও আমার উপর এসে পড়ে। অবশ্যি ইতিমধ্যে মুশকিল আসান হিসাবে আমার এক ফুফাতো ভাই এসে দেখা দেন। তিনি এতোদিন সিলেটের শাহ জালালের দরগার অন্যতম খাদেম ছিলেন। শৈশবে নেত্রকোণায় আমি তাঁকে দেখেছিলাম। এরপর দীর্ঘকাল পরে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। এর ফলে আমার শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া এবং সকলের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। ক্রমে আমার বড়ো ভাই কাজী সাহেবের সাথে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে খরিচাতে বসেই এক সময়ে আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে আমরা পরামর্শ করি। সেই প্রয়োজনে শহরে থাকতে হবে বলে তিনি দোকানে বসতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর হাতেই আমি দোকানের ভার তুলে দিই।

কিন্তু আমার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারটি কিছুটা বিস্তারিত আকারে না বললে এর গুরুত্ব ও নাটকীয়তা ঠিক বুঝা যাবে না। আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, আমার সেই মাফিজ খাঁ নানা মায়ের সাহায্যে আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশটাই বিক্রি করে ফেলেছিলেন এবং এর মাধ্যমে আমুদপুর থেকে আমাদের উচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছিলো। শুধু বাড়ি ও তৎসংলগ্ন কিছুটা জমি তখনো অবশিষ্ট ছিলো। এতে আমার চাচাতো ভাইরাই অবস্থান করছিলো। এর ফলে আমি নিজে বিপন্ন হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরলেও এই জমি বিক্রি করার কোনো চেষ্টা করিনি।

এই জমির নীলাম ডেকে আনার সময়ও আমার ফুফাতো ভাই আব্দুল খালেক প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। এবার শমশের ভাই সিলেট থেকে ফিরে দেখলেন, আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। অথচ তিনি কোনো খোঁজ নিতে পারেননি। কাজেই তিনি এই জমি পুনরুদ্ধারের ইচ্ছা পোষণ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কাজটা সহজ ছিলোনা; দীর্ঘদিন ধরে যেমন কাওলাদাররা এই জমি ভোগ করছিলো, তেমনি আমার চাচাতো ভাইরাও বাড়ি জমি দখল করে রেখেছিলো। আমি মাঝে মধ্যে এই জমি উদ্ধারের বিষয় নিয়ে কথা বলেছি, কিন্তু আমার ক্ষমতা ছিলো খুবই নগণ্য। আমার সহোদর বড়ো ভাইকে নিয়ে যখন একবার কাউরাট থেকে আমুদপুর আসি, তখনো এ নিয়ে তাঁকে চেষ্টা করতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজন সবার প্রতিই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি এ নিয়ে কোনো কথা বলতে চাননি, বরং আমাকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বলেন। এরপরও দীর্ঘ দিন চলে গেছে। আমার পক্ষে এ নিয়ে কিছু করার অবকাশ ছিলো না। শমশের ভাই আসার পর খরিচার বড়ো ভাইকে নিয়ে আমরা ব্যাপারটির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখি এবং উকিলের সাথে পরামর্শ করে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করি।

অবশ্যি ইতিমধ্যেই আমি একবার কওলাদারদের সাথে কথা বলেছিলাম। তাঁদের অনেকেই জমির উচিত মূল্য দিতে পারলে ফিরিয়ে দিতে রাজী ছিলেন। এ নিয়ে একদিন আমাদের গাঁয়ের ওয়াজেদ আলী ফকিরের বাড়িতে একটি দরবার ডেকেছিলাম। এতে চকপাড়া, ফকিরপাড়া, বাইদপাড়া, কান্দাপাড়া ও গড়ুয়া পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু জমির একজন অন্যতম প্রভাবশালী কাওলাদার কাওসারের বাপ আসেন নি। আমরা আলাপ আলোচনা করে তাঁর অপেক্ষা করছিলাম এবং উপস্থিত সবাই তাঁর মতামত জানতে চাইছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বিনা দ্বিধায় বললেন যে, অন্য যারা জমি ফিরিয়ে দিতে বলেছে, তারা কেউই দেবেনা। কাজেই আমি যদি পারি, তাহলে যেন মামলা করে জমি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। তাতে কারো কোনো আপত্তি থাকবেনা। সুতরাং এই কথার উপর দরবার ভেঙে যায় এবং আমি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসি।

কাজেই শমশের ভাই পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা আরম্ভ করার সময় কাওলাদারদের এই সিদ্ধান্তের কথা আমাদের জানা ছিলো। এর ফলে এবার আমরা সরাসরি মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলাম। এ ব্যাপারে বড়ো ভাইয়ের ভাগ্নে উকিল মোশাররফ হোসেন ওরফে লালু মিয়া ছিলেন আমাদের আইনগত উপদেষ্টা। এতে করে আটঘাট বেঁধে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হলো। শমবের ভাই সেই নির্দেশ মতোই তাঁর খালা, আমার দইলার ফুফুর ওয়ারীশটি কিছু টাকার বিনিময়ে কাওলা করে ফেললেন। অন্যদিকে সেটেলমেন্ট পরচায় আমার চাচা যে আমার পিতার সাহোদর হিসাবে বর্ণিত হয়েছিলেন, তা রদ করার মতো একটি দলিল ও সংগ্রহ করা হলো। সুতরাং এবার বাটোয়ারা মামলা দায়ের করার পক্ষে আর কোনো বাধা রইলো না। সকল কাওলাদার সহ আমাদেরকে বিবাদী করে শমশের ভাই তাঁদের প্রাপ্য ওয়ারীশের জন্য মামলা দায়ের করলেন।

এভাবেই মামলার জন্য শহরে থাকার প্রয়োজনে শমশের ভাই আমার শ্বশুরের দোকানটি পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর ফলে দোকানের আয় থেকে একদিকে যেমন আমার লেখাপড়ার খরচ চালানো সম্ভব হয়, তেমনি মামলার খরচও এই আয় থেকেই বেরিয়ে আসে। খরচের এই দিকটি ছাড়া মামলার ব্যাপারে আমার পক্ষে অন্য কোনো সাহায্য করা সম্ভব হয়নি। কারণ আমি আমার লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি। আমার পক্ষের যা কিছু করার তা বড়ো ভাইই করেছেন। এভাবে তাঁরা উভয়ে আমাকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অনুকূল সাহায্য করেছেন।

এ সময়ে আমি একবার ধানিখোলা হাই মাদ্রাসায় এক মাসের জন্য মাস্টারি করতে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা হঠাৎই ঘটে গিয়েছিলো। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বুঝানোর জন্য এর কিঞ্চিৎ পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করা দরকার।

আমার নানা শ্বশুর বাড়ির পরিচয় তুলে ধরার সময় আমি রমাই মোড়লের নাম উল্লেখ করেছিলাম। তাঁরই এক ভাইয়ের নাম পাপুছি মোড়ল এবং অন্য ভাইয়ের নাম

বেচু সরকার। এই পাপুছি মোড়লের নাতি আব্দুল খালেক মাস্টার। তিনি সম্পর্কে আমার মামা শ্বশুর হন। তিনি এখন ধানিখোলা হাই মাদ্রাসার হেডমাস্টার। আমাকে এক মাসের সার্ভিস দিতে বললেন; আমিও রাজী হয়ে গেলাম। সেখানেই মওলানার সাথে পরিচয় হলো। তিনিই তখন মাদ্রাসার সেক্রেটারী। কোনো মাদ্রাসায় না পড়েও যে মওলানা হওয়া যায়, তাই যেন প্রথম সেখানে দেখলাম। তাঁর ভালো নাম আমার মনে নেই; খুব সম্ভব উসমান সরকার। তেমনি আমার লজিং বাড়ির কারো নাম ও মনে করতে পারছিনা। তবে সে বাড়ির নাম কি বেপারী বাড়ি? মাদ্রাসা থেকে কয়েকটি বাড়ি পরেই উত্তর দিকে সেই বাড়ি। দক্ষিণ দিকের বৈঠকখানায় আমি থাকতাম। আমার আরবি পড়াতে হতো। ক্লাসে বেশ বড়ো বড়ো ছাত্র, তারা আমাকে খুব একটা মানতে চাইতোনা। কিন্তু আমার পড়ানোর গুণেই তারা বোধ হয় কিছুটা বশীভূত হয়েছিলো।

ধানি খোলা বিরাট গ্রাম, একটি ইউনিয়ন। হাই মাদ্রাসা ছাড়াও একটি হাইস্কুল এবং আটটি প্রাইমারী স্কুল। এই গ্রামেই সাংবাদিক সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ আবুর মনসুর আহমদের জন্ম। তাঁদের একজন হানাফী এবং অন্যজন লা- মজহাবী। এ কারণে এই গ্রামে এই দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রচন্ড রেষারেষির ভাব আছে। এক সময়ে এ নিয়ে অঘটনও ঘটেছে। আলোচ্য সময়ে এর প্রকোপ কমে গেলেও একবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। ধানিখোলা বাজারের পূর্বদিকে আহলে হাদীস তথা লা-মজহাবীদের একটি মসজিদ আছে। আর মজাহাবীদের মসজিদটি বাজারের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কিন্তু এ সব ব্যাপারে আমার জ্ঞান তখনো জন্মায়নি। এমনি এক সময়ে আমি মাগরেবের নামাজ পড়ার জন্য সেই লা মজহাবী মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি ইমামতি করছি, পিছনে জনা কয়েক মুকতাদী। আমি সুরাফাতেহা শেষ করতেই তারা জোরে 'আমীন' বললো। তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে, এরা লা-মজহাবী। সে যাহোক, আমি নামাজ শেষ করে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় একজন মুসুল্লী বললো,' 'আপনি মসজিদের ভিতরে জুতা নিয়ে গেলেন কেন?'

আমি বললাম, 'এতে কোনো দোষ নেই, জুতা চুরি হয় বলে সবাই তা করে।'

সে বললো, 'কিন্তু আমরা করিনা; মুসুল্লীরা জুতা চোর নয়।'

আমি দেখলাম ওদের কথাবার্তা বেয়াড়া রকমের। তাই আমি বললাম, 'মসজিদটা যদি আপনার বৈঠকখানা হয়ে থাকে, তা হলে বলবো, আমার অন্যায় হয়েছে। আর যদি এটা সকল মুসলমানের পবিত্রস্থান মসজিদ হয়, তা হলে এর পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব আমারও। সুতরাং এনিয়ে আপনার কাছে জবাবদিহি করতে আমি রাজি নই। কারণ এ মসজিদ আমারও মসজিদ।

এবার দেখলাম কাজ হয়েছে। তাই তারা অন্য পথ ধরলো। একজন বললো, 'কিন্তু আপনারতো নামাজই হয়নি, আপনার তবন টাক্‌নুর নীচে পড়ে আছে।'

আমি তা না দেখেই বললাম. 'আমার তবন যে ভাবেই থাকুক, তাতে আমার কিন্তু নামাজের অসুবিধা হয়নি। যেহেতু আপনারা আমার পিছনে নামাজ পড়েছেন, তাই আপনাদের এ ধারণা হলে আপনাদের নামাজ আবার পড়ে নেয়া দরকার।'

এই বলে আমি সেই স্থান ছেড়ে চলে এলাম। পাশেরই একদোকানী আমাকে ডেকে বসালো এবং বাক বিতন্ডার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। আমি সব খুলে বলায় সে বললো, 'আপনি কি জানতেন না যে এটা আহলে হাদীসের মসজিদ?'

আমি বললাম, 'জানলে কি আর ওখানে পা রাখি।'

দোকানী আমার পরিচয় নিলো এবং এর প্রতিকার হবে বলে আশ্বাস দিলো। কিন্তু আমি কোনো কিছু বলতে বা করতে নিষেধ করলাম। কারণ আমি তাদেরকে জব্দ করেই এসেছি। এজন্য আর অধিক কিছু করা আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করিনা। তবু এ ব্যাপারটা নিয়ে কয়েক দিন জটলা হয়েছে। কিন্তু আমি যোগ না দেয়ায় কোনো কিছু হয়নি।

তা না হোক, তবু ব্যাপারটির মধ্যে এমন একটা সংকীর্ণতা আছে, যা আমাকে আঘাত না করে পারেনি। ধর্ম নিয়ে একী রেষারেষি! অথচ সবাই নিজেদেরকে মুসলমান বলছে। সেই যে গল্প আছে না, বৃদ্ধ বড়ো ভাই মারা গেছে, ছোট ভাই মাথা থাপড়িয়ে কাঁদছে। কেউ যেই বললো যে বুড়ো মানুষ মারা গেছে, এতে এমন কাঁদার কী আছে? অমনি ছোট ভাই বললো, 'আমিতো সেজন্য কাঁদি না, আমি কাঁদছি, কারণ সে কাফের হয়ে মারা গেলো। 'বলা বাহুল্য, বড়ো ভাই হানাফী ছিলো।

গল্প আরো আছে, মনসুর সাহেব নির্বাচনে নেমেছেন। এক হানাফী এলাকায় গেলেন ভোট চাইতে। মাগরেবের নামাজে দাঁড়িয়েছেন, অমনি দুই মুসুল্লী তাকে বগল দাবা করে নামাজের বাইরে নিয়ে গেলো, বললো, 'এখানে বসে থাকুন, নামাজ না পড়লেও এরা ভোট দেবে; কিন্তু আহলে হাদীস বলে জানতে পারলে একটি ভোটও পাবেন না।'

রেষারেষির এমনি বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে ঐ এলাকায়। কিন্তু কেন? এর উত্তর কে দেবে! যদি দিতেই পারতো, তা হলে এক আল্লার বান্দারা এমন শতেক দলে বিভক্ত হয়ে মারামারি করে মরতো না। বুঝা খুবই মুশকিল, একই নামাজ তারা একই মসজিদে পড়তে পারে না কেন। কেন পৃথক মসজিদ তৈরী করতে হয়! একই ধর্মে যদি এ তো বিভেদ, তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে বিভেদতো থাকবেই। কিন্তু সর্বত্রই একটি বস্তু সাধারণ, সেটি হলো পরস্পরের প্রতি ঘৃণা। এই ঘৃণার প্রচার ও প্রসারের জন্যই কি ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিলো?

না, এই ক্ষোভের কথা প্রকাশ করে কোনো লাভ নেই! পৃথিবীতে আলোর চাইতে অন্ধকারই বেশি। একটি সূর্য দিয়ে তাইতো অন্ধকার দূর হয় না। সূর্য যখন মধ্য গগনে,তখনো অন্ধকার গুহায় গর্তে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, সূর্য চোখের আড়াল হলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কিছু লেপে মুছে একাকার করে দেয়। মানুষের সমাজেও এমনি

ঘটে; ঘটে ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেও। আমাদের মধ্যে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার যে অন্ধকার বিরাজ করছে, জ্ঞানের আলোও তা বুঝি দূর করতে পারে না। তবু কী অফুরন্ত আশা, কী অক্লান্ত সাধনা নিয়েই না মানুষ অন্ধকার দূর করবার চেষ্টা করছে! কোনো দিন কি মনের গহন গভীরে লুক্কায়িত এই অন্ধকার দূর হবে? কোনো দিন কি আলোর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে? কে জানে!

ধানিখোলায় আমার নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে আসছিলো। সে দিন বোধ হয়, মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ছিলো। কোনো ব্যাপারে আলোচনার জন্য শিক্ষকদেরকেও সেখানে ডাকা হয়েছিলো। আমিও ছিলাম সেই মিটিংয়ে। আমার পরিচয় জানার পর ইয়াকুব আলী নামে একজন সদস্য হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আপনার ধর্মমত কী? আমি বললাম, 'ইসলাম।'

তিনি বললেন, 'সেতো জানি, কিন্তু আপনি মজহাবী না লা-মজহাবী?' আমি বললাম, 'আমি মুসলমান এবং এতেই আমি সন্তুষ্ট।'

আমার এ উত্তর শুনে ধর্ম সম্পর্কে তিনি নানা ধরণের প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রশ্নের মধ্যে আলোর ঝলকানি ছিলো, আমার ভালো লেগেছে। মনে হয়েছে, এমনি আলোর প্রাবল্য যদি আমাদের মানস চেতনাকে ঝলসে দিতে পারতো, তাহলে হয়তো আমরা অন্ধকারের এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতাম।

ধানিখোলায় আমার এক মাসের চাকরিতে আমি বেতন পেয়েছিলাম পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু অন্ধকার ও আলোর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, তার মূল্য অপরিসীম। আমার স্মৃতির সঞ্চয়ে তা চিরকালের জন্য অক্ষয় হয়ে আছে।

ভীষণ রোদ উঠেছে। আমি, আমার মামা শ্বশুর খালেক মাস্টার, আরো একজন কেউ; আমরা হেঁটেই ময়মনসিংহের দিকে যাচ্ছি। একটা রিকসা পাওয়া গেলো, তাতে খালেক মিয়া ও সেই ভদ্রলোক উঠে বসলেন। না, আমি হেঁটেই চলে যাবো। একা রিকসা ভাড়া করে যাবার মতো নবাবী আমার পক্ষে সম্ভবনয়। পকেটে অবশ্যি বেতনের নগদ পঞ্চাশটি টাকা আছে। কিন্তু প্রয়োজনও আছে। তাছাড়া এতো নিজের উপার্জনের টাকা, একটু চিন্তা করে খরচ করা দরকার। না, অর্থ উপার্জনতো আমি বলতে গেলে করিইনি। সেই যে কুলিয়াটিতে গরু রাখালি করে কিছুধান এনেছিলাম। এর পর যা কিছু করেছি, সে লেখাপড়াই হোক আর বিয়ে শাদীই হোক, সবইতো পরের ধনে পোদ্দারি। তাই এই পঞ্চাশটি টাকাই বোধ হয়, আমার প্রথম নগদ অর্থ উপার্জন। একারণেই এই টাকাগুলির প্রতি আমার একটা ভিন্ন ধরণের মায়া আছে।

কিন্তু কানহর বাজার পেরিয়েই হেকিম জাফর আহমদের সাথে দেখা হয়ে গেলো। তিনি এদিকেই কোথাও রোগীর বাড়িতে এসেছিলেন। এই রোদের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে হেঁটে শহরের দিকে যাচ্ছেন। অনেক দিন পরে দেখা হলো তাঁর সাথে। চকবাজারে তাঁর সেই দোকানটি আর নেই। নতুন করে দোকান বরাদ্দ করার সময় তিনি আর লাইনে দাঁড়াননি। তা না হলে চকবাজারেই তাঁর সাথে দেখা হতো। তিনি

আমার ধানিখোলার চাকরির কথা শুনে বিস্মিত হলেন। মনে হলো, লেখাপড়া ছেড়ে আমি যে এমনি মাস্টারি করে বেড়াচ্ছি, তা তাঁর ভালো লাগেনি। হঠাৎ আমার এই সব দয়াল চিত্ত অভিভাবকদের এ প্রকার সদিচ্ছার কথা স্মরণ করে মনের মধ্যে কেমন একটা আবেগের সৃষ্টি হলো। সামনে দিয়ে একটি খালী রিকসা যাচ্ছিলো, সেটি থামিয়ে আমি হেকিম সাহেবকে নিয়ে তাতে উঠে বসলাম। নগদ পাঁচটি টাকা ব্যয় হবার জন্য মনটা একটু খচখচ করলেও মনে হলো, এটা অপব্যয় নয়, এ ধরণের ব্যয়ের মধ্যে একটা তৃপ্তি আছে।

রিকসায় বসে আরো অনেক কথাই মনে পড়লো। মদনের চাচাজীর সাথে অনেক দিন ধরে দেখা হয় না। তিনিও আর পত্র লিখেন না। আমিও লিখতে পারছিনা। কেমন একটা অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে। পথ চলার পাথেয়ের জন্যই আমাকে ভিন্ন পরিবেশের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সুতরাং তাঁর কথা একান্ত অনিচ্ছায় ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছি। দেখা সাক্ষাত যদি হতো, তাহলে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারতাম না। আজতো হেঁটেই শহরে চলে যেতাম, হেকিম সাহেবের জন্য রিকসায় চড়তে হলো। চাচাজী হলেও একই দৃশ্যের অবতারণা হতো। কিন্তু না, বাস্তবে আমার পক্ষে তাঁর জন্য আর কিছু করা সম্ভব নয়।

আর শুধু তাঁর কথাই বা বলছি কেন। এই যে একবারের বদলে দু'বার বিয়ে করলাম, আমার স্ত্রীকে কি আমি আমার উপার্জিত অর্থ দিয়ে কোনো কিছু কিনে দিতে পেরেছি? কিংবা আমার শ্বশুরকে কোনো সাহায্য করতে পেরেছি? একবার বৃত্তির দেড়শ' টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সেতো দেড় হাজার হয়ে জমির মধ্যেই ঢুকে গেছে এবং সে জমিও কেনা হয়েছে আমার নামে। কাজেই এবার যখন কয়েকটা টাকা হাতে এসেছে, তখন অন্ততঃ সায়িদার জন্য একটা কাপড় কেনা দরকার। তাই করলাম, শহরে পৌছে তেরো টাকা দিয়ে একটি শাড়ী কিনলাম। স্নো পাউডার কিনেছিলাম কিনা, এখন আর মনে করতে পারছিনা।

তবে এসব যে আমার উপার্জনের পয়সায় কেনা, সে কথা কারোর কাছেই বলতে পারিনি। কারণ এই বলার মধ্যেও কেমন একটা লজ্জা আছে, সেই শৈবালের এক ফোটা শিশির দেবার মতো লজ্জা। অবশ্যি শৈবাল দীঘিকে এক ফোটা শিশির দেবার সময় কিছুটা অহমিকাই প্রকাশ করেছিলো; কিন্তু আমার তেমন কোনো অহমিকা প্রকাশের মানসিকতা অতীতেও ছিলো না, এখনো নেই। কাজেই আমি লজ্জা পেয়েছি।

কিন্তু থাক সে কথা। বাস্তব ক্ষেত্রে আমি দোকানদারি, মাস্টারি আর সংসারি, যাই করিনা কেন, আমার মূল কর্তব্য হলো অধ্যয়ন। সে কথা আমি কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না। এ কারণেই আবার আমাকে হোস্টেলে ঠাঁই নিতে হলো। অবশ্যি খরচ তেমন একটা কিছু নয়, সালামের হোটেলে মাসিক চল্লিশ টাকার বাঁধা খাওয়া, আর চা নাস্তা বিড়ি মিলে আরো দশপনেরো টাকা। হোস্টেলের সিট ভাড়া তিন টাকা দিলেও বেতন আমাকে দিতে হয়নি। অধ্যক্ষ রিয়াজ উদ্দিন সাহেব এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদারতা

দেখিয়েছিলেন। এমন কি ক্লাসেও তিনি নিজে বসে থেকে আমাকে পড়াবার ভার দিয়ে মাঝে মাঝে লজ্জায় ফেলেছেন। আমার প্রতি তাঁর একটা অদ্ভুত স্নেহ ছিলো। আমার আলীয়ার ফলাফলই ছিলো এই স্নেহের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি আশা করেছিলেন, আমি ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষাতেও অনুরূপ দর্শনীয় কৃতিত্ব দেখাবো। এর ফলে তাঁর নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি বাড়বে, ছাত্র বাড়বে, আয় বাড়বে। এ জন্যই তিনি মাঝে মধ্যে উৎসাহ ব্যঞ্জক কথাবার্তা বলেছেন।

কিন্তু ইসলামিক ইন্টারে আমার পাঠ্য বিষয় কী ছিলো, তা কিছুতেই মনে করতে পারছিনা। আরবিতো নিশ্চয় ছিলো, আর অন্য বিষয়ও এই আরবি ঘেঁষাই একটা কিছু হবে। কারণ সম্পূর্ণ নতুন কোনো বিষয় হলে তা স্মৃতি থেকে এমন ভাবে মুছে যেতো না। কারণ স্মৃতির সঞ্চয়ে ঠাঁই পেতে হলে চেতনাকে আলোড়িত করতে হয়। তা না হলে স্মৃতি তার বোঝা লাঘব করতে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে বলে প্রায় সব কিছুকেই আবর্জনা স্তূপে ফেলে দিতে চায়। সুতরাং আমার অধীত বিষয়ের নামও তেমনিভাবে হয়তো আবর্জনায় ঠাঁই লাভ করেছে।

আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে মৌলানা জালাল উদ্দিন কোরায়শী মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও অধ্যাপক গোপেশ চন্দ্র দত্তের কথা মনে পড়ছে। কোরায়শী সাহেবের স্নেহও আমি পেয়েছিলাম। তাঁর সাথে আমার শ্বশুরের পরিচয় ছিলো। সেই সুবাদেও তিনি আমাকে স্নেহভাজন বলে গণ্য করতেন। অবশ্য মোহাম্মদ আলী সাহেব আমার প্রতি কেমন একটা সমীহের ভাবই পোষণ করতেন। আমার আলীয়ার ফলাফলকে তিনি ভুলতে পারেন নি বলেই তাঁর ব্যবহারে একটা সংকোচ ছিলো। কিন্তু গোপেশ বাবু সকল প্রকারের সংকোচ থেকেই মুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদেরকে বাংলা ইংরেজি পড়াতেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অনেক সময় যুক্তিবাদিতার প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষত্বের জন্যই ওর দ্বারা আমার পক্ষে উপকৃত হওয়া সম্ভব ছিলো না। কিন্তু রাশভারী দোহারা চেহারার এই ভদ্রলোক যে আমার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন, তা টের পেয়েছিলাম, নির্বাচনী পরীক্ষার ইংরেজি খাতার মধ্যে নম্বর দেয়া প্রসঙ্গে। তিনি আমাকে পঁয়ত্রিশ নম্বর দিয়ে লিখেছিলেন, 'একান্তভাবে সতর্কীকরণের ইচ্ছাতেই তোমাকে এই নম্বর দিলাম। তা না হলে তোমাকে পাস করানো এমন কোনো কঠিন ব্যাপার ছিলো না।' বলা বাহুল্য তখন পরীক্ষার পাস মার্ক ছিলো ছত্রিশ। আমি তাঁর এই নম্বর প্রদান ও মন্তব্যে যুগপৎ দুঃখিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। দুঃখিত হবার কারণ, আমার জানা মতে এই প্রথম আমি একটি পরীক্ষায় ফেল করলাম। তিনি যে কারণেই নম্বর কম দিয়ে থাকুন না কেন, আমাকে যে ফেল করিয়ে সতর্ক করেছেন, সে কথাতো অস্বীকার করা যায় না। আর আনন্দের ব্যাপার ছিলো এই যে, হাবভাবে বুঝা না গেলেও আমার প্রতি তাঁর একটা বিশেষ স্নেহ ছিলো। তাই তিনি এ কাজটি করেছেন। এর ফলে ইংরেজির ব্যাপারে আমি প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি। পাস করিয়ে দিলে হয়তো বিষয়টি সম্পর্কে আমি অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতাম না। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমার সহপাঠীদের মধ্যে সিদ্দিকুর রহমানের কথা আগেই বলেছি। ভালো ছাত্র হবার সুবাদে তাঁর একটা নিজস্ব অহমিকাবোধ ছিলো। এর ফলে তাঁর সাথে প্রয়োজনীয় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেনি। অন্যদিকে এই কারণে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবু তার সাথে তাদের মাদ্রাসা কোয়ার্টারের বাসায় দুয়েকবার গিয়েছি বলে মনে পড়ছে। এ ভাবেই তার পিতা মুনির উদ্দিন মুনসী সাহেবের সাথেও আমার পরিচয় হয়। নতুন বাজারে তাঁর একটি হোটেল ছিলো। সামনে দিয়ে গেলেই তিনি ডেকে বসাতেন। বড়ো মসজিদে এলেও কিতাবের দোকানে আমার খোঁজ করতেন। ছেলের সহপাঠী হিসাবেই আমার প্রতি তিনি যথেষ্ট স্নেহ পোষণ করতেন। তিনি নিজেও খুবই সাধারণ অবস্থা থেকে বড়ো হয়েছিলেন।

এই পরিচয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে হোস্টেলের সেই নুরুদ্দিন ছাড়াও অন্য এক নুরুদ্দিনের কথা মনে পড়ছে। সে ছিপছিপে একহারা চেহারার ছিলো। সহপাঠীদের মধ্যে তার সাথে বেশ কিছুটা অন্তরঙ্গতা জন্মেছিলো বলা যায়। এ ছাড়া অন্যসব সহপাঠীর কথা বেমালুম ভুলে গেছি। তাদের চেহারা, নাম, সংখ্যা, কোনো কিছুই মনে পড়ছে না।

এমনি আরো একটা দিক উল্লেখ করতে লজ্জা পাচ্ছি। ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হবার প্রথম বছরে আমি গলগণ্ডার এক বাড়িতে মাস দেড়েকের জন্য লজিং থেকেছিলাম। রেল লাইন থেকে একটা পুকুর ওয়ালা বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়ে সামান্য পশ্চিম দিকের একটা বাড়ি। কিন্তু কারো নামই মনে করতে পারছি না। শুধু রেল লাইন দিয়ে হেঁটে হেঁটে কলেজে আসা যাওয়ার স্মৃতিটুকু টিকে আছে। তেমনি দ্বিতীয় বছরে মাস খানেকের জন্য নতুন বাজারের কাছে এক বাসায় লজিং থেকেছিলাম। বারী সাহেবের দোকানের পাশ দিয়ে ভিতরের দিকে সেই বাসায় যাবার রাস্তা। আমি একটি টিনের চালা ঘরে থাকতাম। তার পিছনেই বোধ হয়, বাড়ির মেয়েরা ছোট ছেলেমেয়ের পায়খানাসহ আবর্জনা ফেলতো। এর ফলে সেখানে একটা বিকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছিলো। সেই দুর্গন্ধ যেন এখনো আমার নাকে লেগে আছে। কিন্তু বাড়ির মালিক বা অন্যদের নাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

এমনি আরো অনেক ব্যাপারই আছে, স্মৃতি যাদের নামধাম কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারেনি। কেবল আভাস ইঙ্গিত নিয়ে সেগুলি আমার সামনে এসে উপস্থিত হয় ; যেন অনেক দিন আগের পরিচিত কোনো লোক, মুখের আদলটা চেনাচেনা, কিন্তু নাম পরিচয় কিছুই মনে নেই। কিন্তু অনেক সময় এমন ব্যাপারও অচেনা হয়ে দেখা দেয়, যেখানে আমার অকৃতজ্ঞ হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ যে ব্যক্তি বা পরিবার আমার উপকার করেছিলো, তারা তখন ভাবে, লোকটা এমন অকৃতজ্ঞ, সবকিছুই বেমালুম ভুলে বসে আছে! উপকারীর কথা যে মনে রাখতে পারে না, সেওতো অকৃতজ্ঞই। কিন্তু আমিতো ইচ্ছা করে ভুলে যাইনি। অদর্শনই এই বিস্মৃতি নিয়ে এসেছে।

কাজেই আমার ফুফাতো ভাই মৌলবী শমশের আলীর বিয়ের ব্যাপারটি আলোচনা করতে গেলেও অনেকাংশে এই বিস্মৃতির কবলে পড়তে হবে। অথচ এই বিয়েতে আমি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলাম। এর ফলে বিয়েটি ভেঙে যেতে যেতে ভেঙে যায়নি। বিয়েটি অবশ্যি শমশের ভাই নিজেই খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে কনে পক্ষের কিছু কথায় তাঁর মন বিগড়ে যায়। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, এই বিয়ে না হলে শমশের ভাই আর বিয়েও করতে পারতেন না। কারণ আমি তাঁর চাইতে বিশ বছরের ছোট হয়েও ইতিমধ্যে দুই বিয়ে করে ফেলেছি, কিন্তু তিনি তখনো পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এদিকে চুলে পাক ধরেছে, ঘন কলপ দিয়ে তার কৃষ্ণশোভা ঠিক রাখতে হচ্ছে।

পাত্রীর চাচা কোনো এক জুট কোম্পানীর পারচেজার ; বাসা বাঘমারায়। পাত্রী দেখে আমার পছন্দ হলো। কারণ কিছুটা শ্যামলা বর্ণের হলেও দেখতে বেশ বড়সড়ো। শমশের ভাইয়ের সাথে মানাবে ভালো। কাজেই আমি অনেকটা জোর করেই তাঁর হাল ধরে রাখলাম। শেষ পর্যন্ত বিয়ে তাঁকে করতেই হলো।

ভাবীকে প্রথম দিকে কিছুটা হাবাগোবার মতো মনে হয়েছিলো। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখলাম, ভদ্রমহিলার সংসার বুদ্ধি বেশ টনটনে। তিনি আমার ভবঘুরে আধবুড়ো রগচটা ভাইটিকে সুন্দরভাবে ম্যানেজ করে নিয়েছেন। ঢাকার খিলগাঁয়ের মেয়ে হয়েও পূর্ব ময়মনসিংহের গ্রামের বাড়িতে নিজেকে এমনভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন যে, দেখে মনেই হয় না, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে শহরে। এর মূলে অবশ্যি আমার ফুফাতো ভাইদের বাড়ির পরিবেশও কাজ করেছে।

এই জীবন কথার প্রথম দিকে আমি ধারাকান্দির ফুফাতো ভাইদের কথা উল্লেখ করেছি। তখন শমশের ভাই বাড়িতে ছিলেন না। তাঁকে শৈশবে দেখেছি নেত্রকোণায় আমাদের নলুয়া পাড়ার বাসায়। বাবার খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর স্নেহ শমশের ভাইয়ের ভবঘুরে প্রবৃত্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি মাদ্রাসায় পড়তে পড়তে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সিলেটের শাহজালালের দরগার অন্যতম খাদেমে পরিণত হলেন। সেখানে শাহী আরাম আয়েশে বেশ দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিয়েছেন। বিয়ে শাদীর কথা চিন্তা করেছিলেন কিনা জানি না। এইবার বাড়িতে ফিরে এসে বিয়ের চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বয়সের জন্য তা বারবার ভেঙে গেলো। শেষতক অনেকটা অনিচ্ছা নিয়েই তিনি এই বিয়ে করেছিলেন।

আরো একটা কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। শমশের ভাই যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, তখন তাদের অবস্থা খুব ভালো ছিলো না। তাঁর অন্য তিন ভাই তাঁর অনুপস্থিতকালে অবস্থা-ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তাঁদের কেনা সমস্ত সম্পত্তিতে তাঁরা শমশের ভাইকে অংশীদার করেছেন। না, শমশের ভাই কোনো টাকা পয়সাও তাঁদেরকে দেননি। এর ফলে তিনি বিয়ে করে যেমন নির্বিবাদে স্ত্রীকে গ্রামের বাড়িতে রাখতে পারলেন, ঠিক তেমনি আমার শ্বশুরের

দোকান পরিচালনার মাধ্যমে আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের মামলার খরচ চালানো এবং আমার লেখাপড়ার খরচ যোগানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। নতুবা তিনি এ সব কাজে এতোটা নিষ্ঠার সাথে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন না। বিয়ে হয়তো করতে পারতেন, কিন্তু স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করতেই তাঁকে অন্যত্র ব্যাপৃত থাকতে হতো।

এজন্যই তাঁদের বাড়ির পরিবেশের কথা আমি এমন নির্দ্বিধায় উল্লেখ করতে পেরেছি। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁরা চার ভাই একান্নভুক্ত। এটিও ছিলো ঐ এলাকার একটি দর্শণীয় ব্যাপার। আর এর ফলে তাঁরা গৃহস্থি করেও অভাবনীয় উন্নতি করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্যি তাঁদের এই একান্নভুক্তি অটুট থাকেনি।

সে যাহোক, শমশের ভাই মূলতঃ আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য যে বাঁটোয়ারা মামলা দায়ের করেছিলেন, তার প্রাথমিক পর্যায় ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে। নোটিশ পেয়ে কাওলাদাররা জবাব দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা শুধু সময় দেবার আবেদন জানাচ্ছে। কারণ তারা কাওলা করে নিয়েছে মার নিকট থেকে। অথচ আইনতঃ মা শুধু তাঁর প্রাপ্য দু'আনি সম্পত্তিই বিক্রি করতে পারেন। তাদের কাওলার এই দুর্বলতার জন্যই দরবার ডেকে আমি উচিত মূল্যের বিনিময়ে তাদেরকে জমি ফিরিয়ে দিতে বলেছিলাম। কিন্তু তারা নিজেরাই গোয়ার্তুমি করে এমনি মামলার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু এখন তারাই কাওলা দেখাতে ভয় পাচ্ছে।

আর ভয় পাবারই কথা। কারণ আমিতো জানি, জমি ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব সমর্থন করে গ্রামের বহু লোকই আমার ডাকা সেই দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু কাওলাদারদের সিদ্ধান্ত তাঁদের সদিচ্ছার কোনো মর্যাদা রাখেনি। এজন্য তাঁরা সত্যি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং মামলা করতে পারলে তাঁরা যে সাহায্য করবেন, সে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কারণ মধুর বাপ মৌলবীর ছেলেমেয়েদের এমনভাবে বানের পানিতে ভেসে যাওয়াকে তাঁরা খুব ভালো বলে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ গ্রামের সাধারণ বিশ্বাস, পাপের সংসারই তছনছ হয়ে যায়। অথচ আমার বাবা সে ধরণের কোনো পাপ করেছিলেন বলে তাঁদের জানা নেই। সুতরাং দেখতে না দেখতেই যখন এই পুণ্যবান ব্যক্তিটির সংসার ছারখার হয়ে গেলো, তখন তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের বিপরীত ব্যাপার দেখে বিস্মিত হবার চাইতে দুঃখিত হয়েছিলেন বেশি। কাজেই মধুর বাপের স্মৃতিই আমাদের তথা শমশের ভাইয়ের মামলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলো। বস্তুতঃ এর প্রমাণ আমি পরবর্তী পর্যায়েও অনেকবার পেয়েছি।

কিন্তু যারা জমির কাওলা করেছিলেন, তাঁরাও তো এই গাঁয়েরই লোক। তাঁরা কী করে বাবার স্মৃতিকে ভুলে যেতে পারলেন। কারণ তাঁরা জমির লালসাতে পড়েছিলেন। এমনি লালসা যে কতো মারাত্মক হতে পারে, তারই একটি ঘটনা মনে পড়ছে।

এ সময়েই আমার শ্বশুর বাড়ির বড়ো ভাই একটি মারাত্মক অসম্মানের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের শুরু থেকে বহুকাল চরসিরতা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এ সময়ে তিনি বয়সের জন্যই এইপদে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকেন। এরফলে তিনি দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সিরতার হাফিজ উদ্দিনের পক্ষে ভোট দেন এবং সে প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়। আর অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী গোবিন্দ পুরের ইমান আলী এ কারণে বড়ো ভাইয়ের প্রতি মহা খাপ্পা হয়ে উঠে। এর ফলে গোদাড়ায় নদী পার হবার সময় সে বড়ো ভাইকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি, এমন কি জুতা খুলে মারতে আসে। নৌকা ভর্তি লোক, কিন্তু ইমানের মারমুখী পাগলামি দেখে কেউই প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়নি। কিন্তু হঠাৎ আমার কী মনে হলো, আমি তীব্র ভাষায় এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করলাম। এরফলে সে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং ডেগার বের করে ঘুরাতে লাগলো। বেশ কিছু লোক আমাকে ঘিরে ধরে আমার মুখে হাত চাপা দিলো, যাতে আমি কোনো কথা বলতে না পারি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে এমন ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো যে, আমি আটকা পড়ে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করি।

আসলে বড়ো ভাইয়ের এই অহেতুক অপমান আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। তাঁর সম্মানের একটি প্রসঙ্গ আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। বস্তুতঃ সারা ইউনিয়নের লোকজন তাঁকে পীরের মতোই মান্য করতো। কাজেই এমনি একজন মান্যবান ব্যক্তিকে বিনা দোষে অপমান করা খুবই অন্যায় ও অমানবিক কাজ ছিলো। একটি পদের লালসাতেই ইমান আলী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এই অপকর্মটি করেছিলো। সুতরাং গোদাড়ার নৌকা পাড়ে ভিড়তেই তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো এবং সে বড়ো ভাইয়ের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে চাইতে অচেতন হয়ে গেলো।

সে এক হৈ চৈ কাণ্ড! আমরা তখন নতুন আক্রমণের দুশ্চিন্তায় ভুগছি। কিন্তু মাথায় প্রচুর পানি দেবার ফলে ইমান আলীর জ্ঞান ফিরে এলো এবং আমরাও নিশ্চিন্তে বাড়িতে ফিরে আসতে পারলাম। কারণ ইমান আলীর একটা কিছু হয়ে গেলে, তজ্জন্য আমাদেরকেই দোষী করা হতো। গ্রামের কুসংস্কার বড়ো মারাত্মক। বান মারার একটা মিথ্যা অপবাদ তুলে আমাদেরকে ধোলাই করা কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিলো না।

এর প্রমাণ পেলাম কয়েকদিন পরেই। গোদাড়া পার হয়ে শহরে যাচ্ছি, হঠাৎ এক চায়ের দোকান থেকে ইমান আলী আমাকে ডাকতে আরম্ভ করলো। আমি যেতে ইতস্ততঃ করায় সে বেরিয়ে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো। আমার জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে বললো, 'বাবাজী, সেদিন একটা গর্হিত অন্যায় করেছি। নির্বাচনে হেরে গিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। আপনি মনে মনে ভেবেছেন, লতু সরকারের পুত একটা আস্ত কুত্তা। কিন্তু আমি যদি সেদিন মারা যেতাম, তা হলে আপনাদের কী অবস্থা হতো ভেবে দেখেছেন! আমার গোষ্ঠির লোকেরা আপনাদেরকে কি ছেড়ে দিতো! কাজেই আমি বেঁচে থেকে আপনাদেরকেও বাঁচিয়ে দিয়েছি। এবার খুশী মনে আমাকে মাফ করে দিন। কারণ সেদিন আপনার সাহস আমি দেখেছি।'

আমি আর কী করি, তার চা খেয়ে তাকে মাফ করে দিলাম। তবে একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলতে পারি, এ জীবনে আমি যে ক'জন ইমান আলী নামের

লোকের সাক্ষাত পেয়েছি, তাদের কাউকেই খুব একটা ভালো বলে মনে হয়নি। অন্ততঃ ইমান বলতে যে ধরণের একটি ধর্মনিষ্ঠা বুঝায়, তা তাদের মধ্যে ছিলো না। আমার লজিং মাস্টার বারুরীর ইমান আলীর কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। পরে আরো দুচার জনের সাক্ষাত পেয়েছি। কিন্তু আমার ধারণার পরিবর্তন হয়নি।

না, আমি সে কথাও জানি এবং মানি যে, নামে কিছুই আসে যায় না। মানুষ তার চরিত্র দিয়েই নিজের পরিচয় তুলে ধরে, নাম সেখানে কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। এ জন্যই ভিখারীর নাম বাদশা, বেশ্যার নাম সাবিত্রী এবং কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়ে হাস্যের উদ্রেক করে মাত্র!

অবিশ্য এমনি হাসিতো আমাদের নামের মধ্যেও লুকিয়ে আছে। আমাদের যে কারোর নামও কাম নিয়ে বিচার করতে বসলে কী বিচিত্র বৈপরীত্যই না ধরা পড়বে! সেই যে গল্প আছে না, বাপমায়ে নাম রেখেছে 'হাছুন চোরা'। ছেলে সেই দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মাঠের মধ্যে দেখে দুটি মেয়ে ধান ক্ষেতের নাড়া কুড়াচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলো। শুনলো, ওদরে একজনের নাম লক্ষ্মী আর অন জনের নাম সরস্বতী। অমনি সে নাম নিয়ে তার দুঃখ পাওয়ার ভুল বুঝতে পারলো। সে বলে উঠলো, 'লক্ষ্মী আর সরস্বতী তারা কুড়ায় নাড়া, ভালো নাম রাখছে মায় হাছুন চোরা।' বলা বাহুল্য 'হাছুন' মানে ঝাঁড়ু।

সুতরাং ঈমান আলীর ঈমান নিয়ে হাপিত্যেশ করার কিছু নেই। তবু স্বভাব যে কী মারাত্মক শত্রু, তারই পরিচয় দিলো সে। গোবিন্দপুর থেকে বিতাড়িত হয়ে সুদূর রংপুরের নদীর চরে গেলো বনবাসে। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারলো না। বিতাড়িত হয়ে আবার ফিরে এলো পৈতৃক গ্রামে। সেখানে খুবই দুরবস্থার মধ্যে তার জীবন শেষ হয়ে গেলো।

মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু তার স্বভাব, মানুষের চরম শত্রুও তার স্বভাব। অন্যে মানুষের যতো ক্ষতি করতে পারে, সে নিজে অনিচ্ছাতেও তার চাইতে বেশি ক্ষতি করে। শক্তির অহংকার, ধনের গর্ব, খ্যাতির অহমিকা কেবলই পায়ের নীচে গর্তের সৃষ্টি করে, আর মানুষ সেই গর্তের মধ্যে তলিয়ে যায়। তাইতো বলি, হে মানুষ! এই পৃথিবীতে তোমার জন্ম হয়েছে কিসের জন্য? সে কি শুধু পশুর মতো জৈবিক তাড়নায় ক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্য?

যাক্, সে কথা থাক। আমার কথা বলি ; সংসার করছি, দোকানদারি করছি, কিন্তু কোনোটারই দায়দায়িত্ব বহন করছি না। কোথায় কী হচ্ছে, ফিরেও দেখছি না। আমার অপাঠ্য পাঠের প্রকোপও কমে গেছে, আত্মপ্রকাশের তাগিদও অনুভব করছি না। শুধু একটি মাত্র চিন্তা, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। কারণ প্রথমদিকে পাঠ্যসূচী দেখে খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। একেবারে না পড়লেও আমার পক্ষে পাস করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু দর্শনীয় কিছু না করতে পারলে আমার অগ্রযাত্রা

ব্যাহত হবে, সাহায্য সহযোগিতায় উৎসাহ পাবে না কেউ। তাই হোষ্টেলে থেকে বেশ নিষ্ঠার সাথে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ডুবে গেছি। সমস্ত সংসার থেকে আমি এখন বিচ্ছিন্ন।

তবু এখানে একটি স্মৃতিকে ভাষা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। আমার একান্ত নিজের কথা বলতে বলতে সেই প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমি। মনে হয় আমার মানসিক অবস্থাই তজ্জন্য দায়ী। কারণ একটু আগে যে বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছি, তখনো সেই বিচ্ছিন্নতাই ছিলো। তাই আমি আলেমদের আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেও তার রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারি নি।

আমি যখন নেজামে ইসলাম পার্টির সভায় বক্তৃতা করছি, দেশের আবহাওয়া তখন বেশ গরম। এখানে সেখানে জোর বক্তৃতা হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। একদিন খরিচা থেকে ফিরছি। গোদাড়া পার হয়েই দেখি বিরাট সভা। দেদার লোক আসছে। সার্কিট হাউজের পূর্ব দিকে নদীর পাড়ে সভার স্থান। সামান্য একটা চৌকির উপর চেয়ার ও টেবিল। কাজেই সেখানেই আটকে গেলাম। বক্তৃতা শোনার আশায় গাছের ছায়ায় বসে রইলাম।

বিকাল তিনটার দিকেই আরম্ভ হয়ে গেলো বক্তৃতা। কিন্তু যারা কথা বলছেন, তাদের কোনো পরিচয়ই আমাকে আকর্ষণ করতে পারলো না। হঠাৎ কেউ বললো, এখন বোকাইনগরী বক্তৃতা করছেন। এবার তাঁকে দেখার জন্য এগিয়ে যেতে হলো। কারণ তাঁর নাম অনেকবারই শুনেছি। কিন্তু তাঁর সেদিনকার বক্তৃতা তেমন জমলো না। দেখেও তেমন কিছু মনে হলো না। সাদা কাঁচা দাড়ি, খয়েরী রংয়ের পাঞ্জাবী পরিহিত মাঝারী গোছের এক বয়স্ক ভদ্রলোক। কিন্তু তাঁর পরেই, যার ছবি বহুবার দেখেছি এবং আগ্রহ ভরে যাকে দেখার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতাম, সেই শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক এসে মঞ্চে উঠলেন। কিন্তু ছবির সাথে তাঁর এই চেহারার কোনো মিল নেই। যেন জমিদার বাড়ির সখের বৈঠকখানা, এক সময়ে তার ভিতরে বাইরে যে সৌষ্ঠব ছিলো, তার অনেক কিছুই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, সাজসজ্জা চাল বেড়া এদিক ওদিক ঝুলে পড়েছে। ভিতরের সজীবতাও যেন নষ্ট হয়ে গেছে। যৌবনের জমিদারী কবেই তো চলে গেছে, এখন শুধু তার স্মৃতি চিহ্নগুলি পড়ে আছে। না, শেরে বাংলার সেদিনের বক্তৃতা কেমন যেন ভাঙা ভাঙা, আধো আধো। তবু এতেই শ্রোতাদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের নয়, শেরে বাংলার নৌকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

পরেও এখানে সেখানে শহরে গ্রামে সেই একই কথা শুনেছি, শেরে বাংলাকে একটা ভোট দিতে হবে। বাংলা ভাষার আন্দোলন শিক্ষিত মানুষের মনে যে চেতনারই সৃষ্টি করে থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষ তাতে খুব একটা অনুপ্রাণিত হয়নি। তাদের কাছে ফজলুল হকই তখন সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ। রাজনীতির মার প্যাঁচ, একুশ দফার তত্ত্ব, এসব কিছু তারা বুঝে না, বুঝতেও চায়না; এমন কি এক সময়ে এই শেরে বাংলাই যে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন, তাও তারা গণ্য করতে চায় না। তারা শুধু জানে ঋণ সালিশী বোর্ডের কথা, প্রাইমারী শিক্ষার কথা, এদেশের গরীব মানুষের

ডালভাতের কথা। সে কথাই শেরে বাংলা নতুন করে বললেন। যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান হয়েছিলো, সেই সাধারণ মানুষের ডাল ভাত, তার তো কোনো ব্যবস্থা এখনো হলো না। বরং আগে যা ছিলো, আশাভঙ্গের বেদনা এসে তাকেও তুচ্ছ করে তুলেছে। সাধারণ মানুষের সুখ সুবিধার কথা বলে যারা পাকিস্তান বানিয়েছিলো, তারা সবাই নিজের নিজের আখের গুছিয়েছে, সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিলো, সেই তিমিরেই আছে। তাই শেরে বাংলাকে একটা ভোট দিয়ে দেখা যাক, ভাগ্যের যদি কোনো পরিবর্তন হয়। কারণ ভরোসা করার মতো আর কেউ তো নেই।

এই-ইতো ছিলো তৎকালীন সাধারণ মানুষের রাজনীতি জ্ঞান। এজন্যই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যে সকল ঘটনাকে যুগান্তকারী বলে মনে করা হয়, তার দ্বারা সাধারণ মানুষের চেতনা খুব একটা আন্দোলিত হয়নি। এর ফলেই মনে হয় পাকিস্তানের সময় তারা বৃটিশ আমলের জন্য হাপিত্যেশ করেছে, এমন কি বাংলাদেশী আমলেও পাকিস্তানের জন্য তাদের হাপিত্যেশ দূর হয়নি। আদর্শের কথা তারা বুঝে না। কারণ খালি পেটে আদর্শের হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কাজেই অবস্থার যতোই পরিবর্তন এসেছে, তাদের পেটের ভাত ততোই দুর্লভ হয়ে উঠেছে। আজো তাই তাদের ভাতের রাজনীতি দূর হয়নি।

ভাতের অভাব অবশ্যি আমার ছিলো না। কিন্তু আমার প্রতিযোগিতাটাই এমন ছিলো যে, এ সকল রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে তা কোনো অবসরই দেয়নি। এ কারণেই এমনি সব উত্থান পতনে আমি নীরব দর্শক হয়েই রইলাম। প্রত্যক্ষ যোগদানের মাধ্যমে তার উত্তাপকে নিজের চেতনায় ধারণ করতে পারলাম না। দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে আমার নিষ্ক্রিয়তা দেখে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, আমি বুঝি এমনি সব ব্যাপারকে মনে মনে ঘৃণা করি। কিন্তু আসলে এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার কোনো অভ্যাসই আমার মধ্যে গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া সেই যে আমার খোলা মেলা সরল স্বভাবের কথা বলেছিলাম, তাওতো এখনো আমাকে ছেড়ে যায়নি। কূটনীতি আমি বুঝি না, তা নয়; তবে তা দিয়ে কোনো ব্যাপারকে জটিল করে তোলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। পানি ঘোলা করে মাছ শিকারের পক্ষপাতী আমি কোনো কালেই ছিলাম না; এখনো নই। আমি চাই সরলভাবে যুদ্ধ করি, সরলভাবে জয়ী হই বা পরাজয় বরণ করি।

সেই যে গল্প আছে না, বাদশা হারুনুর রশিদের বালাখানার থাম হবার জন্য একটি সোজা সরল কাঠ আসছে অনেক দূর থেকে। সেই কাঠ দেখতে স্বয়ং বাদশা এগিয়ে গেলেন, সাথে বয়স্য বাহলুলও আছে। সে সেই কাঠ দেখতে পেয়েই তাকে জড়িয়ে ধরলো, তার সাথে কথা বললো, শেষে তাকে চুমু দিতে দিতে হাসতে লাগলো। বাদশাতো তার পাগলামি দেখে অবাক, বললেন, 'কী ব্যাপার, কাঠের সাথে কী কথা হলো?'

বহলুল বললো, 'আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার এমন কি গুণ আছে, যার জন্য স্বয়ং 'আমিরুল মোমেনীন' এগিয়ে এসেছেন তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতে?'

সে বললো, 'আমার একটি মাত্রই গুণ, আমি খুবই সরল।'

হাঁ, সেই সারল্যই আমার চরিত্রকে অধিকার করে আছে। তাই একদিকে থেকে এ যেমন আমার এক প্রচণ্ড শক্তি, তেমনি পরম দুর্বলতাও। কারণ সংসার যুদ্ধতো এই সরলতা দিয়ে জয় করা যায় না, জয় করার নিয়মও বুঝি নেই। তাইতো 'নাথিং আন-ফেয়ার ইন লাভ এণ্ড ওয়ার' বলে আমরা কুটিলতাকে এমনভাবে প্রশ্রয় দিই।

থাক্, এসব তত্ত্বকথা বলে কী লাভ হবে! আমিতো আমার পরীক্ষা নিয়েই আছি। সেই পরীক্ষাও আরম্ভ হয়ে গেলো। ১৯৫৬ সনের মার্চ মাসে আমি ইসলামিক ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষা দিলাম। নাসিরাবাদ কলেজেই কেন্দ্র। পরীক্ষার অন্যসব দিক প্রায় কিছুই মনে নেই, শুধু বাংলা পরীক্ষায় একটি রচনা লিখতে গিয়ে আমি বেশ কাটাকুটি করেছিলাম। এর ফলে আমার মেজাজটাই খারাপ হয়ে যায়। কারণ পরীক্ষার খাতায় এমনি কাটাকাটির স্বভাব আমার ছিলো না। তাই এটি স্মৃতিতে গেঁথে আছে।

পরীক্ষার পর আমি খরিচা চলে গেলাম। কিন্তু গিয়েই একটি দুঃসংবাদের মুখোমুখি হলাম। আমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে জানতেই পারিনি যে, এমন ভাবে আমার পিতৃত্বের একটি সম্ভাবনা দোর গোড়ায় এসে পড়েছিলো। কারণ সায়িদার বয়স তখন এমন কিছু নয় যে, আমি তার ব্যাপারে এমন কিছু খুঁজে বেড়াবো। আর সেও নিদারুণ লজ্জায় এর সবটাই আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছে। বু'ও আমাকে এমন কিছু বলে উত্ত্যক্ত করতে চাননি। আমার মনে হলো, পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলে তাঁরা আমাকে চমৎকৃত করে দেবার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু সেই আয়োজন হরিষে বিষাদ হয়ে গেলো। আমি জানি না, সায়িদার অপরিণত বয়সের জন্যই হোক, কিংবা গরুর গাড়িতে করে পশ্চিম পাড়া বেড়াতে যাবার কারণেই হোক, কিংবা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণের দ্বারাই হোক, সে পাঁচ মাসের শেষেই গর্ভপাতের দ্বারা আক্রান্ত হলো। অথচ আমি নদীর ওপারে থেকেও কিছু জানতে পারলাম না। আমি গিয়ে দেখলাম, প্রচুর রক্ত ক্ষরণে সে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মানসিক দিক থেকেও কেমন যেন নির্জীব। আমিতো দেখিনি, কিন্তু শুনলাম, তার সেই অপূর্ণ সন্তানটি ছিলো একটি পুত্র সন্তান। ওর জন্য তার বুকে দুধ এসেছে, তার মনে মায়া এসেছে; কিন্তু সেই সন্তান সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন করে পালিয়ে গেছে। আমি দেখলাম,সে নীরবে বুকের দুধ ও চোখের জল ফেলছে। সব দেখেশুনে কেমন মর্মপীড়া অনুভব করলাম। না, পিতৃত্বের বেদনা তখনো আমার মনকে অধিকার করেনি। তাছাড়া আমার তখন মেলা কাজ।

দোকান শমশের ভাই চালাচ্ছেন। পুঁজি যে খুব বেশি কিছু আছে, তা নয়; তবে কোনো প্রকারে সব খরচই চলে যাচ্ছে। এবার কিছুটা অবসর হওয়ায় আমি কয়েকবার ঢাকা গেলাম। সেখানে চকবাজারের এমদাদিয়া, হামিদিয়া, মোহাম্মদী, তাজ, আলিমী লাইব্রেরীগুলির সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিলো। আমার শ্বশুরের মাধ্যমে এই পরিচয় গড়ে উঠেছিলো। এমদাদিয়ার আব্দুল করিম সাহেব আমাকে বেশ স্নেহ করতেন। হামিদিয়ার আজম সাহেবের সাথেও অন্তরঙ্গতা জন্মেছিলো। এর ফলে আমি তাদের

নিকট থেকে বাকীতে মাল আনার বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলাম। এভাবে দোকানের পুঁজির একটা সুসার হয়েছিলো। কিন্তু বছরের শেষে সব ঋণ এক সাথে পরিশোধ করে নতুন করে ঋণ গ্রহণ করতে হতো।

এ সময়ে আবার কিছুটা অবসর পাওয়ায় আমি মুসলিম ইনস্টিটিউটের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। মাঝখানেও যে আমার সর্ম্পক ছিলো না, তা নয়; তখন সায়িদাকে বই নিয়ে দিতে হয়েছে। এবার আমি নিজেও অপাঠ্য পঠনে অংশ গ্রহণ করলাম। বিচিত্র সব পুস্তক পাঠের আনন্দ তাই ভোলবার নয়।

আমার স্মৃতি ময়মনসিংহের অন্য একটি লাইব্রেরীর আবছা দৃশ্য সঞ্চয় করে রেখেছে। সেটি কি টাউন হলে ছিলো ? কিন্তু আমি পাঠক হিসাবে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবার আগেই সেটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ কারণেই তৎকালে এই মুসলিম ইনস্টিটিউটকে সাধারণ জ্ঞান পিপাসুদের এক মাত্র আশ্রয় স্থল বলেই আমার মনে হয়েছে। বিচিত্র ধরনের প্রচুর বই ছিলো এই পাঠাগারটিতে। আমি যতোদূর সম্ভব সব বই থেকেই আনন্দ আহরণের চেষ্টা করেছি। এ জন্য আমি তৎকালীন পাঠাগার কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ। আজ আমার সাথে এই পাঠাগারটির সম্পর্ক যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, এখানে শুধু এই একটি কথাই বলে রাখছি যে, আমি কখনো কথায় ও কাজে এর অকল্যাণ কামনা করিনি। জানিনা, যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে আমার 'নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব'-এ রুষ্ট হয়েছেন, তারা ব্যাপারটিকে কীভাবে নিয়েছেন। কিন্তু আমিতো জানি, তাদের এই সংকীর্ণতার মূল উৎস অন্যত্র। সেটির দ্বারাই তারা অতিমাত্রায় আক্রান্ত হয়েছেন। এই হীনমন্যতাবোধ কোনো কল্যাণই বহন করে না।

অবশ্য এ ব্যাপারে সামগ্রিক মূল্যায়নের সময় এখনো আসেনি। তবে এই একটি কথা আমি এখনো স্বীকার করবো যে, এই পাঠাগারটি অত্যন্ত অকৃপণভাবে আমার জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়েছে। কী আগ্রহ নিয়েই না আমি তখন এর আলমারীগুলি হাতড়ে বেড়িয়েছি। যা সামনে পেয়েছি, তাই গোগ্রাসে গিলেছি। ভালো মন্দ, তিতা মিঠার কোনো পার্থক্য করিনি;, পথ্যাপথ্যের কোনো বিচার করিনি। কারণ আমার প্রয়োজন তখন অফুরন্ত খাদ্যের। আমি তা হজম করতে পেরেছি বলেই সব কিছু আমার চৈতন্যে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে, যেন তা আমার দেহের রক্তে পরিণত হয়েছে। সেই রক্ততো এখনো আমার দেহের শিরায় শিরায় বইছে।

এর ফলে আমার জ্ঞানের পরিমাণ কতোটুকু বেড়েছে, তা আমি জানি না। কিন্তু আমি এই একটি কথা জানি যে, আমি পণ্ডিত হতে পারিনি। কারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে বিষয়ের ধারা অনুসরণ করতে হয়, ভালো মন্দ বিচার করতে হয়; এ যেন কৃষি কাজের মতো, বীজ বুনলেই হয় না, নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করতে হয়, সার দিতে হয়, পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হয়, তারপর এক সময়ে পাকা ফসলে ঘর ভরে যায়। তখন নিজে খাও, দান করো; কিছুতেই তা আর শেষ হতে চায় না। কিন্তু আমিতো সে পথে যাইনি। আমি অপরের ফসল যা পেয়েছি, তাই দুহাতে

মুখে তুলে নিয়েছি, চিবিয়েছি এবং গিলে ফেলেছি। তারপর পাচক শক্তি তাকে কীভাবে হজম করেছে, কীভাবে রক্তে পরিণত করেছে, তা সেই জানে। এর ফলে সেই যে ইংরেজি কথা, 'জ্যাক অফ অল ট্রেড মাষ্টার অফ নান' হয়ে উঠেছি আমি।

সে কথা থাক্। ইতিমধ্যে আমার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আমি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। সিদ্দিক দ্বিতীয় হয়েছে। এ বছর নাসিরাবাদের ফলাফল সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কারণ অনেক দিনের মধ্যে এমন ফলাফল আর দেখা যায়নি। এজন্য অধ্যক্ষ রিয়াজ উদ্দিন আহমদসহ সকলেই খুব খুশী। কিন্তু আমার অভিভাবক শ্বশুর থাকলে এই আনন্দ যতোটা দর্শনীয় হতে পারতো খরিচায় তা হয়নি। তবু সায়িদার সুখ্যাতি এতে দ্বিগুণ বেড়েছে। মেয়েটা সত্যি সৌভাগ্যবতী, তা না হলে এমনভাবে খালি প্রথম হবার গৌরব এসে জুটতো না। স্ত্রী ভাগ্যেই নাকি এসব হচ্ছে। কষ্ট করে পরীক্ষা দিলাম আমি আর ভাগ্য ফললো আমার স্ত্রীর, মন্দ না!

তবে ভাগ্য হোক আর না হোক, মেয়েটার ত্যাগ আছে। সে আমাকে কোনো কিছু নিয়েই উত্যক্ত করেনি। তা না হলে, পিছু লেগে থাকলে আমার পক্ষে এমন নির্বিবাদে লেখাপড়া করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। আর ভাগ্যই যদি বলি, তাহলে সে যেখানে একটি পূর্ণ শিশু প্রসব করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো, সেখানে আমার বেলায় এলো একটি পরিপূর্ণ বিজয়। ভাগ্যই বটে, তবে সবই উল্টো।

অবশ্য উল্টোই হোক আর পাল্টাই হোক, এতেই সে পূর্ণ সন্তান লাভের আনন্দ পেয়েছে। অবশ্যি ইতিমধ্যে তার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে গেছে। শুধু আমার মনেই পুনরায় ঢাকা যাত্রার বাস্তব অসুবিধা এসে ভীড় করছে। বৃত্তি একটা পাবো, কিন্তু তা দিয়েতো সব খরচ চলবে না। হলের খরচ, বইপত্রের খরচ, খাতা কলমের খরচ, কোনোটাইতো কম নয়। কিন্তু পাথেয় নয়, পথ চলাই এখন আমার একমাত্র চিন্তা। যে করেই হোক ঢাকাতে যেতেই হবে।

পরামর্শ সভাতো অবশ্যি বসলো, নানা ধরনের কথাবার্তাও হলো, কিন্তু বাস্তব উপায় চোখে পড়লো না। দোকানটা আছে এই যা ভরোসা। তাতে না চললে অন্য চিন্তা করা যাবে। দরকার হলে জমি বিক্রি করতে হবে। বড়ো ভাই, বু, সবারই তাই মত। এমনকি পুবের বাড়ির বু'রও উৎসাহের অন্ত নেই।

এবার গন্তব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর আগেই নাসিরাবাদ কলেজ থেকে ডাক এলো। তাঁরা একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছেন। কলেজের এই গৌরবজনক ফলাফলকে তাঁরা সাড়ম্বরে অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরতে চান। গেলাম সেই সংবর্ধনায়। সাথে বড়ো ভাই। কলেজের দ্বিতল একটি কক্ষ তখন তৈরী করা হয়েছে। এর নীচেরটাই এক সময় আমাদের হোস্টেল ছিলো। বেশ কিছু সংখ্যক অভিভাবক সমবেত হয়েছেন। একটা মানপত্রও ছাপানো হয়েছে।

আমার জীবনের কিন্তু এটিই প্রথম সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এর পূর্বে আলীয়াতে ভালো ফল করলেও তাতে কোনো সংবর্ধনার আয়োজন ছিলো না। শুধু আমি একবার গিয়ে সকলের সাথে দেখা করে এসেছিলাম। সুতরাং এখানে এই আয়োজন দেখে আমি বেশ অভিভূত হলাম। আমার বক্তৃতায় তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তদুপরি আমার চাইতে সিদ্দিকের ফল যে ভালো হয়েছে, সেই কথা যুক্তি দিয়ে উল্লেখ করলাম। শেষে শিক্ষক ছাত্র নির্বিশেষে সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করলাম।

আমার পরে সিদ্দিক দাঁড়ালো। সে তার বৃক্তৃতায় জ্ঞানের বিভিন্ন দিক, এমনকি রাজনীতি পর্যন্ত টেনে আনলো। এই পরীক্ষা যে জ্ঞান রাজ্যের একটি দ্বার মাত্র, সেই কথা বলে জ্ঞানের সৌধে প্রবেশের জন্য যারা তাকে সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

উপস্থিত সবাই তার বৃক্তৃতার প্রশংসা করলো। মনে হলো, এই প্রশংসার ধারা আমিই শুরু করেছিলাম, সে বক্তৃতার মাধ্যমে আমার সেই প্রত্যাশাকেই পূরণ করেছে। সুতরাং এতে আমার বিচলিত হবার কিছু নেই।

এর কয়েক দিন পরেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আগের বার আমার সাথে ছিলেন হেকিম জাফর আহম্মদ, এবার কেউ নেই। আমি একাই গাড়িতে চড়ে বসেছি। জানি, এ গাড়ি গন্তব্যে পৌঁছবেই।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ ॥

জীবন কী, তা আমরা সবাই জানি। তার অজস্র উদাহরণ আমাদের সম্মুখে ছড়িয়ে আছে। আর আমরা প্রত্যেকেইতো একেকটি জীবনের অধিকারী। এই জীবনের একটি শুরু আছে, শেষও আছে; সুতরাং এর মাঝখানে একটা গতি আছে। তাই সে এই শুরু থেকে সেই শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ গতিতে এগিয়ে যায়। যেমন এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকাগামী এই রেলগাড়িটি। জীবনতো এই রেলগাড়ির মতোই, কতো তার স্টেশন, কতো তার যাত্রী প্যাসেঞ্জার।

আমার জীবন রেলগাড়িও বহু স্টেশন পেরিয়ে এসেছে। সেই নেত্রকোণা, আমুদপুর, কাউরাট, কাঁঠালিয়া, বাস্তা, কাতলাসেন, আলীয়া, নাসিরাবাদ, সবগুলিইতো একেকটি স্টেশন। প্রত্যেক স্টেশনেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই গাড়ি থেমেছে, তাতে বহু প্যাসেঞ্জার উঠেছে এবং অনেকে নেমেও গেছে। গার্ড হিসাবে যারা এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদেরও অনেকে পরিবর্তন হয়েছে; অনেকে নেমে গেছেন আর অনেকে চলে গেছেন পরপারে। আজ সেই গাড়ি গার্ড বিহীনভাবে এগিয়ে চলেছে একটি বড়ো জংশন স্টেশনের দিকে।

এই জংশনতো আমার অপরিচিত নয়। আলীয়ায় থাকার সময় অনেকবার এর আশে পাশে ঘোরাফেরা করেছি। এখন ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু তেমন পরিচয়তো কারোর সাথে নেই। আর পরিচয় ছিলোই বা কোথায়! সব ষ্টেশনইতো ছিলো নতুন। কিন্তু কোথাওতো তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। সুতরাং এই জংশন স্টেশনেও অসুবিধা হবে না। এমনি একটা আশা নিয়ে আরবি বিভাগের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে মোটা মোটা কালো বর্ণের মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে সামনে দেখেই হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি গোলাম সামদানী না?'

আমিতো অবাক। কিন্তু উত্তর দিতে হলো, বললাম, 'জ্বি!'

'আমিতো মনে মনে তোমাকে খুঁজছিলাম। ভালো হয়েছে, আজই ভর্তি হয়ে যাও।'

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে আছি। ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পারলেন, অথচ আমি তাঁর পরিচয়ের কোনো সূত্রই খুঁজে পাচ্ছিনা। এর আগে দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না। পরে ঘনিষ্ঠ হয়ে যখন আলাপ করলাম, বুঝতে পারলাম, আমার পরিচয়ের উৎস ছিলো তৎকালে প্রকাশিত 'ইয়ং পাকিস্তান' নামে একটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা। সেখানে আমার পরিচয়সহ ছবি ছাপা হয়েছিলো। আমার পাশেই ছিলো গায়িকা ফেরদৌসীর ছবি। সে সেই বছর মেট্রিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলো। সেখান থেকেই অধ্যাপক আসগর হোসেন আমার পরিচয় সংগ্রহ করেছেন।

কিন্তু ছবির সাথে মিলিয়ে আমাকে ধরে ফেলার মধ্যে একটা নাটকীয়তা আছে। তাতেই আচমকা আমি চমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে সেদিনই আরবি বিভাগে ভর্তি হতে পারলাম না। ভেবে দেখবার কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। রাতে যদ্দূর মনে পড়ে ছফিরের এখানে রইলাম।

এই ছফির, সেই বাইটকান্দির ছফির। বর্তমানে ময়মনসিংহ বারের এডভোকেট মৌলানা ছফির উদ্দিন। তখনো সে আলীয়া থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। সেই সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসেও ভর্তি হয়েছে। থাকে ফজলুল হক হলের সামনের দিকের রাস্তার ও পারে গলির মধ্যে একটি মসজিদের মীনারার নীচে একটি কোটায়। সেও গরীবের ছেলে, অসাধারণ একটা আগ্রহ ছিলো বলেই এপর্যন্ত এগিয়ে আসতে পেরেছে। রাতে তার বিছানায় শুয়ে আরবি বিভাগের পাঠ্যসূচীটি উল্টে পাল্টে দেখলাম। কিন্তু কোনো উৎসাহ পেলাম না। এর অধিকাংশইতো আমার জানা ব্যাপার। তাই এই বিভাগে ভর্তি হওয়া মানে চর্বিত চর্বণ করা। আসগর সাহেব অবশ্যি অনেক কথাই বলেছেন। ভালো রেজাল্ট করতে পারলে ইউনিভার্সিটিতেই ঠাঁই হয়ে যাবে। কিন্তু সে তো পরের কথা। এর মধ্যে একটি জানা বস্তুকে নাড়াচাড়া করেই আমাকে চারটি বছর কাটাতে হবে। না, এ কিছুতেই সম্ভব নয়। এই জ্ঞানের সাগরে এসে আমি আমার পরিচিত নদীর মোহনাতেই পড়ে থাকবো, তা হলে এখানে আসার কী দরকার ছিলো।

তাহলে কী পড়বো আমি ? কোন বিভাগে ভর্তি হবো ? হঠাৎ মনে হলো, সাহিত্য থেকে অনেক কিছুইতো আমি শিখেছি। সে ছিলো আমার অপাঠ্য নিষিদ্ধপ্রায় জগৎ। কিন্তু সেখানেই জীবনের প্রতিচ্ছবি আমাকে জীবন সর্ম্পকে বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে। এখানে এসে তাকেইতো আমার পাঠ্য করে নেয়া উচিত। যা এক সময়ে ছিলো অবসরের সঙ্গী, তাকেই এখানে আমার কর্মের সঙ্গী করে নিইনা কেন!

কিন্তু আমি কি পারবো? সাহিত্য বিভাগের পাঠ্যওতো উলটে পালটে দেখেছি। আরবির তুলনায় এর ব্যাপকতা অনেক। বাংলা আমার মাতৃভাষা, তাই ভাষা জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিস্তৃতি এসেছে। তাছাড়া এর জন্য অন্য কোনো ভাষায় মাধ্যমও নেই। আরবি একেতো বিদেশী ভাষা, তদুপরি এর পঠন পাঠন চলে ইংরেজির মাধ্যমে। এ কারণেই দুটি বিদেশী ভাষা এর পাঠ্যসূচীকে সংকুচিত করে দিয়েছে। এর জন্যই বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যসূচীর এই বিস্তৃতি আমার মনে এমন প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। তাছাড়া আমিতো পড়েছি উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা; তাও নিজের পছন্দ মতো। কিন্তু এখানে আরো অনেক বিষয়ই আছে। এজন্যই কোনো একজন শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু কার সাথে?

কেউ একজন অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কথা বললেন। একজন ছাত্রের সাহায্য নিয়ে তাঁর বাসায় গেলাম দেখা করতে। বেঁটে খাটো ভদ্রলোককে দেখলে খুব একটা কিছু মনে হয়না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য শুনে তিনি যেভাবে অমায়িক

উৎসাহ দিতে শুরু করলেন. আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আমার মনের দ্বিধার ভাব কেটে গেলো। একটা অযাচিত স্নেহের আস্বাদ পেয়ে ফিরে এলাম।

১৯৫৬ সনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলাম। ভর্তির ফর্মে আমার যে নামটি তখন লিখেছিলাম. তা বেশ লম্বাঃ 'আবুল ফালাহ মোহাম্মদ গোলাম সামদানী কোরায়শী।' এর ফলে প্রথম ক্লাসেই এ নিয়ে কিছুটা লজ্জার সম্মুখীন হতে হলো। ক্লাসটি নিচ্ছিলেন আহমদ শরীফ সাহেব। তিনি নামসহ প্রতিটি ছাত্রের রোল নম্বর ডাকছিলেন আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন। আমার নামটি আসতেই মনে হলো, তিনি অনেক কষ্টে সেটি শেষ করে আমার দিকে ফিরে তাকালেন, বললেন, 'কী ব্যাপার, তুমি রাজা জমিদার নাকি; একাই কয়েক জনের নাম দখল করে রেখেছো!'

আমি বললাম, 'পৈতৃক উত্তরাধিকার, আমার কিছুই করার ছিলোনা। তবে আপনি ইচ্ছা করলে এই সম্পত্তি থেকে আমাকে উচ্ছেদও করতে পারেন।'

আমার এ উত্তর শুনে তিনি আর কিছু বললেন না। কিন্তু আমিতো জানি, শুধু গা বাঁচানোর জন্যই পৈতৃক উত্তরাধিকারের কথা বলেছি। তানা হলে 'গোলাম সামদানী কোরায়শী' হয়তো পৈতৃক উত্তরাধিকার হিসাবে বলা যেতে পারে। কিন্তু সেই বোঝার উপর 'আবুল ফালাহ'র শাকের আঁটি আমিই চাপিয়েছি। সেই যে কাতলাসেন মাদ্রাসায় থাকতে আবুল ফালাহ নামে স্বর্ণপদক পেয়েছিলাম, তাই হয়েছে এই কুনিয়াত বা ডাক নামের উৎস। তারপর এই দুটি অংশকে জোড়া লাগাবার জন্যই মোহাম্মদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ এই শব্দটি না হলে নামটির মধ্যে কেমন একটা ছন্দ পতনের ধাক্কা লাগে। তাই এভাবে অনেকটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার নামটা বড়ো হয়ে গেছে।

আমি যে এই লম্বা নামের ব্যাপারে সচেতন ছিলাম না, তা নয়। কিন্তু কী করবো, আমার অন্যান্য সার্টিফিকেটের ভিত্তি যে 'আলিম' পরীক্ষার সার্টিফিকেটটি, সেখানেই আমার এই লম্বা নাম চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে গেছে। অথচ এই 'আলিম' ক্লাসের পাঠ্যসূচীতেই 'মুস্তাতরফ' নামে একটি আরবি সাহিত্য সংকলন আমাদের পাঠ্য ছিলো। তাতে পড়েছিলাম, এক ব্যক্তি নিজের পীর খোঁজার জন্য এক বুজর্গের সাথে দেখা করতে গেছেন। পোশাক আশাক চেহারা ছবি দেখে খুবই ভালো লাগলো, কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা করতেই সেই বুজর্গ বলে উঠলেন, 'আবদুর রহমানির রাহিম মালেক ইয়াওমেদ্দীন'। এই লম্বা নাম শুনেই সেই পীরসন্ধানী লোকটির মন বিগড়ে গেলো। তিনি বুঝতে পারলেন, বুজর্গটি একটি মাকাল ফল মাত্র।

এই গল্পতো আলিম পরীক্ষার ফরম পূরণ করার আগেই পড়েছিলাম এবং লম্বা নামের বিপদ আমি নিজেও বুঝতাম। তবু সেই স্বর্ণপদকের মোহে আবুল ফালাহ কে ত্যাগ করতে পারিনি। তাছাড়া কৃতজ্ঞতারও একটি ব্যাপার ছিলো, যে আমাকে এমন একটি সুনাম অর্জন করে দিলো, তাকে ভুলে যাই কেমন করে! এর ফল হলো এই যে,

পরবর্তী কালে আমি ছাড়তে চাইলেও সে সেই নাছোড় বান্দা কম্বলের মতো কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায়নি। নাসিরাবাদে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় একবার সে চেষ্টা করেছিলাম। তখন আমার রেজিস্ট্রেশন হয়েছিলো গোলাম ছামদানী নামে। সেখানে কোরায়শীও ছিলোনা। কিন্তু অধ্যক্ষ রিয়াজ উদ্দিন আহমদ একদিন ডেকে বললেন যে, পূর্ববর্তী সার্টিফিকেট গুলিতে মুদ্রিত নাম ব্যবহার না করলে সনদপত্রের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে এবং আমি বিপদে পড়বো। সুতরাং এই লম্বা নাম নিয়েই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হয়েছিলো।

তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে আমার নামের মধ্যে দুটি পরিবর্তন ঘটেছে। এর একটি সংক্ষিপ্ত করণ অর্থাৎ আবুল ফালাহ মোহাম্মদ হয়েছে এ, এফ, এম, এবং অন্যটি বর্ণ পরিবর্তন অর্থাৎ ছামদানী হয়েছে সামদানী। তবে এতে সার্টিফিকেটের কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ প্রায় সব সার্টিফিকেটের ভাষাই ইংরেজি।

নামের এই রামায়ন রচনা করার পশ্চাতে আমার উদ্দেশ্য একটিই, শুধু সেই ইতিহাসটি তুলে ধরা, যার ফলে বুঝা যাবে যে, আমাদের জীবনের অনেক বিষয়ই কী ভাবে আবেগের টানে দৈর্ঘে প্রস্থে বেড়ে যায়, আবার বিবেকের তাড়নায় সংকুচিত হয়ে আসে।

কিন্তু শরীফ সাহেবের ঠাট্টার মধ্যে বুঝি আরো তথ্যের ছোঁয়া আছে। তিনি আমাকে রাজা জমিদার বলেছেন। তাঁরা যেমন করে সহস্র পরিবারের সম্পত্তি একাই দখল করে রেখেছিলেন, তেমনি আমিও অন্ততঃ তিন জনের নাম একা দখল করে নিয়েছি। কিন্তু শব্দতো সম্পত্তি নয়। কিন্তু তা হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছুর মধ্যেই একটা লালসা ও গর্বের ভাব আছে। অনেক সময় কৌলিণ্যের প্রভাবেও এমনি প্রয়োজনাতিরিক্তের সমাবেশ ঘটে থাকে। তবে এ ব্যাপারে রাজা জমিদারের মনোভাব সকলে প্রদর্শন না করলে ও আমাদের নামকরণের মধ্যে সেই তুর্কী মোগলাই প্রভাব এখনো অটুট রয়েছে। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে এখনো আমরা সেই রাজা জমিদারের আরবি ফারসী শব্দ ব্যবহারের ঐতিহ্য অনুসরণ করছি। অনেকেই এটাকে ধর্মীয় প্রভাব বলে মনে করেন। কিন্তু যথার্থ ধর্মবোধতো কোনো বিশেষ ভাষার সাথে যুক্ত নয়; কিংবা ভাষান্তরিত হলেই তা কর্পূরের মতো উবে যায় না। ভিন্ন ভাষায় ডাকলে যে আল্লাহ্ শুনতে ও বুঝতে পারেন না, এমন কথার মধ্যে কোনো যুক্তি বুদ্ধির পরিচয় নেই। কাজেই ভিন্ন ভাষায় নামকরণ হলে যে ধর্ম নাশ হয়ে যাবে, এমন আশংকার কোনো হেতু থাকতে পারেনা এবং নেইও। কাজেই আমাদের নামকরণের ঐতিহ্য এখনো সেই রাজা জমিদারের সামন্ত ধারাই অনুসরণ করছে।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তার জন্য আমরা গর্ব করতে পারি, প্রয়োজনে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে পারি; কিন্তু কিছুতেই আমাদের নামকরণের মধ্যে তার শব্দাবলীকে ব্যবহার করতে পারিনা। এখনো ডাক নামে তার সংকুচিত অনুপ্রবেশ ঘটলেও পোশাকী নামে আরবি ফারসীরই প্রাধান্য। আমাদের প্রতিবেশীরা বাংলা নাম ব্যবহার করে,

কাজেই আমরা যদি তা করতে যাই, তা হলে তাদের সাথে মিশে যাবার আশংকা আছে; এমনতরো যুক্তি আর যাই হোক, আমাদের বিশ্বাস ও আচরণের দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। এ জন্যই— 'ওয়াজে মে তুমহো নাসারা তো তামাদ্দুনমে হুনুদ' অর্থাৎ বেশ ভূষায় তোমরা খৃষ্টান আর সংস্কৃতি চেতনায় হিন্দু বলে ইকবাল আমাদেরকে গালাগালি করেছেন। আমাদের আরবি ফারসী শব্দের নাম আমাদেরকে এই দুরবস্থা থেকে বাঁচাতে পারেনি। সুতরাং আমরা নামসর্বস্ব মুসলমান হয়েই বিরাজ করছি।

প্রসঙ্গক্রমেই এ আলোচনা এখানে চলে এসেছে। এ নিয়ে আমার মনে যে একটা ক্ষোভ আছে, সেটিই শুধু প্রকাশ করলাম। বিষয়টি সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভেবে দেখবেন, এমন আশা অবশ্যি পোষণ করতে পারি। কিন্তু এই উপলব্ধি যে আমার নিজের আচরণের কাছেও পরাস্ত হয়েছে, সেটি যথাসময়ে তুলে ধরার ইচ্ছা নিয়ে আপাততঃ এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

বলা বাহুল্য প্রথম দিনের এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমি শরীফ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। মোফাজ্জাল হায়দার স্যারের কথাতো আগেই বলেছি। এ ছাড়া মুনীর চৌধুরী, কাজী দীন মুহম্মদ, নীলিমা ইব্রাহিম, আবদুল হাই প্রমুখ শিক্ষকরা প্রথম থেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মুনীর চৌধুরী আমাদেরকে উপন্যাস পড়াতেন; কাজী দীন মুহম্মদ সাহিত্যের ইতিহাস, নীলিমা ইব্রাহিম নাটক এবং আবদুল হাই রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতেন।

আহমদ শরীফের কাছে মধ্যযুগের সাহিত্য এবং অন্য এক অধ্যাপক, সম্ভবতঃ ব্রজেন্দ্র নাথ, তাঁর কাছে আমরা ময়মনসিংহ গীতিকা পড়েছিলাম। মোফাজ্জাল হায়দার ছোটগল্প পড়াতেন বলে মনে পড়ছে। তেমনি খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে অজিত গুহ ও ইদ্রিস আলীর কাছে আমরা রূপ ও রসতত্ত্ব পড়েছি। একপর্যায়ে অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম এসে যোগ দেন। তিনি জসিম উদ্দীনসহ অন্যান্য মুসলিম সাহিত্যিকদের রচনাবলী নিয়ে আমাদেরকে জ্ঞানদান করতেন।

কিন্তু শিক্ষকদের সম্পর্কে সার্বিক মনোভাব প্রকাশের সময় এখানো আসেনি। তবে ইতিমধ্যেই আমি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। অনার্সে আমার সহযোগী বা সাবসিডিয়ারী বিষয় ছিলো আরবি ও ইসলামের ইতিহাস। আমি ইচ্ছা করেই এ দুটি বিষয় নিয়েছিলাম। কারণ এ দুটি সম্পর্কে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাকে বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক মনোনিবেশের সুযোগ এনে দিয়েছিলো। কিন্তু প্রয়োজনীয় হাজিরা বা পারসেন্টেজের জন্য দুটি বিষয়েই প্রায় নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। এছাড়া জেনারেল ইংলিশ বলে একটি পত্র ছিলো, যা আমাদেরকে ইংরেজি ক্লাসেও টেনে নিয়ে গেছে। আরবিতে সিরাজুল হক, আবদুস্ সোবহান ও কানিজ ফাতেমার কথা মনে পড়ছে। তাঁরা সবাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তাঁদের ক্লাস নিতেন। ডঃ সিরাজুল হকের 'ওয়েল ওয়েল' বলার একটা মুদ্রাদোষ ছিলো, যা অনেক সময়ই বিরক্তি সৃষ্টি করেছে। আবদুস সোবহান সাহেবের সাথে কিছুটা অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছিলো। তিনি বেশ

অমায়িক ছিলেন। ফলে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, যুক্তির পিছনে ঘুরে তিনিও এক সময় নাস্তিকের পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন। এখনো ঠিক পুরোপুরিভাবে বিশ্বাসীর পর্যায়ে আসতে পারেননি। এজন্যই তাঁর উপদেশ ছিলো, যুক্তি ভালো, তবে যুক্তির আতিশয্য ভালো নয়।

আমি জানিনা, আমার বক্তব্যে তিনি এমনি আতিশয্যের কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা! কিন্তু আমি তখনো অক্তের নামাজ ইচ্ছামতো পড়ি এবং জুম্মার নামাজে নিয়মিত উপস্থিত থাকি। তবে ধর্মের ব্যাপারে যুক্তিবাদিতার ভিত্তি আমার মধ্যে অনেক আগেই গড়ে উঠেছিলো। কাজেই সে দিক থেকে আরবি বিভাগের অধ্যপকদের চাইতে আমার চিন্তাধারা যে কিছুটা আধুনিক হবে, এ আর বিচিত্র কি!

এর তুলনায় বরং ইসলামের ইতিহাস বিভাগে যুক্তির প্রাবল্য ছিলো সমধিক। সেখানে মমতাজুর রহমান তরফদার, হাসান জামান, নুর মোহাম্মদ প্রমুখ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরা সবাই একই বিভাগের না হলেও বিষয়ের অনুরোধে আমাদের ক্লাস নিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্যে যুক্তি ছিলো এবং প্রশ্নের উত্তর তাঁরা যুক্তিসহকারেই দিয়েছেন। অবশ্যি সকলের যুক্তির ধারা একই পর্যায়ের ছিলো না।

ইংরেজিতে সরোয়ার মুর্শেদ, নাদেরা বেগম এবং কদাচিৎ সাজ্জাদ সাহেবের ক্লাস করতে পেরেছি। তাঁদের মধ্যে নাদেরা বেগম ছিলেন সব চাইতে অমায়িক ও স্নেহ পরায়ণ। তিনি মুনীর চৌধুরীর বোন। তাঁর সাথে একটি ঘটনার কথা এখনো আমার স্মৃতিতে কৃতজ্ঞতাসহ উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ইংরেজি বিভাগে ঢোকার পথে করিডোরে একটি পর্দা টাঙ্গানো থাকতো। একদিন আমি সেখানে ঢুকতে গিয়ে না দেখার ফলে নাদেরা বেগমের গায়ের উপর পড়ে যাই। ব্যাপারটি এমন দৃষ্টিকটু ছিলো যে, আমি ভয়ে প্রায় কাঁপতে থাকি। কিন্তু নাদেরা বেগম কিছুই না বলে শুধু মৃদু হেসে আমাকে অভয় দেন। যদি তিনি তা না করে আমাকে ভর্ৎসনা করতেন, তা হলেও আমার পক্ষে তা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলোনা। কিন্তু তাঁর এই অমায়িকতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সহপাঠীদের মধ্যে কাজী রফিকুল হক, আনোয়ারুল হক, মুজিবর রহমান, ফরিদা বেগম, জমিলা আক্তার, সাদ উদ্দিন, আবদুর রকিব, লুৎফুর রহমান, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আজিজুল হক চৌধুরী, আলী ইমাম, এনামুল হক, আবদুল মান্নান, কে জি মোস্তফা প্রমুখ কয়েক জনের নাম মনে পড়ছে। এদের মধ্যে আজিজুল হক সেই বাস্তার ছেলে, যেখানে সে আমার কাছে পড়েছে বলে মনে করে। এবার সে আমার সহপাঠী হলো। কিন্তু সকলের চাইতে অন্তরঙ্গতা জন্মেছিলো রফিকুল হকের সাথে। পশ্চিম বঙ্গ থেকে আগত এই ছেলেটির রুচিশীল অমায়িক সারল্য আমাকে আকর্ষণ করেছিলো।

রুমমেটদের মধ্যে আমি যে চার সিটের রুমে তখন ঢুকেছিলাম, সেখানে পাশের সিটের সুলতান সাহেবের নাম মনে পড়ছে। তিনি তখন বোটানী শেষ পর্বের ছাত্র। তবু

তার সাথে বেশ হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় তিনি আমার প্রতি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আমরা, হলের ছাত্ররা অফিসের দোতলায় জুম্মার নামাজ পড়তাম। সেখানে ইবনে নাবাতার বহুল প্রচলিত জুম্মার খোতবাটি পাঠ করা হতো। এতে বিচিত্র বিষয়ের ষাটটি খোতবা বিদ্যমান। কিন্তু দ্বিতীয় খোতবা একটি। এটিতে একদিকে যেমন মক্কা মদিনার উপর কর্তৃত্বের অধিকারী বাদশার গুণ কীর্তন করা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বিধর্মীদের প্রতি অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। খোতবা গুলির রচনাকালে হয়তো একান্ত বাস্তব কারণেই এ দুটি বিষয়ের প্রয়োজন ছিলো; কিন্তু এরপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে এবং ভিন্ন দেশে ভিন্ন পরিবেশে এ দুটি বিষয়ই বাহুল্য বলে পরিত্যক্ত হবার যোগ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিষয় বস্তুর বাছবিচার না করে এগুলিকেই এখনো খোতবার আকারে পাঠ করে যাচ্ছেন। আর এগুলির ভাষা আরবি হবার ফলে পাঠক ও শ্রোতা কেউই এর হাস্যকর অবাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারছেন না। অথচ ধর্মের স্বার্থেই এগুলির পরিবর্তন হওয়া দরকার।

একদিন জুম্মার নামাজ শেষে খোতবার সংশ্লিষ্ট অংশ অনুবাদ করে শুনিয়ে আমি এমনি কিছু কথা উপস্থিত মুসুল্লীদের নিকট তুলে ধরেছিলাম। তা শুনে আমার রুমমেট বেশ রাগ দেখালেন এবং বললেন যে, খোতবার প্রতি এমন ভাবে মন বিষিয়ে তোলা আমার অন্যায় হয়েছে। কারণ এ ব্যাপারটি নিতান্তই ছোয়াবের কাজ। এর বাইরে এর কোনো উপকারিতা নেই। কারণ যে বিষয়ের ভাষা জানা নেই, তা পাঠ করা হয় শ্রোতাদের জ্ঞান দানের জন্য নয়, বরং ছোয়াবের জন্য। তাঁর এ প্রকার বক্তব্য বাস্তব অবস্থার সাক্ষ্য মাত্র; ইসলামের কোনো যুক্তি নয়। কিন্তু আমি অবাক হয়েছিলাম, কারণ, তিনি একজন বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও এমন একটি অন্ধ বিশ্বাসের পোষকতা করছেন, যা একজন মূর্খলোকের জন্য অধিকতর যোগ্য!

হলমেটদের মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানের আলী আসগর, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্দিকুর রহমান, বাংলার মনিরুজ্জামান ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং অন্যান্য বিষয়ের নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী ও রফিক সিদ্দিকী প্রমুখ কয়েক জনের নাম মাত্র স্মরণ করতে পারছি। এদের মধ্যে সিদ্দিকুর রহমান আমার পূর্ব পরিচিত। সে নাসিরাবাদ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আমার সাথে দ্বিতীয় হয়েছিল।

ফজলুর হক হলে তখন খোরাকীর জন্য মাসিক চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা খরচ হতো। আট আনা দিয়ে ভালো নাশতা করা যেতো। কিন্তু হলের খাবারের মান তেমন উন্নত ছিলো না। ফলে পেটের অসুখ দূর করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়েছিলো। কিছু দিন পরেই আমি একবার জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার খানা থেকে ওষুধ খাওয়ার ফলে পাকস্থলীতে এমন গোলমাল হয়েছিলো যে, আমাকে অরুচি ও দুর্বলতার জন্য প্রায় মাসখানেক ভুগতে হয়।

এসব ছাড়াও এ সময়ে আমি দাঁতের ব্যথায় ভুগতে আরম্ভ করি। কাতলাসেনে থাকার সময় আমার দাঁতের গোড়ায় কৈ মাছের একটি কাঁটা বিঁধে গিয়েছিলো। সেই

দাঁতটি ক্রমান্বয়ে ব্যথার সৃষ্টি করে আমাকে ভোগাচ্ছিলো। এর ফলে আলীয়ায় পড়ার সময় ইসলামপুরের একজন দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শে আমি উক্ত দাঁতটি ফেলে দিতে বাধ্য হই এবং একটি নকল দাঁত লাগিয়ে নেই। এতে কিছু দিন ভালো ছিলাম। কিন্তু নাসিরাবাদে পড়ার সময় আবার দাঁতের ব্যথা দেখা দেয়। এ কারণেই দাঁতের ব্যথা দেখা দিলেই বেদনা নাশক বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলেট নির্বিবাদে গ্রহণ করতাম। কিন্তু এর দ্বারা সাময়িক উপশম হলেও এটি একটি স্থায়ী উৎপাতে পরিণত হয়। নানা ধরনের দাঁতের ওষুধ, দাঁতের মাজন ব্যবহার করেও আমি এই 'পাইরিয়া'র আক্রমন ঠেকাতে পারিনি। শীতকাল এলে দাঁত শিরশির করা, হঠাৎ মাড়ি ফুলে যাওয়া, রক্ত পড়া ইত্যাকার অসুবিধা আমার অনেক সময় ও মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে।

আমার মুখে দাঁতের সংখ্যা এমনিতেই কম ছিলো। প্রত্যেক মাড়ির শেষ মাথায় দুটি করে এই চারটি নাকি আক্কেল দাঁত। আমার এই চারটি দাঁতের একটিও ওঠেনি। এজন্য আমার স্ত্রী মাঝে মধ্যে ঠাট্টা করে বলে, 'তোমার আক্কেল আছে নাকি, তোমারতো আক্কেল দাঁতই ওঠেনি।' কারণ তার ধারণা, এই আক্কেল দাঁত না উঠলে মানুষের আক্কেল হয় না। আমার আক্কেল আছে কিনা, আমি জানি না; আক্কেল দাঁত উঠলে আরো কিছু আক্কেল বাড়তো কিনা, তাও বলতে পারবো না। কিন্তু দাঁতের যত্ন না করে এবং এর উপরে গোয়ার্তুমি করে নানা ভাবে দাঁতকে ব্যবহার করে আমি যে আক্কেল সেলামি দিয়েছি, তার কোনো তুলনা হয় না। বস্তুতঃ দাঁতের ব্যথা আমাকে যতোটা কষ্ট দিয়েছে, অন্য কোনো রোগ ততোটা কষ্ট দিতে পারেনি। এরফলে দাঁত ফেলতে ফেলতে আজ কয়েকটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। এর সাথে কিছুটা নকল দাঁত লাগিয়ে কোনো প্রকারে কাজ চালাচ্ছি।

এভাবে শারীরিক অসুস্থতার সাথে কিছুটা মানসিক দুশ্চিন্তাও এ সময়ে আমাকে পীড়ন করেছে। কারণ একেতো আমি বিবাহিত, তদুপরি অভিভাবকহীন। আমার খয় খরচার টাকার জন্য আমাকেই চিন্তা করতে হয়েছে। আমি অবশ্যি বিশ্ববিদ্যালয়েও বেতন দিইনি এবং পঁয়ত্রিশ টাকার একটি বৃত্তিও পেয়েছিলাম। কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ মিটাতে তৎকালে কম করে হলেও একশোটি টাকার প্রয়োজন ছিলো। সে টাকা দোকান বা অন্য উৎস থেকে আমাকেই যোগাড় করে আনতে হয়েছে।

এজন্যই বাস্তা, কাতলাসেন বা আলীয়ার মতো আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনে নিরুদ্বেগ ছিলাম না। এমনি অবস্থায় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মতো অন্য একটি অনিবার্য ত্রুটি এসে যুক্ত হলো। আমি ইতিপূর্বে আলীয়া মাদ্রাসায় পরীক্ষার খাতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলাম যে, স্মৃতি শক্তির কল্যাণে আমি কিতাবের ভাষাই প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহার করতাম। এর ফলে আমার নিজস্ব কোনো ভাষা গড়ে উঠতে পারেনি। এ সত্ত্বেও বাংলা ভাষার উপর আমার কিছুটা দখলের কথা অস্বীকার করা যায় না। কাতলাসেনে স্বর্ণ পদক প্রাপ্তি থেকে এ কথার প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সেই দখল কোনো প্রকার ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতায় রূপান্তরিত হবার সুযোগ পায়নি। কারণ

আমার অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে ডান দিকে থেকে বাম দিকে লেখার ব্যাপারে। কাজেই এখন বিষয়ের অনুরোধে আমাকে বাম দিক থেকে ডান দিকে লিখতে হচ্ছে। এর ফলে একটি বিপরীত কসরৎ আমাকে কেমন যেন শ্লথ করে দিয়েছে। হস্তলিপির ছাঁদ, দ্রুত লিখন সবগুলিই অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। আমি দীর্ঘকাল ধরে সেই অভ্যাসে অনুপস্থিত থেকে এখন হঠাৎ করে সেটাকে সচল করতে সচেষ্ট হয়েছি। ফলে যে ভালো করে হাঁটতে শিখেনি, তাকে দৌড়াতে হচ্ছে! কারণ এখানে শুধু পড়লেই হয়না, বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরতে হয়। আর বাংলা যেহেতু আরবি ভাষার মতো সংকোচনশীল নয়, বরং সম্প্রসারণশীল ভাষা, সুতরাং এর জন্য লিখতে হয় অনেক বেশি। আমি এই লেখার কবলে পড়ে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে লাগলাম। বিশেষ করে টিউটারিয়েল ক্লাসে যখন কোনো প্রশ্ন লিখতে দেয়া হতো, তখন আমি বিষয়টি জানা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে কিছুতেই শেষ করতে পারতাম না। এর ফলে এমন একটা মানসিক কষ্ট অনুভব করতাম, যা আমার আত্মবিশ্বাসকেই দুর্বল করে দিতো। কারণ রাতারাতি হাতের লেখার দক্ষতা বাড়ানো কিছুতেই সম্ভব নয় এবং আমার পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। তবু আমি এ ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম।

এ বিষয়ে আমার এই ত্রুটির বিশ্লেষণ শুধু নয়, এর অন্তর্গত দুর্বলতাটুকু অনুধাবন না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পরীক্ষার ফলাফল আমার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কেন আশানুরূপ হয়নি, তার হেতুটি ঠিক বুঝা যাবে না। তা না হলে হঠাৎ মনে হবে যে, আরবিতে আমি সকলকে টেক্কা দিতে পারলাম, কিন্তু বাংলায় এসেই আমার সেই দক্ষতা যেন হঠাৎ নীচে নেমে গেলো! কেননা আমি এতো দিন এমন এক শিক্ষার পরিবেশে বিচরণ করেছি, যেখানে পিতামাতা তাঁদের অমেধাবী অকেজো প্রায় সন্তানদেরকে পাঠিয়ে থাকেন। কাজেই তাদের মধ্যে আমি অতি সহজেই এমন অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পেরেছি কিন্তু এখানে যেহেতু সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, তাই আমি হেরে গেছি। আমি অসাধারণ থেকে নিতান্ত সাধারণে পরিণত হয়েছি।

অবশ্যি এমন কিছু মনে হবার পিছনে যে একেবারে কোনো সত্য নেই, তা নয়। কারণ তৎকালে বাংলা সাহিত্য যারা পড়তে আসতো, তারা মনের টানেই আসতো। অন্য কোনো বিষয় পড়ার যোগ্যতা নেই বলেই তারা সহজতর বাংলা সাহিত্য পড়তে এসেছে, এমন মনে করার কোনো কারণ ছিলো না। বিষয় হিসাবে বাংলা সাহিত্য তুলনামূলক ভাবে কঠিনই ছিলো। সুতরাং সাহিত্যমনা মেধাবীরাই সাধারণতঃ এই বিভাগের ছাত্র হয়েছে। কিন্তু আমার মুশকিল হয়েছে এই যে, আমি যদি বিষয়টা না বুঝতাম, আত্মস্থ করতে না পারতাম, তাহলে নিজের হীনতা স্বীকার করে নিতে আমার কোন দ্বিধা ছিলোনা। কিন্তু আমার সাথেই যারা প্রথম শ্রেণী পেয়েছে, তাদের চাইতেও বেশি করে আমি আমার জানার আগ্রহ ও তৎপরতার দ্বারা শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। তাঁরাও আশাবাদী ছিলেন যে, আমি পরীক্ষায় ভালো করতে

পারবো। কিন্তু একমাত্র হাতের লেখার শ্লথ গতির জন্যই আমি তাঁদের আশা পূরণ করতে পারিনি।

আমার এই বিশ্লেষণের ধরন দেখে মনে হবে, আমি যেন আমার অকৃতকার্য হবার হেতু তুলে ধরে কারো কাছে কৈফিয়ত দিচ্ছি। আসলে অন্য কারো কাছে নয়, আমি নিজের কাছে নিজেই বরং জবাবদিহি করছি। কারণ আরবি বিভাগের আসগর হোসেন সাহেব এই আশংকাই আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং আমাকে আরবি বিভাগে যোগ দিতে বারবার বলেছিলেন। কারণ সেখানে থাকলে আমি অতিসহজেই দুটি প্রথম শ্রেণী লাভ করতে পারতাম এবং আমার পূর্বাপর সকল ফলাফল একই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতো। কিন্তু আমিতো সেই সহজলভ্য সাফল্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছি। সুতরাং জবাবদিহি করি আর যা-ই করি, এতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে!

সে যাই হোক, আপাততঃ আমি জেনারেল ইংলিশ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে আরম্ভ করলাম। কারণ এই পরীক্ষাটিও আমাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো। ছাত্রদের মধ্যে এমন একটা ধারণা ছিলো যে, সাজ্জাদ হোসেন সাহেব নাকি সহজে কাউকে পাস হতে দেন না। এর ফলে অনেকের জন্য এই পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে তৃতীয়, চতুর্থ, এমনকি পঞ্চম সুযোগও ব্যবহার করতে হয়েছে। এ সংবাদে অন্যের যাই হোক, আমার ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিলো। কারণ আমি ইংরেজির ব্যাপারেও আনাড়ী ছিলাম।

ইতিমধ্যে আমি ময়মনসিংহে এসে জানতে পারলাম যে, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য দায়েরকৃত বাঁটোয়ারা মামলা সাফল্যজনকভাবে তার দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম করেছে। কাওলাদাররা যে জবাব দাখিল করেছিলো, তা আইনের চোখে অকেজো বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। শীঘ্রই মামলার রায় প্রকাশ হবে। এ সংবাদটি আমার জন্য অধিকতরভাবে আনন্দের ছিলো। কারণ কাওলাদাররা আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে যে মামলার কথা বলেছিলো, সেই মামলাই এভাবে সফল হতে যাচ্ছে।

কিন্তু খরিচায় এসে বেশ একটা দুশ্চিন্তার কবলে পড়লাম। কারণ বু মানে আমার নানী শ্বাশুড়ীর শারীরিক অবস্থা বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। থেকে থেকে তাঁর গলা দিয়ে রক্ত যাচ্ছে। খরিচার বাজারে একজন ডাক্তার ছিলেন, সবাই তাঁকে 'নাপিত ডাক্তার' বলে ডাকতো। তাঁর ডিগ্রি ইত্যাদি সম্পর্কে কারোরই কিছু জানা ছিলোনা। তবু ইনিই ছিলেন এই এলাকার একমাত্র সহজলভ্য ডাক্তার। ভিজিটের কোনো বালাই নেই, যে যা পারতো দিতো; না দিলেও নাপিত ডাক্তারকে ডাকলেই পাওয়া যেতো। অনেকে বড়ো ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে গিয়েও তাঁর মাধ্যমেই চেষ্টা করতো। কাজী বাড়ির তিনি, বলতে গেলে, গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। একটা কিছু হলেই তাকে ডেকে আনা হতো। তিনিই বু'র চিকিৎসা করছেন।

কিন্তু আমার দুশ্চিন্তার কারণ ছিলো অন্যত্র। বলতে গেলে এই বু'ই তখন আমাদের সকলের মুরুব্বী। বিশেষ করে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ছিলো অপরিসীম। আমার লেখা—পড়ার পিছনে তিনি যে অকৃপণ উৎসাহ যুগিয়েছেন, তার কোনো তুলনা হয়না।

তাছাড়া তিনিই বলতে গেলে আমার আনন্দ ও ঝগড়ার উৎস ছিলেন। তাঁর কাছে প্রচুর অনাবিল আনন্দের উপকরণ যেমন পেয়েছি, তেমনি সময়ে সময়ে প্রচণ্ড ঝগড়াও করেছি। আমার রাগ হজম করে আমাকে শান্ত করতে তিনি যে উদারতা দেখিয়েছেন, তারও তুলনা তিনি নিজেই। সুতরাং এই বু'র একটা কিছু হয়ে গেলে আমাকে খুবই বিপদে পড়তে হবে।

এক্ষেত্রে আরো একটা কথা বলা দরকার। এই বু'র তুলনায় আমার শ্বাশুড়ী সান্নিধ্য আমি খুবই কম পেয়েছি। এর একটা প্রধান কারণ তাঁর অসুস্থতা। যেখানে নিজের জীবন বিপন্ন, সেখানে অপত্য স্নেহের প্রকাশ ঘটানোর কথা কল্পনা করা যায় না। ইদানীং তিনি সুস্থ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘকাল রোগ ভোগের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এর ফলে আমার কাছে তিনি বুর আড়ালেই থেকে গেছেন। তদুপরি আরো একটি ব্যাপার তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীদের কেউই আমাকে তুমি বলে ডাকতে পারেননি। যেখানে আমার স্ত্রী আমাকে তুমি বলে ডাকে, সেখানে যদি আমার শ্বাশুড়ী মায়ের সমান হয়েও আমাকে আপনি বলে ডাকেন, তাতে ঘনিষ্ঠতার চাইতে দূরত্বের ব্যাপারটাই বেশি করে চোখে পড়ে!

আমার জীবনে এই আপনি-তুমি'র এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। আমার শ্বাশুড়ী আমাকে তুমি বলতে পারলেন না, ঠিক তেমনি আমার মা-ও তাঁর পুতের বৌ আমার স্ত্রীকে তুমি বলতে পারেননি। এটা যে পারিবারিক কোনো ঐতিহ্য, এমন কিছুও আমার কাছে মনে হয়নি। বরং এটা তাঁদের স্বভাবের একটা বিশেষ দিক। যার ফলে দেখেছি, আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী উভয়ে উভয়কে আপনি বলতেন। কিন্তু তাঁদের মেয়ে হয়েও সায়িদা অবলীলায় তার স্বামীকে তুমি বলতে পারছে। অবশ্যি ব্যাপারটি খুব সহজে হয়নি, এজন্য আমাকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মেয়েটির সাহস আছে। তা না হলে অনেক চেষ্টা করেও আমি তার বড়ো বোনকে এ ব্যাপারে সম্মত করাতে পারিনি। সে যতো দিন ছিলো, এ ব্যাপারে আমার ধমক খেয়ে শুধু হেসেছে, কিন্তু তুমি বলতে পারেনি।

আবার এ ক্ষেত্রে আমার শ্যালিকা অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীর অন্য একটি অভ্যাসও লক্ষণীয়। আমার ভাগনে, ভাতিজা, ছোটভাই তুল্য যে সব আত্মীয়কে আমি তুমি বলি, তাদের অনেককেই সে তুমি বলতে পারেনা। এ ব্যাপারে, আমার মনে হয়, বয়সের তারতম্য বিচার করে সে এই সম্বোধন নির্বাচন করে। অর্থাৎ যারা বয়সে তার চাইতে বড়ো, তাদেরকে সে আপনি বলেই ডাকে। কিন্তু আমার মাকে আমি আপনি বললেও তার মাকে সে তুমিই বলে। বস্তুতঃ এই সম্বোধনের ব্যাপারে মানুষের আচরণ বড়োই বিচিত্র! এদিক থেকেও প্রতিটি মানুষই একটি রহস্যের খনি!

যাহোক, আমি আবার হলে ফিরে এলাম। কারণ জেনারেল ইংলিশ পরীক্ষার সময় হয়ে এসেছে। এটা আমার প্রথম সুযোগ। আমার ইচ্ছা এই সুযোগেই আমি এই পুলসেরাত পার হয়ে থাকবো। কারণ আগামী বছর সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা দিতে হবে।

তাই পথ যতোটা পরিষ্কার হয়, ততোই ভালো। কিন্তু পরীক্ষার পর এই ইচ্ছার সপক্ষে খুব একটা জোর পেলাম না। কারণ পরীক্ষা তেমন ভালো হয়নি।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সালাম এলো আমার রুমে। এই সালাম আমার সাথে আলিম ও কামিল পরীক্ষা দিয়েছিলো। দর্শনীয় কিছু না করতে পারলেও প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছে এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস করে এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হয়েছে। এর আগেও তার সাথে দেখা হয়েছে। সে চানখাঁর পুলের কাছেই তার ভায়রা ভাই ডাক্তার গাফফারের ওখানে থাকে। আজ এসেছে আমাকে কাকরাইল মসজিদের এখানে নিয়ে যাবে। সেখানে তবলিগী জমাতের বিরাট সমাবেশ। তার ইচ্ছা, সম্ভবতঃ সেই সমাবেশ আমাকে দেখানো এবং সে সম্পর্কে আমার মন্তব্য শোনা।

যাহোক, তার সাথে সেই সমাবেশে গিয়ে পৌছলাম। মসজিদের পশ্চিম দিকের জায়গাটি তখন ফাঁকা মাঠ। সেখানেই তাঁবুর পরে তাঁবু পড়েছে এবং বিরাট সামিয়ানার নীচে মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। হঠাৎ বৃষ্টি এসে উপস্থিত। আমরা একটি চায়ের দোকানের পাশে আরো লোকের সাথে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ালাম। তখনি চোখে পড়লো, আরবি বিভাগের ডঃ ইসহাক হাত নেড়ে নেড়ে আশ পাশ দেখিয়ে 'হাওয়ালায়না লা আলায় না' অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে, আমাদের উপরে নয়,—এই কথাগুলি বলছেন। কথাগুলি হজরত মুহম্মদ (সঃ) বৃষ্টি দেখে বলেছিলেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। ডক্টর সাহেব সেই বিশ্বাসে এটি আউড়াচ্ছেন, হয়তো এতে বৃষ্টি থেমেও যেতে পারে। বৃষ্টি থামলো, তবে ইতিমধ্যে আমাদেরকে ভিজিয়ে দিলো। এর আগেই আছরের নামাজ শেষ হয়ে গিয়েছিলো, এবার দোয়ার পালা। কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেই দোয়া এখন আরম্ভ হলো। মাইকে সেই দোয়ার সব কিছুই শোনা যাচ্ছে। পাপ কতো প্রকার আছে, তার যেমন বিস্তারিত বিবরণ আছে, তেমনি সেই সব পাপের পাপীরাই যে এখানে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সমবেত হয়েছে, তার সকরুণ স্বীকৃতিও আছে। সমস্ত দোয়ার মধ্যে এই পাপরাশির মার্জনা ভিক্ষাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

সালামের সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমিও সেই করুণ মিনতি, নিদারুণ আর্তনাদ, কান্নাকাটি হা-হুতাশ মাখা মোনাজাতের সবটুকু শুনলাম। কেবলই মনে হতে লাগলো, পাপীর পাপ মার্জনা ছাড়া বুঝি আল্লার আর কোনো কাজ নেই। সমস্ত ধর্মই বুঝি এই উদ্দেশ্যেই আবির্ভূত হয়েছে। কারণ পাপ ছাড়া পূন্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই বললেই চলে। বাবা আদম-ইতো আল্লার সান্নিধ্যে থেকেও তাঁর পদস্খলন দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানব চরিত্র কতোটা অনির্ভরযোগ্য! তারপর তিনি তাঁর সেই পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতেই বাকী জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তাঁর নব্বইতম অধস্তন পুরুষ হযরত মুহম্মদও (সঃ) পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে চাইতে আকুল হয়ে কেঁদেছেন। সুতরাং তাঁর বংশধর এবং তাঁর উম্মতদের কর্তব্যতো একটাই, সারা জীবন পাপ করে এই শেষ বয়সে মাইকে জোর আওয়াজ তুলে ক্ষমা প্রার্থনা করা!

সন্ধ্যার পর সালামের সাথে হলে ফিরে আসছিলাম। রাস্তায় এবার সে এই সমাবেশ সম্পর্কে আমার মনোভাব প্রকাশ করতে বললো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কী কী পাপ করেছো?'

সে বললো, একেবারে যে কিছুই করিনি, তাতো নয়; এজন্য ক্ষমা চাওয়ারও প্রয়োজন আছে এবং সেটা তুমিও অস্বীকার করতে পারো না।'

আমি বললাম, 'না, তা আমি অস্বীকার করিনা। মানব চরিত্র বড়োই দুর্বল। এর ফলে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু আমিতো সে কথা বলছি না; আমি বলছি, আল্লাহ্‌কে একান্তভাবে হাজির নাজির জেনেও তুমি অর্থের লালসায় অপরের ক্ষতি করে যে পাপ সঞ্চয় করেছো, তা আল্লাহ্ মাফ করে দিলেই কি তোমার সঞ্চিত সম্পদ হালাল হয়ে যাবে? তুমি এতো দিন স্বেচ্ছায় যে কাজ করেছো, তাতে আল্লার কোনো ক্ষতি হয়নি, হয়েছে সমাজের। আল্লাহ্ কি তোমাকে মাফ করে দিয়ে সমাজ জীবনে যথেচ্ছাচারকেই প্রশ্রয় দেবেন না? তা হলে ধর্ম পালনের অর্থ হবে সমাজের সুস্থতা নয়, পতিতের উদ্ধার। ইসলাম কি তা স্বীকার করে? যদি করতো, তাহলে অতীত ধর্মমতগুলির সে সমালোচনা করতো না!'

সালাম বললো, 'যাই বলো, আল্লাহ্‌তো সব পাপ মার্জনা করার অঙ্গীকার করেছেন। সেখানে স্বেচ্ছা অনিচ্ছার কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি।'

আমি বললাম, 'সে ছিলো ইসলামের আবির্ভাব কালের ব্যাপার। সত্য প্রকাশ পাওয়ার আগে যারা না জেনে পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন, আল্লাহ্ তাঁদের সমস্ত অতীত ক্ষমা করে দিয়ে তাঁদেরকে সৎ পথ অবলম্বন করতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তাই বলে মুসলমানদের স্বেচ্ছাকৃত পাপ ক্ষমা করার চুক্তি করেননি! যদি কেউ আল্লাহ্‌র সেই অভয়বাণীকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে, তা হলে নিজের লালসাকেই প্রশ্রয় দেবে মাত্র, ধর্মকে নয়। তোমার অন্যায্য পন্থায় উপার্জিত সম্পদকে হালাল করার জন্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটেনি। সমাজকে সংস্কার করাই তার উদ্দেশ্য।'

এরপর সালাম আর কিছু বললো না। বলার আছেই বা কী! যে ধর্ম সমাজের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলো, তাকে আমরা অন্যায়ভাবে নিজের জন্য কুক্ষিগত করে নিয়েছি। অর্থ, কাম, মোক্ষ, অবশিষ্ট তিন বর্গও একই অবস্থায় পতিত হয়েছে। এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করা যায়, কিন্তু বাস্তব অবস্থার তাতে কিছুই হয় না। সেই যে কথায় বলেনা, 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।'

এ কারণেই তবলিগী জমাতের এই অনুষ্ঠানটি আমার মনে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো এবং এর মধ্য দিয়েই আমি ইসলামের মূল সত্য ও তার বিচ্যুতিকে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। বস্তুতঃ হঠাৎ কোনো দৃশ্য বা ঘটনা এমন ভাবে চেতনাকে নাড়া দেয় যে, তার প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে নিজের অলক্ষ্যে সঞ্চিত অনেক উপকরণকে একত্র করতে হয় এবং নিজের অভিমত দেখে নিজেকেই বিস্মিত হতে হয়। আমার এই যুক্তি তর্কের মধ্যেও সেই বিস্ময় ছিলো। এজন্য সালামের

প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ সে টেনে না নিয়ে গেলে আমি এমন একটি সমাবেশে উপস্থিত হতাম না। অন্যদিকে এরই মধ্য দিয়ে সালামের সাথে আমার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে উঠেছিলো। যদিও শেষ পর্যন্ত সে সম্পর্ক টিকেনি, তবুও আমি তদ্দ্বারা খুবই উপকৃত হয়েছি। কিন্তু সে কথা এখন নয়।

আপাততঃ আমার জন্য একটি সুখবর আছে। আমি জেনারেল ইংলিশ পরীক্ষায় পাশ করেছি। খুব খুশী হলাম এবং তারই স্মৃতি ধরে রাখার জন্য গর্কির 'মাদার' উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদ কিনে আমার স্ত্রীকে উপহার দিলাম। এ সময়ে আমি গর্কি, টলস্টয়, চেখভের বহু বই পড়ে ফেলেছি। সাহিত্যের প্রয়োজনেই পড়তে হয়েছে। এসবের মধ্যে গর্কির জীবন-স্মৃতিমূলক উপন্যাসটি আমাকে বেশ আকর্ষণ করেছিলো। তবু উপহার দেবার বেলায় তার বদলে 'মা' নামক এই উপন্যাসটি কেন বেছে নিলাম, তা তখনো খুব বোধগম্য নয়!

তবে ইতিমধ্যেই আশরাফ ফারুকী ও আব্দুল গফুর সাহেবের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। তাঁরা নিজেরাই এই পরিচয় স্থাপনের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। আমাকে হল থেকে বের করে নিয়ে রমনা পার্কে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে বিভিন্ন ব্যাপারে দীর্ঘকাল তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা হয়। তমদ্দুন মজলিসের প্রতি, বাংলা ভাষা আন্দোলনে তাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য, আমার একটা দুর্বলতা ছিলো। তারই সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। হয়তো কারো কাছে আমার এই দুর্বলতার কথা জানতে পেরেই তাঁরা আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সত্যি আমি খুব সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাঁদের যুক্তি একটা পর্যায় পর্যন্ত অনুসরণ করা যায়, এরপর তা যখন প্রশস্ত পথ ছেড়ে কানা গলিতে ঢুকে পড়ে, তখনি মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। মনে হয়, তাঁরা এতোক্ষণ যে মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ করেছেন, তা এই কানা গলির শ্বাস রুদ্ধকর পরিবেশকে সহনীয় করে তোলার জন্য, তাকে রাজপথে পরিণত করার জন্য নয়। আমিতো কানাগলি ছেড়ে তখন উন্মুক্ত রাজপথে উঠে আসার জন্য চেষ্টা করছি। কারণ আমি জানি; সেই রাজপথ শহর গ্রাম পেরিয়ে মাঠ ময়দানের মধ্য দিয়ে কেবলই এগিয়ে গেছে। কাজেই সেই রাজপথের গন্তব্য একটি কানা গলিতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাক্, এ আমি কিছুতেই চাইতে পারিনা। তাই তাঁরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন! আমি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি।

যাহোক, আমি খরিচায় এসেছি পরীক্ষা পাসের আনন্দ সংবাদ দিতে। সেখানে এসে দেখি শমশের ভাই ও বড়ো ভাই দুজনেই আছেন। তাঁদের মুখেই শুনলাম, বাঁটোয়ারা মামলার রায় বেরিয়েছে। আমরা মামলায় জিতেছি। শুধু কাওলাদাররা নয়, সেটেলমেন্ট পরচায় আমার বড় চাচার বাবার সহোদর হবার দাবীও নস্যাও হয়ে গেছে। শমশের ভাইরা তাঁদের ওয়ারিশ, খরিদা ও হেবা মিলিয়ে মোট জমির দুই তৃতীয়াংশ লাভ করেছেন, তাতে অবশ্যি আমার কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কারণ জমি যে উদ্ধার হয়েছে তাতেই আমি মহাখুশী।

আরো খুশী হলাম, বু যখন বললেন যে, আমি নাকি আবার পিতা হতে চলেছি। কিন্তু সায়িদাকে খুব একটা খুশী দেখলাম না। পূর্বের অভিজ্ঞতা তাকে এখনি ভাবিয়ে তুলেছে। ভাঙা পা-ও নাকি কেবলি গর্তে পড়ে, কাজেই রাস্তার শেষ মাথায় না পৌছা পর্যন্ত খুশি হবার কিছু সেই। এখনতো মাত্র তিন মাস!

যাহোক, আমি কিছুটা আনন্দ নিয়েই ঢাকা গিয়ে পৌছলাম। কিন্তু পথের একটি ঘটনা সেই আনন্দকে কেমন যেন ক্ষত বিক্ষত করে দিলো। আমার স্টেশনে পৌছতে দেরী হওয়ায় টিকেট করতে পারিনি। টিটিকে সে কথা বললাম। সে বললো যে, আমার ময়মনসিংহ থেকে উঠার প্রমাণ দিতে না পারলে পুরো ভাড়া দিতে হবে। এ কারণেই গার্ডকে বলে গাড়িতে উঠতে হয়। কিন্তু আমিতো তাও করিনি। কাজেই সে আমাকে টিকেট না দিয়েই চলে গেলো। তেজগাঁও স্টেশনে নেমে আবার তার সাথে দেখা হলো। সে তখন বললো যে, টিকেট ছাড়া ভাড়াটা দিয়ে দিলে সে আমাকে গেইট পার করিয়ে দেবে। কিন্তু আমি তার প্রস্তাবে সম্মত হলাম না; বরং রেলওয়েকে ফাঁকি দেবার এই মনোভাবের নিন্দা করলাম। সে একজন পুলিশ ডেকে আনলো এবং আমি বিনা টিকেটে ভ্রমণ করেছি বলে যথা বিহিত ব্যবস্থা নিতে বললো। পুলিশটি আমাকে নিয়ে তাদের অফিস কক্ষে গিয়ে পৌছলো এবং অফিসার ইনচার্জকে আমার ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে তিনি আমাকে বসতে বললেন। কিন্তু আমি গোঁ ধরে দাঁড়িয়েই রইলাম।

আসলে এসব ব্যাপারে আমার একটা ভীষণ গোঁ ছিলো। আমি কখনো পারতপক্ষে বিনা টিকেটে রেলগাড়িতে উঠতাম না। বিনা ভাড়ায় রেল ভ্রমণকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করতাম। সেই সঙ্গে আমি যেহেতু ফাঁকি দিতে চাইনা, সেজন্য অন্য কাউকে ফাঁকিতে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলোনা। এমনও হয়েছে বিনা টিকেটে সারা পথ এসে যে স্টেশনে পৌছলাম, সেখানেও গেইটে কোনো লোক না থাকায় গেইট পেরিয়ে দূরত্বের সমমূল্যের একটি টিকেট কিনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। যাতে করে আমার বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার থাকতে পারি যে, আমি সুযোগ পেয়েও ফাঁকি দিইনি। সুতরাং সেই সরলতার গোঁ-ই আজকে আমাকে পুলিশ অফিসে নিয়ে গেলো।

ভদ্রলোক বোধ হয় কী একটা করছিলেন। আমি বসছিনা দেখে তিনি এবার মুখ তুলে আমাকে ভালো করে দেখলেন, তারপর বললেন, 'আপনি যদি হাজতে যেতে না চান, তা হলে পুরো ভাড়াটা দিয়ে চলে যান।'

আমি তাকে বুঝিয়ে বলতে গেলে তিনি বললেন যে, আমি আইন দেখালে তারাও আইন দেখাবে এবং জরিমানা দিয়ে আগামীকাল বিকালের আগে আমি ছাড়া পাবোনা। কাজেই আমি যেন সে ধরনের বোকামী না করি। আমি আর কোনো কথা বলছিনা দেখে তিনি অন্য একজন পুলিশকে ডেকে আমার নিকট থেকে পুরো ভাড়া আদায় করে ছেড়ে দিতে বললেন। পুলিশের সাথে বেরিয়ে গেলাম আমি। গিয়ে দেখি কিছুটা দূরে সেই টিটি সাহেবও দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'সেইতো দিলেন, মাঝখানে একঘণ্টা দেরী করলেন কেন!'

আমি কোনো কথা না বলে দশ টাকার একটি নোট বের করে তার হাতে দিলাম এবং টিকেট ও ভাংতি দশ আনার পয়সা তার হাতে থেকে নিয়ে গেইটে তারই হাতে টিকেটটি দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। মনে মনে আমার নিজের প্রতিই তখন রাগ হচ্ছিলো। একী অভ্যাস আমি গড়ে তুলেছি! এ নিয়ে তো অহেতুক বিপদে পড়তে হবে। আমার নিজের প্রতিই তখন রাগ হচ্ছিলো। আমার সততার মূল্য কেউ দেবে না, বরং বারবার আমাকে আহতই করবে!

আমি যে একেবারে নিষ্কলুষ, তাতো নই। ছোটবেলার কথা মনে পড়লো, দুষ্টামি করে কতো কিছুই না করেছি। এরপরও কি শুধু সততা দিয়েই জীবনের পথ অতিক্রম করে এসেছি? অন্ততঃ আর কিছু না করি, মিথ্যা কথাতো বলতে হয়েছে। তা হলে এমন গোঁ ধরে পাষাণ দেয়ালে মাথা ঠুকতে যাই কেন! এ সংসারে পরিপূর্ণ সৎ কে? মানুষতো দোষে গুণেই মানুষ; ফেরেশতাও নয়, শয়তানও নয়!

তবু বারবার ধাক্কা খেয়েও আমার এই সৎ হবার নেশা এখনো কাটেনি! কিছুটা অহংকারও বুঝি এর সাথে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু খেসারত দিতে হয়েছে প্রচুর!

থাক সে কথা। হল জীবনের কথা বলি। খাবারের কথা এর আগে বলেছিলাম। এর ব্যবস্থা হতো ছাত্রদের দ্বারাই। এজন্য অনুরূপ ব্যবস্থার দায়িত্ব যারা গ্রহণ করতো, তাদের ব্যাপারে একটা মুখরোচক কথা প্রচলিত ছিলো এই যে, কারো স্যুট তৈরী করার ইচ্ছা থাকলে ডাইনিং হলের ম্যানেজারী গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্তই একটা প্রচারণা মাত্র, তা আমি নিজে ম্যানেজারী গ্রহণ করে বুঝতে পেরেছিলাম। আসলে ব্যাপারটা, যারা পালা করে বাজার করতো, তাদের দায়সারা মনোভাব এবং ডাইনিং হলের বয় বেয়ারা ও পাচকদের ধূর্তামির মধ্যে নিহিত ছিলো। এর ফলে চেষ্টা করেও এর কোনো উন্নতি করা সম্ভব ছিলো না। অবশ্যি ম্যানেজাররা যে সবাই সমান ছিলো, তাও ঠিক নয়। কেউ যদি এভাবে স্যুট বানিয়ে থাকে, তাও অস্বাভাবিক কিছু নয়!

হলে খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিলো। তাস, দাবা, কেরাম, ভলিবল ইত্যাদি প্রায় সবই সমান তালে চলতো। কিন্তু আমি কোনো কিছুতেই যোগ দিতে পারিনি। কেন জানি, কোনোটাই আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। শুধু মাঝেমধ্যে কমন রুমে বসে রাত দশটার অনুরোধের আসর শুনতাম। সঙ্গীতের দিকে একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিলো বলেই অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে এটি সম্ভব হয়েছিলো।

এসময়েই একরাত টিকেট কেটে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের হল রুমে উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনতে গেলাম। এ সংগীত আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন সালামত আলী-নাজাকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁদের সাথে সুরাইয়া মুলতানিকর ও আখতারী বেগমের নামও মনে পড়ছে। নৃত্য পরিবেশন করেছিলো 'কমর' নামে একটি কিশোরী। সব কিছু মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি এমন উপভোগ্য হয়েছিলো যে, কী ভাবে সারা রাত কেটে গেলো,

আমরা বুঝতেই পারলাম না। সুরের এক অদ্ভুত আবেশ চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো। সকাল সাতটায় রোদ উঠলে হলে ফিরে এলাম।

অথচ এসময়ে সিনেমা দেখার আগ্রহ তেমন একটা ছিলোনা। শুধু বিশেষ আগ্রহ নিয়ে 'মুখ ও মুখোশ' দেখতে যাওয়া এবং নিরাশ হওয়ার কথা মনে পড়ছে। বিশেষ করে সুলতানা নাম্নী মহিলাটির 'পরোটা' উচ্চারণ আমার খুবই বিরক্তিকর মনে হয়েছিলো। এর একটা পরোক্ষ কারণ এও ছিলো যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত পরিবেশকে এই সুলতানা এমন ভাবে তার অশালীন চলাফেরা দিয়ে মুখর করে তুলেছিলো যে, তা কোনো দিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই ছাত্রী অবস্থাতেই সে সিনেমায় নেমেছিলো। সুতরাং আমার বিরক্তির এও একটি কারণ হতে পারে। একারণেই মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের অন্য এক ছাত্রী রওশন আরার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় তেমন ভালো না হলেও খারাপ লাগেনি।

কারণ অর্থ সামর্থই হোক বা রূপ যৌবনই হোক, কোনোটারই অশালীন প্রদর্শনী কোনো কালেই কল্যাণকর হয়না। কেননা মানুষ পশু নয়; শালীনতা দিয়ে পশুত্বকে চাপা দিতে পেরেছে বলেই সে মানুষ হয়ে উঠেছে। সেই চাপা দেয়ার লজ্জার আচ্ছাদনটি ছিঁড়ে ফেলে দিলে যা বেরিয়ে পড়ে, তা পশুর আচরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এজন্যই সুলতানাকে নিয়ে যুবকরা টানা হেঁচড়া করলেও কেউ তাকে নিজের ঘরনী করতে সাহসী হয়নি। শেষ পর্যন্ত সে এক অর্থশালী বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা হয়েছিলো।

এ সময়ে আরো একটি ব্যাপার আমার কাছে বিরক্তিকর ঠেকেছিলো। সম্ভবতঃ প্রথম বলেই এমনি বিরক্তির সম্মুখীন হয়েছিলাম। পরে দেখলাম এটিই মহাজন পন্থা। আমাদের কাছে সুখ্যাতির অধিকারী অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই তাঁদের জীবনে আমার অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই মহাজন পন্থা অনুসরণ করেছেন।

আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক আমিনুল ইসলামের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি এক টিউটারিয়েল ক্লাসে উপস্থিত আট দশ জন ছাত্রকে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করতে দিলেন। ব্যাপারটা ব্যতিক্রমধর্মী ছিলো। কারণ আমরা সাধারণতঃ একই বিষয়ের উপর লেখা তৈরী করতাম এবং সার্থকতা অনুসারে এ, বি, সি, মার্ক পেতাম। কিন্তু বিষয় একটি নয়, বিভিন্ন। কাজেই এতে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সামর্থ বিচারের তেমন কোনো সুযোগ ছিলোনা। তবু যাহোক আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করলাম এবং যথা নিয়মে রচনাগুলি পরীক্ষার জন্য তাঁর কাছে সমর্পণ করলাম। যে দিন ফেরৎ দেবার কথা, সেদিন রচনাটি চাইতেই তিনি সেটি তাঁর ব্যাগ থেকে বের করে আমাকে দেখালেন এবং খুব ভালো হয়েছে বলে এ প্লাস দিয়েছেন, তাও বললেন; কিন্তু সেটি আমাকে ফেরৎ না দিয়ে আবার তাঁর ব্যাগের মধ্যে পুরলেন। আমি জিজ্ঞাসা করায় তাঁর প্রয়োজন আছে বলে আমাকে জানালেন। আমি আর উচ্চবাচ্য করিনি। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেটি তাঁর নামে প্রকাশিতব্য একটি রচনার বইতে ব্যবহার করেছেন। এতোদিন পরে বিভিন্ন বিষয়ে রচনা লেখানোর

তাৎপর্য আমার বোধগম্য হলো এবং কেমন এক বিরক্তিজনক সংকীর্ণতায় মনের ভিতরটা হাঁফিয়ে উঠতে লাগলো।

এর ফল হলো এই যে, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব কমে গিয়ে কেমন একটা বিরূপতা দেখা দিলো। আর তা আমি সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে পারলাম শিক্ষা ভ্রমণে গিয়ে। ১৯৫৭ সনের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অর্থানুকূল্যে ভারত, পশ্চিম পাকিস্তান হয়ে প্রায় একমাস ব্যাপী শিক্ষা ভ্রমণে আমরা, বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এতে আটজন ছাত্রী, চৌদ্দজন ছাত্র, দলনেতা হিসাবে সস্ত্রীক অধ্যাপক আহমদ শরীফ এবং সহকারী নেতা হিসাবে অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম যোগ দিয়েছিলেন। সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্রকে দুশ' টাকা করে দিতে হয়েছিলো।

এই শিক্ষা ভ্রমণ দলের সদস্য হিসাবে আমি যে কোন্ গুণে নির্বাচিত হয়েছিলাম, তা বলা মুশকিল। কারণ এ ব্যাপারে আমাদের কোনো পরীক্ষা বা সাক্ষাতকার নেয়া হয়নি। প্রায় দেড়শ' ছাত্রের মধ্যে আমাদের নাম একটি নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেয়া হয় এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দুশ'টাকা জমা না দিলে এই সুযোগ হারাবার সম্ভাবনা আছে বলে সতর্ক করা হয়। আমার নাম দেখে আমি খুবই উৎসাহিত হয়েছিলাম; কিন্তু টাকার অংক দেখে ঘাবড়ে গেলাম। এতো টাকা আমি একসঙ্গে কোথায় পাবো! দোকান থেকে আনা সম্ভব নয়। কারণ আমার শ্বশুর মারা যাবার পর তৎকালীন কর্মচারী কোব্বাদ মিয়া যখন আমার কাছে দোকানের হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নেন, তখন তাতে সর্বসাকুল্যে পুঁজি ছয়শ' টাকার মতো। এর পর শমশের ভাইয়ের তত্ত্বাবধায়ন যাবার পর সামান্য কিছু বেড়েছে। কিন্তু যাইহোক, সেখান থেকে তিনশ' টাকা এক সাথে বের করে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু যে করেই হোক, এই টাকা আমাকে যোগাড় করতে হবে। হঠাৎ পুবের বাড়ির বুর কথা মনে পড়লো। পরদিনই ছুটলাম খরিচায় এবং পুবের বাড়ির বুকে বুঝিয়ে বলতেই তিনি সাড়ে তিনশ' টাকা বের করে দিলেন।

অদ্ভুত মহিলা! কোথায় শিক্ষা ভ্রমণে যাবো, তাতে কী হবে, এসব ব্যাপারে বুঝার কথাতো তাঁর নয়, কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে বুঝলেন ব্যাপারটা জরুরী; অমনি তাঁর মন বিগলিত হয়ে গেলো! বুও বেশ উৎসাহ দেখালেন। শুধু সায়িদা মুখ বাঁকিয়ে বললো, 'আমাদের কথা কি তোমার মনে থাকবে! যদি প্রতিটি স্থান থেকে পত্র না দাও, তাহলে বুঝবো, তুমি অন্যত্র অন্য কারো সাথে জড়িয়ে গেছো!'

আসল ব্যাপার, কথায় কথায় ছাত্রীদের কথাও আমি তার কাছে বলে ফেলেছিলাম। কাজেই তার এই মন্তব্যের মধ্যে তারই ইঙ্গিত ছিলো। মেয়েরা স্বামীকে কী মনে করে জানিনা, তবে যিনি যতো সৎ-ই হোন না কেন, স্ত্রীর নিকট তার সততা বারবার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এর কারণ একমাত্র স্ত্রী-ই তার স্বভাবের সেই গোপন দিকটি জানে, যা অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এ জন্যই অন্যের কাছে আমরা যতো বিশেষণেই বিশেষিত হইনা কেন, স্ত্রীর কাছে একজন পুরুষ মাত্র!

যাহোক, নির্ধারিত তারিখের আগেই আমার টাকা জমা দিয়ে দিলাম এবং অন্যদিক থেকেও প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলাম। আমি তখন অধিকাংশ সময় পায়জামা পাঞ্জাবীই পরি, তবে প্যান্ট হাওয়াই সার্টও আছে। কিন্তু কোনোটাই তেমন শোভন কিছু নয়। মনে মনে ভাবলাম, কলকাতা থেকে একটা স্যুট কিনে নিলেই হবে। আপাততঃ বিছানার জন্য পঁচিশ টাকা দিয়ে নিউ মার্কেট থেকে একটা ছোট হোল্ডল কিনে নিলাম। এতে আমার ছোট লেপ, বিছানার চাদর ও বালিশটি ঢুকিয়ে ফেললাম।

ব্যস্, ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন থেকে একদিন সকাল বেলা আমাদের যাত্রা হলো শুরু। দিন তারিখ এখন আর মনে নেই। শুধু মনে আছে বেশ আনন্দ কোলাহলের মাঝেই ময়মনসিংহ ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। তখন বেলা দশটা। গাড়ি ছাড়তে আধঘণ্টা খানেক দেরী হবে জেনে রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্ট রুমে আমরা চা নাশতা খেয়ে নিলাম। কিন্তু গাড়ি ময়মনসিংহ রোড স্টেশনে পৌছার আগেই খোঁজ হলো দলের সহকারী নেতা তথা ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম সাহেব টাকা, রেলওয়ে পাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজ ভর্তি এটাচী ব্যাগটি সেই রিফ্রেশমেন্ট রুমে ভুলে ফেলে চলে এসেছেন। চেইন টেনে মেইল ট্রেন রোড ষ্টেশনে থামানো হলো এবং ম্যানেজার সাহেব একজন ছাত্র নিয়ে ময়মনসিংহ ষ্টেশনের দিকে চলে গেলেন।

ট্রেন আবার ছাড়লো; কিন্তু সরিষাবাড়ি গিয়েই আমাদের যাত্রা বিরতি করতে হলো। সেখানে এম, এ, ক্লাসের ছাত্রী হামিদা আপার স্বামী কোনো জুট কোম্পানীর ম্যানেজার হিসাবে চাকরী করেন। যোগাযোগ করে কোম্পানীর ডাক বাংলোতে আমাদের থাকার স্থান নির্ধারণ করা হলো। কারণ দলের ম্যানেজার এসে না পৌছা পর্যন্ত আমাদের অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। কারণ হারানো ব্যাগটি যদি তিনি না পান, তাহলে এই সরিষাবাড়িতেই আমাদের শিক্ষা ভ্রমণের ইতি টানতে হবে।

প্রায় সবারই মেজাজ খিচড়ে যাবার মতো অবস্থা। অতি করিৎকর্মা হলে যা হয়, তাই হয়েছে। তা না হলে মেয়েদের অনেকেইতো গাড়িতে ছিলো, তাদের কাছে রেখে গেলেই হতো। যাহোক, ব্যাগটি তিনি ভাগ্যক্রমে পেয়ে গিয়েছিলেন এবং স্টেশনে ফোন করে জানালেন যে, তিনি বিকালের গাড়িতে সরিষাবাড়ি আসছেন।

আমরা আর কী করি, ডাক বাংলোতে ঠাঁই নিলাম। হামিদা আপার স্বামী ও তাঁর সহকর্মীরা খুব যত্ন করলেন আমাদের। আমরা ঘুরে ফিরে বাজার, নদীর ঘাট, এটা সেটা দেখলাম। ফিরে এসে দেখি বাংলোর বারান্দায় বসে জহির রায়হান তন্ময় হয়ে একটা কিছু লিখছেন। আমি ভাবলাম, ভ্রমণ কাহিনী; কিন্তু উঁকি মেরে কিছুটা পড়ে মনে হলো, কোনো একটা উপন্যাস।

সহযাত্রীদের কথা যখন এসেই পড়েছে, তখন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যাদের নাম মনে করতে পারছি, তারা হলেন, জহির রায়হান, হামিদা রহমান, মাহমুদ শাহ কোরেশী, আব্দুল আউয়াল, পুষ্পিতা বড়ুয়া, আলী ইমাম, বশিরা বারী মালীক, আতাউল হক, সাদ উদ্দিন; আর, আর, না, আর মনে পড়বেই বা কী করে! যারা দৃষ্টির সামনে পড়েছে বা কোনো কারণে এসেছে, তাদের কথাই স্মৃতি ধরে রেখেছে; বাকীরা হারিয়ে গেছে।

যাহোক. প্রায় ভোর রাতেই আমরা আবার গাড়িতে চেপে বসলাম। জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে পৌছে আবার লাগেজ হারানোর উপক্রম হয়েছিলো। সুতরাং ম্যানেজার সাহেব এরপর খুব সতর্ক হয়ে গেলেন এবং ফেরীতে লাগেজের সংখ্যা নির্ধারণ করে ফেললেন। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে জহির রায়হানের একটি বিরাট হোল্ডলের মধ্যে আমার ক্ষুদ্রটিসহ অনেকের বিছানা পত্র নিয়ে প্রবেশ করালেন। এতে লাগেজের সংখ্যা কমে অধিকতর নিরাপত্তার ব্যবস্থা হলো বটে, কিন্তু ট্রেনে তা ব্যবহার করার আর সুযোগ রইলো না। একটি এটাচী ব্যাগ হারানোর সতর্কতা আমাদের সকলের বিছানা পত্রের স্বাধীন ব্যবহার হরণ করে নিলো।

তাহোক, আমরা এবার বর্ডার স্টেশন বেনাপোল গিয়ে পৌছলাম। সেখানে পাসপোর্ট দেখানো, মালপত্র চেক করানোতে বেশ সময় লাগলো। এই অবসরে আমরা ভারতীয় ফেরিঅলাদের নিকট থেকে মাটির ভাঁড়ে চা খেলাম। এক আনা করে এক কাপ চা, কিছুটা পানসে ধরনের হলেও বেশ সস্তাই বলতে হবে। কারণ মাটির ভাঁড়টি সহই তা এক আনা। চা খেয়ে ভাঁড়টি ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হলো, তাতে ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই অনেকটা কমে বটে; কিন্তু কেমন যেন তৃপ্তি পাওয়া যায়না।

তবু গাড়ি ছাড়লো। আমরা শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌছলাম বিকালে। পথে বঙ্কিমের জন্মস্থান কাঁঠালী পাড়া, কল্যাণী উপশহর দেখিয়ে গাড়ি এনে এখানে ছাউনীতে প্রবেশ করলো। এখানে নেমে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। কারণ আমাদের জন্য থাকার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে পাকিস্তান হাই কমিশন অফিসে। সেখানে যোগাযোগ করে জানা গেলো যে, হাই কমিশন অফিস থেকে গাড়ি পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের নিজের ব্যবস্থাতেই সেখানে পৌছতে হবে। সে ভাবেই টানা রিকসায় আমরা সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌছে গেলাম। একটা দোতলা বাড়ির হল রুমে আমাদের অনেকের ঠাঁই হলো। মেয়েদের জন্য একটি পৃথক রুমের ব্যবস্থা করা হলো।

কলকাতায় এই আমার প্রথম আসা। এর আগে কতো নাম শুনেছি এই শহরের, বইপত্রে কতো তার বর্ণনা পড়েছি; তাই ভারতের এক কালের রাজধানী এই নগর আমার বড়ো চেনা। কিন্তু তার সাথে সাক্ষাত পরিচয় হলো আজ। ঢাকার ঘিঞ্জি গলির অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে সব কিছুই প্রশস্ত ও বড়ো মনে হতে লাগলো। তাছাড়া প্রশস্ত রাস্তার মাঝ খান দিয়ে ট্রাম লাইন এক নতুন আকর্ষণ। একটা বড়ো কিছু দেখার আনন্দ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিন্তু সকাল বেলাই মনটা খিঁচড়ে গেলো। ম্যানেজার সাহেব হঠাৎ এসে আমার উপর চড়াও হলেন। চা নাশতা খেতে বাইরে যাবো, এমন সময় তিনি এসে বললেন, আমার দাড়ি কামিয়ে ফেলতে হবে। আমি হ্যাঁ, না, কিছু না বলেই বাইরে গেলাম। ফিরে এসে দলের সাথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, গড়ের মাঠ, মনুমেন্ট, এ্যাসপ্লানেড চৌরঙ্গী ইত্যাদি ঘুরে বেড়িয়ে ধর্মতলা স্ট্রীটের এক দোকান থেকে পয়ঁত্রিশ টাকা দিয়ে আমার জন্য একটি সাদা লিনেন কাপড়ের স্যুট কিনলাম। বিকালে আবার দেখা হলো ম্যানেজার সাহেবের সাথে। তিনি বললেন, 'তুমি দেখছি এখনো মোল্লাই রয়ে গেছো।'

আমি ভিতরে ভিতরে রেগে গেলেও কোনো উত্তর দিলাম না। কারণ যাই হোন, তিনি আমার শিক্ষকতো! কোন্ কথায় কোন্ কথা বলে ফেলি, ঠিক নেই। কিন্তু মনের রাগ চেপে রেখে বাইরে যাওয়াই আমার পক্ষে দায় হয়ে উঠলো। অনেকেই গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলো, কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। সাদ উদ্দিনকে সাথে নিয়ে বাইরে এক দোকানে চা খেতে গেলাম। কিন্তু চা-ও মুখে বিস্বাদ হয়ে উঠলো। মনে মনে বললাম, 'উস্তাদ, ঢাকা পৌছে আপনাকে আমার মোল্লাকি দেখাবো।'

যাহোক, পরদিন আমরা সবাই একসাথে গেলাম আলীপুর চিড়িয়াখানা দেখতে। বিরাট আয়োজন। সব চাইতে ভালো লাগলো একটি বনমানুষ ও একটি জেব্রা। আরো অজস্র প্রাণী ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। সবইতো চেয়ে দেখার মতো। আর আমার এই প্রথম চিড়িয়াখানা দেখা। কিন্তু সময় বড়ো কম। বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখতে যেতে হবে। সেখানে পৌছে বিচিত্র বনস্পতি আর লতা গুল্মের অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে হলো। শুধু কিছুক্ষণ বসলাম সেই বটগাছটির কাছে, যার কাণ্ড নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; কিন্তু জটা শিকড়ের উপর এখনো প্রসারিত হয়ে আছে চার দিককার ডালপালা!

পরদিন অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো স্থানে যাবার প্রোগ্রাম ছিলো না। কারণ ঐদিন সন্ধ্যায় জনতা এক্সপ্রেস যোগে আমরা আগ্রা যাত্রা করবো। তাই ম্যানেজার সাহেব যাবেন তাঁর ম্যানেজরীয়েল স্টাফ নিয়ে আমাদের পাথেয় সংগ্রহ করতে। অন্যদেরও নানা জায়গায় যাবার প্রয়োজন আছে। এমনি ভাবে আমরা দুজন মাত্র একত্র থাকতে পারলাম, আমি আর আতাউল হক। কী আর করবো, শিয়ালদা স্টেশনের আশে পাশেই কিছুক্ষণ হেঁটে হেঁটে ঘোরাফেরা করলাম। ট্রামে উঠার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু উঠে যাবোই বা কোথায়! শুধু শুধু পয়সা খরচ করে কী লাভ! তাই দুপুর না হতেই হাই কমিশনে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার আগেই পার হলাম হাওড়া ব্রীজ। তারপরেই রেল স্টেশন। ভীড়ের ঠেলায় স্বস্তিতে দাঁড়ানো দায়। যাহোক, শেষ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর পনেরো জনের একটি কামরা দখল করতে পারলাম আমরা। মালপত্র আর পাথেয় সবই ঠিকঠাক মতো গাড়িতে উঠেছে। লোকটা সত্যি উস্তাদ! তা না হলে মুনীর চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আব্দুল কাইউমের সাথে চার নম্বরে প্রথম শ্রেণী বাগাতে পারতেন না। রাত্রের খাবার খেয়ে মনটা তাঁর প্রতি কিছুটা প্রসন্ন হলো। কিন্তু যাকে মনে করতাম উন্নাসিক সেই শরীফ স্যার আমাদের সাথে একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। কার তাস বুঝি তিনি কেড়ে নিয়েছেন। আমাকে পক্ষ বানিয়ে তাই খেলতে বসলেন। যখন দেখলেন যে আমি একেবারে আনাড়ী নই, তখন তাঁর খুশী দেখে কে! সেই খুশীর চোটে আমার কাছে একটি সিগারেটই চেয়ে বসলেন। আমি স্যারের মুখে সেটি তুলে দিয়ে ম্যাচ জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, 'উহুঁ, তুমিও একটা ধরাও।' কী আর করি, গুরুজনের নির্দেশ, মান্য না করে পারা যায় না। একজনের দাড়ি ফেলার আদেশ অমান্য করেছি, কিন্তু অন্য জনের এই সিগারেট খাবার আদেশতো অমান্য করতে পারিনা। কারণ 'প্রবাসে নিয়ম নাস্তি।'

তাছাড়া পনেরো জনের এই কামরায় আমরা যে ভাবে গাদাগাদি হয়ে আছি, তাতে আড়াল খোঁজার কোনো উপায় নেই। কিন্তু মজা হলো এই যে, দুপুর রাতের পরে কোনো এক স্টেশনে এক ভদ্রলোক জোর করেই আমাদের কামরায় উঠে এলেন। আমাদের অবস্থা দেখে তাঁর বুঝি মায়া হলো। তাই দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'বুঝতে পারছি, আপনারা আগ্রা যাবেন। তাই যদি অনুমতি দেন আমি কিঞ্চিৎ আবৃত্তি করতে পারি।'

আমাদের তাস খেলা তখনও চলছে। অবশ্যি অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তবু এক ঘেয়েমি দূর করার জন্য আমরা অনুমতি দিলাম। ভদ্রলোক উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে 'শাজাহান' আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন। মনে হলো, তার সুরে যেন সমস্ত কামরাটা গম্‌গম্‌ করছে। 'হে সম্রাট কবি', বলতেই অনেকেই চোখ রগড়ে উঠে বসলেন। তন্ময় হয়ে শুনলাম তাঁর আবৃত্তি। আবেগে করুণায় মনের মধ্যে কে যেন বলতে লাগলো, 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই, প্রিয়া!'

পালা করে ঘুমানোর পালায় চোখ তখনো ঢুলছে, হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো, 'ঐ তাজমহল দেখা যায়!' ধড়ফড় করে জানালা দিয়ে চোখ বাড়ালাম। না, খুব স্পষ্ট নয়, তবু আবছা একটা আদল বুঝি চোখের তারায় ফুটে উঠছে। গাড়ি যমুনা পুলের উপর উঠতেই হঠাৎ করে ভেসে উঠলো তাজ, তারপর মিলিয়ে গেলো। গাড়ি এসে ভিড়লো আগ্রা স্টেশনে ।

লটবহর নিয়ে একটা হোটেলে এসে উঠলাম আমরা। সবাই খুব ক্লান্ত! হাত পা ছড়িয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে না পারলে ঘুমঘুম চোখে তাজের সজীবতা ধরা পড়বেনা। গা ধুয়ে কিছু নাশতা খেয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম এসেও আসতে চায়না। তাজমহলের এতো কাছে এসে ঘুমিয়ে পড়বো! কিন্তু একাতো যাওয়া যাবে না। উঠে পড়ে দেখলাম, সাদ উদ্দিনও উসখুস করছে। বাইরে গেলাম সিগারেট কিনতে। ঘুরলাম আশেপাশের রাস্তায়। যেন তর সইছেনা। কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পর রোদের ঝাঁজ একটু কমে আসার আগে বেরুনো গেলোনা। টাঙ্গায় চলেছি আমরা যমুনার পাড় ধরে। এরপর কিছুটা গাছের আড়াল পেরিয়েই লালচে পাথরে বাঁধানো একটা চত্বরে উঠে এলাম আমরা। ডানপাশে লাল পাথরের তৈরী সরাইখানা, দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার। বামপাশে সেই পাথরের এক বিরাট সিংহ দরজা। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো তাজ, যেমন ভেসে উঠে ছবির মাঝে। তারপর কিঞ্চিৎ নীচু চত্বরের মাঝখানে পাথরে বাঁধানো পরিখার দুপাশে ঝাউগাছের সারি। দুপাশ দিয়েই পাথরে বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে তাজের দিকে। মাঝে মাঝে পাথরের বেদী। দিব্যি বসে আরাম করে তাজ দেখা যায়।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম বাঁ পাশের রাস্তা দিয়ে। সামনেই তাজের ভিত্তিমূল দাঁড়িয়ে আছে। একই লালচে পাথরে তৈরী হয়েছে এই ভিত্তি, প্রায় একতলা সমান উঁচু। দুটি রাস্তার মাথা থেকে দুটি সিঁড়ি উঠে গেছে ভিত্তির গা বেয়ে, মিশে গেছে একটি

সোপান স্তরে। উঠে গিয়ে ঠিক তাজের মাঝামাঝি সামনে দাঁড়ালাম। মনে হলো, বলে উঠি. 'এই তব হৃদয়ের ছবি!' সাদা মর্মরের তৈরী বিরাট এক সৌধ। দোতলা সমান উঁচু তার গুম্বুজ আকৃতির বিরাট দরজা। তার উপর দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট গুম্বুজ। ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে বাম পাশে ঘুরলাম; ডান পাশে পড়লো একটি বিরাট সৌধ, নহবতখানা। দেখতে অনেকটা মসজিদের মতো। মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালাম, মনে হলো সেই একই স্থানে বুঝি একটু আগে দাঁড়িয়েছিলাম। একই ধরনের দরজা, একই ধরনের ডিজাইন। আবার বাম দিকে ঘুরলাম; ডান পাশে যমুনা নদী। আবার বাম দিকে ঘুরলাম; ডান পাশে মসজিদ, অবিকল সেই নহবতখানার মতো। আর দরজা ও ডিজাইন সেই একই। একটি দরজা দেখলেই বাকী তিনটি দেখা হয়ে যায়।

এবার এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। মুখপাতেই সাদা মর্মর খোদাই করে লাল টক্‌টকে মুগা পাথর বসিয়ে লিখা হয়েছে সুরা ইয়াসীনের প্রথমাংশ। এভাবে চার দরজা মিলে শেষ হয়েছে পুরো সুরটি। ভেতরের মুখপাতে তেমনি আমপারার চারটি সুরা। দরজা দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়ে পাথরের জালি দিয়ে ঘেরা দুটি কবর; আল্লাহ্‌র নিরান্নব্বই নাম লেখা পাথরের চাদর দিয়ে ঢাকা। এ দুটি নকল কবর। সোজা নীচে ভিত্তির গভীরে রয়েছে মূল কবর।

বেরিয়ে এসে ভিত্তির গা ঘেঁষা সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনে হলো, ভিত্তির চার কোণায় চারটি উঁচু মীনার যেন এখনই দেখতে পেলাম; কী বিরাট আর উঁচু! কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে মনে হলো, একটি নারীর স্মৃতির জন্য বুঝি বড়ো বেশি হয়ে গেছে! চলে এলাম প্রবেশ দ্বারের কাছে। বসে পড়লাম চত্বরের উপর। দুচোখ মেলে চেয়ে রইলাম তাজের দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আসছে। সেই আলো আঁধারিতে এক অপরূপ আভায় ভাস্বর হয়ে উঠলো তাজমহল। তাজকে যদি দেখতে চাও, কাছে যেয়োনা, দূর থেকে দেখো!

হোটেলে ফিরে এলাম একটা অতৃপ্তি নিয়ে। একি তাজকে দেখার অতৃপ্তি; না তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আমার অক্ষমতার অতৃপ্তি; কিংবা একজন বিরাট ক্ষমতাবান লোকের প্রেমের নামে বিপুল অবিমৃষ্যকারিতার নিদর্শন দেখার অতৃপ্তি? বুঝিনা, কেন যে আমার ভালো লাগেনি; কেন যে আমাকে আনন্দ দেবার বদলে কেবলই বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তুলছে!

পরদিন ফতেপুর সিক্রি। বাসে করে রওনা হলাম। দশ এগারো মাইল পথ অতিক্রম করতেই পাইনের সারি দেওদারুর চূড়া ভেদ করে ভেসে উঠলো বুলন্দ দরওয়াজা। নীচু উপত্যকা বেয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে একটি অনতি উচ্চ পাহাড়ী এলাকায় নির্মিত দুর্গের সামনে। লালচে পাথরের তৈরী তেতলা সমান উঁচু গুম্বুজাকৃতির এই মূল ফটক। নীচু থেকে পঞ্চাশটি সিঁড়ি বেয়ে উপরের চত্বরে উঠলেই চোখে পড়ে সাদা মর্মরের তৈরী একটি ছোট মাজার। সেলিম চিশতীর মাজার এটি। লালচে পাথরের তৈরী দরদালানের দেহের মাঝে যেন একটি হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। ডানদিকে পাঁচতলা

বেগম মহল। তার গায়ে খোদাই করা বিভিন্ন জীব জন্তুর মূর্তি। কিন্তু নির্মমভাবে এদের মস্তক ছেদন করা হয়েছে। দুর্গটি নির্মাণ করিয়েছিলেন সম্রাট আকবর। আর জীবজন্তুর এই মস্তক ছেদন করিয়েছেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। দুর্গের পিছনে 'হিরণ মীনার', একটি প্রিয় হাতির স্মৃতিস্তম্ভ। বেগম মহলের পাশেই হারেমের সেই পাঠাগার, যার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আহত হয়ে ছিলেন জাহাঙ্গীর; আকবরের পুত্র সেলিম।

আরে, আরে, বেগম মহলের চত্বরেই একটি ছবির শুটিং হচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে দর্শকের সারিতে দাঁড়ালাম। দেখেই চিনলাম, নায়িকা মালা সিনহা। কিন্তু নায়ক? না, চিনতে পারলাম না। প্রেমিক প্রেমিকার একটি লুকোচুরির দৃশ্য। কানের মাঝে স্টার্ট, কাট্ শব্দই বাজলো; সঙ্গীত নেই নাকি!

সন্ধ্যায় এসেই আবার দৌড়ালাম তাজ দেখতে। কিন্তু অন্ধকারে তেমন ভালো লাগলোনা। কলকাতার এক কেরানী ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হলো। তিনি প্রায় প্রতি মাসেই আসেন তাজ দেখতে। এটা তার হবি। জ্যোস্না রাতেই নাকি তাজের বাহার খোলে। কিন্তু আমরাতো দেরী করতে পারবোনা, কালই এগিয়ে যেতে হবে দিল্লীর দিকে। হুনুজ, দিল্লী দূর অস্ত!

হ্যাঁ, কিছুটা দূরেতো বটেই। যাত্রার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আগ্রা দুর্গ। গেলাম দেখতে। যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা এই দুর্গটি তেমন বড়ো কিছু নয়। কিন্তু এখানেই অলিন্দটি আছে, যেখানে বসে বসে বন্দী শাজাহান তাজের দিকে চেয়ে থাকতেন। আছে সাদা মর্মরের তৈরী মতি মসজিদ।

কিন্তু দিল্লী কি সত্যি খুব দূরে? নিজাম উদ্দিন আউলিয়া যে অর্থে বলেছিলেন, সে অর্থেতো খুবই দূরে, পৌছানো যায় না। কিন্তু আমরাতো দিব্যি পৌছে গেলাম। এখানেও হাই কমিশন অফিসে ঠাঁই হলো আমাদের। পরদিন খেয়ে দেয়ে ছুটলাম কুতুব মীনারে। ওরে বাবারে, কী বিরাট পাথুরে স্তম্ভ! দুশ' চৌষট্টিটি সিঁড়ি ভেঙে চূড়ায় উঠতে হয়। উঠে দাঁড়ালে দিল্লীর বিরাট এলাকা চোখে পড়ে। উঠলাম এবং সেই দৃশ্যও দেখলাম; কিন্তু ভয়ে বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। এর চাইতে তার পাশে রাখা ব্রাঞ্জের তৈরী ত্রিমূর্তি অশোক স্তম্ভটি দেখতে বরং আরাম। দোতলা সমান উঁচু, হাতে বেড় দেয়া যায়।

এরপর গেলাম 'হুমায়ুন টুম্ব' দেখতে। তাজ মহলের পরেই এই স্মৃতি সৌধটি সব চাইতে সুন্দর। গেলাম লাল কেল্লায়। ভিতরের বিরাট কুয়াটি দেখে বিস্মিত হলাম। এটিই নাকি ছিলো দুর্গের পানির উৎস। গেলাম ফিরোজ কোটলায়। ফিরোজ শাহ তুগলকের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত থরে থরে পাথরের চাঁই দিয়ে বাঁধানো হারেমের জলাশয়টি এখনো দর্শনীয়। গেলাম যন্তরমন্তর দেখতে। মাটির উপর ছড়ানো সময় নিরূপক একটি ঘড়ি। গেলাম নতুন দিল্লীর হিন্দুস্তান গেইট দেখতে। গেলাম চাঁদনী চকে কেনাকাটা করতে। কিন্তু কী কিনবো আমি, সাথেতো পয়সা খুব একটা নেই। তবু স্মৃতি চিহ্ন একটা কিছু বুঝি কিনেছিলাম, এখন আর মনে নেই।

কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে বুঝলাম দিল্লী ছড়ানো ছিটানো এক বিরাট ব্যাপার! কতো রাজার উত্থানপতন ঘটেছে এখানে; কতো দিগ্বিজয়ীর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এর পথে ঘাটে! এর এই বিস্তৃতির তুলনায় কলকাতা তো ঘিঞ্জি কানা গলির শহর!

এরপর লাহোর। বর্ডার পেরুনোর ঝামেলা মিটিয়ে গুজরানওয়ালায় পৌছতেই মনে হলো, বাংলাদেশের কোনো গ্রামের মধ্য দিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেতের আলে পাথরের চাঙড় ভেসে আছে, এতেই যা বিপত্তি। অবশ্যি লাহোর পৌছে ভিন্ন পরিবেশ পেলাম। হোটেলে উঠেছি; ধূলি আর মাছির অত্যাচার খুব বেশি। তবু ছ'আনা সের দরে আঙ্গুর কিনে চিবুতে চিবুতে রাবীর তীরে নুরজাহান, আসফ উদ্দৌলা ও জাহাঙ্গীরের মাজার দেখতে গেলাম। রেল লাইনের পাশে একটা ঝুপড়ীর মতো দালানে শুয়ে আছেন নুরজাহান। তাঁর পাশেই তাঁর মেয়ের কবর; যে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে শাহরিয়ারকে সম্রাট বানাতে চেয়েছিলেন, সেই মেয়ে। কিন্তু ভাই আসফ উদ্দৌলার চালে খুররমের কাছে হেরে গেলেন। সে শাজাহান হয়ে সিংহাসন দখল করলো। এ কারণেই আসফউদ্দৌলার মেয়ে মমতাজের কবরে তাজমহল নির্মিত হয়েছে আর এক কালের ভারত সম্রাজ্ঞী মেয়ে নিয়ে ঝুপড়ীতে শুয়ে আছেন। 'বর মাজারে মাগরীবা'—তাঁর যোগ্য উক্তিই বটে।

সে তুলনায় আসফউদ্দৌলার সৌধটি বড়ো এবং জাহাঙ্গীরেরটি বিশাল; লাল পাথরের তৈরী ইমারত। কোর্ট এলাকায় আনারকলির মাজার দেখতে গেলাম। দেখতে গেলাম শাহী মসজিদ। মূল দরজার বাঁ দিকে ইকবালের কবর। বিরাট চত্বরের সামনে তিন গুম্বুজের মসজিদটি সৌন্দর্যের প্রতীক। তার সামনেই লাহোর দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে প্রবেশ করে দেওয়ানে আম, দেওয়ানে খাস দেখলাম, দেখলাম শীস মহল, আয়নায় সুসজ্জিত একটি কক্ষ। দেখলাম ময়ুর সিংহাসনের নীচের সাদা পাথরের তৈরী চৌকিটি। ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হলেও এখনো সেই স্পর্ধিত উক্তি, —'বেহেশত যদি কোথাও থাকে', তার বহু স্মৃতি চিহ্ন এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে।

গেলাম পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে। পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের সাথে দেখা হলো। প্রশিক্ষণরত কয়েকজন বাঙালী সি এস পি অফিসারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান ছিলেন বলে মনে পড়ছে। চা নাশতায় আমরা আপ্যায়িত হয়েছিলাম।

এরপর রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে বাসে করে শৈল নিবাস মারী। ছাব্বিশ মাইল পথ পেরিয়ে দে ারু বৃক্ষের অরণ্য ছাড়িয়ে সেখানে গিয়ে পৌছতে পৌছতে শীতে কাবু হয়ে গেলাম। ে ীত করছে, কিন্তু উৎসাহের চোটে শীত উবে গেলো। ঘোড়ায় চড়ে গেলাম কাশ্মীর পয়েন্টে; সেখান থেকে কাশ্মীর দেখা যায়। ওইযে অনেক দূরে পর্বতশিরে বরফ ঝক্‌মক্ করছে, ওখানেই কাশ্মীর। আবার ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে গেলাম অন্য মাথায় পিন্ডি পয়েন্টে। চড়াই উৎরাই দিয়ে ঘেরা এই শহরে দেখার মতো দৃশ্য হলো উপত্যকাব্যাপী ছড়িয়ে থাকা পাইন দেওদারুর বিরাট বন।

নেমে এসে আবার গাড়িতে চড়লাম। এবার পেশোয়ার। রেলপথের পাশেই তক্ষশিলা। সেখানে যাত্রা বিরতি করতে হলো। বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞানপীঠ আর গ্রীকদের স্মৃতি বিজরিত এই পবিত্র স্থান দেখে যেতে হবে। একটি ছোট নদী, নুড়ি পাথরে ভর্তি। পাথরের নীচ দিয়ে পানি বয়ে যাচ্ছে। দিব্যি পাথরের উপর পা রেখে রেখে পার হয়ে গেলাম। তারপর বৌদ্ধ বিহারের ভিতর বাহির ঘুরে দেখা। তখনো খোদাই করে বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করা হচ্ছে। গেলাম যাদুঘরে। থরে থরে সাজানো বিভিন্ন যুগের তৈজসপত্র, অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্র। বিভিন্ন ধরনের মূর্তিও আছে।

এবার সোজা পেশোয়ার। কিন্তু আমাদের থাকতে হবে শহর থেকে সাতমাইল দূরে ইউনিভার্সিটি শহরে। সেখানে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান আখলাকুর রহমান আছেন। তাঁর এখানেই আমাদের ঠাঁই করে নিতে হবে। পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমরা গেলাম রেস্তোরাঁয় খেতে, কিন্তু ছাত্রীরা বাসায় রইলেন। এখানে বোরখা ছাড়া বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়। বেপর্দা বেগানা আওরত দেখে কোন্ খান সাহেবের মাথায় কখন খুন চড়ে যাবে, কে জানে! আমরা খেয়ে মেয়েদের জন্য নিয়ে আসবো। থালার আকারে ইঞ্চি পুরো রুটি আর ভুনা মাংস। আমিতো এক রুটির অর্ধেকটাই খেতে পারলাম না। আর খান সাহেবরা নাকি চার পাঁচটা সাবাড় করে দেয়। তবে পানিটা বেশ ভারী।

পরদিন বাসে চড়ে চললাম খাইবার পাস গিরিপথ বেয়ে লাণ্ডিকোটালে। খাইবার পাসের মুখেই জমরুদ দুর্গ। ভার্সিটি থেকে দশমাইল। কিন্তু দেখে মনে হয়, ঐতো দেখা যায়; যেন হিন্দু কুশ উঁকি মেরে ভার্সিটির কাজকর্ম দেখছে। বাস চলছে বিরল গুল্ম শোভিত বালুকা প্রান্তরের মাঝ দিয়ে। জমরুদ দুর্গ পার হতেই আখলাকুর রহমান বলে উঠলেন, 'এইখানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

"রণধারা বাহি, জয় গান গাহি, উন্মাদ কলরবে,
ভেদি মরুপথ, গিরি পর্বত, যারা এসেছিলো সবে;
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারই বিচিত্র সুর।"

আমরা তাঁর আবৃত্তি শুনে হৈচৈ করছি, হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আর এইখানে দাঁড়িয়ে ইকবাল বলেছিলেন,

"উঠো, মেরে দুনিয়াকে গরীবোঁকো জাগা দো,
কাখে উমারা কি দরও দেওয়ার হেলা দো;
সুল্‌তানাতে জমহুর্‌কা আতাহে জমানা,
জো ক্‌শে কুহন্ তুমকো নজর আয়ে মেটাদো।"

এবার হৈচৈ আরো বাড়লো। ভদ্রলোক সারাটা পথ একাই একশ' হয়ে জমিয়ে রাখলেন। তাঁর রসিকতা, তাঁর উচ্ছলতা এখনো একটি সজীব প্রাণের নিদর্শন হয়ে আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

আমরা লান্ডিকোটালে পৌঁছালাম। বৃক্ষগুল্মহীন উষর ধূসর পাথরের বুকে এখানে সেখানে ছড়ানো কয়েকটা ভেড়া। অদূরেই আফগান বর্ডার। কিঞ্চিৎ এগিয়ে গেলেই সীমান্ত রক্ষীর পদচারণা দেখা যায়। আমরা ঘুরে ফিরে একটি দোকানে দুম্বার ঝলসানো গোশত আর সবুজ চা খেলাম। মনে হলো, কাঁচাপ্রায় মাংস খেয়েছি, পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। কিন্তু পানিটাই এমন যে, যা কিছু খাওয়া যায়, তার স্পর্শে সবই মিলিয়ে যেতে থাকে।

শুনেছি লান্ডিকোটাল নাকি এখন চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্য; ত্রিতল চতুর্তল অট্টালিকা শোভিত এক শৈলপুরী হয়েছে। কিন্তু এর শুরু হয়েছে অনেক আগেই। এখনো আমরা সেখান থেকে রাশিয়ান ম্যাচ কিনেছি। পয়সা থাকলে আরো বস্তু কিনে আনা যেতো।

কিন্তু না, এখন আমাদের ফেরার পালা। লাহোরে এসে গাড়ি বদল করলাম। তারপর তিনদিন দু'রাত অনবরত চলে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। কিন্তু কোথাও থামার উপায় নেই; কারণ সময় নেই, পয়সা নেই। তা-না হলে করাচী দেখে আসতাম। কাজেই শিয়ালদা স্টেশনে স্টীমারে চড়ে মনে হলো, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। বিছানোর জন্য হোল্ডল খুলতে গিয়ে জহির রায়হানের সাথে ঝগড়াই হয়ে গেল।

ধুত্তরি, কী পণ্ডশ্রমই না এই চারটি সপ্তাহ ধরে করে এসেছি! কী দেখে এলাম, কী শিখে এলাম! প্রকৃতির দৃশ্যেতো বৈচিত্র্য আছেই, কিন্তু তাতেতো মন ভরে না। মন চায় মানুষের কীর্তি। কিন্তু ভারত পাকিস্তানের বিশাল ভূভাগ জুড়ে যা দেখে এলাম, সবইতো স্মৃতিসৌধ, মৃত মানুষের সমাধি। জীবিতের উত্তরাধিকার বহন করতে পারে, এমন একটি প্রতিষ্ঠানওতো চোখে পড়লো না! মুসলমান নরপতিরা সাতশ' বছর ধরে এই ভারত উপমহাদেশ শাসন ও শোষণ করেছে, তাঁরা কি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলতে পারলো না। এ দেশের যা ছিলো, তাও তাঁরা বিধর্মের আস্তানা বলে ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে এই বিরাট দেশের মানুষ ক্রমান্বয়ে অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের তিমিরে তলিয়ে গেছে। আর বিলাসী সম্রাটরা এরই সুযোগে নিজেদের কবরের উপর গড়ে তুলেছে বিরাট বিরাট সৌধ।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা এইসব স্মৃতিসৌধ তথা মৃতের মাজার জিয়ারত করে কী ফল লাভ করবে?

চতুর্দশ তরঙ্গ ॥

আমার ছাত্র জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় শেষ হতে এখনো অনেক দেরী। আমি সবে মাত্র অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করেছি। কিন্তু এখনি মনে হচ্ছে, আমি যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়ছি। যে উৎসাহ উদ্দীপনা, যে নিরলস প্রতিযোগী মনোভাব আমাকে এতোদিন ঠেলে নিয়ে এসেছে, তা শেষ হয়ে গেছে, এমন কথাতো বলতে পারি না। তাহলে এমনি ঝিমুনির কারণ কী?

এর কারণ হিসাবে আমার যদ্দূর মনে হয়, দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। এর একটি আমার বাস্তব অসুবিধা, আর অন্যটি আশা ভঙ্গের বেদনা।

আমার বাস্তব অসুবিধার কথা ইতিপূর্বেও আমি বলেছি। একেতো বিবাহিত, তদুপরি অভিভাবকহীন। আমার অর্থের জন্য আমাকেই চিন্তা করতে হয়। অন্যদিকে পারিবারিক জীবন সর্ম্পকেও আমি সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ থাকতে পারি না। আমার স্ত্রী আমার কাছে কিছুই দাবী করে না। কিন্তু দাবী না করলেও তার ভালো মন্দ নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হয়। একবার সে অসফল মাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছে। আবারো তার মাতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমি তার জন্য কোনো প্রকার সর্তকতা অবলম্বনের চেষ্টাই করতে পারছি না। অথচ এমনি অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ব্যবহার করা উচিত।

সে যা হোক, তজ্জন্য একটা মানসিক দুশ্চিন্তা ছাড়া অন্যসব কিছুই আমার আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু যা আমার আয়ত্তের মধ্যে, সেখানেওতো আশা অনুরূপ কোনো কিছুই হচ্ছে না। হাতের লেখাসহ আমার একটি নিজস্ব ভাষা দরকার। সেটি হঠাৎ করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এত আমি জানি। কিন্তু আমার প্রয়োজনকেতো আমি অস্বীকার করতে পারি না। এখনি ভাষাসহ হস্তলিপির দ্রুতগতি আমার একান্ত প্রয়োজন। কারণ আমি যদি সহপাঠীদের চাইতে কম বুঝতাম, তাহলে এই অভাব আমাকে এমনভাবে পীড়ন করতো না। কিন্তু এইদিকে আমি যখন ঝড়ের বেগে চলতে চাইছি, তখন আমার সামর্থ আমাকে অদ্ভুতভাবে পিছু ঠেলে দিচ্ছে। এটি বাস্তব অসুবিধার দ্বিতীয় দিক।

কিন্তু আশা ভঙ্গের বেদনা সম্পূর্ণ নতুন একটি মাত্রা। এরজন্য আমার আশার কথাটি আগে বলা দরকার। আমি যে শিক্ষার পরিবেশ থেকে ইতিপূর্বে বেরিয়ে এসেছি, সেটি তুলনামূলকভাবে খুবই সংকীর্ণ। সেখানে ছাত্র শিক্ষক নির্বশেষে সবাই সেই সংকীর্ণতার মধ্যেই লালিত পালিত হচ্ছে। এর কারণ হিসাবে আমি আধুনিক শিক্ষার সাথে তাদের পরিচয়হীনতাকেই দায়ী করেছিলাম। কেননা এর ফলে, যাকে আমি শিক্ষক হিসাবে সকলের চাইতে বেশি শ্রদ্ধা করেছি, তিনিও আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে

গিয়ে এমন মনোভাব প্রকাশ করেছেন, যা একজন সাধারণ মানুষও প্রকাশ করতে পারতো। এই ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলতে হয়।

আমি ইতিপূর্বে আলীয়া মাদ্রাসার শেষ পর্যায়ে মৌলানা জাফর আহম্মদ থানবী সাহেবের অন্যত্র চলে যাবার কথা বলেছিলাম। এর ফলে আমার মনের তৎকালীন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অনেক কিছু নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করে তৎসম্পর্কে তাঁর উপদেশ লাভ থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছিলাম। এজন্যই টাইটেল পরীক্ষা দিয়ে এসে আমি তাঁর নিকট একটি পত্র লিখি। এ পত্রের বিষয়ে ছিলো, আত্মা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ কোরানে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, সে সর্ম্পকে তাঁর নিজস্ব মতামত তুলে ধরার বিনীত অনুরোধ। কিন্তু তিনি একটি মাত্র বাক্য লিখে আমার সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমার পত্রের এক কোণায় 'কোরান ইমেকে জওয়াস মত্তজুদবহে, আস্থিতরাহ্ মুতালেয়া করো'- লিখে আমার পত্রটিই আমাকে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। কোরানে অবশ্যি এধরনের কথাই বলা হয়েছে। এ বিষয়ে যে আমাদেরকে খুব অল্পই জ্ঞানদান করা হয়েছে, সেকথাই যেন কিছুটা ধমকের সুরে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ তৎকালের সাধারণ মানুষের ধারণা ছিলো, আল্লাহ্ যেহেতু সর্বজ্ঞাতা, সুতরাং তিনি এই রহস্যের যথার্থ বর্ণনা তুলে ধরতে পারবেন। কারণ তিনিইতো হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উপর তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তিনি বললেন যে, এটি আল্লাহ্‌র মহিমা মাত্র এবং এ ব্যাপারে আমাদের অতি সামান্য জ্ঞানই আছে।

আমার মুশকিল হলো এই এখানে যে, বিষয়টি নিয়ে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ও কিছু বললেন না, নবীও কোনো ব্যাখ্যা দিলেন না। এমনকি নবীর প্রতিনিধি আলেম সমাজকে জিজ্ঞাসা করলেও একই ধরনের গোলমেলে কথা বললেন, তা হলে আমরা, এই স্বল্পজ্ঞানী অল্পবুদ্ধির মানুষেরা কোথায় এর বিশ্লেষণ পাবো! এ রহস্য বুঝার ক্ষমতা যদি আমাদের না থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে প্রশ্নই বা মনের কোণায় দেখা দেয় কেন!

এর ফলে সমগ্র পরিবেশের মধ্যে এমন একটা সংকীর্ণতা বিরাজ করছিলো, যা আমার চিন্তার অগ্রযাত্রাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছিলো। সুতরাং আমি ভেবেছিলাম, আধুনিক শিক্ষার পরিবেশে অনুরূপ সংকীর্ণতা থাকবে না; সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আরো উদার আরো মুক্ত চিন্তার বাহক ও পোষক হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার চারপাশে তারই অভাব আমার চোখে পড়লো। ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ে কী আছে, তা এখনো আমি জানতে পারিনি। কারণ এই পরিবেশে আমার বয়স অল্প। তাই আমার ধারণা ছিলো দর্শন বিজ্ঞানের তথ্যও তত্ত্বের দ্বারা সমৃদ্ধ বয়স্কদের ধ্যান ধারণা ও আচার আচরণের মধ্যে উদার চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাবো। কারণ মাদ্রাসার শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষার অভাবে যে সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়েছে তা অন্ততঃ এখান থাকবে না। সুতরাং এই আধুনিক শিক্ষার পরিবেশে মাদ্রাসা শিক্ষার সেই সংকীর্ণতার সাক্ষাত পেয়ে আমি যেমন বিস্মিত হলাম, তেমনি আশা ভঙ্গের বেদনায় পীড়িত হতে আরম্ভ করলাম।

আমারতো মনে হয়, এ ব্যাপারে আপাততঃ দুটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। এর একটি ইতিপূর্বে বর্ণিত খোতবা সর্ম্পকে আমার রুম মেটের উক্তি, আর অন্যটি কলকাতায় আমার সম্পর্কে আমার শিক্ষকের মন্তব্য। কারণ তাঁর ধারণা, দাড়ি রাখাটা মোল্লাদের কাজ এবং না রাখাটা আধুনিক শিক্ষিতদের কাজ। এমনি ধারণা যে, মোল্লাদের মতোই একটা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় বহন করে, তা আমার এই শিক্ষককে কে বুঝাবে! কারণ আধুনিক শিক্ষাতো তাঁকে এই জ্ঞান দেয়নি। দিলে তিনি এমন ভাবে আমার প্রতি কটাক্ষ করতে পারতেন না।

শিক্ষা ভ্রমণের শেষে আমি যে মন্তব্য উপস্থাপন করেছি, তা শুধু দৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে নয়, আমার সহযাত্রী সচল মানুষগুলির আচরণের মধ্যেও উপ্ত ছিলো। এ কারণেই আমি ফেরার পথে ময়মনসিংহে না নেমে ঢাকা চলে গিয়েছিলাম। পরদিনই আমি নিউ মার্কেটের একটি সেলুনে বসে আমার দাড়ি মুণ্ডন করলাম এবং পাশের স্টুডিওতে একটি ছবি তুললাম। কারণ দাড়িহীন অবস্থায় আমার চেহারা এরপর হয়তো আমি আর পাবো না। কেননা একাজটি শুধু আমার শিক্ষকের মন্তব্যের প্রতিবাদ হিসাবেই আমি করেছি!

আমার সাথে সাদউদ্দিন বা অন্য কেউ ছিলো। আমি সোজা অধ্যাপক আমিনুল ইসলামের বাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন, খুব সম্ভব, ঢাকা হলের হাউজ টিউটর ছিলেন। আমাকে তিনি কিছুটা ব্যঙ্গমিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখলেন এবং আমার বক্তব্যের উত্তরে নীরবতা অবলম্বন করলেন। আমার ইচ্ছা ছিলো, তিনি কিছু বললে আমি দাড়ি সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাবো। কিন্তু তিনি আমাকে আর ঘাটাতে সাহস করেননি। কারণ যে একটা মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে দাড়ি ফেলে দিতে পারে, সে প্রয়োজন হলে বেয়াড়া কথাও বলতে পারে।

কিন্তু দাড়ি সম্পর্কে তখন আমার মতটা কী ছিলো ? কারণ ইতিপূর্বে কাতলাসেন থাকতে 'দাড়ি বিলাপ' নামে আমি একটি দীর্ঘ কবিতাই লিখে ফেলেছিলাম। তার মধ্যে দাড়ির যতো গুণাবলীই বর্ণনা করে থাকি না কেন, এর সবটাই ব্যঙ্গ বিদ্রুপের জন্য ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে দাড়ি সম্পর্কে আমার ধারণা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর মূল দাড়িঅলাদের অধর্ম এবং দাড়িছাড়াদের ধর্ম অবশ্যি কিছুটা কাজ করে থাকবে। সুতরাং আলোচ্য সময়ে দাড়ি আমার কাছে ধর্ম বা ধার্মিকতার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হতো না। বরং এ ছিলো স্বভাব দত্ত পুরুষের নিদর্শন। এর প্রয়োজন না থাকলে এভাবে গজানোর কোনো কারণ ছিলো না। এ কারণেই যারা দাড়ি কামান, তারা ধর্মের নয়, প্রকৃতির বিরোধিতা করেন মাত্র।

এদিক থেকে দেখতে গেলে ইসলাম যেহেতু স্বভাবকে ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে, সে জন্যই স্বভাবের বিরোধিতার মধ্যে ইসলামের বিরোধিতাও জড়িয়ে আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম স্বভাবকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের পক্ষপাতী। বরং এই স্বভাব দত্ত শরীরের অন্যান্য দিকে ছেদন, মুণ্ডন, কর্তণ ও সংমার্জনের মাধ্যমে সে যেমন অসুবিধা দূর করতে উপদেশ দেয়, তেমনি সৌন্দর্য বিকাশের কথাও বলে। যেমন

লিঙ্গত্বক ছেদন করে, বগল ও নাভির নীচের লোম মুণ্ডন করে, হাত পায়ের নখ ও চুল দাড়ির বর্ধিতাংশ কর্তণ করে এবং প্রয়োজনীয় সংমার্জনার মাধ্যমে দেহকে পরিষ্কার করে তোলে। সম্ভবতঃ একারণেই সৈনিকদের দাড়িমুণ্ডনের ব্যাপারে অনুমতি দিতেও ইসলাম পরাম্মুখ নয়। কারণ এতে করে সৈনিকের যৌবন দীপ্ত মুখচ্ছবি শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চারের সহায়ক হয়ে উঠে।

এজন্যই বিষয়টি নিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রদর্শনের চাইতে শরীর বিদ্যার দিক থেকে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। এতে যদি দেখা যায় যে, দাড়িমুণ্ডন পুরুষের জন্য ক্ষতিকারক নয়, বরং ক্ষেত্রে বিশেষ তার প্রকাশক ও সংবর্ধক, তাহলে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। কারণ একে ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করার কোনো হেতু নেই। তেমনি দাড়ি মুণ্ডন বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিকতার পরিচায়ক, অনুরূপ ধারণাও যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা আমাদের মনীষীদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যারা মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে যুগান্তকারী বৈপ্লবিক আধুনিক চিন্তা চেতনার জন্ম দিয়েছেন।

দাড়ি নিয়ে এতো কথাবলার কারণ এই যে, প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি আমাকে খুবই ভাবিয়েছিলো। আমি নিজেও আধুনিক চিন্তা চেতনাকে পছন্দ করি, তবু আমার মুখে দাড়ি শোভা পাচ্ছে। উস্তাদের মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে একবারই আমি দাড়ি কামিয়েছিলাম; এরপর আর মুখে ক্ষুর লাগাইনি। দাড়িতে আমার কোথাও কোনো অসুবিধাও হয়নি। স্ত্রীর মনোরঞ্জনে ও আমার যোগ্যতা প্রমাণে দাড়ি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

তবে এ যাত্রা খরিচা ফিরতে আমার কিছুটা দেরী হয়েছিল। কারণ আমার দাড়িশূন্য মুখ দেখলে অনেকে আঁৎকে উঠতে পারে। যেহেতু এ মুখ আমার আসল মুখ নয়, তাই নকল মুখ দেখিয়ে আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাইনি। তবু আমার দাড়ি ফেলার কথা এখানে সেখানে ছড়িয়ে গিয়েছিলো এবং একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। এর ফলে অনেকে যেমন মুখ বাঁকিয়েছেন তেমনি অনেকে আমার দাড়িশূন্য মুখ দেখার জন্য উদ্‌গ্রীবও হয়ে উঠেছিলেন। তাদের মধ্যে আমার স্ত্রীও অন্যতম।

কিন্তু আমার স্ত্রী এখন আমার দাড়ি শূন্য মুখ দেখলেও খুশী হতে পারতো না। কারণ সে আবার অসফল মাতৃত্বের অধিকারিণী হয়েছে। পাঁচ মাসের মধ্যে জরায়ু তার পুত্র সন্তানের বোঝা বইতে অস্বীকার করেছে। এর ফলে বিষয়টি আমাদের সকলের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার মানসিক শান্তি অনেকাংশে বিপর্যস্ত করে। কিন্তু আমার পক্ষে এর কারণ অনুসন্ধান ও যথাবিহিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কেননা তখন আমার আর্থিক সঙ্গতি এমন যে, একদিকে টানলে অন্যদিকে উদাম হয়ে যায়। আমি যদি সায়িদার দুর্ভোগ দূর করতে যাই, এমন কি অসুস্থ বু'র চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে যাই, তাহলে আমার লেখা পড়ার অর্থতো যাবেই, এমন কি আমার সামগ্রিক সামর্থেও কুলাবে না। সুতরাং সকলের সম্মতিক্রমে আমার লেখা পড়াকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের দুর্ভোগকে চেপে রেখেই আমার জন্য পাথেয়

সংগ্রহ করে দিয়েছে। এ কারণেই এঁদের এই ত্যাগ স্বীকারকে আমি সর্বান্তঃকরণে মর্যাদা দিয়ে থাকি। এর জন্য সাধারণ কৃতজ্ঞতা স্বীকারই যথেষ্ট নয়।

এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। আমার প্রথম বিয়ের সময় আমার শ্বশুর তাঁর বড়ো মেয়েকে চার পাঁচ ভরির এক প্রস্ত অলংকার গড়িয়ে দিয়েছিলেন। সায়িদার বিয়ের সময় উত্তরাধিকার সূত্রে সে এগুলি পেয়েছিলো এবং তার নিজেরও কিছু অলংকার ছিলো। এ সময়ে আমার আর্থিক প্রয়োজনে এই অলংকারগুলি বিক্রি করে দিতে হয় এবং আমার মামা শ্বশুরের বিয়েতে এ সকল অলংকার ব্যবহার করা হয়। প্রায় তখন থেকেই আমার স্ত্রী অলংকার ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানেও তার গায়ে কোনো অলংকার নেই।

ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত! আমার স্ত্রী উচ্চ শিক্ষিতা কোনো মহিলা নয়, প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছিলো, তারপর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তার লেখা পড়ার পাট চুকে গেছে। অবশ্যি সে উপন্যাস গল্প ইত্যাদি প্রচুর পড়েছে। কিন্তু মেয়েটির সব চাইতে বড়ো দিক হলো, সে অবলীলায় মেয়েদের আসক্তির ও সংস্কারের মায়াজাল কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। এক সময়ে আমার অসঙ্গতির জন্য তার অলংকার আমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গতির পরও তাকে কোনো অলংকার কিনে দেবার সুযোগ পাইনি। অন্যদিকে পোশাক প্রসাধনীর ব্যাপারেও সে কিছুটা উদাসীন। অন্ততঃ এটা সেটা নিয়ে বায়না ধরার অভ্যাস তার নেই।

কিন্তু আমার কাছে সবচাইতে অদ্ভুত লাগে 'হাতের নোয়া' খসানোর ব্যাপারটি। এ নিয়ে মেয়েদের মধ্যে সাংঘাতিক কুসংস্কার আছে; যেন স্বামী রাক্ষসটির প্রাণ ভোমরা লুক্কায়িত আছে হাতের নোয়ার মধ্যে, সেটি খুলে ফেললেই সেই ভোমরাটি উড়ে চলে যাবে। এই সংস্কারটি বংশ পরম্পরায় এমনভাবে স্থায়ী হয়ে আছে যে, এর উর্ধ্বে উঠা অনেকটা দুঃসাহসের পরিচয় বহন করে বৈকি! অলংকার না পরাটা অনেক সময় সম্ভব হতে পারে, কিন্তু হাতের নোয়া খুলে ফেলা মানে বিধবা সাজা, খুব সহজ ব্যাপার নয়! তাই একান্ত কিশোর বয়সে সে এই দুঃসাহসের পরিচয় তুলে ধরে তার আত্মীয়-স্বজনসহ সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে!

এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার। ব্যক্তিগতভাবে আমি অলংকারের পক্ষপাতী নই। মেয়েদেরকে রঙচঙা কাপড় আর অলংকার দিয়ে সাজানো আমার কাছে কেমন যেন দৃষ্টি কটু বলে মনে হয়। মেয়েরাতো আর পুতুল নয়, মানুষ। এর চাইতে তাদের মানসিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব আমার কাছে অধিকতর মূল্যবান। জানিনা, সাজ সজ্জা হয়তো প্রাকৃতিক নারী স্বভাবের একটি অঙ্গ। এ জন্যই ফুলের এমন বিচিত্র শোভা। কিন্তু মানুষ ফুল নয়। শোভার প্রয়োজন যে একেবারে নেই, তা নয়; কিন্তু ওটুকুই সর্বস্ব হওয়া উচিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে এর আতিশয্য শুধু ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে না, সমাজ পরিবেশেও নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। এ নিয়ে আমার একটি নিবন্ধ পরবর্তীকালে মুমিনুন্নেসা কলেজ বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছিলো। সুতরাং আলোচ্য

সময়ে আমার এ প্রকার মতামত আমার স্ত্রীর অলংকার ত্যাগকে অনেকাংশেই উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু তার নিজের মন মানসকে সংস্কারমুক্ত করার জন্য দরকারী শক্তি তার মধ্যে ছিলো বলেই ব্যাপারটি এতো সহজে সম্ভব হয়েছে।

সে যাহোক, আমার স্ত্রীর অলংকার কিনে নিয়েই আমার মামা শ্বশুরের বিয়ে ঠিক করা হয়েছিলো। এর প্রথম পর্যায়ে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। বরের এক খালার বিয়ে হয়েছে হরিয়াগাই গ্রামে। তাঁরই মেয়ের খালাতো বোন বিয়ের কনে। আমি এসে শুনলাম, ছেলেকে মেয়ে দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত বরের মামু আগ্রহ করে বিয়েই দিয়েছেন। এর ফলে বাড়ির মুরুববী বড়ো ভাই খুব রাগ করেছেন। কারণ বিয়ের পূর্বে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সুতরাং তাঁর রাগ থামাতে আমাকে খুব বেগ পেতে হয়।

যা হোক, এবার মেয়ে তুলে আনার আয়োজন। শম্ভুগঞ্জ ঘাট থেকে একটি বাস ভাড়া করে এনে বেশ হৈচৈ করেই হরিয়াগাই যাওয়া হয়েছিলো। অন্যান্য ব্যাপারও মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ করেছিলাম, কিন্তু বিয়ে পড়ানোর সেই পুরানো ক্ষত খুঁচিয়ে নতুন করে ঝগড়ার সূত্রপাত করলেন বড়ো ভাই নিজেই এবং তাঁর দলবল নিয়ে তিনি হেঁটেই বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু আমার পক্ষে চলে আসা সম্ভব হয়নি। বিয়ে যেহেতু হয়ে গেছে, সে জন্য বৌ নিয়ে আসতে হবে। আমি রাত্রিবেলা বাসে করে বৌ নিয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু বড়ো ভাইয়ের রাগ তাতে আবার বাড়লো। মনে হলো , তাঁর জন্য কিছুই আটকে থাকে না? সব কিছুই তাঁর রাগারাগি সত্ত্বেও হয়ে যাচ্ছে। তাঁর মত না নিয়েই আমি আমার শ্বশুরের জমি ভাগ করে দিয়েছি; তাঁর ভাতিজার বিয়ে পড়ানো ও বৌ তুলে আনাও, বলতে গেলে তাঁর মতের বিরুদ্ধেই হয়ে গেলো। কাজেই তাঁর কোনো মূল্যই আর রইলো না। এর ফলে তিনি অবুঝের মতো কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন। আমি তাঁর ব্যথাটা বুঝতে পারতাম, কিন্তু করার কিছুই ছিলো না। কারণ তাঁর কথা মানতে গেলে সব কিছুই ভুণ্ডুল করে দিতে হয়; তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এজন্যই পরদিন সকালে তাঁর সাথে আমার ঝগড়াই হয়ে গেলো। তিনি বলতে গেলে, আমার শুধু মুরুব্বী নন, বন্ধু স্থানীয়। তাঁর অনাবিল স্নেহের স্বাদ আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু এ সংসার বড়ো বিচিত্র স্থান; এখানে কোনো কিছুই অটুট থাকে না। বন্ধুর সাথেও মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং যাকে শত্রু বলে মনে করি, সেও বন্ধুর মতো আচরণ করে।

অবশ্যি বড়ো ভাই সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। তবে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, ঝগড়াঝাটি সত্ত্বেও তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে কোনো ছেদ পড়েনি এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমাকে স্নেহই দিয়ে গেছেন!

আমি আবার হলে চলে এলাম। বিকালে রাস্তায় আজিজুল হক চৌধুরীর সাথে দেখা। সে আমার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলো এবং আমার খাবারের মধ্যে শুঁটকি মাছের কথা শুনে ঢাকা হলের পশ্চিমের সদর রাস্তার মাঝ খানেই হাঁউ মাঁউ করে কান্না

জুড়ে দিলো। পথচারী দুচারজন উৎসুক দৃষ্টিতে কাছে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু আমি ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলতেই তারা হাসতে হাসতে চলে গেলো। সামান্য ব্যাপার নিয়ে দৃশ্য তৈরী করতে ওর জুড়ি ছিলো না। শুধু এটুকুই নয়, ওদের 'গরু সমিতি' নামে একটা আড্ডা ছিলো, আর সেই আড্ডার মুখ্য বিষয় ছিলো 'মুজিব' নামে একজন বেঁটে খাটো সহপাঠী। বেচারা কিছুটা সরল প্রকৃতির হওয়াতে ওরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশার চূড়ান্ত করে ছাড়তো। ওরা মাঝে মধ্যে আমাকে সেই আড্ডায় টেনে নিয়ে যেতো এবং অনেক সময় মুজিবের বিচারের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকতে হতো। এসব কিছুর মূলে ছিলো সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে আনন্দ উল্লাসের উপকরণ সংগ্রহ করা। আমি কিছুটা বয়স আর কিছুটা আমার সাংসারিক জটিলতার জন্য এই সব নির্মল উল্লাসে যোগ দিতে পারিনি। তবু দূর থেকে যতোটুকু সম্ভব, তা উপভোগ করেছি।

না, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন আতংকগ্রস্ত হয়ে ওঠেনি। মারামারি আমরা যে দেখিনি, তা নয়; তবে তা-ও হাত পায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিলো। যে হক সাহেবের নামের গুণে যুক্তফ্রন্টের নৌকা এমন ভাবে বিজয়ী হয়েছিলো, সেই হক সাহেবকে লাটভবন থেকে অসম্মানের সাথে বিতাড়ণ করা হলো। এ বিষয়টি অনেকের কাছেই একটি দুর্লক্ষণ বলে মনে হয়েছে। ভাসানী সাহেবের সংস্কৃতি সম্মেলন নিয়েও মিশ্র প্রতিক্রিয়া এমন বিতর্কের সৃষ্টি করে রেখেছিলো। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি এ সবের ধারে কাছে ছিলাম না। কারণ আমার অবস্থা তখন ব্যক্তিগত শোচনীয়তার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তবু শাহেদ আলী সাহেবের হত্যাকাণ্ড আমার মতো নিস্পৃহ লোককেও ভাবিয়েছে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে বিরান্নব্বই-ক ধারার আগমন তখন জনমনে খুব একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেনি।

এসময়েই ফজলুল হক হলে একটি ইসলামী তৎপরতা লক্ষ্য করেছিলাম। সে তৎপরতার উদ্দেশ্য কী ছিলো, তা আজ আর মনে নেই। কিন্তু এর প্রথম পর্যায়ে আমিও যোগ দিয়েছিলাম। যদ্দূর মনে পড়ে, নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী একটি মিটিং ডেকে ছিলেন। ইষ্ট হাউজের একটি কক্ষে সেদিন হলের ও বাইরের অনেকেই এসেছিলেন। তাঁদের বক্তৃতায় ইসলামের দুরবস্থা ও তা থেকে উদ্ধারের জন্য অনেক কথা বলা হলো। খুব সম্ভব শেষেরদিকে আমার মত ব্যক্ত করার জন্য আমাকে সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। আমি সেদিন একটি তুলনা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করেছিলাম। তুলনাটি ছিলো; সকলের বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে, ইসলাম যেন সেই সোনার সুঁই, যা ছাইয়ের গাদায় হারিয়ে গেছে। এর ফলে সুদূর অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অনেকেই এই সুঁই খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। একান্ত সাম্প্রতিককালেও এ চেষ্টার বিরাম নেই। কিন্তু লাভ বিশেষ কিছুই হয়নি; শুধু সবাই ছাই দিয়ে নিজেদের শরীর মাখিয়ে ফেলেছেন।

জানা কথাই, আমার এ ধরনের বক্তব্য ও মন্তব্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো। কিন্তু কথাগুলি যেহেতু যুক্তিপূর্ণ ছিলো, সেজন্য বিরক্তি প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু করতে

তারা এগিয়ে আসেনি। অন্যদিকে ভবিষ্যতে অন্য কোনো মিটিংয়ে আমাকে আর ডাকেওনি।

এ সময় সম্ভবতঃ সালামের সাথেও আমার সম্পর্কের অবসান ঘটে। বেশ কিছুদিন সে, কখনো নিয়মিত আবার কখনো অনিয়ামিতভাবে আমার সাথে ঘোরাফেরা করেছে। বিভিন্ন ব্যাপারে তার জানার আগ্রহই তাকে টেনে এনেছে এবং আমিও যথাসাধ্য তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। একটা ব্যাপারে সুবিধা ছিলো এই যে, সেও আমার মতো একজন 'মমতাজুল মুহাদ্দেসীন' বা টাইটেল পাস ব্যক্তি। কাজেই ধর্মীয় ব্যাপারে তার প্রশ্নের উত্তরে অতি সহজেই আমি হাদিস কোরান ব্যবহার করতে পেরেছি এবং এর সাথে আমার যুক্তিবাদিতা এসে মিশ্রিত হয়েছে। কোনো কোনো সময় সে পাল্টা যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদও করেছে; কিন্তু আমার যুক্তির প্রভাবকে সে অস্বীকার বা অবহেলা করতে পারেনি।

এর ফল হলো এই যে, হঠাৎ সে উধাও হয়ে গেলো। প্রায় মাস দেড়েক পরে তার সাথে সাক্ষাত হলো চানখার পুলের কাছে। আমি তাকে তার নিরুদ্দেশের কথাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম। এর উত্তরে সে এমন সব কথা বললো, যা অজুহাত হিসাবে খুবই তুচ্ছ। সুতরাং আমার পীড়াপীড়িতে বলতে বাধ্য হলো যে, আমার সাথে ঘুরলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এই আশংকায় স্বেচ্ছায় সে আমার সাথে এই আলোচনা ত্যাগ করেছে। আমি রাগ করতে পারি, এই ভয়ে সে এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে সাহস পায়নি। কিন্তু আমি হেসেই তাকে আশ্বস্ত করলাম এবং বললাম যে, এর জন্য মোটেও রাগ করিনি। কারণ আমি প্রত্যেকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি; শুধু তাতে ন্যায় ও যুক্তি থাকলেই আমি সন্তুষ্ট।

এই ঘটনাটি আমাকে কিছুটা ভাবিয়েছিলো। কারণ আমি তখনো মাঝে মধ্যে নামাজ পড়ি। বিশেষ করে জুম্মা ও ঈদের নামাজ পারতপক্ষে বাদ দিইনা। সুতরাং ঈমান বলতে যা বুঝায়, তা থেকে আমি তখনো দূরে সরে আসিনি। তবু আমার বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু ছিলো, যা আমার এককালের এই সহপাঠীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। কিন্তু কী ছিলো? যাদ্দুর মনে হয়, যুক্তি। আর এই যুক্তি এমন একটি বিষয়, যা অন্ধ বিশ্বাসকে কেবলই প্রশ্নকাতর করে তোলে। সুতরাং অন্ধ বিশ্বাস অটুট রাখতে হলে যুক্তির ধারা অনুসরণ করা সম্ভব নয়। একটি হাদীসের কথা মনে পড়েছে, সেখানে আছে; তোমার মনে চার পাশের বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন জাগতে পারে, তুমি ভাবতে পারো, এগুলি কে সৃষ্টি করেছে? এর উত্তরে আল্লাহ্‌র নাম তুমি খুব সহজ ভাবেই উচ্চারণ করতে পারো। কিন্তু এর পর একথা তোমার ভাবা চলবে না যে, তা হলে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? কারণ এ ধরনের প্রশ্ন শয়তানী কুমন্ত্রণা মাত্র। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এইযে, আল্লাহ্ পর্যন্ত তুমি যুক্তির ধারা অনুসরণ করতে পারো; কিন্তু ব্যস, আল্লাহ্ পর্যন্তই; এরপরে যুক্তির ধারা অচল।

কিন্তু যুক্তির বাস্তব ধারাতো এখানে থামতে জানে না। সে যতোটা সম্ভব অগ্রসর হতে থাকে। যদিও শেখ সাদী বলেছেন, 'নাহর জায়ে আস্‌পে তাওয়া তাখ্‌তান্‌' —সব খানেই ঘোড়া দৌড়ানো যায় না; কিন্তু যুক্তির ঘোড়াতো দিগ্বিজয়ী তারেকের সেই ঘোড়া, যা আটলান্টিক মহাসাগর পার হওয়া অসম্ভব জেনেও গলা পানিতে নেমে দাঁড়িয়ে থাকে!

যাহোক, ইতিমধ্যে আমি সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার পূর্বে রসদ সংগ্রহের জন্য খরিচা এসেছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, জেনারেল আইউব খান মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে সরিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করার পর পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসছেন। এর ফলে ময়মনসিংহ শহর পরিষ্কার করার ধুম পড়ে গেছে। তার ঢেউ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এসে লেগেছে। মার্শাল-ল কী বস্তু, তা এ দেশের মানুষ এর আগে দেখেনি। কিন্তু হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ দোকানপাট বাড়ির সামনের ময়লার জন্য যে ভাবে নির্বিচারে মানুষকে নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছে, তাতেই বুঝা যায়, আইউব সশরীরে এসে উপস্থিত হলে না জানি কী হয়! তাই গ্রামের পথ ঘাট বাড়ির আনাচ কানাচও পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

সত্যি খরিচা বসেও মানুষের মধ্যে এমন একটা আতংকের ভাব দেখলাম, যা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। পাকিস্তান হবার সময় একটা বিরাট উল্লাসই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো মহররমের মিছিলের মধ্য দিয়ে। সে কী জঙ্গী মিছিল! গ্রামের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বুঝি সেই মিছিলে একত্রে জড়ো হয়েছিলো। সত্যি বলতে কি, এই মিছিলের হাব ভাব দেখে অনেক হিন্দুই দেশ ত্যাগের মনোভাব পোষণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। কারণ জনতার এই মিছিল যদি মারমুখী হয়ে উঠে, তা হলে তা ঠেকানোর সাধ্য কারোর নেই। ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি তখনো পুরানো হয়নি। এবং ভারতে তখনো এর জের চলছে। কাজেই মুসলিম জনসাধারণের এই উল্লাস ভিন্নধর্মীদের মনে আতংক ছাড়া অন্য কিছু করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু আজ সংখ্যালঘুদের সেই আতংকই যেন এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ইতিমধ্যে অবশ্যি সেই উল্লাসের সজীবতা দূর হয়ে ভিতরের খড় কুটার তৈরি কাঠামো বেরিয়ে পড়েছে। সর্বত্রই বহু আবর্জনা জমে উঠেছে। সামরিক আইনের দাপটে বাইরের আর্বজননা যৎকিঞ্চিত দূর হলেও মনের আবর্জনা দূর হয়নি। না, কেউ সে আবর্জনা দূর করতে চেষ্টা করেনি। এখনো সেই আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উপচে পড়েছে।

তবু আইউব খানের ময়মনসিংহে আগমনের কথা শুনে মানুষের মধ্যে সে কী উত্তেজনা! কেউ বলছে বিরাট লম্বা চওড়া এক লোক, দেখলেই ভয় করে। কেউ বলছে, সে কথা বললে মনে হয়, জ্যান্ত বাঘ গর্জন করছে। কেউ বললো, বেয়াদবী দেখলে সে এমন জোরে ধমক মারে যে, দুর্বল মানুষের পেশাব পায়খানা হয়ে যায়। এমনি সব কথা

সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। কাজেই অনেকের ধারণা, শুধু বাইরের নয়, ভিতরের আবর্জনাও এবার সাফ হয়ে যাবে।

আইউব খানকে ইতিপূর্বে আমি ময়নামতিতে দেখেছিলাম। তখনই তিনি পাকিস্তানের সিএনসি হয়ে গেছেন। ইউ, ও, টি,সি,র ক্যাম্প ফায়ারে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে তিনি সকলের সাথে করমর্দন করেছিলেন। এজন্য তাকে খুব একটা কিছু মনে হয়নি। কিন্তু মানুষের কথা শুনে নির্দিষ্ট দিনে আমিও তাঁকে দেখার জন্য ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ ময়দানে চলে এলাম। সে কী লোকারণ্যের ভীড়। এমনি ভীড় দেখেছিলাম কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত খানের আগমনেও! অর্ধেক মানুষ বুঝি ময়দানের আশে পাশের গাছগুলিতে উঠে বসেছে। শুধু একনজর দেখার জন্য সে কী আকুলি বিকুলি! শেষটায় তিনি এলেন, দেখে কিছুটা অস্বাভাবিক লম্বাই মনে হলো। আর সেই ডান পা টেনে টেনে চলার ভাবটাও যেন নেই।

এমনি আতংকের পরিবেশেই আমি সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার জন্য হলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আমার দুর্দিন বলতে হবে, অন্যান্য বারের পরীক্ষার মতো এবারও সুস্থ থাকতে পারলাম না। সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। প্রথম দিন কিছুটা জ্বর নিয়েই পরীক্ষার হলে যেতে হলো। কার্জন হলে সিট পড়েছিলো। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করেছিলাম। এর ফলেই প্রথম সুযোগে সাবসিডিয়ারীর বেড়াও আমি পেরিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলাম।

এই সময় বাংলা বিভাগ থেকে মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোম ও হাসপাতাল দেখার একটি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো। রণদাপ্রসাদ সাহা নিজেই আমন্ত্রণ জানিয়ে নির্দিষ্ট দিনে দুটি বাস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দুটি বাস ভর্তি আমরা প্রায় শ'দেড়েক ছাত্র-ছাত্রী মির্জাপুর গিয়েছিলাম। সাথে শিক্ষকদের প্রায় সবাই ছিলেন। প্রথমে ঢুকতেই চোখে পড়লো আইউব হলের ব্যাপারটি। এটি এমন একটি হল, যা প্রায় প্রত্যেকটি পরিবর্তনের সময়ই নিজের নাম পরিবর্তন করে। কিছুদিন আগেই এটি ছিলো ইস্কান্দর মির্জা হল। কিন্তু সামরিক আইন জারির পরপরই এটি আইউব হলে পরিণত হয়েছে। যা হোক, আমরা সেখানে 'মেঘদূত' নৃত্যনাট্যটি উপভোগ করেছিলাম। ভারতেশ্বরী হোমের মেয়েরা এটি পরিবেশন করেছিলো। এর পরিবেশন, উপস্থাপনা ও দৃশ্যপট রচনা বেশ সুন্দর হয়েছিলো।

এরপর আমরা গেলাম ভারতেশ্বরী হোম দেখতে। এটি মেয়েদের আবাসিক শিক্ষালয়। এখানে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক মেয়েরা হাতে কলমে শিক্ষা করে। বিশেষ করে নিজেরাই পালা করে নিজেদের খাবার রাঁধে। এই রান্নার প্রায় সব কিছুই আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতির অধীন। সুতরাং এখানকার রান্নার ধারা আমাদের সাধারণ জীবনের মধ্যে বেমানান। তবু এখানে মেয়েরা এমন অনেক কিছু শিখতে পারে, যা শৃঙ্খলাবদ্ধ সচ্ছল পারিবারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা যায়। এ কারণে অনেক পিতাই মাসিক দুশ'টাকা দিয়ে এখানে মেয়েদের ভর্তি করাতে নিয়ে আসেন।

অন্ততঃ নিরাপত্তার দিক থেকে এই হোমের পরিবেশ অতুলনীয়। তবে বেশি শৃঙ্খলা অনেক সময় পঙ্গুত্বও নিয়ে আসে। বর্তমানের অবস্থা অবশ্যি আমার জানা নেই।

যা হোক, এরপর আমরা ঘুরে ঘুরে হাসপাতালটিও দেখলাম। রণদাপ্রসাদ সাহার মতো ধনী ব্যক্তি বাংলাদেশে আর নেই, এমন কথাতো বলা যাবে না। কিন্তু তিনি যে কীর্তি স্থাপন করেছেন, তা শুধু ধন দিয়ে হয় না, তার জন্য মনের প্রয়োজন সবচাইতে বেশি। কেউ বলতে পারেন যে, এ সবের পিছেও তাঁর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি কাজ করেছে। আমি সে কথা মেনে নিয়েও বলবো, আমাদের মধ্যকার ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যদি এমনি জনকল্যাণমূলক মনোবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে আসতেন, তাহলে সমাজে ধন বৈষম্য এমন দৃষ্টিকটু হয়ে থাকতো না। শিক্ষায়, সমাজ সেবায় বিদেশীরাও এমন সুযোগ পেতো না।

কিন্তু সে কথা থাক; দুপুরে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিলো। ইতিমধ্যে একবার চায়ের পর্ব শেষ হয়েছে। এবার ভুরিভোজ। প্রায় শ'দেড়েক লোকের স্থান সংকুলানতো সহজ কথা নয়। তাই ছোট নদীটি পেরিয়ে ওপারে গেলাম আমরা। কিন্তু একটিমাত্র লোক আমাদের সাথে গেলো না, সে হলো স্বনামধন্য আখতার ফারুক। সে তখন বাংলা এম,এ, ক্লাসের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আমাদের সাথে সে এক বাসেই গিয়েছে। মেঘদূত নৃত্য নাট্য, ভারতেশ্বরী হোম সে দেখেছে কিনা লক্ষ্য করিনি। কারণ সে শর্ষিনা মাদ্রাসার টাইটেল পাস করা আলেম। মেয়েদের অভিনয় আর বসবাসের দৃশ্য তার দৃষ্টিতে কতোটুক দর্শনীয় হতে পেরেছে, তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তবে এ ব্যাপারে সে যে খুব একটা গোঁড়া, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা তার মানসিকতা সে পর্যায়ে থাকলে, সে বাংলায় এম,এ, পড়তেই আসতো না। কারণ সাহিত্য আর যাই করুক, গোঁড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দেয়না। আর যা গোঁড়ামিকে জড়িয়ে থাকে, তা কখনো সাহিত্য হয়ে ওঠে না।

সেই যাই হোক, নদী পেরুবার সময় আখতার ফারুক আমার পাশেই ছিলো। তাই খুব সহজেই আমি তার অনীহার কথা জানতে পারলাম। সে শুধু বললো যে, এই খাদ্য দ্রব্য তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেন সম্ভব নয়, সে তর্ক করার সময় ছিলো না। এমনো হতে পারে যে, তার পেটই খারাপ ছিলো। সে কথা বললে, আমি খুবই খুশী হতাম। কিন্তু সে এমন একটা ভাব দেখালো, যার অর্থ একটাই হয় অর্থাৎ এই বিধর্মীর বাড়িতে আহার্য গ্রহণ করা উচিত নয়। অথচ আমি নিজে তার মতোই টাইটেলের একটি সনদ সংগ্রহ করেছি। কিন্তু বিধর্মীর বাড়িতে আহার্য গ্রহণে আমার মধ্যে কোন অনীহার সৃষ্টি হলো না। আমি মরণ চাঁদের দোকানের দই মিষ্টি যদি নির্বিবাদে গ্রহণ করতে পারি, তা হলে এখানে এসে থেমে যাবো কেন! তা ছাড়া আমাদের খাবার তৈরী করেছে ভারতেশ্বরী হোমের মেয়েরা। তাদের মধ্যে হিন্দুর চাইতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। আর স্থানাভাবের জন্যই আমরা নাট মন্দিরের বারান্দায় পংক্তি ভোজনে বসেছি, কোন পূজার প্রসাদ গ্রহণের জন্য নয়। কাজেই অনীহার কারণটি খুব স্পষ্ট নয়।

তাছাড়া ইসলামী নিয়মে জবাই করা পশু পাখির মাংস আমরা গ্রহণ করছি কিনা, এব্যাপারে একটা সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু এ দেশে এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার কোনো কারণ আছে বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া রণদাপ্রসাদ সাহা কৌশলে বলির মাংস খাইয়ে আমাদের জাত মেরে দেবেন, এমন কোনো চক্রান্তের ধারণা আমার পক্ষে পোষণ করা সম্ভব নয়। আরো মজার ব্যাপার হলো, সেদিন প্রায় পঞ্চাশ প্রকার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মাংস ছিলোই না। পিঠা ছিলো আট দশ প্রকারের, তার মধ্যে পাটি সাপটার স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। ডাল ছিলো সাতআট প্রকারের, ভাজিভুজি মাছের ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে নানান ব্যাঞ্জন; সে এক এলাহি কাণ্ড! খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত 'ছেড়ে দে মা শ্বাস ফেলে বাঁচি'র মতো অবস্থা। এর উপরে রণদাপ্রসাদ স্বয়ং গলায় গামছা ফেলে হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি করছেন, যেন তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ—ভোজনের আয়োজন করেছেন।

ব্যাপারটা এমন যে, এর মধ্যে হিন্দু মুসলমানের গন্ধ শুঁকবার কোনো উপায় ছিলো না। তবু আমাদের চেতনার মধ্যে এমন একটা সংকীর্ণতা বিরাজ করেছে যে, একই আলো বাতাস গ্রহণ করে একদিকের ব্রাহ্মণ আর অন্যদিকের আলেম সমাজ এ ব্যাপারে যে বিভেদের পাঁচিল তুলে রেখেছেন, তা শিক্ষিত মানসকে বিচলিত না করে পারে না। শিক্ষা ও সংস্কারের এই প্রভাবকে সহজে দূর করতে সমর্থ হয় না।

এ প্রসঙ্গে নীলিমা আপার কথা মনে পড়ছে। নীলিমা আপা মানে আমাদের শিক্ষয়িত্রী নীলিমা ইব্রাহিম। নর্থব্রুক হল রোডে তাঁর বাসায় প্রায়ই আমি যেতাম। কারণ তখন বিভাগীয় ছাত্র সমিতির তিনি ছিলেন সভানেত্রী এবং আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক। এই সুবাদে অনেক সময় বাসায় তাঁর সাথে দেখা করতে হতো। কিন্তু যখনই গিয়েছি, তিনি আমাকে না খাইয়ে ছাড়েননি। কখনো চা নাশতা, কখনো ভাত খেতে হয়েছে তাঁর এখানে। একদিন আমার কেমন সন্দেহে হলো যে, ব্যাপারটা সহজ নয়। আমি জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম। শুনে তিনি হেসে বললেন, ঠিকই ধরেছো, আসলে আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। কারণ জানি তুমি একজন পাস করা আলেম।

অর্থাৎ তিনি আমাকে বারবার ভাত খাইয়েও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আমি যে তাঁর এখানে খেতে ঘৃণা বোধ করছি না, এ সর্ম্পকে তিনি নিশ্চিত হতে চাইছেন। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত মহিলা, তাঁর মধ্যে এ ধরনের মনোভাব সত্যি অদ্ভুত ব্যাপার! তবে তিনি নিজে এ ব্যাপারে যে গোঁড়া নন, ডঃ ইব্রাহিমের সাথে বিয়েইতো এর প্রমাণ। তা না হলে যেমন শুনেছি, যে মেয়ের পিছনে ডক্টর সুকুমার সেনের মতো লোক ঘোরা ফেরা করেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি বিয়ে করলেন কিনা একজন মুসলামান রেডিও-লজিস্টকে! সুতরাং তাঁর অন্তরে সাম্প্রদায়িক চেতনার কোনো উপাদান থাকার কথা নয়; ছিলোও না।

একদিনের কথা মনে পড়ে; গিয়ে দেখি ডক্টর আহমদ শরীফ বসে আছেন; নাশতা তৈরী করে এনেছে তাঁর বড়ো মেয়ে খুকু। ডিমের মামলেট করেছে, কিন্তু পিয়াজ মরিচ

কিছুই দেয়নি। শরীফ স্যার দেখেই বললেন, 'কী ব্যাপার, একটু পিয়াজওতো দিতে পারতে!'

নীলিমা আপা হেসে বললেন, 'কী করে দেবে, দোআশলাতো, এখনো রপ্ত করতে পারেনি।' আসলে এখানেই বোধ হয়, একটা কিছুর আভাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ গাঙ্গ মরে গেলেও তার রেখ সহজে মরে না। বহু যুগের সংস্কার দূর হতে চায় না। আবার পুরুষরা যতোটা সহজে পারে, মেয়েরা ততোটা সহজে পারে না। এর কারণও সুস্পষ্ট।

এই সংস্কারেরই একটি দিক ছিলো বঙ্কিম সাহিত্য। তাঁর কিছু উপন্যাস সরাসরি মুসলিম মানসকে আঘাত করেছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক চেতনা অদ্ভুতভাবে নাড়া খেয়েছে। যুগটাই ছিলো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির। কাজেই তা কেবলই প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু আমরা যখন বঙ্কিম সাহিত্য পড়ছি, তখনতো সেই পরিবেশ ও মানসিকতা থাকার কথা নয়। কিন্তু পাকিস্তানী কর্মকর্তারা সেই পরিবেশ ও মানসিকতাকে জিইয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বঙ্কিম থাকলেও তাঁর প্রতি সুবিচার করার মানসিকতা ছিলো খুবই বিরল। আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, আমরা মুনীর চৌধুরীর নিকট বঙ্কিম পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তা না হলে এই কালজয়ী প্রতিভার প্রতি আমাদের মনের সংকীর্ণতা কখনো ঘুচতো না। কারণ এ ব্যাপারে পরিবেশগত সংস্কার মুক্তচিন্তার অনুকূল ছিলো না।

আমি ইতিপূর্বেও হয়তো উল্লেখ করেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জীবনে মুনীর চৌধুরী ছিলেন আমার সব চাইতে প্রিয় শিক্ষক। তাঁর এই শিক্ষকতার পরিচয় পেয়েছিলাম বঙ্কিম পড়তে গিয়েই। আনন্দমঠের ভবানন্দ চরিত্র আলোচনা করেই তিনি আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। তখন হঠাৎ আমার চোখের সম্মুখে ঝুলানো একটা পর্দা সরে যেতে আরম্ভ করে। ব্যক্তি বঙ্কিম আর শিল্পী বঙ্কিমের মধ্যকার পার্থক্য আমি বুঝতে পারি। না, ব্যক্তি বঙ্কিমও গোঁড়া বলতে যা বুঝায়, তা ছিলেন না। তাঁর 'কৃষ্ণ চরিত্র ' পড়ে আমি বুঝতে পারি যুক্তিবাদিতার সমস্ত স্তর তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সীমাবদ্ধতা তাঁকে উত্তীর্ণ হতে দেয়নি। এর থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, শহীদুল্লাহ, কেউই তাঁর দেশ-কালের সীমাকে সামগ্রিকভাবে অতিক্রম করতে পারেননি।

আর শিক্ষকতা! আমারতো মনে হয়, শিক্ষক হলেন সেই বাতিওয়ালার মতো, যে রাতের আঁধার দূর করার জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাতি জ্বালিয়ে দেয়। সে বাতির যদি তেল থাকে, তবে তা নিজের সামর্থেই জ্বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু সব বাতিই কি সমান আলো দেয় ? না, বোধ হয়। কারো ভেতরের তেল বেশি মাত্রায় ধোঁয়াই উদ্গীরণ করে। কারণ বাতিওয়ালা যদি তার সলতা ঠিকমতো পরিষ্কার না করে থাকেন তা হলে আলোর চাইতে ধোঁয়াই হয় বেশি। এ জন্যই যথার্থ শিক্ষক জ্ঞানের সেই কূপমণ্ডকতাকে ভেঙ্গে দেন; তিনি এমনভাবে চেতনাকে সম্প্রসারিত করেন যে, ছাত্র তখন যথার্থই ছত্রের মতো চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়তে সমর্থ হয়। মুনীর চৌধুরীর মধ্যে সেই দুর্লভ গুণটি ছিলো। এজন্য আমি তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা পোষণ করি।

শিক্ষকতো আরো ছিলেন, তাঁদের কাছে জ্ঞানের কথা কম শিখেছি, তাতো বলা যাবে না। কিন্তু আর কেউ বুঝি চেতনাকে এমনভাবে দুলিয়ে দেননি। হাই স্যার রবীন্দ্র কাব্য পড়াতেন। কিন্তু ঝিনুক দিয়ে সাগর সেঁচার তাঁর সেই গলদ ঘর্ম প্রয়াস আমাদের মধ্যে কোনো আকর্ষণেরই সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনিভাবে আরো অনেকের কথাই বলা যায়। কিন্তু সে কথা আগেইতো বলেছি, সেই যে আগুনের চাইতে ধোঁয়ারই সৃষ্টি হয়েছে বেশি।

এর ফলে শিক্ষক অশিক্ষক নির্বিশেষে কারোরই নিছক পাণ্ডিত্য আমাকে তেমন ভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। সকল পাণ্ডিত্যকে আমার মনে হয়েছে লাকড়ির দোকান। মণ দরে এগুলি তাঁরা বিক্রি করেন। মানুষ ভাত তরকারী রাঁধার জন্য যেগুলি কিনেও নিয়ে যায় এবং হয়তো তাতে আগুনও জ্বলে। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়াই এর দ্বারা সৃষ্টি হয় না। মানুষ কী করে, তা মানুষই জানে; কিন্তু তাঁরা নিজেরা না আলো, না উত্তাপ, কোনো কিছু দিতেই সমর্থ হননা। এমন লোকের সংস্পর্শে আসার চাইতে একটি বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ পাঠ করা অনেক বেশি সহজ ও নিরাপদ!

আসলে আমরা পূর্বপুরুষ বা সমকালীন জ্ঞানীদের কাছে কী চাই? আমরা চাই, আমাদের ঔৎসুক্যের সেই দিকটি তিনি পূরণ করুন, যা অন্যত্র অলভ্য। আর সেটি পূরণ করতে গিয়ে তিনি সেই সত্য ও সুন্দরকে ভাষা দিন যা পৃথিবীর রহস্য উদ্‌ঘাটনে আমাদের সহায়ক হয়। আমরাতো তাঁদের কাছে জ্ঞানের বোঝা চাইনা, বরং আমরা চাই বুঝ, যা বোঝা হয়ে উঠে না। বোঝাকে হালকা করে। কিন্তু এই দুর্লভ সামগ্রী চাইলেই পাওয়া যায়না, সংসারে তা খুবই বিরল!

যাহোক, আমি সাংসারিক প্রয়োজনে আবার চর খরিচা ফিলে এলাম। কিন্তু আমার জন্য একটি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিলো। বড়ো ভাইর মুখেই সেটি শুনতে পেলাম। আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির যে মামলা আমরা জিতেছিলাম, যাতে আমার ফুফাতো ভাইরা বেশি ভাগ সম্পত্তি ওয়ারিশ, খরিদা ও হেবা সূত্রে লাভ করেছিলেন, তার সেহাম ঠিক করার সময় আমাকে না জানিয়ে সমস্ত ভালো ভালো জমি তারা নিজে নিয়েছেন। এতে অবশ্যি খুব একটা দুঃখ পাওয়ার কিছু ছিলো না। কারণ আমি আগেই বলেছি যে, কাওলাদারদের চ্যালেঞ্জ জয় করে জমি যে ফেরৎ এসেছে, এতেই আমি খুশী। তবু একটা কথা থাকে, যে জমি আমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে, সেটি নেয়ার সময় আমাকে জানানো দরকার ছিলো। কিন্তু যাই হোক দুঃখ পেলেও ব্যাপারটি মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি মেনেও নিলাম; কিন্তু জমির দখলের সময় আমি উপস্থিত থাকবো না বলে জানালাম।

আমার এ কথা শুনে শমশের ভাই মুষড়ে পড়লেন। কারণ আমি উপস্থিত না থাকলে ভেতরের ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যাবে। আর তার ফল হবে এইযে, কাওলাদাররা সহজে দখল দিতে চাইবে না। কারণ তারা সবাই জানে, জমি ফেরৎ

এসেছে আমার কাছে, তাই তারা খুব সহজে এই পরিবর্তন মেনে নিয়েছে। কিন্তু যদি জানতে পারে যে, জমি নিয়ে গেছে ধারাকান্দির তারা, তা হলে তাদের মত পরিবর্তন করতে সময় লাগবে না।

ব্যাপারটি আরো একটু খোলসা করে বলা দরকার। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, গাঁয়ের সাধারণ মানুষ আমাদের অবস্থা বিপর্যয়ে খুব খুশী হতে পারেনি। কারণ বাবাকে তারা একজন সৎলোক বলেই জানতো। কাজেই তাঁর পরিবারটি যখন তাঁর মৃত্যুর পরপরই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো, তখন তারা স্বাভাবিক কারণেই মর্মাহত হয়েছিলো। সুতরাং আমি জমি ফেরৎ নেবার প্রস্তাব করায় তারা খুবই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু কাওলাদাররা তাতে বাদ সাধলো, তাই মামলায় কাওলাদারদের পরাজয়ে তারা খুবই উৎসাহ বোধ করছে। তারা আবার এই পরিবারটির পুনর্বাসন কামনা করছে, যাতে সৎ মানুষের পরিণাম ভালো হবার ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এমতাবস্থায় যদি জানতে পারে যে, মামলার ফসল সেই সৎ মানুষের সন্তানেরা কিছুই পায়নি, তাহলে অন্যকে তা দিয়ে দেয়ার চাইতে তারা নিজেরাই ভোগ করতে চাইতে পারে। তদুপরি এই মামলার ফলে এমন একটি জমি ডিক্রির অধীনে চলে এসেছে, যা বাহ্যতঃ আমার পিতা বিক্রি করে দিয়েছিলেন বলেই সবাই জানে। কিন্তু এই জমির ওয়ারিশিয়ানরা এই মামলার কোনো দলিল দেখাতে পারেনি। এর ফলে অনেকের সন্দেহ হয়েছে যে, জমিটি হয়তো তারা বন্ধকী সূত্রে ভোগ্ দখল করছিলো। তবু যেহেতু আমরা জমিটা পাচ্ছি, এজন্যই তারা আর কোনো উচ্চ বাচ্য করেনি। সুতরাং সব মিলিয়ে আমার অনুপস্থিতি যে কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, তা শমশের ভাই ভালো করেই বুঝেছিলেন।

এ কারণেই তিনি বড়ো ভাইকে ধরলেন, তিনি যেন আমাকে বুঝিয়ে এ ব্যাপারে রাজী করান। আমি শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম। কারণ তীরে এসে এভাবে তরী ডুবিয়ে দেবার ইচ্ছা আমারও ছিলো না। আর লোভ যদি করেই থাকে, তবে আমার ফুফাতো ভাইরাই করেছে; তারাই বলতে গেলে এক সময়ে এই জমি নীলাম ডেকে আমাদেরকে এনে দিয়েছিলো। সুতরাং অন্যের চাইতে তাদের দাবী অবশ্যি বেশি। সেই দাবীই আমি পূরণ করতে সম্মত হলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আমি কমিশনার নিয়ে বীর আহমদপুর গেলাম। ফুফাতো ভাইরা সাথে থাকলেও নেপথ্যে রইলেন। বড়ো ক্ষেতে গিয়ে যখন আমি হালের মুঠি ধরলাম, তখন দেখতে না দেখতেই লোকের ভীড় জমে গেলো। কাওলাদাররা এগিয়ে এসে হাসি মুখে দস্তখত করে দখল দিলেন। সব চাইতে বেশি আগ্রহ দেখালেন সেই কাউসার বাপ, যিনি আমাকে মামলা করতে বলেছিলেন। এ ভাবে ক্ষেতে ক্ষেতে নির্বিবাদে দখলের কাজ চললো। বাড়ির পিছনে একটা জমিতে আমার সেই আরবি অক্ষরের শিক্ষক সাবুদ আলী ভাইরা বাড়ি বানিয়েছিলো, তারা কিছুটা সময় চেয়েছিলো, কিন্তু সমবেত লোকজন তা দিতে অস্বীকার করলো। দেখতে না দেখতেই ঘরদুয়ার ভেঙে তারা জমির দখল নিয়ে নিলো।

বড়ো ভাই মানে আমার সেই প্রেসিডেন্ট নানা শ্বশুর আমার সাথে গিয়েছিলেন, তিনিতো সব কিছু দেখে অবাক। এতো দিনের দখলের জমি এমন বিনা বাধায় কেউ ছেড়ে দিতে পারে, তা দেখেও যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি কৌতূহলী হয়ে উপস্থিত অনেকের সাথে আলাপ করে বুঝতে পারলেন যে, বাবার প্রভাব এ অঞ্চলে কী দর্শনীয়ভাবেই না এখনো সজীব। তারা অনেকেই বললেন যে, জমি আরো লাগে আমরা দিতে রাজী আছি, তবু মধুর বাপ মৌলবীর ছেলেরা এই গাঁয়ে ফিরে আসুক। ব্যাপারটায় আমি নিজেও কম অবাক হইনি! মধুর বাপ যে এখনো এমন ভাবে তাঁর সন্তানদেরকে সাহায্য করার জন্য মানুষের মনের মধ্যে বসে আছেন, তাঁর এমন প্রবল প্রকাশ এর আগে আমি আর দেখিনি। ইতিপূর্বে আমার ইতিহাস পিতৃবন্ধুদের অযাচিত সহায়তায় গড়ে উঠেছিলো। তাঁরা শিক্ষিত হৃদয়বান বলেই আমাকে এমনভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু গাঁয়ের এই সাধারণ মানুষ, তাঁদের হৃদয়ের বুঝি কোনো তুলনা হয় না!

কিন্তু তাদের এ প্রকার সহানুভূতি আমাকে খুব একটা উৎফুল্ল করতে পারেনি। কারণ এই ভুল-ভাঙতে খুব দেরী হবে না। ধারাকান্দির তারা জমি বিক্রি করুক বা চাষ করুক, এই গোপন তথ্য তারা খুব বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারবেনা। তখন সহানুভূতির এই উচ্ছ্বাস কী মারাত্মকভাবেই না আহত হবে। সেই শিশুকালে, আমরা যখন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে ভেসে যেতে লাগলাম, তখন এই সহানুভূতি যদি এমন ভাবে দর্শনীয় হতো! তাহলে হয়তো আমরা এমন ভাবে বাস্তুহারা হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতাম না। সাহায্যের জন্য এমন ভাবে মানুষের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতাম না।

অবশ্যি যুক্তি দিয়ে বিচার করলে তৎকালের সহানুভূতি এমনভাবে দর্শনীয় হবার কোনো কারণ ছিলো না। কারণ তেমনভাবে সহানুভূতি পাবার যোগ্যতাই আমাদের ছিলো না। মানুষ যা কিছু দান করে, যোগ্য পাত্রেই দিয়ে চায়: অযোগ্যের দিকে কেউই ফিরে তাকায় না। আমার পিতার সততা ও অমায়িকতার পূন্য প্রভাবের ফসল আমি যতোটা পেয়েছি, আমার বড়ো ভাই গোলাম রব্বানী সেই তুলনায়, বলতে গেলে, খুব কমই পেয়েছেন। এর কারণও সুস্পষ্ট। পিতার উত্তরাধিকার ভোগ করতে হলে শুধু তাঁর সম্পদ নয়, তাঁর গুণাবলীকেও গ্রহণ করতে হয়। তা না হলে অনেক সময়ই সেই উত্তরাধিকার বোঝা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা হাত ছাড়া হয়ে যায়!

অন্যদিকে অন্যায্য লোভের পরিণাম কখনোই ভালো হয় না। শমশের ভাই অদ্ভুত একটা লোভের বশবর্তী হয়ে জমির সেহামে এমন একটি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিলেন। তদুপরি শুধু মামলার সুবিধার জন্য খরিদা ও হেবা জমি পাবার যে সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছিলো, তাকে তিনি ক্রমান্বয়ে নিজের প্রাপ্য বলেই বিশ্বাস করেছিলেন। কারণ আমার অন্য ফুফুর জমি আমি ইচ্ছা করলে নিজের নামেও কিনতে পারতাম। অন্যদিকে হেবার শর্তানুসারে এই হেবার জমির উপর তাদের কোনো দাবী করাও ঠিক ছিলোনা। কারণ আমার দাদা যে উদ্দেশ্যে মেয়ের জামাই বাড়িতে ধাঁই দিয়ে এই জমি লিখে দিয়ে

ছিলেন; সেই উদ্দেশ্য তাঁরা পূরণ করেন নি। সুতরাং এই সকল বিষয় বিবেচনা না করে তিনি যখন সবটুকু পাবার লোভ করলেন, তখন কিছুটা ঘৃণার সাথেই আমি সেটি দখল নিয়ে তাদের হাতে তুলে দিলাম। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। তবে সে কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

আপততঃ আমি খরিচায় ফিরে এসে আমার রসদ সংগ্রহে নিয়োজিত হলাম। কারণ দোকানের অবস্থা ভালো নয়। মামলার ধকল কাটিয়ে উঠে এখনো তা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তাই পুবের বাড়ির বুর কাছেই হাত পাততে হলো। কিন্তু এখানেও আগের সেই সহজ ভাব ছিলো না। কারণ ইতিমধ্যেই তাঁর তহবিল বার দুয়েক চুরি হয়ে গেছে। তাঁর ছেলেরাই চুরি করেছে। কারণ যে টাকা পয়সা শুধু অপরের উপকারে লাগে, তা না থাকাই ভালো। তবু এই মহিলা আমাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করতেন না। যতোটুকু তাঁর পক্ষে সম্ভব, সাময়িকভাবে আমাকে কর্জ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

আমি আবার হল জীবনে ফিরে এলাম। এবার একটা একক রুমে ঠাঁই হলো আমার। দোতলার এই সিঙ্গেল রুমগুলির আমার পাশেরটিতেই থাকতেন আলী আসগর। অন্য একটিতে সিদ্দিকুর রহমান। তার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিলো; সেই নাসিরাবাদের দ্বিতীয় ছেলে। কিন্তু হল জীবনে তেমন কোনো অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হতে পারেনি। এর কারণ তার নিজে ই সীমাবদ্ধতা। কেমন জানি হয়ে গেছে সিদ্দিক। কারো সাথে কথাবার্তা নেই, কেমন গুম হয়ে থাকে সারাক্ষণ। পরে জানতে পারলাম তার অমতে বিয়ে দেয়া হয়েছে। l।তার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সে তার ছাত্র জীবনকে নষ্ট করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স সে পায়নি।

সেই তুলানায় অধুনা ডক্টর আলী আসগরের সাথে বেশ কিছুটা অন্তরঙ্গতা জন্মেছিলো। এর মাধ্যমে ছিলো একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আমাদের উত্তরের জানালার প্রায় পাশ দিয়েই একটা তার চলে গেছে, তার উপর এসে বসতো পাখিটা। কেমন নিঃসঙ্গ একাকী। সকাল বেলা জানালা খুলতেই চোখে পড়তো। এই পাখির কথা বলতে গিয়েই পরিচয় হলো পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র আলী আসগরের সাথে। দেখলাম, পাখিটি সম্পর্কে সে-ও উৎসাহী।

হাঁ, এমনি ব্যাপারেই অনেক সময় পরিচিত ছাত্রদের সাথে আলাপ হতো। সাহিত্যের সাথে পরিচয় থাকার ফলে এমনি সব নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে আনন্দ লাভের একটা অনুভূতি ছিলো। আর এ অভ্যাস গড়ে উঠেছিলো অনেক আগে থেকেই। এর ফলে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে আমার অনেক সময় কেটে গেছে। সেই তুলনায় চলতি রাজনীতির সাথে সক্রিয় পরিচয়ের আমার কোনো সুযোগ হয়নি। তাছাড়া সেখানে সক্রিয় হতে গেলে যে সচ্ছলতা ও নিরুদ্বেগ পারিবারিক জীবন দরকার, তা আমার কোনো কালেই ছিলো না। এর উপর এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

রাজনীতির যে মারমুখী রূপ দেখলাম, তা নানা কারণেই আমার কাছে গর্হিত মনে হয়েছে।

অর্থনীতি বিভাগে তখন ময়মনসিংহের আজিজুর রহমান নামে একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় আমি ঠিক জানতাম না; তবে বামপন্থী ধাঁচ ছিলো বলে মনে হয়। একদিন দেখলাম বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রহৃত হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন এন, এস, এফ, এসে প্রবল বিক্রমে প্রবেশ করেছে। তার প্রতিমূর্তি ছিলো জগন্নাথ কলেজের এককালের ভিপি ছাত্র নেতা ইউসুফ। সেই ইউসুফ আজকের ব্যারিস্টার ইউসুফ কিনা, জানি না। কিন্তু তৎকালে তার নাম যেমন শুনেছি, তেমনি তার কামও দেখেছি। সভা পণ্ড করতে, মধুর রেস্তোরাঁ ভাঙচুর করতে তার দল সর্বদাই মুখিয়ে থাকতো। শুনেছি, মুনেম খান নাকি এই ছাত্র রাজনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ইসলাম পন্থীদের মধ্যে আমান উল্লাহ্‌র বেশ নাম ছিলো। পরে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে তার একটি পা কেটে যায়। মওদুদ আহমদ, মোস্তফা জামান আব্বাসী, এরাও এখন বেশ পরিচিত। বিশেষ করে মোস্তফা জামান আব্বাসীতো একদিন আমাকে ধরে বললো, কার্জন হলে কী একটা মিটিং হবে, সেখানে কোরান পাঠ করতে। আমি রাজী হয়ে যতোই বলি পারবো, সে ততোই আমার কোরান পাঠ শুনতে চায়। শেষ পর্যন্ত একান্তে একটু পাঠ করে তার বিশ্বাস জন্মাতে হলো। কিন্তু এদের এই হামবড়াভাবে মনটাই বিষিয়ে উঠলো।

এছাড়া রাহাত খান, আনোয়ার হোসেন, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদরা তখন এসে প্রবেশ করেছে মাত্র। এ সময় পরিচয় হয়েছিলো শহীদ আখন্দের সাথে। ঢাকা হলের ইংরেজির অন্য একজন ছাত্র, যার সাথে বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মেছিলো, কিন্তু আজ তার নামটাও মনে করতে পারছি না। তার রুমে আমি বাংলা একাডেমীতে চাকরি হবার পরও গিয়েছি।

এ সময়ে গভর্ণর ছিলেন আজম খান। তিনি বেশ মাতিয়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর অমায়িক আন্তরিকতা মানুষকে খুব আকর্ষণ করতো। হঠাৎ একদিন ঢাকা হল ও ফজলুল হক হলের মাঝ খানের পুকুরটিতে একটি ছেলে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মারা গেলো। এর আগেও নাকি এমনি ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং আজম খান এই পুকুরটি সিঁচে ফেলার জন্য আদেশ দিলেন। রাত দিন দমকল চলতে লাগলো। শুকিয়ে এলে মাছধরা নিয়ে সে কী হুড়োহুড়ি কাণ্ড। দুই হলের ছেলেরা গলা সমান পাঁকের মধ্যে ডুবতে ডুবতে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা লাগিয়েছিলো। কিন্তু কিছুদিন পরে পাঁক উঠিয়ে উত্তর পশ্চিম কোণায় পাওয়া গেলো একটি কুয়ো। এছাড়া মৃত্যু রহস্যে আর কোনো ভৌতিক উপাদান খুঁজে পাওয়া গেলো না!

বাঘেড়ের ব্যাপারটিও এ সময়েই ঘটেছিলো। জিঞ্জিরার ওপাশে কেরানীগঞ্জের একটি গণ্ড গ্রাম! সেখানে হঠাৎ এক পীরের আবির্ভাব ঘটলো। পানি পড়ায় নাকি অদ্ভুত সব কাণ্ড হয়। হলের ছেলেরাও বাদ রইলো না। বোতল ভরা পানি পড়া সংগ্রহের জন্য

তারাও অনেকেই এগিয়ে গেলো। হুজগের দেশ বটে একটা! কোনো কিছু অদ্ভুতের কথা শুনলে যুক্তি তর্কের ধারে না, গড্ডালিকার মতো এগিয়ে যায়। এজন্য এদেশে দর্শনীয় বিষয় হিসাবে জাদু এখনো সবার উপরে স্থান পেয়ে আছে।

আরো মজার ব্যাপার এই যে, বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররাই এই হুজগের দলের মধ্যে বেশি। এরা যে কেন বিজ্ঞান পড়ছে, আর পড়ে কীইবা শিখছে, তা কোনো কালেই আমার বোধগম্য হয়নি। অথচ ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ একটা হুজগ। এধরনের হুজগে ইতিমধ্যে শম্ভুগঞ্জ, ধারাকান্দা, নেত্রকোণার কাছের একটি গাঁয়েও দেখা গেলো। দেশের অন্যত্রও তার অভাব ঘটেনি। একইভাবে লোকজনের ছুটোছুটি, তারপর কিছু দিনের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা। আবার এগুলিও ঘটলো এক দশকের মধ্যেই। এর পর হুজগের ধারা বদলে গেছে। এসেছে উরস মোবারকের মধ্যে। এরই জমজমাট পর্ব বর্তমানের আটরশি। তবলিগী জমাতও এরই ভিন্নতর শোভন সংস্করণ মাত্র!

এ সবের কারণও অস্পষ্ট কিছু নয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু নয়, চিকিৎসা ব্যবস্থাও সেই তুলনা খুবই নগণ্য। সুতরাং দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অভাবী মানুষ একটা কিছু শুনলেই বিশ্বাস করে বসে। আবার রোগটা যদি দৈহিক না হয়ে মানসিক হয়, তাহলেও এমনি সব আজগুবী অদ্ভুত ব্যাপারই সে অবলম্বন করে। কারণ দেহের উপর অত্যাচার করে যেমন দৈহিক রোগ জন্মিয়েছে, তেমনি বিবেকের বিরুদ্ধে লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায় করায় মনের মধ্যে পচন ধরেছে। কাজেই হুজগের সুযোগ ছাড়া এর থেকে মুক্তি পাবার অন্য কোনো পথ নেই। কারণ মূর্খতা আর লালসা সে পথ বন্ধ করে রেখেছে

তদুপরি দেশের ক্ষমতাবান প্রশাসকরাও যখন এসব পীর ফকিরদের দুয়ারে ধর্না দেন, তখন সাধরণ মানুষের কথাতো বলাই বাহুল্য। সামন্ত যুগেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। এ যুগের আইউব খানরাও শর্ষিনা, শাহ জালাল, আটরশি গিয়ে ভক্তির চূড়ান্ত রূপ প্রদর্শন করেছেন। আসলে এও সাধারণ মানুষের মন জয় করার ফন্দিমাত্র। অতীতেও এ কাজ তারা করেছেন এবং এখনো সমান তালে এর জের চলছে।

আসলে এই বিষয়টি রাজনীতির একটি বড়ো দিক। গণ মনস্তত্ব সম্পর্কে যাদের কোনো ধ্যান ধারণা নেই কিংবা যারা জনগণকে প্রতারণা করতে নারাজ; তাদের পক্ষে রাজনীতি বেশ বিপজ্জনক। কারণ তারা অতি সহজেই জনগণের উষ্মার কারণ হয়ে উঠেন। প্রগতি, শান্তি ও শ্রমের কথা সাধারণভাবে জনগণ শুনতে চায়না। তারা চায় নগদ প্রাপ্তি। কিন্তু সে ব্যাপারটি খুব সহজ নয়। এ কারণেই জনগণকে তাদের মনস্তত্ত্ব অনুসারে স্তোক বাক্যে আপাততঃ ভুলিয়ে রাখার অভিনয় করতে হয়। নিরুদ্বেগে সেই অভিনয় যিনি যতো বেশি করতে পারেন, তিনিই ততো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। শতকরা একজন বুদ্ধিজীবীর কটাক্ষে তাদের কিছুই যায় আসে না। অবশ্যি জনগণের ভুল ভাঙতেও খুব দেরী হয় না। কিন্তু ভুল ভেঙেও তারা আবার নতুন ভুলের মধ্যে জড়িয়ে

পড়ে। এ কারণেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী রাজনীতিকরাও এই গণমনস্তত্ত্বকে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকেন।

বস্তুতঃ আমার রাজনীতি বিশেষভাবে দলীয় রাজনীতি না করার এও একটা মস্তবড়ো কারণ। কেননা কোনো অজুহাতেই আমি এই প্রতারণাকে প্রশ্রয় দিতে পারিনি। আমি মনে মুখে এক হবার চেষ্টা করেছি। এ আমার সাফল্যেরই নিদর্শন; এ কথা আমি পূর্বেও বলেছি। তাই আমি চেয়েছি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধন, রাজনীতির অমানবিক বিজয় নয়। এর ফলে আমি কতোটুকু মানুষ হয়ে উঠেছি, তা আমি বলতে পারবোনা; তবে প্রতারণা এখনো আমার দুচোখের বিষ!

থাক্ রাজনীতি, আমার সামনে অনার্স পরীক্ষা। সেজন্য জোর প্রস্তুতির প্রয়োজন। যে করেই হোক প্রথম শ্রেণী পেতে হবে। শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে ভালো ছাত্র হিসাবে আমার যে একটা জনপ্রিয়তা আছে, তার বড়ো প্রমাণ আমি ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক। তদুপরি টিউটারিয়েল ক্লাসে আমি যেমন এ প্লাস পেয়েছি বেশি, তেমনি প্রথম সুযোগেই জেনারেল ইংলিশ ও সাবসিডিয়ারী পাস করে ফেলেছি। কাজেই অনার্সে আমি ভালো করবো, এমন একটা আশা আমি কেন, প্রায় সবাই পোষণ করছেন। কিন্তু মনের ভয় তবু যায় না; কারণ ভাষা ও লিপি কোনোটাই তখনো আমার আত্মবিশ্বাস জন্মানোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

আর এ ব্যাপারে শক্তি সঞ্চয়ের পথে বাধাও ছিলো প্রচুর। সে সব কথা ইতিপূর্বেও বলেছি। এখানে আরো একটি সাময়িক বাধা এলো। হঠাৎ বিভাগে বনভোজনের জিকির উঠলো। যারা এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলো বেশি, তাদের খাটতে হলো সব চাইতে কম। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমার খাটুনির আর কোনো অন্ত রইলো না। চাঁদা আদায় করা, বাজার সওদা করা এবং সেগুলি যথাস্থানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা। সহযোগী পেয়েছি অনেক, তবে দায়িত্বটাতো আমার, সেদিক থেকে দুশ্চিন্তাও ছিলো আমারই। আর আমার যেমন স্বভাব, খুব বেশি আন্তরিক হলে যা হয়, আমারও তাই হয়েছে। তবু ডাঃ ইব্রাহিম ও অধ্যাপক অজিত গুহ সাহায্য না করলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। কারণ বিভাগের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দুশ'। এর উপর সস্ত্রীক সবান্ধবেরও কিছু ধাক্কা ছিলো। যার ফলে প্রায় শ' আড়াই লোকের খাবার দাবারের ব্যবস্থা। কিন্তু তাঁরা আমার ঝামেলা প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। অধ্যাপক অজিত গুহ প্রধান বাবুর্চি হয়ে আরো বেশি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন। তাঁদের এই আন্তরিক অমায়িকতা চিরদিন মনে রাখার মতো বস্তু!

কিন্তু এতো লোক নিয়ে যাওয়া যায় কোথায়? খুব কাছে, জয়দেবপুর। রেল গাড়িতে যাবার জন্য এর চাইতে ভালো স্থান আর নেই। কারণ বাস ব্যবহার করার মতো সম্পদ আমাদের আয়ত্তে ছিলো না। আর কক্ষপক্ষে পাঁচটি বাস এক সাথে যোগাড় করাও ছিলো প্রায় অসম্ভব।

যাহোক, নির্দিষ্ট দিনে ফুলবাড়িয়া থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। সবাই এক সঙ্গে না হলেও আমরা বেশ কয়টা কামরা দখল করে যথেষ্ঠ হৈচৈ করলাম। আমার দৌড়াদৌড়িটাই ছিলো দর্শনীয়। কে কোথায় উঠলো, বসতে পারলো কিনা, মালপত্র উঠেছে কিনা, সব কিছু তদারক করে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু টঙ্গী পেরিয়েই ঘটলো বিপত্তি। মেয়েরা যে কামরায় ছিলো, সেখানে একটি বদ্ধজানালা খুলে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে ভাঙ্গা জানালার অন্য একটা পাট পড়লো আমার হাতের উপর। পড়বিতো পর ডান হাতের তর্জনীটাই থেতলে গেলো। আঘাতটা এমন হঠাৎ ও তীব্র ছিলো যে, আমি অচেতনের মতো হয়ে ঘেমে নেয়ে উঠলাম। চেতন হয়ে দেখি আমার পরিচর্যা শুরু হয়ে গেছে। অধুনা ডক্টর মনিরুজ্জমানের বৌ রাশিদাই এই পরিচর্যায় মুখ্য স্থান দখল করে আছে। সে তার রুমাল ছিঁড়ে আমার আঙ্গুল বেঁধে ফেলেছে এবং আমার মাথায় মুখে পানি দেবারও চেষ্টা করছে।

আমার ধারণা ছিলো, যেহেতু আমি বিবাহিত এবং আমার মুখ ভর্তি দাড়ি, কাজেই কুমারী মেয়েদের কাছে আমি আবর্জনা তুল্য। কিন্তু বিপদে পড়ে দেখলাম, সহানুভূতি আমারও কম প্রাপ্য নয়। প্রায় সবাই আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং সাথে সাথে আমার দায়িত্বের বোঝাও সবাই ভাগ করে নিলেন। এর ফলে আমি অনেকটা স্বাধীন হয়ে বনভোজনের আনন্দ উপভোগ করতে পারলাম। সবাই বেশ আনন্দেই এখানে সেখানে ঘুরে ফিরে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। রান্না খাওয়া সব কিছুই এতোটা প্রচুর, উপাদেয় ও ও নিখুঁত হলো যে, বিভাগীয় পর্যায়ে এমন বৃহদাকারের স্মরণীয় বনভোজন আর কখনো হয়নি বলে সবাই মন্তব্য করলেন।

কিন্তু আমি ফিরে এলাম আমার থেত্‌লানো আঙ্গুল নিয়ে। সেই যে কথায় আছে না, ভাঙ্গা পা-ও নাকি আগেই গর্তে পড়ে, আমারও হয়েছে সেই অবস্থা। তা না হলে এমনিতেই হস্তলিপির জন্য আমি বিপদে পড়ে আছি, সেই হস্তলিপির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ডান হাতের তর্জনীটি এমনভাবে থেতলে যাবে কেন! তবে মাস খানেক এখনো সময় আছে। এর মধ্যে আঙ্গুল অবশ্যি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ঠিক করার ওষুধ খেয়ে শরীরকে আরো দুর্বল করে ফেললাম। এরপর যা হবার তাই হলো, পরীক্ষার আগের দিন হঠাৎ সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হলাম। প্রায় দুই ডিগ্রি জ্বর নিয়ে প্রথম পত্রের পরীক্ষা দিতে হলো। ভালো হয়নি; মনটাই খারাপ হয়ে গেলো। খোঁজ নিয়ে জানলাম, শরীফ স্যার প্রথম পত্রের খাতা দেখবেন। গেলাম তাঁর কাছে। তিনি মন দিয়ে আমার আহাজারি শুনলেন এবং খাতাটি উলটে পালটে দেখে বললেন যে, আমি বড়ো জোর পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পেতে পারি। বাকী পরীক্ষাগুলিতে ভালো করতে পারলে একটির জন্য অসুবিধা হবে না। কিন্তু এর প্রভাবেই কিনা জানিনা, বাকী পরীক্ষাও আমার মনোমত হলো না!

যাহোক, দায়িত্ব পালন করে আমি খরিচায় ফিলে এলাম। না, এখানেও খুব আনন্দিত হবার কিছু নেই। সায়িদা আবার অন্তঃস্বত্তা হয়েছে। এও এক দুচিন্তার কারণ।

তদুপরি শমশের ভাই তাঁর পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দোকানের অবস্থা ভালো নয়। পুঁজি বলতে কিছু নেই। তবু তিনি আমুদপুরের জমির বিনিময়ে এই দোকানটি প্রার্থনা করেছেন। বুর কাছে ইতিমধ্যেই তিনি এই প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। এখন আমার মতামতের জন্য অপেক্ষা করছেন। বড়ো ভাইও আমাকে এ ব্যাপারে বেশ কিছু কথা বললেন। আমি শুনে কিছুটা রাগই করলাম। কারণ দোকানটি আমার নয়, আমার শ্বশুরের। আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করতে গিয়ে এটি হস্তান্তর করতে পারিনা। অথচ শমশের ভাই লোভে অনেকদুর অগ্রসর হয়ে এসেছেন। কথাবার্তা শুনে মনে হলো, সবাই রাজী, শুধু আমি মত দিলেই হয়।

কিন্তু আমি মত দিতে পারিনি। ব্যাপারটি নিয়ে আমি যতোই চিন্তা করেছি, সবটাই একটা চক্রান্ত বলে মনে হয়েছে। সেহামের গোলমাল এই উদ্দেশ্যেই বুঝি এমন বিসদৃশ হয়ে উঠেছে। যাতে করে আমার পৈতুক সম্পত্তির লোভে আমি দোকনের আশা ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু যে কোন মূল্যে আমি এই চক্রান্তের বিরোধিতা করতে বাধ্য। কারণ দোকান থেকে মামলার খরচ পরিচালনা করা আর আমার পড়ার ব্যয় নির্বাহ করা দুটোই কোনো মতে চলেছে। ভবিষৎতেও যতোদিন কোনো চাকরি না পাই এর উপর নির্ভর করতে হবে। তা ছাড়া লেখাপড়াওতো এখনো শেষ হয়নি! কাজেই দোকান হাতছাড়া করে জমির আয় উদ্ধার করে আনা আমার পক্ষে সহজ হবে না। সুতরাং শমশের ভাই রাগ করুন আর যাই করুন, দোকান তাঁকে দেয়া যাবেনা। না, আমার দেবার কোনো অধিকার নেই।

অবশ্যি শমশের ভাই এতে খুবই রাগ করলেন। সেই রাগে তিনি দোকান প্রায় ছেড়েই দিলেন। প্রায়ই দোকান বন্ধ থাকে; কোনো সময় সপ্তাহ দু'সপ্তাহ পেরিয়ে যায়। দোকানের চাবি তাঁর কাছেই আছে। আমি নিজে গরজ করে সেই চাবি নিজের হাতে নিতে চাইনি। কারণ এখনি আমি দোকানে বসতে পারবো না। এম, এ, টা যে ভাবেই হোক শেষ করে যা হয় একটা করবো। এ নিয়ে ঢাকা এমদাদিয়ার মালিক আব্দুল করিম সাহেবের সাথে কথাও বলে রেখেছি। একদিন চন্দবাড়িতে এই উদ্দেশ্যে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। সেই চন্দবাড়ি, যেখানে আকবর আলী সাহেবের বাসায় আমি কয়েক মাস লজিং ছিলাম। সেটিই করিম সাহেব পঁচাত্তর হাজার টাকায় কিনে নিয়েছেন। আমার সাথে অন্তরঙ্গভাবে অনেকক্ষণ কথা বললেন। মাত্র পনেরো ষোল বছর আগে ভগ্নিপতির দোকানে কর্মচারী হিসাবে ঢুকেছিলেন। তারপর নিজের অধ্যবসায়ে সেই দোকানের মালিক হয়ে আজ কোটি টাকার মালিক। আমার শ্বশুরের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিলো; এমন কি এই খরিচা পর্যন্ত তিনি এসেছেন। সুতারাং তাঁর আশ্বাস হলো আমি ব্যবসা করলে পুঁজির কোনো অভাব হবে না।

কিন্তু এম. এ. পাস না করে কিছুই ভাবতে পারছি না। ইতিমধ্যে বেশ সময় চলে গেছে। আমি বই পড়াও, বোধ হয়, ছেড়ে দিয়েছি। কারণ মনের মধ্যে এমন একটা দুশ্চিন্তা এসে প্রবেশ করেছে যার ফলে কোনো কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। একটা হাত

পাখায় রঙিন সুতার ফুল তুলে আর মাছ মেরেই এই সময় কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যে দিন শুনলাম পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, সেদিন হঠাৎ মনে হলো, আমার রোল নম্বরটি বোধ হয় আমি ভুলে গেছি। এডমিট কার্ডটিও সাথে নেই যে শুধরে নেবো। তাই আমার কল্পিত নম্বরটি পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখতে পেলাম না, পরীক্ষা এতো খারাপ দিইনি যে আমি ফেল করবো। কাজেই কোথাও গোলমাল হয়েছে। ভয়ে ভয়ে ঢাকা গেলাম। রফিকের সাথে দেখা। সে বললো যে, পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঞ্চম স্থান পেয়েছি আর রফিক দ্বিতীয় হয়েছে। প্রথম শ্রেণী পেয়েছে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। কিন্তু তার নাম বেরুয়নি। কারণ সে জেনারেল ইংলিশ পাস করতে পারেনি।

দেখলাম, সত্যি আমি আমার রোল নম্বর ভুলে গিয়েছিলাম। কতোটা মানসিক বিপর্যয় ঘটলে এমন একটা বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে! সত্যি বিপর্যয়! কারণ এম. এ. পড়ার মতো রসদ আমার হাতে নেই। এর আগে আমার সহোদর বড়ো ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছিলো ময়নামতিতে। সোলজার বোর্ডে খবর নিয়ে আমি নিজেই ঢাকা থেকে কুমিল্লায় গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, আমার সব খবর তাঁর নখদর্পণে। এমন কি ইয়ং পাকিস্তান পত্রিকাটি পর্যন্ত তাঁর সংগ্রহে বিদ্যমান, যাতে আমার ইসলামিক ইন্টার পরীক্ষার খবর ছবিসহ বেরিয়েছিলো। কিন্তু একটি পত্রও তিনি লিখতে পারে নি। সেই যে আমার শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলেন। এরপর দীর্ঘ ছয় বৎসরের ব্যবধানের এই তাঁর স্যাথে দেখা। আলাপ করে সব কথা বললাম। শমশের ভাইও ময়মনসিংহ থেকে গিয়ে উপস্থিত হলেন পরের দিন। তিনিও আমার খরচের কথা বললেন। বড়ো ভাই সব শুনে খরচ পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি।

তাই আজ এই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে অনেকটা নিরুপায় হয়েই তাঁর কাছে একটা কড়া পত্র লিখলাম। বললাম যে আমি হয়তো যেভাবেই হোক এম. এ. পড়বো, তবে কাউকেই আমি ক্ষমা করবো না মানুষের আত্মীয়স্বজন থাকে কিসের জন্য! যদি বিপদের সময় তাদের সাহায্যই না পাওয়া যায়, তাহলে এমন আত্মীয় থাকার চাইতে না থাকাই ভালো। কিন্তু চিঠি লিখেও খুব একটা ভরসা করতে পারলাম না। কারণ এতে হিতে বিপরীতও হতে পারে। সুতরাং আমার শ্বশুর যে চালা ঘরটিতে থাকতেন, তার টিনগুলি বিক্রি করে আপাততঃ এম. এ. পড়ার খরচ সংগ্রহ করতে হলো। ঢাকা যাবার মাস খানেক পরে হলের ঠিকানায় একটি চিঠি ও একশ টাকার একটি মানি অর্ডার পেলাম। বড়ো ভাই আমাকে দুশ্চিন্তা না করতে উপদেশ দিয়েছেন। কারণ তিনি প্রতিমাসে একশ' টাকা করে পাঠাবেন। কিন্তু বাস্তবে এই একশ'তেই শেষ হয়েছে তাঁর এবারের প্রতিশ্রুতি। আর টাকাও নেই, চিঠিও নেই, এমন কি আমার চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেননি।

এর ফল হয়েছে এই যে, শিক্ষা জীবনের এই শেষ বছরটি আমাকে বেশ কষ্ট করে অতিক্রম করতে হয়েছে। দোকানের কথাতো আগেই বলেছি; শমশের ভাই রাগ করে সেটি প্রায় বন্ধ করে রেখেছেন। তাই পুঁজির অজুহাতে পুবের বাড়ির বুর কাছেও আর

কিছু চাইতে পারছিনা। সায়িদারও আছে। আর দেবার মতো কিছু নেই। এক জমি আছে; কিন্তু জমি বিক্রি করার ঝামেলাও অবশ্যি আমার নিজের নামের জমিও আমি বিক্রি করতে পারতাম। কিন্তু কেন জানি ইচ্ছে হয়নি। যতোটা সম্ভব কষ্ট করেই পথ চলেছি!

তাছাড়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মতো সায়িদা আবারো অসফল মাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছে। এবার তার একটি মেয়ে হয়েছিলো। এ পর্যন্ত দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে সে প্রসব করেছে। এতে রক্তপাত হয়েছে প্রচুর, আর কোনো লাভ হয় নি। নিজের স্বাস্থ্য যেমন নষ্ট করেছে, তেমনি আমার মন মানসও বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু আমি কী করবো, কোন্ দিক রক্ষা করবো। যে দিকে যাই সেদিকে বাধা, সে দিকেই বিপদ। তবু পাষাণে বুক বেঁধে আমি দৃঢ় সংকল্প, যে করেই এই শেষ খেয়া পাড়ি দিতেই হবে।

এ সময়ে আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, কী বিপুল পরিমাণ নৈরাশ্য আমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছিলো। এর ফলে আমার অন্তর্মুখিনতা কেবলই বাড়ছিলো। অবশ্যি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সময় থেকেই আত্মপ্রকাশের তাগিদ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কারণ সাহিত্য পড়তে গিয়েও সাহিত্য চর্চার জন্য যে মানসিক প্রশান্তি দরকার, তা আমার ছিলো না। একমাত্র টিউটারিয়েল ক্লাসের রচনা ছাড়া খুব উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু আমি এসময়ে লিখতে পারিনি। আমার পুরানো খাতাপত্রে এ সময়ের কিছু লেখা এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু এগুলির মূল্যমান খুবই অকিঞ্চিৎকর। এজন্য এগুলি কোনো পত্রিকা অফিসে যায়নি। অবশ্য এমনিতেও পত্রিকা অফিস সম্পর্কে আমার মধ্যে একটা বিতৃষ্ণার ভাব অনেক আগে থেকেই বিরাজ করছিলো। সেই যে করিমার অনুবাদ হারিয়ে গেলো, বলতে গেলে তখন থেকেই আমি আর কোনো লেখা পত্রিকা অফিসে পাঠাইনি। এমনকি তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কোনো সংকলনে আমার কোনো লেখা ছাপানোর চেষ্টাও আমি করিনি। সুতরাং ঢাকার পত্রিকাগুলির সাথে আমার কোনো যোগাযোগ ছিলো না।

এ বিষয়টি এখানে এজন্যই উল্লেখ করছি যে, এমনি কোনো যোগাযোগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করলে আমি হয়তো এমনি নৈরাশ্যের মধ্যে তলিয়ে যাবার সুযোগ পেতাম না। সৃজনশীলতার নেশা আমাকে আশার বাণী শোনাতো এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করতো। কিন্তু এর অভাবে আমার জীবন ও জগৎ কেবলি সংকুচিত হয়ে উঠেছিল।

এর ফলে এ সময়ে আমি বিভাগীয় ছাত্র সমিতির দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি চেয়ে নিয়েছিলাম। অবশ্যি এর একটা অন্যতর কারণও ছিলো। অপেক্ষাকৃত তরুণ ছাত্রদের অনেকের ব্যবহারই আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো। তারা শুধু সহপাঠীদের প্রতিই নয়, শিক্ষকদের প্রতিও অশ্রদ্ধার ভাবপ্রকাশ করতে দ্বিধা করতো না। আমি আগেও বলেছি, আমাদের সব শিক্ষক যে সমমানের ছিলেন, তা নয়; তবু তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের কর্তব্য বলে আমি মনে করি। কোনো কারণেই তাঁদেরকে অশ্রদ্ধা

করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আমরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথেই অতিক্রম করবো। পিতার মূর্খতা কখনোই অশ্রদ্ধার বিষয় হতে পারে না। এতে আমার অকৃজ্ঞতাই বেশি মাত্রায় প্রকাশ পাবে। কারণ পিতার মূর্খতার জন্য পিতাকে অস্বীকার করায় বিপদ আছে।

শিক্ষকদের এ প্রসঙ্গে তৎকালের দুজন বিদেশী শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে। তাঁদের একছন জে,এস, টর্নার। তিনি ইংরেজি বিভাগে ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর অদ্ভুত আন্তরিকতা একটি অমলিন আদর্শ হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে। শুধু রিডিং রুমে নয়, তিনি হলে হলে ঘুরেও তাঁর বিভাগের ছাত্রদের খোঁজ খবর নিতেন। ছাত্ররাও তাঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতো। তিনি শিক্ষক জীবন শেষ হওয়ায় ইংল্যাণ্ডে নিজের বাড়িতে চলে যান। অন্য শিক্ষকের নাম নিউম্যান। তিনি ছিলেন রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে। তিনি টর্নার সাহেবের উল্টো পিঠ। ছাত্রদের তাড়া খেয়ে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তাঁর সম্পর্কে উচ্চারিত সি.আই.এ.-র এজেন্ট শব্দটি এবং এর তাৎপর্য সম্পর্কে আমি এ সময়েই প্রথম অবহিত হই।

এ সময়ে সংস্কৃত বিভাগের একজন শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর নাম অভয়া চরণ চক্রবর্তী। যেহেতু তখন বাংলা ও সংস্কৃত একই বিভাগের অধীন ছিলো, এ জন্য পুরো বিভাগই তাঁর বিদায় সংবর্ধনায় মিলিত হয়েছিলো এবং তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলো। কারণ বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষকদের মধ্যে রেষারেষি তখনো দর্শনীয় হয়ে ওঠেনি। তবে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার রেষারেষি তখনই দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। এভাবেই দীন মুহম্মদ বনাম আব্দুল হাই সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠতে থাকে।

কাজী দীন মুহম্মদ সাহেবকে আমরা প্রথম বৎসরে কিছুদিনের জন্য শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম। এর পর তিনি ডক্টরেট করার জন্য বিদেশ চলে যান এবং আমরা থাকতে থাকতেই বিভাগে ফিরে আসেন। তখন তাঁর পারিবারিক জীবনে কী ঘটেছিলো, তা আমরা ভালো করে জানতে পারিনি। কিন্তু বিভাগে তিনি যেন কেমন নিস্প্রভ হয়ে গেলেন। এর কারণ হাই সাহেবের সাথে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত কিনা, জানি না। তবে পূর্ব পশ্চিমের এই বিরোধ নিয়ে তখন অনেক কথাই শুনেছি। অবশ্যি পরবর্তীকালে কাজী দীন মুহম্মদ সাহেবের বিদেশী ডিগ্রি সম্পর্কে শহীদুল্লাহ সাহেবকে সপ্রশংস মনোভাব প্রকাশ করতে দেখেছি; এমন কি হাই সাহেবের বিদ্বেষেরও তিনি নিন্দা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য সময়ে কেন জানি দীন মুহম্মদ সাহেব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি।

আমার ছাত্র জীবনের এই শেষ বৎসরে নতুন সহপাঠীদের অনেকের কথাই আমার মনে নেই। তবে ইত্তেফাকের ভীমরুলের আহমেদুর রহমান এ সময়ে আমাদের সাথে পরীক্ষা দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে। আখতার ফারুকের কথা আগেই বলেছি। শহীদ আখন্দও কি এ সময়ে ছিলেন না? স্মৃতির বন্ধন ছিন্ন করে আমার সহপাঠীদের প্রায় সবাই জনারণ্যে হারিয়ে গেছেন। এ ভাবে হারিয়ে গেছে আমার শিক্ষা জীবনের শেষ

বৎসরের অনেক স্মৃতি। আমার মানসিক অবস্থার জন্যই এমনি বিপর্যয়ে ঘটেছে। কারণ একমাত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি ছাড়া আর সব কিছু থেকেই আমি তখন বিচ্ছিন্ন।

পরীক্ষাও এক সময়ে শেষ হলো। কিন্তু কীভাবে , তার কিছুই আজ মনে করতে পারছি না। এমন কি, অন্যান্য বারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম কিনা, তাও মনে পড়ছে না। শুধু পরীক্ষা শেষ হবার পরেই দুজন স্বল্প পরিচিত ছাত্র এসে আমার বইগুলি দাবী করলো। তারা নাসিরাবাদ কলেজ থেকে পাস করে এসে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে। সাথে অধ্যক্ষ রিয়াজউদ্দিন আহমাদের একটি পত্র। তাদের বাড়ি ঘর পুড়ে যাওয়ায় খুবই বিপদে পড়েছে। সুতরাং আমার বইগুলি দিয়ে সাহায্য করলে তাদের খুবই উপকার হবে। তাদের নাম দেলোয়ার হোসেন ও নুরুল ইসলাম। কাজেই বাংলা উপন্যাসের ধারা থেকে আরম্ভ করে অনেক ভালো বই-ই আমি তাদেরকে দিয়ে দিলাম। শুধু শর্ত রইলো, তারা ছাত্র জীবন শেষে বইগুলি ফেরৎ দেবে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, তারা সেই শর্ত পূরণ করেনি। কারণ তাদের নিকট থেকে এ সকল বইপত্র নাকি অধ্যক্ষ রিয়াজ সাহেবের ছেলে ইয়াকুব ধার নিয়েছিলো। কিন্তু কেউই আর ফেরৎ নিয়ে আসেনি। আমি নিজেও সেগুলি খুঁজে পেতে আনার চেষ্টা করিনি। বাংলার মাস্টার হলে হয়তো আমি সে চেষ্টা করতাম। বাংলা একাডেমীতে যাবার ফলে তা আর হয়নি।

হয়নি আরো অনেক কিছু। সহপাঠীদের সাথে বিদায় নেবার নামে হুড়োহুড়িতে যোগ দেয়া হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ের 'র‍্যাগডে' তখনো অনেক দূরে। তবু তার আভাস বুঝি তখনি পাওয়া যাচ্ছিলো। কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি আর এঁদো পুকুরে ডুব দেয়া তখনই আরম্ভ হয়ে গেছে। আমি এগুলির নীরব দর্শক ছাড়া আর কিছু হতে পারিনি।

এই শেষ বৎসরের স্মৃতির বলয়ে একটি মাত্র হাস্যোজ্জ্বল মুখই ভাসছে, সেটি মুনীর চৌধুরীর মুখ। ভাইভাতে তিনি এই অমায়িক সদয় মুখটি নিয়েই আমাদের সামনে হাজির হতেন। কৌশলে নিজের প্রশ্ন ও সহকর্মীদের প্রশ্ন ঘাবড়ে যাওয়া ছাত্রকে ধরিয়ে দিতেন। অনার্সের ভাইভায় মুনীর চৌধুরী ছিলেন না, ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর মধ্যেও একটা সহজ সরল ভাব ছিলো। কিন্তু মুনীর চৌধুরী এ ব্যাপারে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর হাস্যেজ্জ্বল মুখ প্রায় সকল বিদায়ী ছাত্রের মনেই দাগ কেটেছে। এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে গিয়েও অদ্ভুত আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছিলাম। এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দুমুর্খ বলে পরিচিত আহমদ শরীফ সাহেবও অমায়িক স্নেহের পরশ দিতে পেরেছিলেন। অবশ্যি এসবই অনেক পরের কথা। কারণ পরীক্ষার ফল তখনো বের হয়নি।

আমার গন্তব্যতো চরখরিচা। সেখানেই ফিরে এলাম। অদ্ভুত একটা মুক্তি। পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট, দীর্ঘ দেড় যুগের প্রতিষ্ঠান-বন্দী জীবন থেকে মুক্তি। সব কিছু শেষ করে সামনে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার যে দুশ্চিন্তা, তার চাইতে এই মুক্তির ধারণাটাই তখন প্রবল। তাছাড়া ভবিষ্যৎ একেবারে অনিশ্চিতই বা বলি কী করে। আসার সময় এমদাদিয়ার মৌলবী সাহেব উৎসাহ দিয়ে দিয়েছেন, তাতে

অন্য কিছু না পাই, ব্যবসার পথতো খোলাই আছে। পরীক্ষার শেষে নেহাতই ঢাকা থেকে বিদায় নেবার কথা জানাতেই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার কথা শুনে হঠাৎই প্রশ্ন করলেন, 'এখন চাকরি হলে আপনি কতো বেতন পাবেন ?'

আমি বললাম, 'বড়ো জোর চারশ' সাড়ে চারশ'!

আমার টাকার অংক শুনে তিনি হাসলেন, বললেন, 'আমি আমার ছেলেদেরকেই তো মাসিক পাঁচশ টাকা করে হাত খরচ দিই।'

ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরীর মালিক মৌলবী আব্দুল করিমের কথা আমি ইতিপূর্বেও বলেছি। তাই তাঁর আশ্বাস ছিলো, পূঁজির কোনো চিন্তা যেন আমি না করি। শুধু দোকানে বসে থাকতে পারলেই তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। সুতরাং মুক্তির আনন্দ উপলব্ধির ক্ষেত্রে খুব একটা বাধা ছিলো না।

কিন্তু এ সময় হঠাৎ কেন যে আইউব খানকে স্বপ্নে দেখলাম. তার রহস্য আমার পক্ষে বুঝে উঠা সম্ভব হয়নি। দেখলাম, তিনি আমার সাথে হাত মিলিয়ে আমার সাহায্য চাইছেন। এও এক অদ্ভুত ব্যাপার! ইতিপূর্বে আমি যে সব স্বপ্ন দেখেছি. তার সাথেও এর কোনো মিল নেই। তাই কীভাবে এই স্বপ্ন দেখার উপকরণ আমার মধ্যে জড়ো হয়েছিলো, তা বিশ্লেষণ করা খুবই মুশকিল। তবে তখনো আমি নামাজ, রোজা একেবারে বাদ দিইনি। অন্ততঃ জুম্মা ও ঈদের নামাজে নিয়মিত উপস্থিত হবার একটা অভ্যাস ছিলো। তদুপরি সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকায় তাঁর মৌলিক গণতন্ত্রের প্রতি আমার বিরূপতা তেমন প্রকট হবার কথা নয়। এর ফাঁকে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজে দেখা তাঁর মূর্তি আমার অবচেতন মনে ঢুকে পড়েছিলো কিনা, কে জানে! কিন্তু সেতো বেশ আগের কথা। আজ মুক্তির এই আনন্দতাড়িত উপলব্ধির মধ্যে হঠাৎ এসে সে আবির্ভূত হলো কেন ?

এর কারণ সম্ভবতঃ দীর্ঘদিন পরে এই অবসর সময়ে আমি আবার আমার মধ্যে আত্মপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করছিলাম। হাতের কাছে অন্য কিছু না পেয়ে এই মৌলিক গণতন্ত্রকেই একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করার জন্য উদ্ধুদ্ধ হয়েছিলাম। এর ফলেই 'আমার দেশ' নামে একটি একাংকিকা লিখে ফেললাম। সেখানে তরুণ সমাজকর্মী ও-কায়েমী স্বার্থবাদীদের সংঘাতই রূপায়িত হলো। কিন্তু এই রচনাটি কোথাও মঞ্চস্থ বা প্রকাশিত হয়নি। এখনো আমার আবর্জনা-প্রায় কাগজপত্রের স্তূপে সেই পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে এ সময়েই আমি 'আনোয়ারে সুহায়লী' নামে একটি ফারসী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজও আরম্ভ করি।

যাহোক, আমার শেষ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পাস করেছি। মাত্র বারো নম্বরের জন্য আমি প্রথম শ্রেণী পাইনি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে যে কাজী রফিকুল হক, তার ব্যবধান মাত্র চার নম্বরের। আমি জানি না, এই চার নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে তাকে প্রথম শ্রেণী দেয়া যেতো কিনা! কারণ তা নিয়ে তখন কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। পরীক্ষার্থী সবাই নির্বিবাদে ফলাফল মেনে

নিয়েছে। অথচ এ সময়ে অনার্সে অনেক নীচের দিকে থেকেও লুৎফুর রহমান জাহাঙ্গীর এই শেষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়ে গেছে। কী করে পেলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাই নিয়ে গুজব, নীলিমা আপাই নাকি এই প্রথম শ্রেণীটি ম্যানেজ করেছেন। কারণ তাঁর বড়ো মেয়ে খুকুর সাথে লু,র,জা,র বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

আমি কিন্তু এই সব গুজবে বিশ্বাস করিনি। কারণ বিভাগীয় পর্যায়ে এমন কিছু ম্যানেজ করা যায় কিনা, তা নিয়েও আমার কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ অপরের ছিদ্রান্বেষণের স্বভাব আমার কোনোকালেই ছিলো না। আর আমাদের নম্বর কেটে লু,র,জাকে প্রথম শ্রেণী দেয়া হয়নি নিশ্চয়! কাজেই আমার দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্তির জন্য আমিই দায়ী। সুতরাং আমার এই শেষ পরীক্ষার ফল সেই আগের মতো দর্শনীয়ভাবে না হলেও সবাইকে সন্তুষ্ট করেছে। আমি নিজেও সন্তুষ্ট হয়েছি। কারণ আমি এর চাইতে ভালো করতে পারলে বিভাগ আমাকে তা দিতে অবশ্যি কার্পণ্য করতো না। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শেষ দান আমার যোগ্যতা অনুসারেই আমি পেয়েছি।

আর এই পাওয়াওতো খুব সহজে সম্পন্ন হয়নি। আমার দৈহিক , মানসিক ও বাস্তব অসুবিধা সত্ত্বেও অনেকের স্নেহ ও সাহায্যেই কেবল আমার ছাত্রজীবন মোটামুটি সাফল্যের সাথে শেষ করতে পেরেছি। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি একান্তই কৃতজ্ঞ। তাঁদের ঋণ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আমার এই সামান্য সাফল্য তাঁদের অসামান্য স্নেহের দান মাত্র।

দ্বিতীয় প্রবাহ ঃ কর্মজীবন

তরঙ্গ সূচী

প্রথম তরঙ্গ/৩৪৫
দ্বিতীয় তরঙ্গ/৩৭১

প্রথম তরঙ্গ ॥

আমার প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে। কিন্তু ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। কারণ মানুষের ছাত্রত্ব কখনও শেষ হয় না। তাকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কারণ ছাত্রত্বের অপর নামই জীবন। জীবনের ধর্ম যেহেতু বিকাশ লাভ করা, সেইজন্য ছাত্রত্বের সাথে তার মিল আছে। ছত্র বা ছাতা যেমন আকার প্রাপ্ত হলে চারদিকে ছড়িয়ে যায়, ছাত্রত্ব ঠিক তেমনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ছড়িয়ে যেতে থাকে। জীবনও ছড়িয়ে যায়, দৈহিকভাবে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আর মানসিকভাবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিস্তারে। যতোদিন না মৃত্যু এসে সে বিস্তার থামিয়ে দেয়, সে নানাভাবেই ছড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। এভাবেই পৃথিবীতে জীবন প্রবহমান।

ত্রিশে আমার জন্ম। আজ ষাটে আমি বয়সের দিক থেকে ত্রিশ বছর পেরিয়ে এসেছি। দিনে রাতে এই ত্রিশ বছর ধরে আমার চেতনা বিস্তারলাভ করেছে। জীবনের পাঠশালায় এই প্রায় এগারো হাজার দিনে আমি কী শিক্ষা গ্রহণ করেছি? আজ অবসর মুহূর্তে তা খতিয়ে দেখার সময় এসেছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, কিছু সংখ্যক প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই আমি শিখতে পারিনি। না মাদ্রাসা, না বিশ্ববিদ্যালয়, কেউই আমার এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। সুতরাং আমার ছাত্রত্ব ঘোচেনি। এখনও আমাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

অবশ্যি ষাটের সেই শেষ পর্যায়ে পরিবেশ এমনি সব প্রশ্নের অনুকূল ছিলো না। বিশেষ করে আমার এসব প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? চার পাশে যাদেরকে দেখি, তারা যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে অভ্যস্ত। কিছু কথা তারা বিভিন্ন ভাষা থেকে শিখে নিয়েছে, সেগুলি আউড়িয়ে এক ধরনের পাণ্ডিত্য জাহির করতে পারলেই তাদের তৃপ্তি। কিন্তু আমি এতো অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই আমার প্রশ্ন আর শেষ হয় না। কিন্তু উত্তর কোথায়!

অবসর সময়ে এমনি সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি আমার বড়ো ভাই—নানা শ্বশুরের সাথে! শ্রোতা হিসেবে তিনি আমার যুক্তির ধারা অনুসরণ করেছেন, কিন্তু সব কিছু বুঝার মতো যোগ্যতা তাঁর ছিলো না। সুতরাং এ আলোচনায় তাঁরও যেমন লাভ হয়নি, আমারও তেমনি কোনো উপকার হয়নি। কারণ প্রশ্নের ব্যাখ্যা করলেই উত্তর বেরিয়ে আসে না। আর উত্তর একটা দিলেই যে প্রশ্ন শেষ হয় যায়, তাও তো নয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন বেরিয়ে আসে আর শেষ প্রশ্নে এসে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানও নিরুত্তর হয়ে যায়।

কিন্তু বাস্তব জীবন এমনি প্রশ্নের লীলাবিলাসকে দীর্ঘক্ষণ সহ্য করতে নারাজ। সে কখোন বলে না, 'এখনি অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা'। সে চায় একটি ছোট নীড়ের নিরাপদ আশ্রয়। দু'বেলা পেট পুরে খাওয়া আর আরাম করে শোওয়ার আয়োজন করতে পারলেই সে সুখী। এর জন্যই সে সারা দিনমান খেটে মরে। এই-ই আমার চার পাশের সাধারণ জীবন। এই জীবনেরই একটি সোচ্চার আশা হলো, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'। সেই দুধভাতের যোগাড় আমাকেও করতে হবে। এই পৃথিবীর সৃষ্টি যেভাবেই হয়ে থাকুক, মানব সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ যেভাবেই ঘটে থাকুক, এই জীবনের সাধারণ চাওয়ার তাতে কোনো তারতম্য ঘটেনি। তাই প্রশ্নের লীলা-বিলাস ত্যাগ করে আমাকেও তৎপর হতে হবে।

কিন্তু কীভাবে তৎপর হবো আমি? দোকান আছে, সেখানে বসলে ব্যবসা করতে পারি। অবশ্য এ হলো একেবারেই শেষ পর্যায়ের ব্যাপার। সবারই ধারণা, ব্যবসা করলে এতো লেখাপড়া শেখার কী দরকার ছিলো! সত্যিইতো, আরও আগে থেকে ব্যবসাতে নামলে এতোদিন দাঁড়িয়ে যেতাম। তাই চাকরি করতে হবে। পত্রিকা ঘেঁটে মাগুরার একটি কলেজে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম। প্রয়োজন হলে আরও দু'একটি দরখাস্ত পাঠাতে হবে। আর ইতিমধ্যে সংসারের কিছু প্রয়োজন মেটাতে হবে।

তবে একদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত যে, সায়িদার খরচ এখনও আমাকে বহন করতে হচ্ছে না। তার জমির ফসলই তার খোরাকি ও অন্য খরচের জন্য যথেষ্ট। দোকান শমশের ভাই এখনও ছাড়েননি; তবে তাঁর মন নেই। অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। তবু অন্য কোনো ব্যবস্থা আমি করিনি কারণ শমশের ভাই স্বেচ্ছায় ছেড়ে না গেলে আমি জোর করে কিছু করতে চাই না। কাজেই এদিক থেকেও আপাততঃ আমার কিছু করার নেই। এমনিভাবে কিছু করার ব্যাপার খুঁজতে গিয়ে পৈতৃক ভিটার কথা মনে পড়লো। বহুদিন ধরে এর সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। মাঝে মধ্যে গেলে একদিন বা এক বেলার বেশি থাকি না। তাও রাত্রি কাটাই বড়ো বাড়িতে মোগল ভাইয়ের ওখানে। কারণ বাড়িতে আমাদের কোনো ঘর নেই। তাই এবার এই অবসর মুহূর্তে বাড়িতে একটা ঘর করার কথা চিন্তা করলাম।

আমার ফুফাতো ভাইরা ভালো ভালো সব জমি নিয়ে গেছেন, সে কথা আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি এখন তাঁরা আমার চাচাতো ভাই, সামু ভাইয়ের সহায়তায় সেই জমি চাষ বাস করছেন। কিন্তু এর বাইরেও বাড়ি জমির একটা অংশ রয়ে গেছে। সেখানে সামু ভাইরাসহ আমাদের সবারই হিস্যা আছে। আবার এ জমির উপর বাপ-দাদার কবরও আছে, তার হেফাজত করা দরকার। এতোদিন এ ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবর নিতে পারিনি। এবার তাই সপ্তাহ খানেকের জন্য আমুদপুর গেলাম। সামু ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করতেই সে ঘর বাঁধার কথা শুনে খুশি হলো। পাশের গাঁয়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে একটি পুরানো চৌচালা ঘর কিনে ফেললাম। বাঁশ, ছন, কামলা ইত্যাদি মিলিয়ে শ'খানেক টাকা খরচ হলো। এই হলো বাড়ির বৈঠক খানা, যাতে অন্য মেহমান

সহ আমি নিজেও এখানে থাকতে পারি। পাড়ার অনেকেই এসে আমার ঘর দেখে খুব খুশি হলো।

ময়মনসিংহ ফিরে এসে সমাবর্তন উৎসবের একটি পত্র পেলাম। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অনার্স পরীক্ষার একটি সার্টিফিকেট দিবে। তজ্জন্য আগের দিন গিয়ে নির্দিষ্ট ফিসের বদলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ইতিপূর্বে আর কোনো সমাবর্তন উৎসব দেখিনি, খুব সম্ভব তা হয়ওনি। তাই খুব আগ্রহ নিয়ে ঢাকায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। উঠলাম কাজী রফিকুল হকদের বাসায়। আমি আগেই বলেছি, পশ্চিম বাংলা থেকে আগত এই ছেলেটির সারল্য ও আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। সহপাঠীদের মধ্যে ওর সাথেই আমার অন্তরঙ্গতা ছিলো সবচেয়ে বেশি। সুতরাং ঢাকায় ওদের ওখানে ঠাঁই পেতে আমার খুব একটা সংকোচ ছিলো না। তাঁর পিতাও ছিলেন অমায়িক ভদ্রলোক।

যাহোক, আগের দিন বিকালেই আমরা অফিস থেকে প্রবেশ পত্র ও এক টুকরো কাপড় সংগ্রহ করলাম। ওই টুকরাটি পিঠের উপর বাঁধতে হবে এবং যথানিয়মে যথা স্থানে বসতে হবে। সকাল বেলা বেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই সমাবর্তন মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। তখন কে উপাচার্য আর কে আচার্য, তার কিছুই মনে করতে পারছি না। কারণ সেদিকে খুব একটা লক্ষ্যও ছিলো না। পুরানো বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এসেছে, তাদের সাথে সাক্ষাতের এই দুর্লভ মুহূর্তটি নীতিকথা শোনার জন্য হাতছাড়া করা যায় না। তাই আমরা যতোটা সম্ভব নীরবে নিজেদের কুশল জিজ্ঞাসায় ব্যাপৃত রয়েছি।

অনেকদিন পরে দেখা হলো ছফিরের সাথে। সে এ বছরই আরবি বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। কাজেই ওদের সার্টিফিকেট দেয়া না হলেও আইউব খানের ঘোষিত এক হাজার টাকার পুরস্কার এবং একটি স্বর্ণপদক ওরা পাবে। সেখানে বসে হঠাৎ মনে হলো, এই পুরস্কারটি আরও দর্শণীয়ভাবে আমিও নিতে পারতাম। কিন্তু, না আমি বাংলা সাহিত্য পড়ে খুব দর্শণীয় কিছু করতে না পারলেও পুরস্কৃত কম হইনি। কারণ সাহিত্যের এই সজীব ভুবনে না এলে জীবনকে এমন ব্যাপক পটভূমিতে দেখার সুযোগ পেতাম না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আরবি সাহিত্য পড়ানো হয়, সে তো মৃত অতীতের একটি অংশমাত্র। সেখানে জীবনের যে বাস্তবতা আছে, তা প্রিয়ার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে কান্না ছাড়া আর কিছু নয়।

শেষ হলো সমাবর্তন। সার্টিফিকেট পেলাম। ডক্টর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সহ বাংলা বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রীর সাথে কার্জন হলের সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তোলালাম। তারপর এখানে সেখানে আড্ডা মেরে দুপুর গড়িয়ে দিয়ে যখন রফিকদের বাসায় ফিরবো, তখন সে বললো, 'চল, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সাথে দেখা করে যাই।'

ইতিপূর্বে অনার্সের ভাইভায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে দেখেছিলাম। ময়মনসিংহের কথা শুনে তিনি ময়মনসিংহ গীতিকা নিয়েই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু হোমরা ও মহুয়া শব্দের মধ্যে উমর ও মেওয়া শব্দের অপভ্রংশ খুঁজে বেড়ানোর মানসিকতাটি আমার খুব ভালো লাগেনি। কারণ এ কাহিনী মুসলিম অভিযাত্রীদের আগমনের বহু পূর্বের।

যাহোক, রফিকের সাথে শহীদুল্লাহ সাহেবের কামরায় গিয়ে পৌঁছলাম। রফিক পা ছুঁয়ে সালাম করলো, কাজেই আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। এর ফলেই কি না জানি না, তিনি বেশ আন্তরিকতার সাথে আমার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং টাইটেল পাসের খবর শুনে হঠাৎ তকদীর বা ভাগ্য সম্পর্কে আমার ধারণা প্রকাশ করতে বললেন। আমি যথাসাধ্য আমার মত প্রকাশ করে ইসলামের কর্মবাদী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করলাম। কারণ এই কর্মবাদকে স্বীকার করলে ভাগ্যকে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমার বক্তব্যের যুক্তি মেনে নিয়েও শহীদুল্লাহ সাহেব ভাগ্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাসের কথা বললেন। এমনকি দেশব্যাপী তাঁর এই অসাধারণ খ্যাতির মূলেও যে ভাগ্য কাজ করেছে, এ কথাও তিনি বলতে ভুললেন না। আমি এরও বিরোধিতা করে যুক্তি দেখাতে গেলে তিনি কাজের কথা বলে আমাকে থামিয়ে দিলেন।

প্রথম সাক্ষাতেই আমার কেমন যেন মোহ ভেঙ্গে গেলো। না, পাণ্ডিত্যের প্রতি কোন মোহ আমার নেই। কিন্তু নিজের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের নিরলস সাধনাকে যিনি ভাগ্যের ফল বলে চালিয়ে দিতে চান, তিনি আসলে কর্মের মূল্যকে ছোট করে ফেলেন। তবে শহীদুল্লাহ সাহেবের খ্যাতির মূল উৎস সেই সংস্কৃত পড়ার ঘটনা। সেটি 'শহীদুল্লাহ সমস্যা' হিসেবে তৎকালের সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন পরিবেশকে বেশ আলোড়িত করেছিলো। এর সাথে তাঁর সাধনা যোগ হয়েছে। তা না হলে এমন খ্যাতি তাঁর জন্য জুটতো না।

যাহোক, আমার কথা আমি বলে চলে এসেছি। আমি যেমন তাঁকে বুঝে নিয়েছি, ঠিক তেমনি তিনিও হয়তো আমাকে বুঝে নিয়েছেন। এর ফল হয়েছিলো এই যে, ধর্মের ব্যাপারে আর কোনো কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি। দীর্ঘ সাত বছর আমি তাঁর সাহচর্য পেয়েছি, বিভিন্ন ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে ধর্মের কোনো প্রসঙ্গ ছিলো না। আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ত্রুটির জন্যও তিনি কোনো কথা বলেননি। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে আমাকে শাসন করতে পারতেন।

কিন্তু সে কথা এখন থাক্। তাছাড়া এ ব্যাপারে আমি একটি পৃথক নিবন্ধে কথা বলবার চেষ্টা করেছি। 'সাহিত্য ও ঐতিহ্য' নামে আমার একটি প্রবন্ধ সংকলনে সেটি প্রকাশিতও হয়েছে। আপাততঃ এই আশুতোষ মনীষী ব্যক্তির সাথে এ ভাবেই আমার প্রথম পরিচয় অনুষ্ঠিত হলো। আমি আবার ময়মনসিংহে ফিরে এলাম।

অবশ্যি এখানে তখন করবার মতো কোনো কাজই নেই। কারণ কোথাও কোনো কাজে জড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত নিরুদ্বেগে কোনো কিছুই করতে পারছি না। তবু 'আনোয়ারে সুহায়লী' নামে একটি ফারসি পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ করেছি। এতে গল্পচ্ছলে দরবারী রাজনীতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আমি বাংলা অনুবাদটির নাম দিয়েছিলাম 'অনেক তারার হাতছানি'। কিন্তু কাজ খুব একটা এগোয় না। কর্মখালির বিজ্ঞাপনও খুঁজি। মাগুরায় ইতিপূর্বে যে দরখাস্তটি পাঠিয়েছিলাম, তার একটা উত্তরের জন্যও অপেক্ষা করি। এভাবেই ঢিমে তেতালা গোছের সময় কেটে যাচ্ছে।

এমন সময় রফিকের নিকট থেকে একটি পোস্টকার্ড পেলাম। কুশল জিজ্ঞাসার পর একটিমাত্র সংবাদ, শহীদুল্লাহ সাহেব আমাকে যেতে বলেছেন। পরদিনই ঢাকা রওনা হয়ে গেলাম। কারণ শহীদুল্লাহ সাহেবের এই স্মরণ করার ব্যাপারটি আকর্ষণীয় কিছু হবে বলেই আমার মনে হলো। ইতিপূর্বে ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত যেভাবে হয়েছিলো, তাও যদি হয়, তাহলেও এর প্রতি লোভ আমার কম নয়। এ ছাড়া অন্তরঙ্গতা বাড়লে চাকরিরও একটা হিল্লা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং দুপুরবেলা গিয়ে রফিকদের বাসায় উঠলাম। কিন্তু রফিকের সাথে আলোচনা করেও প্রয়োজনের কোনো হদীস পেলাম না। বিকালে রফিককে সাথে নিয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের চক বাজারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

তখন আসরের নামাজ পড়ে শহীদুল্লাহ সাহেব বৈঠকখানাতেই বসেছিলেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। ভেতরের দিক থেকে একটি ফাইল নিয়ে এসে পাতা উল্‌টিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে স্মরণ করেছি একটা শব্দের জন্য'—

কিন্তু আমি মাঝপথে বাধা দিয়ে বললাম, 'আমাকে আপনি বলবেন না, স্যার! কারণ আমি আপনার ছাত্রের-ছাত্রের ছাত্র। তা ছাড়া আমি রফিকের সহপাঠী।'

তিনি আমার বক্তব্য শুনে মুচকি হাসলেন, বললেন, 'ঠিক আছে, এখন শব্দটা শোনো ঃ 'আবেন্দা', শব্দটা কোন্ ভাষার হতে পারে?'

আমি প্রায় বিনা দ্বিধায় বলে ফেললাম, 'ফারসি; অর্থ আনয়নকারী।'

তিনি আমার কথা শুনে ফারসি অভিধান খোঁজার জন্য উঠে গেলেন। আর আমি বসে বসে ঘামতে লাগলাম। হাঁ, শব্দটার জন্যই। কারণ এই একটা শব্দের জন্য যদি সেই ময়মনসিংহ থেকে আমাকে এখানে আসতে হয়ে থাকে, তা হলেই চিত্তির! আর শব্দটা ভুল হলেতো কথাই নেই; আমার অযোগ্যতাও সেই সাথে নিরূপিত হয়ে যাবে। কিন্তু না, একটু পরেই তিনি 'লুগাতে কেশোয়ারী' থেকে শব্দটি বের করে আমাদের কাছে ফিরে এলেন। শুধু শব্দ নয়, আমার দেয়া অর্থও মিলে গেছে। শব্দটি যশোর অঞ্চলে বিয়ের ঘটক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে এই শব্দটি এসেছে। তিনি এখন সেই অভিধানের সম্পাদক হিসেবে বাংলা একাডেমীতে কাজ করছেন।

তিনি যথাস্থানে শব্দটির ব্যুৎপত্তি লিখে নিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে একটা সন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, 'তুমি কোথায় উঠেছো?'

আমি রফিকের কথা বললে তিনি বললেন, 'কাল একবার একাডেমীতে আমার সাথে দেখা করো।'

আমি সম্মতি দিয়ে বেরিয়ে গেলাম রফিকের সাথে। হাঁটতে হাঁটতে আমরা এমনি দেখা করার ফলাফল সম্পর্কে ভাবছিলাম, আলোচনা করছিলাম, কিন্তু খুব আশা করার

মতো কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। তবু দেখা করতে হবে।

পরদিন গেলাম একাডেমীতে। আমি একাই ছিলাম। গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি হাতের ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। একটা কিছু বোধ হয় লিখছিলেন, সেটি শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার সাথে এসো!'

আমি তাঁর পিছু পিছু তৎকালীন পরিচালকের কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন পরিচালক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর সাথে আমার কোনো পরিচয় ছিলো না। সুতরাং আমি অত্যন্ত সংকোচের সাথে সেখানে প্রবেশ করলাম এবং শহীদুল্লাহ সাহেবের নির্দেশে তাঁর পাশের চেয়ারে উপবেশন করলাম। তিনি পরিচালকের কাছে তাঁর সহকারীদের নিয়োজিত করার ব্যাপারে জানতে চাইলেন। পরিচালক জানালেন যে, সরকারী কলেজের দু'জন অধ্যাপককে এ ব্যাপারে আনার জন্য যথারীতি লেখা হয়েছে। খুব শিগ্‌গিরই সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শহীদুল্লাহ সাহেব সব শোনার পর বললেন, 'তুমি কাকে এনে দেবে? তার দ্বারা কতোটুকু কাজ হবে, কিছুই বুঝার উপায় নেই। আমি বলছি, তুমি একে নিয়োগপত্র দাও।'

তাঁর এই বক্তব্যে যুগপৎ আমি ও পরিচালক সাহেব একে অপরের দিকে ফিরে তাকালাম। যেন এমন একটি প্রস্তাবের জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। তবু আমার চাইতেও বেশি অপ্রস্তুত হলেন সৈয়দ আলী আহসান সাহেব। তাঁর চোখে মুখে একটা প্রচ্ছন্ন বিতৃষ্ণার ভাব লক্ষ্য করে আমি আরও সংকুচিত হয়ে গেলাম। সৈয়দ সাহেব পূর্বের কথাই আবার আউড়ে গেলেন এবং এখন যে ভিন্নতর কোনো কিছু করা সম্ভব নয়, সে কথা বেশ একটু জোরের সাথেই বললেন।

শহীদুল্লাহ সাহেব আর কিছু বললেন না। উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, 'এসো'। আমি লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে মাথা নিচু করে তাঁর পিছুপিছু বেরিয়ে এলাম। নিজের কামরায় এসে তিনি বললেন, 'তুমি বাড়ি গিয়ে বিছানাপত্র নিয়ে চলে এসো। এখানে শ'দুয়েক টাকার একটা কাজ তোমাকে আমি যোগাড় করে দেবো। সে কাজ করে তোমার ঢাকার খরচ চলে যাবে। তুমি আমার কাছাকাছি থাকবে, দেখি সে আমার কথা অমান্য করে কাকে নিয়োগপত্র দেয়।'

এ কথার উত্তরের সম্মতি জানানো ছাড়া আমার কী বলার আছে! আমি তাই করে বাইরে বেরিয়ে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কারণ তাঁদের দু'জনের মাঝখানে পড়ে আমার যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। একজনের আগ্রহ আর অন্যজনের উপেক্ষা যেন আমার কাছে আচমকা আনন্দ বেদনার উপকরণ হয়ে আমাকে বিচলিত করে তুললো। আমি হাসবো কি কাঁদবো, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এ কারণেই রফিকের সাথে বিষয়টি নিয়ে আনুপূর্বিক আলোচনা করতে হলো। সব শুনে সে বললো যে, বুড়ো যা বলেছে, আমি যেন তাই করি; তা না হলে বাকি জিন্দেগীতে তাঁর কাছে আর কোনো সহায়তা পাবো না। আমিও তার কথা বিশ্বাস না করে পারলাম না। তাছাড়া দেখাই যাক না, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়। তাই সেদিনই ময়মনসিংহ ফিরে এলাম।

কিন্তু তল্পিতল্পা নিয়ে পরদিনই ঢাকা যাওয়া হলো না। একদিকে সংসারের গোছগাছ করা অন্যদিকে কিছু টাকা সাথে নিয়ে যাওয়া দরকার। কারণ শহীদুল্লাহ সাহেব যাই বলুন, পরদিনই আমার জন্য তিনি টাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন না। কাজেই যোগাড় করে রওনা দিতে সপ্তাহখানেক দেরী হয়ে গেলো। এর মধ্যে আবার রফিকের পোস্টকার্ড এসে উপস্থিত। সংবাদটি হলো, 'তাড়াতাড়ি আয়, তোর চাকরি হয়ে গেছে।'

আমার গাঁটরী বাঁধাই ছিলো। পরদিনই ঢাকা গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে দিনটি ছিলো ২৬শে ফেব্রুয়ারি। রফিককে সাথে নিয়ে বিকালে গেলাম ডক্টর সাহেবের ওখানে। তিনি দেখেই বললেন, 'কালই একাডেমীতে এসো, তোমার নিয়োগপত্র দেয়া হবে।'

আমি নীরবে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। পথে রফিককে বললাম, 'কী হয়েছিলো রে? হঠাৎ এমন নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে।'

রফিক বললো, 'বুড়ো রাগ করে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলো। তাই সৈয়দ সাহেব বুড়োর রাগ থামানোর জন্য তোকে চাকরি দিতে বাধ্য হয়েছে।

পরদিন ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ সন; আমি বাংলা একাডেমীর আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্পের সহকারী সম্পাদক হিসেবে আমার নিয়োগপত্র পেলাম। আমার বেতন নির্দিষ্ট ৬০০ টাকা এবং এক বছরের জন্য এই নিয়োগ কার্যকর থাকবে। এর পর কাজের অগ্রগতি দেখে যথাসময়ে নবায়ন করা হবে। ডক্টর সাহেবকে এসব বিষয় দেখালাম। তিনি বললেন, 'ও কিছু না; তুমি আজই যোগদানপত্র দিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করো।'

আমি তথাস্তু বলে আমার চাকরি জীবনে প্রবেশ করলাম।

কিন্তু আমার কাছে সব চাইতে অদ্ভুত মনে হলো, শহীদুল্লাহ সাহেবের এমনি অযাচিত স্নেহ তথা গুণগ্রাহিতার ব্যাপারটি। এখানেই তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যান। তা না হলে আমার সাথে তাঁর পরিচয়ের মধ্যে তো আকর্ষণের চাইতে বিকর্ষণের উপকরণই ছিলো প্রচুর। আমি যুক্তি দিয়ে তাঁর ধারণার বিরোধিতা করেছি। আমার সে যুক্তি তিনি মেনে নিয়েছেন, এমনও মনে হয়নি। এরপর ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমার জ্ঞানতো একটি শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কাজেই আমাকে নিয়োগ দেবার জন্য তাঁর উষ্মা প্রকাশের মধ্যে জ্ঞানের প্রতি একটা সরল আকর্ষণ ছাড়া অন্য কিছুই ছিলো না। আমি এখানে উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং আমি না হয়ে অন্য কেউ হলেও তিনি এর অন্যথা করতেন না। জ্ঞানের প্রতি এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাঁর ধর্মবোধ কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

যাহোক, শহীদুল্লাহ সাহেবের অযাচিত স্নেহে চাকরিতো হলো; এখন থাকি কোথায়? কোনো মেসে ঠাঁই নেয়া যায় কিনা, এমনি কথা যখন ভাবছি, তখনই দেখা হলো আখতার ফারুকের সাথে। সে একাডেমীতেই এসেছিলো; আমার কথা শুনে বললো, 'যদি আপত্তি না থাকে, আমার সাথেই থাকতে পারিস্!'

আমি বললাম, 'আপত্তি তো তোর হবার কথা। আমি তো যে কোন স্থানে যেতে পারি, কাজেই তোর সাথে আপত্তি হবে কেন!'

গেলাম ওর সাথে। মাহুতটুলী বিখ্যাত তারা মসজিদের পাশে ইসলামিয়া লাইব্রেরীর মালিক শরফ উদ্দিন সাহেবের বাড়ি। তার সামনের দিকে দোতলার একটি রুমে থাকে আখতার ফারুক ও হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ। স্থানটি আমার ভালো লাগলো। সেদিনই বিকালে বারো টাকা দিয়ে একটি চৌকি, সাত টাকা দিয়ে একটি টেবিল ও ছয় টাকা দিয়ে একটি চেয়ার কিনে আমি ওদের রুমমেট হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পরেই ঈদের ছুটি হলো। ফেব্রুয়ারি মাসের দু'দিনের বেতন ও ঈদ অগ্রিম সহ বেশ কিছু টাকা হাতে এলো। খরিচায় ফিরে এলাম। কার জন্য কী কিনেছিলাম, তা এখন আর মনে নেই। কিন্তু চাকরি হওয়ায় সবাই বেশ আনন্দিত। বু-ই খুশি হলেন সব চাইতে বেশি। বেতনের কথা শুনে বড়ো ভাইতো চমকেই গেলেন। শুরুতেই ৬০০ টাকা! আমি বললাম, 'শেষেও এই ৬০০। কারণ চাকরিটি চুক্তির চাকরি। প্রকল্পের সাথে এর মেয়াদ জড়িয়ে আছে। যতোদিন প্রকল্প চালু থাকবে, আমার চাকরিও চলবে।'

তাই চললো। মাস তিনেকের মধ্যেই আমার যোগ্যতা আমি প্রমাণ করে ফেললাম। এর ফলে শহীদুল্লাহ সাহেব মহা খুশি। কারণ তাঁর স্নেহ যে অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হয়নি, এতেই তিনি আমার প্রতি আগের চাইতে বেশি স্নেহ করতে আরম্ভ করলেন। আমার সহকর্মিনী হিসেবে রওশন আরা আগে থেকেই ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই লুৎফুল হায়দার চৌধুরী এসে যোগ দিলেন। কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেব সকলকে ডিঙিয়ে আমার উপরই বেশি নির্ভর করতে লাগলেন।

এ সময়েই কোনো এক ফাঁকে তিনি আমাকে অবসর সময়ে কিছু অনুবাদের কাজ করতেও বলছিলেন। এর ফলে আমি ইকবালের 'আরমুগানে হিজাজ' নামের ফারসি কাব্যটি অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। ইতিপূর্বে 'আনোয়ারে সুহায়লী' নামের অন্য একটি ফারসি গদ্যগ্রন্থ অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছিলাম। সেটি তখনও শেষ হয়নি। তবু এই নতুন আবাসে 'আরমুগানে হিজাজে'র কাব্যানুবাদই আমার অবসর সময়ের কাজ হয়ে উঠে! ইতিমধ্যে সৈয়দ আলী আহসান সাহেব আমাকে হাতের লেখা একটি উর্দু পাণ্ডুলিপি এনে দিয়েছিলেন। এতে তাঁদের বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিলো। আমি এর পাঠোদ্ধার করে অনুবাদ করে ফেললাম এবং 'ফতেহাবাদের আউলিয়া কাহিনী' নামে সেটি বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হলো।

বস্তুত এই অনুবাদের মাধ্যমে সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের সাথে আমার পরিচয় অনেক খানি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। চাকরি দেবার বেলায় যে বিতৃষ্ণা তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম, এই পরিচয়ের মাধ্যমে তা দূর হয়ে গেছে বলেই মনে হলো। এরপর যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আমি প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধারে পারদর্শী এবং হিন্দী ভাষাও জানি, তখন শহীদুল্লাহ সাহেবের চাইতেও বেশি করে তিনি আমাকে স্নেহ করতে আরম্ভ করলেন। এরই ফলশ্রুতি আলাওলের 'তোহফা' কাব্যের সম্পাদনা।

ইতিমধ্যে আরও মাস তিনেক পেরিয়ে গেলো। এই সময়ে আমার কাব্যানুবাদ যেমন শেষ হয়েছে, তেমনি আমার স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ এর পূর্বে আমার স্বাস্থ্য এতোটা ভালো আর কখনও হয়নি। এর কারণও সুস্পষ্ট, একেতো আর্থিক দুশ্চিন্তা, তদুপরি প্রত্যেক বছরই একটা না একটা ফাইনাল পরীক্ষা। সবকিছু মিলিয়ে স্বাস্থ্যহানির যথেষ্ট উপকরণ একত্র হয়েছিলো। এর ফলে প্রত্যেক ফাইনাল পরীক্ষাই আমাকে অসুস্থতা নিয়ে দিতে হয়েছে।

কিন্তু এবার স্বাস্থ্য ভালো হবার ব্যাপারটিও খুব বেশি দিন টিকলো না। আমার এক খালা এলেন ঢাকায় চিকিৎসা করাতে। পাছপাড়ার এই খালা দীর্ঘদিন থেকে জরায়ুর রোগে ভুগছিলেন। নানাভাবে চিকিৎসা করিয়ে কোনো সুফল হয়নি। এবার এই অপারেশনের উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা এসেছেন। উঠেছেন ডাঃ হামিদুর রহমানের বাসায়। চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছেন ডাঃ লুৎফর রহমান। এঁরা দু'জনই এককালের মন্ত্রী জনাব হাফিজুর রহমানের ভাই এবং আমার খালুর খালাতো ভাই। আমি মাঝে মধ্যে খালাকে দেখতে যাই। কারণ আমি এখনও বাসা করিনি। তাই অফিস ফেরৎ খালার খোঁজখবর নিয়ে আসি।

এভাবেই খালার রক্ত সংগ্রহের ভার আমাকে নিতে হলো। নির্দিষ্ট সময়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে রক্তের খোঁজ নিতেই পড়ে গেলাম এক নার্সের খপ্পড়ে। সে আমার আপাদমস্তক জরিপ করে হঠাৎ বলে উঠলো, 'রক্তটাতো আপনিই দিয়ে দিতে পারেন।'

তার কথা শুনে আমিতো অবাক; বললাম, 'আমি টাকা নিয়ে এসেছি।'

সে বললো, টাকার রক্ত পাওয়া গেলেও নিজে দিলে আর হাঙ্গামা পোহাতে হয় না তা ছাড়া ব্লাড ব্যাংকে এমনিতেই রক্তের অভাব!'

তবু আমি গলা টেনে বললাম, 'গ্রুপে যদি না মেলে?'

'সে আমরা দেখবো'—এই বলে সে সত্যি আমাকে ব্লাড ব্যাংকে নিয়ে গেলো এবং রক্ত নেবার আয়োজন করলো। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমিও সম্মতি দিলাম। কারণ মায়ের বোন খালা মাতৃতুল্য। তার জন্য রক্ত দিতে পারাটা অবশ্যি সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু ব্লাড ব্যাংকের কর্মীরা প্রয়োজন অতিরিক্ত রক্তই আমার শিরা থেকে বের করে নিয়েছিলো। যার ফলে রক্ত নেবার পর আমি যখন একাডেমীতে ফিরে এলাম, তখন সবাই আমাকে দেখে অবাক হলেন; আমি নাকি অনেক খানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছি।

সত্যি সেই ফ্যাকাসে ভাব দূর হতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিলো। এ সময়েই আমরা কয়েকজন একাডেমীতে দুধ খাবার একটা ব্যবস্থা করি। এই সুবাদে শহীদুল্লাহ সাহেব আমাদেরকে দুগ্ধ পোষ্য বলে ঠাট্টা করতেন। কারণ তিনি নিজে কখনও এভাবে দুধ খাওয়া পছন্দ করতেন না। বরং প্রত্যেক দিন কিছুটা দই খাওয়ার অভ্যাস তিনি করে নিয়েছিলেন। আমাদেরকেও দুধ ছেড়ে দইয়ের অভ্যাস করতে উপদেশ দিতেন।

এ সময় আমরা বাংলা একাডেমীর পুরাতন ভবন অর্থাৎ বর্ধমান হাউজের দোতালার পশ্চিমের কামরাটায় বসতাম। এরই দক্ষিণ পশ্চিম কোণার রুমটিতে বসতেন

শহীদুল্লাহ সাহেব। সংকলন বিভাগের অনেক কাজ তখনও বাকি ছিলো। এমনকি শব্দ বাছাইয়ের সবকাজ এখনও শেষ হয়নি। সংকলন বিভাগের প্রধান ছিলেন হাবীবুল্লাহ সাহেব। তিনি ডক্টর এনামুল হক সাহেবের সময় থেকেই আছেন। এরপর এই বিভাগে এসেছেন অধুনা ডক্টর আবদুল কাইউম এবং একাডেমী গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত আবদুর রাজ্জাক। এরা দু'জনই আমার পূর্বে একাডেমীতে প্রবেশ করেছেন। তাঁদের সাথে ক্রমেই অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলো। বিশেষ করে রাজ্জাক সাহেব খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন।

অন্যদিকে ইতিমধ্যে আমাদের মেসের আবাসও কিছুটা অনিশ্চয়তা নিয়ে এলো। কারণ শরফ উদ্দিন সাহেব ভাড়া বাড়ানোর ছলে আমাদেরকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করলেন। এছাড়াও আমার জন্য মেস ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো। চাকরি করছি, অথচ বৌ পড়ে আছে দেশের বাড়িতে তথা শ্বশুর বাড়িতে। ব্যাপারটা সন্দেহ উদ্রেকের জন্য যথেষ্ট। এর কিছুটা আভাসও খরিচা গিয়ে পেয়ে গেলাম। সায়িদার কাছেই জানতে পারলাম, আমার সহকর্মিণী রওশন আরা নাকি খুব সুন্দরী। সুতরাং আমার মন এখন আর খরিচামুখী হতে রাজি নয়। এজন্যই পত্র দিতে দেরী হয়, এমনকি বাসা করতেও দেরী হচ্ছে। এ সব ব্যাপার শুধু মেয়েদের মনে নয়, অভিভাবকদের মনেও খুব সহজেই আসে। কারণ আমাদের সমাজে শ্বশুরের পয়সায় লেখা পড়া শিখে শ্বশুরের মেয়েটিকে রাস্তায় ফেলে যাওয়া খুব অসম্ভব বা বিরল ঘটনা নয়। সুতরাং অনুরূপ ধারণা যাতে বাড়তে না পারে, তজ্জন্য যথা সম্ভব তাড়াতাড়িই আমাকে বাসা ভাড়ার ব্যবস্থা করতে হলো।

অথচ এই কয় মাস দেরী হবার পিছনে আমার অন্য কোনো চিন্তা কাজ করেনি। সেই যে আরমুগানে হিজাজের কাব্যানুবাদ করতে আরম্ভ করেছিলাম, সেটিই আমাকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিলো। ইতিমধ্যে সেই অনুবাদ করাচীর ইকবাল একাডেমীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তার স্থান দখল করেছিলো আনোয়ারে সুহায়লীর অসমাপ্ত অনুবাদটি। এর ফলেই আমি সাংসারিক ব্যাপারে খুব একটা চিন্তা করিনি। কারণ এখনও সায়িদার খোরাকীর জন্য আমার কোনো চিন্তা ছিলো না। কিন্তু এসব কথার আভাস পাওয়া মাত্রই সংসার যেন আমাকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিলো।

অন্যদিকে বাসা ভাড়া না করলেও আমার টাকা পয়সা যে খুব একটা উদ্বৃত্ত হচ্ছিলো, তা নয়। কারণ এখন থেকেই আমার বোনকে সাহায্য করতে হচ্ছিলো। এটিও সংসারের দৃষ্টিতে খুব সুখের ব্যাপার নয়। কারণ চাকরির টাকা বৌয়ের কাছে না গিয়ে বোনের কাছে যাচ্ছে, এতেও নানা সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া আমিও আমার খাওয়া থাকার বাইরে খুব ভালো কাপড় চোপড় বা অন্য আসবাবপত্র কিনতে পারিনি। শুধু একটি ঘড়ি এ সময়ে কিনেছিলাম, যা আমি এখনও ব্যবহার করছি। অবশ্যি এটাই আমার প্রথম ঘড়ি। এর আগে আমার হাতে বা পকেটে কোনো ঘড়ি কখনও শোভা পায়নি।

সুতরাং বাড়ি ভাড়া করার জন্য আর দেরী করা চলে না। আখতার ফারুকের সাথে এ নিয়ে পরামর্শ করলাম। সেও দেখলাম বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। কারণ নানা কারণেই বর্তমান এই মেসটি ছেড়ে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। তবু স্মৃতির পাতায় নানা দিক থেকেই শরফ উদ্দিন সাহেবের এই দোতলা আবাসটি অক্ষয় হয়ে আছে। এখানে থাকার বেলাই একদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিলো। জানালা দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ চোখে পড়লো সামনের বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত ট্রেনিং কলেজের যে সাইন বোর্ডটি ছিলো, তার ট্রেনিং শব্দের টি বর্ণটি ঝড়ের তাণ্ডবে উড়ে গেছে। সুতরাং শব্দটি 'রেইনিং' হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমরা বেশ হাসাহাসি করেছিলাম। এমনি বাড়িটার খুব কাছেই অবস্থিত ঢাকার বিখ্যাত 'তারা মসজিদ'। একদিন দেখি তার সামনে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মুনীর চৌধুরী। তিনি কিছু একটা বলছেন আর মুভি ক্যামেরা দিয়ে কিছু বিদেশী লোক ছবি তুলছে। পরে শুনেছিলাম, একটি বিদেশী কোম্পানি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন মসজিদ নিয়ে একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি করছিলো, *তারা মসজিদের* এই ব্যাপারটি ছিলো তারই অংশ। এমনি সব টুকরো স্মৃতি মনের কোণে জমে আছে। কিন্তু অবাক হবার ব্যাপার এই যে, এ সময়ের বাইরের ঘটনা খুব একটা কিছু মনে নেই। এর কারণ সম্ভবতঃ অনুবাদ নিয়ে আমার আত্মস্থ হয়ে থাকা।

এভাবে টুকরো স্মৃতির পসরা নিয়ে আমি পাড়ি জমালাম জগন্নাথ সাহা রোডে। বাড়িটির খোঁজ আখতার ফারুকই এনেছিলো। তারই এক আত্মীয় বোধ হয় সেখানে থাকতো। সে ছেড়ে দিচ্ছে, কাজেই আমি ইচ্ছা করলে সেটি নিতে পারি। দেখে মোটামুটি পছন্দই করে ফেললাম। ছোটখাটো হলেও বাড়িটি দোতলা। নিচে দুটি আর উপরে দুটি মোট চারটি রুম। সামনে কিছুটা খোলা ছাদও আছে। পেছন দিকে রান্নাঘর সহ এক চিলতে উঠোন। তারপরে পায়খানা, প্রশ্রাবখানা এবং একটি কুয়া। মন্দ না, দেখে পছন্দ করে ফেললাম। অবশ্যি ভাড়াটা কিছু বেশিই, একশ' টাকা। তবু এর চাইতে ভালো বাড়ি খুঁজে দেখার মতো ধৈর্য তখন আর ছিলো না। সুতরাং বাড়ি ঠিক করেই আমি সায়িদাকে পত্র লিখে দিলাম, ঢাকায় আসার প্রস্তুতি নেবার জন্য।

কিন্তু যতোটা সহজ ভেবেছিলাম, তা হলো না। সায়িদা তার শ্বাশুড়ীকে ছাড়া ঢাকায় আসবে না বলে গোঁ ধরে বসলো। অগত্যা মার কাছে যেতে হলো। এমনিতেও আমি তাঁকে আনবার জন্য যেতাম। কিন্তু সায়িদার কথায় সেটি ত্বরান্বিত এলো। আমার বি-পিতা আবদুল লতিফ তালুকদার তখন আর নেই। ইতিপূর্বে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি গিয়েছিলাম। তখনই মাকে আমার কাছে নিয়ে আসার কথা বলে রেখেছিলাম। সুতরাং এবার যাবার ফলে কাজটি খুব সহজেই সম্পন্ন হলো। তবু আমার বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরা কিছুটা আপত্তি জানিয়েছিলো। কারণ তারাও মাকে মায়ের মতোই দেখেছে। সুতরাং তাদেরও তো দাবী আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার দাবীর সম্মুখে তারা হার মানতে বাধ্য হলো।

যাহোক, মাকে নিয়ে আমি খরিচায় ফিরে এলাম। কয়েকদিন গেলো গোছগাছ করতে। ইতিমধ্যে স্থির হলো আমার শ্বাশুড়ীও যাবেন। মা-ই এ ব্যাপারে শর্ত আরোপ

করে বললেন। বেহাইনকে ছাড়া তিনি একা যাবেন না। সুতরাং সবাই মিলে যাওয়াই স্থির হয়ে গেলো। শুধু আমার নানী শ্বাশুড়ী অর্থাৎ বু-কে নেয়ার ব্যবস্থা করা গেলো না। অথচ আমার এই সংসার পাতায় তিনিই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। তিনি তখন খুবই অসুস্থ, শয্যাগত রোগী।

যথা সময়ে আমরা গিয়ে ঢাকায় পৌছলাম। জগন্নাথ সাহা রোডের ভাড়াটে বাড়িতে খুব সাধারণভাবে আমার সংসারী জীবন আরম্ভ হলো। একটি কাজের ছেলে পূর্ব থেকেই ঠিক করা ছিলো। বরিশালের এই ছেলেটির নাম ছিলো খালেক। এই ছেলেটিকে কে কীভাবে এনে দিয়েছিলো, তা এখন আর মনে নেই। কিন্তু ছেলেটির স্বভাবচরিত্র ও পরিবারের সকলের সাথে আপন হয়ে যাবার ব্যাপারটি ছিলো দর্শনীয়। বিশেষ করে মার খু'ব নেওটা হয়ে উঠে সে এবং তাঁকে দাদী বানিয়ে যথারীতি সবাইকে প্রয়োজনীয় সম্বোধন করতে থাকে। একাডেমীতে আমার জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে যেতো সে। কোনো সময় বাজারও করতো। এভাবেই আমার সংসার চলতে লাগলো।

এর মধ্যে একদিন বারুরীর ঈমান আলী গিয়ে হাজির। আমি বিকালে একাডেমী থেকে ফিরে দেখি বাসার সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে সমাদর করে বসালাম। কিন্তু কেমন যেন উদভ্রান্ত মনে হলো তাঁকে। আমি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন যে, গাড়িভাড়া বাকী গেছে। আমার সঙ্গে তখন গোটা পঁচিশেক টাকা ছিলো। সবটাই তাঁর হাতে তুলে দিলাম। বেচারা কেমন সংকুচিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'না, না, এতো লাগবে না।'

আমি বললাম, 'নিয়ে যান, আমার পক্ষ থেকে কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে যাবেন। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের কাছে আমার কথা বলবেন।'

ঈমান আলী কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাঁর ভাবটা বুঝতে পারলাম। এতোটা তিনি আশা করেননি। তাই কেমন একটা লজ্জা তাঁকে পেয়ে বসলো। যেন আমার নিকট থেকে পালাতে পারলেই বাঁচেন। এ জন্যই চা নাশতা খাওয়া, রাত্রে থাকার অনুরোধ এড়িয়ে জোর করেই চলে গেলেন। এরপর ঢাকার চাকরি জীবনে আর কোনো দিন ঈমান আলীকে দেখিনি।

এই এক লোক, শিক্ষা-দীক্ষা নেই, স্বভাব চরিত্রও খুব একটা ভালো নয়; তবু তাঁর মধ্যে মুনষ্যত্বের একটা অদ্ভুত স্পর্শ ছিলো, যা আমাকে বারবার আকর্ষণ করেছে। পূর্বেও সে কথা আমি বলেছি। এই তুলনায় মিজানুর রহমান সাহেবের ঘটনাটি ছিলো হৃদয় বিদারক। কারণ তিনি শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। ঢাকায় 'যৌনবিজ্ঞান' গ্রন্থ রচয়িতা আবুল হাসানাত এবং অন্য আরও কয়েকজনের একটি আলোচনা চক্র ছিলো। এতে তাঁরা মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করতেন। মিজানুর রহমানও সেই চক্রের একজন সদস্য ছিলেন।

কিন্তু পুরো ব্যাপারটি না বললে এই ভদ্রলোকের আচরণের তাৎপর্য ঠিক বুঝা যাবে না। সেই যে কবি ইকবালের আরমুগানে হেজাজের কাব্যানুবাদ আমি ইকবাল

একাডেমীতে পাঠিয়েছিলাম, তারই সংবাদ নিয়ে এলেন সৈয়দ আলী আহসান সাহেব। আমি জানতাম না যে, তিনি ইকবাল একাডেমীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তিনি করাচী গিয়েছিলেন, এসে বললেন যে, ইকবাল একাডেমী আমার অনুবাদটি প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেছে; পূর্ব পাকিস্তানে যে কমিটি আছে, চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তার সুপারিশ প্রয়োজন হবে। উক্ত কমিটির মধ্যে এই মিজানুর রহমান, ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং অধ্যাপক আবদুল হাই ছিলেন। মিজান সাহেব সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করতেন।

ইতিমধ্যে আমি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোলাম ফারুকেরও একটি পত্র পেয়েছিলাম। তাতে জানতে পারলাম যে, অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি মিজানুর রহমানের কাছে ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, মিজান সাহেবের সাথে আমার কোনো পরিচয় ছিলো না। সুতরাং আলী আহসান সাহেবের নির্দেশে তাঁর পি.এ. মোহাম্মদ আলী সাহেবের সাথে আমি একদিন পুরানা পল্টনে মিজান সাহেবের বাসায় গেলাম এবং পরিচিত হলাম। তিনি বেশ সহানুভূতির সাথেই আমাকে গ্রহণ করলেন। তাঁর নির্দেশেই আমি হাই স্যার ও কাজী সাহেবের সুপারিশ সংগ্রহের জন্য পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এলাম। হাই স্যারকে বুঝিয়ে বলতেই তিনি অনুবাদটি উল্টে পাল্টে দেখে একটি সুপারিশ পত্র লিখে দিলেন। কিন্তু কাজী সাহেবের কাছে এসে অসুবিধার সম্মুখীন হলাম। তিনি বললেন, 'হাই সাহেব, তাড়াতাড়ি দিতে পারেন, কিন্তু আমি পারবো না। কারণ আমি ফারসি জানি। মিলিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু এক মাসের আগে তো আমি সময় পাবো না!' আমি বললাম, 'আপনি এই কথাগুলিই আমাকে একটি কাগজে লিখে দিন। তাতেও আমার কাজ হবে; পাণ্ডুলিপিটি আমি যথা সময়ে ফেরৎ দিতে পারবো।'

কাজী সাহেব তাই লিখে দিলেন। মিজান সাহেব সব কিছু বিচার করে আমাকে বেশ সহানুভূতি দেখিয়েই বললেন যে, তিনি নিজেও সুপারিশ করছেন। সুতরাং অনুবাদটি গৃহীত বলেই ধরে নেয়া যায়। এবার নিয়ম মত এর জন্য প্রাপ্য হিসাব করা দরকার। আর এটি করতে গিয়েই তিনি এমন একটি হিসাব তুলে ধরলেন, যাতে আমার প্রাপ্য খুব বেশি হলে তিন'শ' টাকা হতে পারে। আমি তাঁর এই আচরণ দেখে বিস্মিত হলাম। কারণ এই অনুবাদটি পদ্যানুবাদ। গদ্যের সাধারণ হিসেবে এর মূল্য নির্ধারণ করা একান্তই অনুচিত সুতরাং আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, এতো কম মূল্যে আমি আমার অনুবাদটি বিক্রি করবো না।

আমার মনটা খুবই খারাপ হ[illegible] গেলো। তাই আলী আহসান সাহেবের কাছে বিষয়টা খুলে বলতে হলো। তিনিও [illegible] রাগ করলেন। কিন্তু মিজান সাহেবকে কিছু বলতে চাইলেন না। কারণ তাঁর সাথে [illegible]জান সাহেবের সদ্ভাব ছিলো না। কিন্তু কারও কিছু বলতে হলো না। ইকবাল একাডে[illegible] সমস্যার সমাধান করে দিলো। অনুবাদের আংশিক প্রাপ্য হিসেবে আমি এক হাজার টাকার একটি চেক পেয়ে গেলাম। ভাগ্যিশ

চেকটি আমার নামে এসেছিলো, মিজান সাহেবের নামে এলে আমাকে তিনি তিনশ' টাকাই দিতেন। এজন্যই ঈমান আলীর প্রসঙ্গে তাঁর কথা এমনভাবে মনে পড়েছে।

যাহোক, 'হেজাজের সওগাত' নামে আমার এই কাব্যানুবাদটি পরে ঢাকার একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সওগাত প্রেসে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো। অবশ্যি এ ব্যাপারে মিজান সাহেব যেমন আমাকে আর কিছু বলেননি, তেমনি ইকবাল একাডেমীও আমাকে আর কোনো টাকা দেয়নি। আমিও খোঁজ নেবার চেষ্টা করিনি।

কারণ ইতিমধ্যেই আমার পারিবারিক জীবনে নতুন দুঃসংবাদের সূচনা হয়েছিলো। হঠাৎ খরিচার ছোট ভাই এসে উপস্থিত। ইনি আমার নানা শ্বশুরের ছোট ভাই। নাম আব্দুল লতিফ। তিনি আমার বু অর্থাৎ নানী শ্বাশুড়ীর মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ নিয়ে আমার শ্বাশুড়ীকে নিতে এসেছেন। এই ছোট ভাইয়ের কথা এ যাবৎ আমি কোথাও উল্লেখ করিনি। কারণ তাঁর সাথে আমার তেমন কোনো অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠার সুযোগ হয়নি। তবু তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলাম। এজন্য তাঁর পায়ের ছেঁড়া জুতা দেখে আমি জোর করে তাঁকে এক জোড়া পাম্পসু কিনে দিয়েছিলাম। এর ফলে তিনি খুবই খুশি হলেন। পরদিন আমার শ্বাশুড়ীর সাথে সায়িদাও খরিচা চলে গেলেন। আমার পক্ষে তাঁদের সাথে যাওয়া সম্ভব হলো না।

না গিয়ে একদিক থেকে অবশ্যি ভালোই হয়েছিলো। কারণ পরদিনই আমার ধারাকান্দির ফুফাতো ভাই আবদুল খালেক এসে উপস্থিত। তাঁর ক্যানসার হয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে তাঁকে রেডিও থেরাপীর জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আমি তাঁকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ব্যস্ত থাকায় খরিচা যেতে দেরী হয়ে গেলো। ইতিমধ্যে আমার বু, আমার নানী শ্বাশুড়ী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর শয্যার পার্শ্বে আমার থাকা উচিত ছিলো। কারণ তাঁর স্নেহ আমি এতোটাই পেয়েছিলাম যে, তাঁর সেবা করার মাধ্যমে আমি তার কিঞ্চিৎ পরিশোধ করারও সুযোগ পেলাম না। আমি পৌঁছে দেখলাম সব শেষ হয়ে গেছে। তাঁর ঋণ আমার জীবনে অপরিশোধ্য বোঝা হয়েই রইলো।

যাহোক আমার সাথে শুধু সায়িদাই ঢাকায় ফিরে এলো। আমার শ্বাশুড়ী তাঁর ছোট ভাইয়ের সংসার দেখার জন্য খরিচাতেই রয়ে গেলেন। কারণ মায়ের মৃত্যুতে সে খুবই মুষড়ে পড়েছে। তাছাড়া সংসার জ্ঞান এখনও তার তেমন একটা হয়নি।

এদিকে এক সপ্তাহ পরেই খালেক ভাই আর থাকতে চাইলেন না। আমি খরিচা থেকে ফিরে দেখলাম তাঁর স্বাস্থ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। রেডিও থেরাপীর তেজ তিনি সহ্য করতে পারছেন না। সুতরাং তাঁকে বিদায় দেয়া ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। খালেক ভাই এক সময়ে আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। সেই যে জমির নীলাম ডেকে আনা, ঘর বেঁধে দেয়া; এসবই ছিলো তাঁর স্নেহের নিদর্শন। এজন্য মাও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু তাঁর রোগটি এমন ছিলো যে, আমরা কোনো কাজেই লাগলাম না। পরে শুনলাম, মাস খানেকের মধ্যেই তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছেন।

একাডেমীতে আমি তখন সংকলন বিভাগের কাজ করছি। কারণ অভিধানটির শব্দ বাছাইয়ের কাজ এখনও শেষ হয়নি। যে পরিমাণ শব্দ বাছাই করা হয়েছিলো, তার সম্পাদনার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। আর সে কাজ করতে গিয়ে আমি, বোধ হয়, কিছুটা তাড়াতাড়িই করে ফেলেছি। এর ফলে আমার সহকর্মীদের দু'জনের কাজের চাইতেও আমার কাজের পরিমাণ বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্যই শহীদুল্লাহ সাহেবের কাছে একদিন ধমকও খেয়েছিলাম। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশে ভুল হয়েছিলো। তিনি ডেকে নিয়ে বললেন, এটা কী করেছো, এমন ভুল করেছো কেন? জানো, আমি বললে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তোমার ডিগ্রি কেড়ে নিতে পারে!

আমি তাঁর এই স্নেহ মাখা ভর্ৎসনার কোনো জবাব দিতে পারিনি। আমার নীরবতা দেখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আত্তাজিলু মিনাশ্ শয়তান' অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করাটা শয়তানের কাজ।

কিন্তু সত্যিই কি আমি খুব তাড়াতাড়ি করেছিলাম? বোধ হয় না, কিন্তু চাকরির কাজ যে ধীরে সুস্থে করতে হয়, এ বোধ তখনও আমার জন্মেনি। শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে আরবি বাক্যটি বলে আমাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সেটি একটি আরবি প্রবাদ; তবে পরবর্তীকালে হাদীস হিসেবে চালু হয়ে গেছে। সুতরাং এটি আমিও জানতাম। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতো আমার কোনোকালেই ছিলো না। তাই যা করতে যাই, তা নিজের হোক বা পরের হোক, মন দিয়েই করি। এর ফলে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয় বৈকি! অনেকে এটাকে অবশ্য নির্বুদ্ধিতা বলেই মনে করেন। আমিও সেটা যে বুঝি না, তা নয়; তবুও কী করবো, সেই যে কথায় আছে, 'স্বভাব যায় না মলেও', আমারও হয়েছে সেই অবস্থা!

এ কারণেই এ সময়ে আমার জন্য শহীদুল্লাহ সাহেবের আরও একটি সতর্ক বাণী অপেক্ষা করছিলো। আমার সহকর্মিনী রওশন আরা হঠাৎ আমার বাসায় পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকার প্রস্তাব করে বসলেন। তাঁর স্বামী তখন করাচীতে এক কমার্শিয়াল ব্যুরোতে উচ্চপদে কাজ করেন। ঢাকায়, বোধ হয়, তাঁর থাকার অসুবিধা হচ্ছিলো সুতরাং তাঁর এই প্রস্তাবকে আমি খুব সরল মনেই গ্রহণ করলাম। কিন্তু হঠাৎ কী মনে হওয়ায় আমি বিষয়টি শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে তুলে ধরে মতামত চাইলাম। তিনি সব শুনে আমার দিকে চেয়ে শুধু বললেন, 'লাতাক্রাবা হাজেহিশ্ শাজারাতা' অর্থাৎ এই বৃক্ষের নিকটেও যেয়ো না।

এই আরবি বাক্যটি কোরানের একটি আয়াত। এই বলে আল্লাহ্ আদম হাওয়াকে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটে যেতে মানা করেছিলেন। সুতরাং শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ইঙ্গিত আমিও বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি যে রওশন আরাকে ইতিমধ্যে সম্মতি দিয়ে বসেছি, তার কী হবে! শহীদুল্লাহ সাহেবের নিষেধ আল্লাহ্‌র বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিষেধের মতোই আমার জন্য কঠিন হয়ে উঠলো। তবু আমিতো আদম সন্তান, তাই বিকাল বেলা রওশন আরাকে নিয়ে বাসায় পৌছলাম। সে ঘুরে ঘুরে আমার রুমগুলি দেখলো, আমার

স্ত্রীকে দেখলো, আমার মায়ের সাথে আলাপ করলো; এমন কি রাতের খাবারও খেলো। তারপর রাত আটটার সময় হঠাৎ বলে উঠলো যে, তার বোনের বাসায় যাবে। আমরাতো অবাক। এ কী ব্যাপার এখন এই রাতের বেলা তাকে নিয়ে বেরিয়ে যাই কী করে। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা। সুতরাং রিকসা ডেকে তাকে নিয়ে রিকসায় উঠলাম। নিউ মার্কেটের কাছে আজিমপুর কলোনীর এক ফ্লাটে থাকে তার বোন ও ভগ্নিপতি। সেখানে তাকে পৌঁছে দিয়ে সেই রিকসাতেই আমি আবার বাসায় ফেরৎ গেলাম। কিন্তু ইতিমধ্যেই সায়িদার অবস্থা কাহিল। তার কালো মুখে আষাঢ়ের ঘনায়মান নিবিড় কালো মেঘ, গর্জনহীন বর্ষণের প্রতীক্ষায় তা ছলোছলো!

মনে মনে শহীদুল্লাহ সাহেবকে ধন্যবাদ জানালাম; কৃতজ্ঞতা জানালাম রওশন আরাকে। সে আমাকে স্বর্গ থেকে পতনের দুর্গতি হতে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্তি বোধ হয় আমি পাইনি। কারণ তার এই আবির্ভাব ও তিরোভাব আমার পারিবারিক জীবনে একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলো। অবশ্যি সে কথা এখনি বলার নয়।

ইতিমধ্যে একদিন আমার নুরু ভাই এসে উপস্থিত। তিনি কোনো কাজে ঢাকা এসেছিলেন। তাঁর দুশো টাকার দরকার। কিন্তু মাসের শেষ বলে আমার হাত তখন প্রায় খালি। তাই দুশো টাকা তখন আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব হয়নি। আমি গোটা পঞ্চাশেক টাকা দেবার কথা বলেছিলাম, তাতে তিনি নাকি খুবই রাগ করেছেন এবং মায়ের কাছে নানা ধরনের কথা বলে আমি একাডেমী থেকে ফেরার আগেই বিদায় হয়ে গেছেন।

আমি বাসায় ফিরে দেখলাম, মা আমার প্রতি রাগ করে বসে আছেন এবং আমি নুরু ভাইর কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কেঁদে ফেললেন। আমি জানি না, নুরু ভাই তাঁকে কী বলে গেছেন। কিন্তু তার কথায় নিশ্চয় এমন কিছু ছিলো, যাতে মা আহত হয়েছেন। এ কথা ঠিক যে, এক সময়ে আমরা নুরু ভাইদের অনেক খেয়েছি পরেছি। কিন্তু তাই বলে দুশো টাকা চাওয়া মাত্র না পেলে, সেই খোঁটা দিয়ে মাকে কাঁদাতে হবে, এ কেমন ব্যবহার।

এমনিতেই মায়ের শরীরটা কিছুদিন যাবত ভালো যাচ্ছিলো না। এর উপর নুরু ভাইয়ের এমনি কথাবার্তা তাঁকে আরও কাহিল করে তুললো। এর ফলে সায়িদার সাথেও তাঁর আগের স্নেহের ভাব যেন তিনি হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। সব দেখে শুনে আমার মন মেজাজ এতোটাই খারাপ হলো যে, আমি নুরু ভাইকে আমার জীবনের প্রথম এবং শেষ একটি কড়া চিঠি লিখলাম। তাতে টাকার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নিয়ে আমি কিছু কথা লিখেছিলাম। এতে অবশ্যি হিতে বিপরীতই হয়েছিলো।

যাহোক, আমার এই পারিবারিক জীবন ছিলো একান্তই নতুন। আমার ধারণা ছিলো এটি তার সহজ নিয়মেই এগিয়ে চলবে। কিন্তু নানা ধরনের প্রভাব ও বিশেষ ধরনের অভাব তার সহজ গতিকে ব্যাহত করে তুললো। আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি

যে, মা খালেক নামের চাকর ছেলেটিকে ঠিক তাঁর নাতির মতোই স্নেহ করতেন। এখানেই সেই অভাবের সূত্রপাত। আমি অনুবাদ আর একাডেমী নিয়ে ব্যাপৃত থাকায় এই অভাবের দিকটি তেমন তলিয়ে দেখিনি। এর ফলে মা-ই হয়তো সন্তান সম্পর্কে সায়িদার সম্মুখে কিছু বলে থাকবেন। যার ফলে সে তার অক্ষমতাজনিত হীনমন্যতায় ভুগতে আরম্ভ করলো। এর মধ্যে রওশন আরা ও নুরু ভাই এসে আরও জটিলতার সৃষ্টি করে গেলো।

আরও একটি দিক এর সাথে যুক্ত হয়েছিলো। আমার বাসাটির দু'পাশেই বিহারী পরিবারের বাসা। এদের সাথে মেলা মেশার খুব সহজ উপায় ছিলো না। তাই আমার মা ও স্ত্রীর অবস্থানগত দিকটি ছিলো অনেকটা কয়েদখানায় আটকে থাকার মতো। চারজনের জন্য রান্নার পর তাদের আর কী করার ছিলো! তবু আমি লক্ষ্য করলাম, আমার স্ত্রী পশ্চিমের পাশের উর্দুভাষী পরিবারটির সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করছে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় সেই পরিবারটিও সাড়া দিচ্ছে। একদিন আমার স্ত্রী বললো, 'আচ্ছা, রোশনি শব্দের অর্থ কী?'

আমি বললাম, 'কোথায় শুনেছো?'

'নওশাবার মা তার ছেলেকে রোশনি এনে দিতে বলেছিলো।'

আমি বললাম, 'লেখার কালিকে ওরা রোশনি বলে। মূলতঃ শব্দটার অর্থ আলো; সুভাষণে এমন বলা হয়।'

একদিন আমার স্ত্রী বললো, 'ওরা নাকি জমিদার ছিলো!'

আমি বললাম, 'সেখানে গৃহস্থকেই জমিদার বলে; জমি যার আছে, সেই জমিদার।'

বস্তুতঃ এমনি সব প্রশ্নের মধ্য দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার স্ত্রী এক অসাধ্য সাধনে রত হয়েছে। কিন্তু আমার মায়ের পক্ষেতো এভাবে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করা সম্ভব ছিলো না। তাই তাঁর মনে অপত্য স্নেহের অভাবটাই বড়ো হয়ে উঠলো।

অথচ আমি এই অভাব পূরণের কোনো উদ্যোগই নিচ্ছি না। সায়িদা এ পর্যন্ত পরপর তিনবার অসফল মাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছে। এরপর তার আর মাতৃত্বের কোনো সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে না। মনে পড়ে আমি একবার ঢাকায় আসার আগে ময়মনসিংহে এ ব্যাপারে ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। জব্বর আলী সাহেবের বাসায় থেকে সে রাতে স্ত্রীসহ *অলকা* সিনেমা হলে *বিধিলিপি* ছবিটিও দেখেছিলাম। কিন্তু ঢাকায় আসার পর তাকে নিয়ে আর কোথাও যাইনি। আমার এ প্রকার উদাসীনতার মূলে অবশ্যি কর্মব্যস্ততা ছিলো। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে দুধারী তলোয়ারের মতো। এতে আমার মা ও স্ত্রী উভয়ে আহত হয়েছেন।

মায়ের কথাতো শুনতে পাইনি। কারণ তিনি এমনিতেই স্বল্পভাষী; কোনো কথাই সহজে বলতে চাইতেন না। তাই আমার স্ত্রীর কাছেই শুনলাম যে, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কারণ সে কোনো সন্তানই দিতে পারছে না। তাই আমার আরেকটি বিয়ে

করা দরকার। সে তার বাপের বাড়িতেই চলে যাবে। এতোদিন যদি তার সেখানে চলে থাকে, তাহলে বাকি জীবনও সে চালিয়ে দিতে পারবে। সুতরাং তাকে খরিচা দিয়ে না এলে সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

দারুণ রাগে কাঁদতে কাঁদতে আরও অনেক কথাই বললো সে। মনে হলো, অনেক দিনের অনেক কথাই জমিয়ে রেখে সে আজ একটা হেস্ত নেস্ত করতে চায়। তার এই পাগলামি আমার সহ্য হলো না, আমি তাকে বেশ জোরেই কয়েকটা থাপ্পড় মারলাম। এর ফলে সে সত্যিই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বাসার পিছনের দরজা খুলে এগিয়ে গেলো। অনেক কষ্টে তাকে ফিরিয়ে আনলাম। কিন্তু আমি অবাক হলাম যে, মা আমাকে ফিরাতে এলেন না, এমন কি কিছু বললেনও না। সে জন্যই রাত্রে আমার স্ত্রীকে কিছু খাওয়াতে পারলাম না। অথচ মাকে যে কিছু বলবো, সে সাহসও আমার নেই।

আমার সমস্ত চেতনা কেমন অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। আজতো আমি বাসায় আছি, আমি যখন একাডেমীতে থাকবো, তখন যদি সে পাগলামি করে কিছু একটা করে বসে, তাহলে কে দেখবে! মায়ের যদি দেখার ইচ্ছা থাকতো, তাহলে তো আজই দেখতেন। কাজেই পরদিন ভোরের গাড়িতেই আমি সায়িদাকে নিয়ে খরিচা রওনা হয়ে গেলাম। মা একা চাকর ছেলেটাকে নিয়ে বাসাতে রইলেন। অবশ্যি রাতেই আমি ফিরে এলাম।

মা বোধ হয়, এতোটা আশা করেননি। তাই আমাকে তিনি বৌমা সম্পর্কে কোনো কথাই বলতে পারলেন না। আমিও মাকে কিছু বলতে গেলাম না। কারণ সায়িদাকে এভাবে রেখে আসাটা আমার জন্য খুব সহজ ব্যাপার ছিলো না। জানি না, মা কতোটা উপ .ব্ধি করতে পেরেছিলেন! সম্ভবতঃ সে কারণেই দু'দিন পরে আমার ভগ্নিপতি এলে তিনি জোর করেই তার সাথে তাদের বাড়িতে চলে গেলেন। এভাবে আমার ছোট সংসারটি অকালে ভেঙে যাবার উপক্রম হলো। বাসায় আমি আর চাকর ছেলেটাই শুধু অবশিষ্ট রইলাম।

কিন্তু এ কেমন হলো, কার দোষে এমন বিপর্যয় এসে দেখা দিলো? দোষ অবশ্যি আমার। আমাকে অনুবাদের নেশায় পেয়ে না বসলে পরিস্থিতি এমন জটিল হবার সুযোগ পেতো না। আমি যাদেরকে এনে একত্র করেছিলাম, তাদের মন মানস সুস্থ রাখার কোনো আয়োজন আমি করতে পারিনি। শুধুমাত্র একটি সন্তানের অভাবেই আমার সাজানো সংসার ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সন্তান তাড়াতাড়ি পাবার জন্য আমি কি আবার বিয়ে করতে পারি? অবশ্যি না। সায়িদা নিজে, আমার মা; এমন কি আমার শ্বশুর বাড়ির তাঁরাও যদি এমন কিছু ভেবে থাকেন তাহলে খুবই ভুল করেছেন। কারণ সায়িদাকে বাদ দিয়ে আমি কিছুতেই সুখী হতে পারবো না। একটি মেয়ের পক্ষে যা কিছু দেবার আছে, সবইতো সে আমাকে দিয়েছে। এবারতো আমারই দেবার পালা। তা না হলে আমি যে চরম অকৃতজ্ঞ হয়ে যাবো!

কোথায় গেলো আমার অনুবাদের নেশা; এমনকি একাডেমীর কাজের একাগ্রতাও আমি হারিয়ে ফেললাম, সুতরাং পরবর্তী শনিবারেই আমি খরিচা গিয়ে পৌঁছলাম। খুব

বেগ পেতে হলো সায়িদাকে বুঝাতে। তবু আমি ধৈর্য হারা হলাম না। বড়ো ভাইয়ের সাথে সবকিছু খুলে বলতে হলো। তিনিও বুঝালেন, নানা কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে পরদিন ঢাকা ফিরে আসতে পারলাম। সায়িদা নিজেও এর মাধ্যমে তার গুরুত্ব ও আমার আন্তরিকতা বুঝতে পারলো।

দাম্পত্য জীবনের এই দিকটিই বড়ো মারাত্মক। এর ফলে ভুল বুঝাবুঝি অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যা স্বামী-স্ত্রী কারোরই কাম্য নয়। অথচ তারা তারই শিকারে পরিণত হয়। আমি হতভাগা একবারের বদল দু'বার বিয়ে করেছি, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা করারই সুযোগ পাইনি। কারণ তখন এ প্রশ্নটি এমনভাবে দেখাই দেয়নি। আমি আর সায়িদাতো বলতে গেলে একই পরিবারের। নিতান্ত বালিকা বয়স থেকেই সে আমাকে জানে, সে আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানেই বুঝি এই গুরুত্বহীনতার বীজও উপ্ত হয়ে ছিলো। কারণ তার সাথেই আমার বিয়ে হবার কথা। কিন্তু রূপের বেলাতে তাকে এড়িয়ে তার বড়ো বোনকে করলাম। আর এখনোতো আমি শিক্ষার লোভে তাকে এড়িয়ে অন্যকে বিয়ে করতে পারি। এ জন্যই তাকে নিয়ে বাইরে যাবার আমার সময় হয় না। কিন্তু সে যদি রওশন আরার মতো শিক্ষিত হতো, তা হলে কি আমি এমনভাবে অনুবাদ নিয়ে বসে থাকতে পারতাম। মনে হলো, তার এই ধারণা সৃষ্টির জন্য আমিই দায়ী।

তাই ঢাকা ফিরে পরদিনই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। জহুরা কাজী তখন গাইনীতে বেশ নাম করেছেন, তাঁকেই দেখালাম। কিন্তু রক্ত প্রশ্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়েও অকাল প্রসবের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেলো না। সবই ঠিক আছে, সন্তান সম্ভাবনার পথে কোনো বাধা নেই। সুতরাং অহেতুক দুশ্চিন্তারও কোনো কারণ নেই। তাই আমার পক্ষে আমার স্ত্রীকে আরও সহজ করে তোলা সম্ভব হলো। আমি তাকে অন্ততঃ এটুকু বুঝাতে পারলাম যে, উচ্চ শিক্ষার আমার দরকার নেই; তাকে নিয়েই আমি জীবন কাটিয়ে দিতে পারবো।

এর ফলে সে আমার সাথে বাইরে যাবার সংকোচ অনেক খানিই কাটিয়ে উঠতে পারলো। একদিন তাকে নিয়ে গেলাম রওশন আরার বাসায়। সে এখন ধানমণ্ডিতে একটি বাসা ভাড়া নিয়েছে। রওশন আরাও তাকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করলো। সব চাইতে বেশি সমাদর পেলো সে রাজ্জাক সাহেবের বাসায়। আমার সহকর্মী রাজ্জাক সাহেবতো তাকে বোনই বানিয়ে ফেললেন। সেও তাঁর স্ত্রীকে ভাবী ডেকে খুশি হয়ে উঠলো। এভাবে মেলামেশার ফলে সে বুঝতে পারলো যে, তাকে কেউই তুচ্ছ ভাবছে না; বরং সকলেই আমার যোগ্য সহধর্মিনী হিসেবেই গ্রহণ করছে।

তার এই সংকোচ ও জড়তা ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেব একদিন বাসায় এসে আরও ভেঙে দিলেন। আমি আমার স্ত্রীর আবদার হিসেবেই একদিন তাঁকে আমার বাসায় আসতে বলেছিলাম। তিনি শুনে খুব উৎসাহের সাথেই সে আবদার রক্ষা করলেন। আমার দোতলায় উঠার সিঁড়ি দিয়ে বেশ কষ্ট করে উপরে উঠলেন এবং চেয়ার টেবিল

এড়িয়ে একটি মোড়ায় বসে আমাদেরকে অবাক করে দিলেন। আমার স্ত্রী তাঁকে কদম বুছি করায় খুশি হয়ে বললেন, 'বেঁচে থাকো, মা!'

সায়িদা হঠাৎ বলে ফেললো, 'আমি ভেবেছিলাম আপনাকে নানা বলে ডাকবো।'

তিনি হেসেই বললেন, 'আমার স্ত্রী ছাড়া দুনিয়ার সব মেয়ে মানুষই আমার মা। তাই বলে আমি ছাড়া সব পুরুষই আমার বাবা নয়; আমার বাবা একজনই!'

এভাবেই হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে তাঁদের আলাপ জমে উঠলো। আমি অদূরে দাঁড়িয়ে তাঁদের এমনি রসালাপ উপভোগ করছিলাম। অবাক কাণ্ড, সায়িদা তাঁর সংসারের কথা, ছেলেমেয়ের কথা অবলীলা ক্রমে জিজ্ঞাসা করলো এবং তিনিও উত্তর দিলেন। আমি শুধু ভাবছিলাম, এতোটা নিঃসংকোচ সে হতে পারলো কী করে! আসলে শহীদুল্লাহ সাহেবের ব্যবহারের মধ্যেই এমন একটা সহজ ভাব ছিলো, যা তাকে সহজ হতে সাহায্য করেছে। কিন্তু যখন তিনি তার হাত, নাক খালি কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে লজ্জা পেলো। আমি বললাম, 'সেতো অলংকার পরে না!'

এবার তিনি তাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু এবারও সে কোনো কথা বলতে পারলো না। আমাকেই উত্তর দিতে হলো, বললাম, 'প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছিলো, কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আর পড়তে পারেনি।'

তিনি তার দিকে চেয়েই বললেন, 'না, না, তা কী করে হয়; তোমার ঘরে বিদ্যার জাহাজ আর তুমি পিছে পড়ে থাকবে, তাতো হয় না! তুমি লেখা পড়া করো।'

কথাগুলি তিনি এমন সহজভাবে বললেন যে, আমার স্ত্রী অভিভূত হয়ে গেলো। সে পুনরায় তাঁর কদম বুছি করলো। তিনিও তাকে দোয়া করলেন।

এরপর আমার স্ত্রীর লেখাপড়া নিয়েই আমার সাথে কথাবার্তা হলো। আমি যে তাকে ক্লাস সিক্সের বই কিনে দিয়ে সে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে লজ্জার জন্য স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি, সে কথাও তাঁকে জানালাম। সায়িদা ইতিমধ্যে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তিনি প্রায় কিছুই খেলেন না এবং এক সময় সায়িদার মাথায় হাত রেখে দোয়া করে বিদায় নিলেন। অদ্ভুত লাগলো তাঁর এই উদার অমায়িকতা!

এর ফলে সায়িদা আরও সহজ, আরও সংকোচ মুক্ত হতে পারলো। তার বিশ্বাস জন্মে গেলো যে, সত্যিই উচ্চ শিক্ষার অভাব তাকে তুচ্ছ করে তুলেনি। তাহলে শহীদুল্লাহ সাহেবের মতো লোক তাকে এতোটা স্নেহের সাথে গ্রহণ করতে পারতেন না। এমনি ভাবে নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করার ফলে সে মা'র সম্পর্কেও আমাকে তাগাদা করতে আরম্ভ করলো। কারণ সেই যে তিনি আমার বোনের ওখানে গিয়েছিলেন, আর ফিরে আসেননি। কিছুটা রাগ করেই তিনি গিয়েছেন। মনে হয়েছে, বৌকে তাড়িয়ে তিনি আমার সংসারে থাকতে চাননি। কিন্তু এদিকে বৌয়ের অবস্থা এখন এমন যে, মনে হচ্ছে, সে-ই বুঝি শ্বাশুড়ীকে তাড়িয়েছে!

এমনিই হয়; আত্মবিশ্বাসের অভাবে যখন দুর্বলতা দেখা দেয়, তখন সংকীর্ণতার মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই দুর্বলের পক্ষে উদার হওয়া কিছুতেই

সম্ভব নয়। একমাত্র শক্তিমানই উদার হতে পারে। এই-ই ব্যক্তির যেমন, তেমনি সমাজের নিয়ম। সেই নিয়মের আবর্তন আমার স্ত্রীর মধ্যেও আমি লক্ষ্য করলাম।

কিন্তু তার তাগাদা সত্ত্বেও খুব তাড়াতাড়ি আমার পক্ষে মাকে আনতে যাওয়া সম্ভব হলো না। কারণ ঈদের পরবেও আমিও আমার স্ত্রী কোথাও যাইনি। চাকর ছেলেটাও বাড়ি চলে গেছে। বাসায় আমরা দু'জন মাত্র। ঈদের দিন পোলাও কোরমা রাঁধার মহড়া দিচ্ছি আমরা। পোলাওটা ভালোই হয়েছিলো, কিন্তু কোরমায় বেশি দই দেবার ফলে টক হয়ে গেছে। তবে খেতে খুব একটা খারাপ লাগেনি। আনন্দের খাওয়াতো!

সুতরাং মাকে আনতে যাবার যখন আমার সময় হলো, তখন আরও একটি সুসংবাদ আমি বহন করে নিয়ে যেতে পারলাম। আর এ ব্যাপারে প্রশ্রাব পরীক্ষা করাতে গিয়ে ডাঃ ওয়াদুদের খপ্পরে পড়ে গেলাম। তিনি আমাকে প্রশ্রাব পরীক্ষার রিপোর্ট দেবার বদলে মানব দেহে রক্ত ও পানির অবস্থান ও ক্রিয়াকর্ম বুঝাতে আরম্ভ করলেন। যাহোক, শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই সুসংবাদটি পেলাম যে, আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।

একটি সম্ভাবনার সংবাদ মাত্র। কিন্তু এই সম্ভাবনাই আমার নিরানন্দ সংসারকে আনন্দময় করে তুললো। এই সংবাদ শুনে আমার শ্বাশুড়ী এসে উপস্থিত হলেন। সুতরাং তাঁকে বাসায় রেখে আমি মাকে আনতে গেলাম। কিন্তু বড়ো খালাদের ওখানে গিয়েই পড়লাম বিপদে। নুরু ভাইকে লেখা আমার কড়া চিঠির প্রতিক্রিয়া এবার বুঝতে পারলাম। বড়ো খালা বেশ কিছুটা রাগ দেখিয়েই আমার হাতে কয়েকটি টাকা তুলে দিলেন। এ টাকা সেই বাস্তায় থাকার সময় আমার আমানত রাখা টাকা। চিঠির মধ্যে বুঝি এ কথাটিও আমি উল্লেখ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এখন প্রায় দেড় যুগ পরে সেই টাকা দিয়ে আমি কী করবো! শুধু দুঃখই পেলাম; কোনো কিছু বলতে পারলাম না।

যাহোক, মাকে নিয়ে ফিরে এলাম ঢাকায়। আমার ক্ষুদ্র সংসার আবার এগিয়ে চললো। আমি আবার নিরুদ্বেগে অনুবাদের কাজে মন দিতে পারলাম। আনোয়ারে সুহায়লীর অনুবাদ কর্মটি এবার শেষ হলো। আমি নাম দিয়েছিলাম, 'অনেক তারার হাতছানি'। কিন্তু সৈয়দ আলী আহসান সাহেব এই কাব্যিক নামটি পছন্দ করলেন না। গদ্য পুস্তকের একটি গদ্য নাম হলেই ভালো হয়। শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে অনুবাদটির নাম রাখা হলো, 'কালিলা ও দিমনা'। এ নামে আরবি ভাষায় একটি গ্রন্থ আছে। মূলতঃ আমার অনূদিত ফারসি গ্রন্থটির গল্পগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে নেয়া। এটি প্রথম পাহলবী ভাষায় রূপান্তরিত করেন পারস্য সম্রাট নও শেরোয়াঁর সময় 'বরজন মেহের'। সেখান থেকে অষ্টম শতাব্দীতে ইবনে মুকাফফা আরবিতে ভাষান্তরিত করেন। পরে চতুর্দশ শতাব্দীতে হাসান ওয়াজেদ নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি এই গল্পগুলি অবলম্বন করে ফারসি ভাষায় আনোয়ারে সুহায়ালী গ্রন্থটি রচনা করেন। এর প্রথমেই কালিলা ও দিমনা নামের দুটি শৃগালের গল্প আছে। সুতরাং এই বাংলা অনুবাদটি এই নামেই বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছিলো।

ইতিমধ্যে আমাদের শব্দ বাছাইয়ের কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং তা বর্ণানুক্রমিক সাজানোর জন্য কার্ডে লেখা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বপাকিস্তানি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের শব্দ সংগ্রহের কাজটি খুব সুচারুরূপে করা হয়নি। এর ফলে সংগৃহীত বহু শব্দই অনাঞ্চলিক বিধায় বাদ দিতে হচ্ছে।

এ সময়ে তাই একাডেমী, সংসার ও অনুবাদ এমনভাবে আবৃত করে রেখেছিলো যে, তৎকালের বাইরে ঘটনাবলী আমার স্মৃতিতে খুব একটা ঠাঁই পায়নি। শুধু রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে *আজাদ ইত্তেফাকের* ঝগড়ার কথাই তখন বিশেষভাবে মনে পড়ছে। কারণ এ বিষয়টি ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো। এই ঝগড়া সম্পর্কে শহীদুল্লাহ সাহেবের একটি মন্তব্য তখন আমার চেতনায় খুবই নাড়া দিয়েছিলো।

শহীদুল্লাহ সাহেব যে রুমটিতে বসতেন, সেখানে একটি ইজি চেয়ার ছিলো। দুপুরের আহারের পর তিনি সেই চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজটি পড়তে পড়তে কিঞ্চিৎ তন্দ্রা উপভোগ করতেন। আমরা তখন রুমে থাকলে বেশ সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলতাম। সেদিন আমি ও আমার এক সহকর্মী খুব নিম্নস্বরে আজাদ ইত্তেফাকের ঝগড়া নিয়ে কথা বলছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ইজি চেয়ারের উপরে মেলানো খবরের কাগজটি নড়ে উঠেছে এবং আমরা ডক্টর সাহেবের ঘুম নষ্ট করে দেল[illegible] অপরাধে শংকিত হয়ে উঠেছি। কিন্তু তিনি অম্লান বদনে আমাদের [illegible] দূর করে বললেন, 'তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি। দেখোতো আশে পাশে কেউ আছে কিনা; না থাকলে তোমাদেরকে একটা কথা বলি।'

আমরা এদিক-সেদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে বললাম, 'না, কেউ নেই।'

তখন তিনি বললেন, 'দেখো, আমরা সাধারণভাবে মানুষের মুখ দেখলেই চিনতে পারি। কিন্তু কিছু লোক আছে, তারা মুখ দেখে সন্তুষ্ট নয়; তারা কাপড় তুলে পিছনের দিকটাও দেখতে চায়। এতেও বুঝি তাদের তৃপ্তি হয় না, তাই তারা সেখানে শুঁকে দেখে গন্ধ আছে কি না। বুঝলে কিনা, ওখানে সবারই গন্ধ আছে, এমন কি শহীদুল্লাহরও।'

আমরা তাঁর এই মন্তব্য শুনে অবাক হয়েছিলাম। কারণ ইত্তেফাক শত চেষ্টা করেও রবীন্দ্র বিরোধীদের এমন দাঁত ভাঙা জবাব দিতে পারেনি। অবশ্যি সেই সাথে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, তিনি সতর্কতার সাথে আমাদের কাছে এ মন্তব্য তুলে ধরলেও এ নিয়ে পত্র পত্রিকায় কিছু লিখেননি। শহীদুল্লাহ সাহেব এ সব ব্যাপারে কেন জানি নিষ্ক্রিয় ছিলেন।

অবশ্য এই নিষ্ক্রিয়তা আমার মধ্যেও জন্মেছিলো। তা না হলে এ ব্যাপারে সামান্য এই ঘরোয়া উত্তাপ ছাড়া আর কিছুই আমার চেতনায় ধারণ করতে পারিনি। এমনকি, তৎকালের শিক্ষা আন্দোলন তো, বলতে গেলে, আমার অফিসের সামনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সতেরোই সেপ্টেম্বর আমার স্মৃতিকে তেমন কোনো সক্রিয়তায় ভরিয়ে

দিতে পারেনি। এর কারণ আমি আবার পারিবারিক জটিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। যে সম্ভাবনা আমার সংসারকে আবার আনন্দময় করে তুলেছিলো, সেটাই লোপ পাবার উপক্রম হলো; সায়িদার পাঁচ মাসের সেই ফাঁড়া আবার এসে দেখা দিলো।

সেদিন রোববার। দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ মা আমাকে জাগিয়ে বললেন যে, সায়িদার পেটে খুব ব্যথা; খুব ছটফট করছে। আমি মুখ ধুয়েই বেরিয়ে পড়লাম। গেলাম জহুরা কাজীর কাছে। কারণ এ ধরনের কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, তাঁকে খবর দেয়ার কথা ছিলো; কিন্তু পেলাম না। অগত্যা আরও কোনো ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় কি না, তারও খোঁজ নিলাম। কিন্তু রোববারের বিশ্রাম দিবস সবাইকে আমার নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে। আমি বিফল মনোরথ হয়ে বাসায় ফিরে এলাম। এখন সায়িদার রক্তপাত আরম্ভ হয়ে গেছে। খুব বেশি না হলেও লক্ষণ খারাপ।

আমারও মাথা খারাপ হবার যোগাড়। কী যে করি, কিছুই বুঝতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলাম। নিয়ে গেলাম ইমারজেন্সীতে। কিন্তু কোনো ডাক্তারের দেখা নেই। নিরূপায় হয়ে বসে রইলাম কতোক্ষণ। নার্সরা আমার কোনো সাহায্যই করতে পারলো না। তারা ভর্তি করিয়ে রেখে যেতে বললো। কিন্তু এ কোথায় ফেলে যাবো স্ত্রীকে! না, যদি কিছু হয়, বাসাতেই সবার সামনে হোক; সেখানে অন্ততঃ সেবাটা পাবে। তাই আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম।

এমনিভাবে ঘোরাফেরা করতে করতে রাত প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেলো। লাভ কিছুই হলো না; সায়িদা আরও কাহিল হয়ে পড়লো। সব আশা ছেড়ে দিয়ে যখন চিৎকার করে কাঁদবার ইচ্ছা হচ্ছে, তখন আমার প্রতিবেশী হাজী সাহেব এসে ডাকলেন আমাকে। আমার এখানে বারবার এ্যাম্বুলেন্স আসায় জিজ্ঞাসা করলেন এবং সবশুনে রাগ করে বললেন, 'কিছু করতে পারেননি, সেটাতো আমাদের বলবেন; আসুন আমার সাথে।'

আমার এই প্রতিবেশীর নাম আতাউর রহমান। ব্যবসায়ী, সম্প্রতি হজ্ব করে এসেছেন। আমার বাসার সামনের সড়কের ও পাশেই তাঁর বাসা। আমি দোতলার যে রুমটিতে বসে অনুবাদের কাজ করি, সেখান থেকে তাঁর দোতলার বারান্দা দেখা যায়। মাঝে মাঝেই তিনি সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলেছেন এবং প্রতিবেশীর প্রতি আমার নির্লিপ্ত ভাব দূর করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমি খুব একটা উৎসাহিত হইনি। সুতরাং আমার বিপদের কথা তাঁর কাছে বলবার মতো অন্তরঙ্গতা জন্মায়নি।

কাজেই তাঁর এই অযাচিত আগমন ও ভর্ৎসনায় আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। তাঁর পিছুপিছু গিয়ে পৌঁছলাম হাফেজ মুসার দরবারে। তিনিই এই মহল্লার সর্দার। রাত তখন সাড়ে এগারোটার মতো। দরবার ভেঙে গেলেও তিনি কয়েকজনের সাথে চাদর

বিছানো ঢালাও বিছানার উপর বসে আছেন। হাজী সাহেব আমার পরিচয় দিয়ে আমার বিপদের কথা বললেন। তিনি শুনে সামান্যক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর ফোনটা টেনে নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কী, শুয়ে পড়েছে ? তাহলেও বলুন তাঁকে, আমি হাফেজ মুসা তাঁকে একটি জরুরি ব্যাপারে তলব করছি। এরপর কিছুক্ষণ নীরব। হাফেজ সাহেব ফোন ধরেই আছেন। আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। এই দুপুর রাতে! তা কী করবো বলুন, এদিকে আমার মেয়ের অবস্থা যে শোচনীয়। কী বললেন, আপনার গাড়ির সোফার চলে গেছে, তাতে কী হয়েছে, আমি এখনি গাড়ি পাঠাচ্ছি। আপনি দয়া করে তৈরি হয়ে থাকুন।

আমি এতোটা অভিভূত হয়েছি যে, কোনো কথাই বলতে পারলাম না। প্রতিবেশী হাজী সাহেবের পিছু পিছু দরবার থেকে বেরিয়ে এলাম। হাজী সাহেব নিজের গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করলেন। তাঁর গাড়ির সোফারও চলে গেছে। তাই তিনি নিজেই আমাকে নিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করে এগিয়ে গেলেন। যাবার বেলা দেখলাম। হাজী সাহেবের স্ত্রীও আমার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কী অদ্ভুত এঁদের এই মানবিক আন্তরিকতা!

আমরা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে ডাঃ আলতাফুন্নেসার বাসায় গিয়ে দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সুতরাং তাঁকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়িই আমরা ফিরতে পারলাম। সায়িদার রক্তস্রাব তখন বেশ বেড়েছে এবং বেদনায় সে অনবরত কাৎরাচ্ছে। ডাক্তার সাহেবা তাকে দেখে একটা ইনজেকশান দিলেন এবং কিছু ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল দিয়ে খাওয়াতে বললেন। আবার গাড়িতে উঠলেন তিনি। আসার সময় দেখেছিলাম, হাফেজ মুসা তাঁর বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; অবাক কাণ্ড, যাবার বেলাও দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ি থামিয়ে রোগিনীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তার সাহেবা অবশ্যি আমাকেও বলেছিলেন যে, এমনিতে ভয়ের তেমন কিছু নেই; তবে রোগিনীর জ্বর যদি দুই ডিগ্রির উপরে উঠে যায়, তা হলে সন্তানটি নষ্ট হয়ে যাবে মাত্র, আর কিছু হবে না। যাই হোক,পরদিন তাঁকে জানাতে বললেন। এরপর আমরা মিটফোর্ড হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার সাহেবাকে তাঁর বাসায় পৌঁছে দিলাম।

পরদিন সায়িদার অবস্থা ক্রমশঃ ভালোই হয়ে উঠলো। আমি যথা সময়ে সে সংবাদ ডাঃ সাহেবাকে জানালাম। কিন্তু ভিজিট তিনি কিছুতেই নিলেন না। কারণ হাফেজ মুসার কাছে এমনিতেই তিনি ঋণী। শেষ পর্যন্ত ওষুধের দাম হিসেবে মাত্র পঁচিশটি টাকা আমি তাঁকে গছাতে পারলাম। তাও হাফেজ সাহেব যাতে জানতে না পারেন, তার আশ্বাস দিতে হলো। এভাবেই এই স্বল্প শিক্ষিত হৃদয়বান প্রতিবেশীদের অযাচিত সহায়তায় সায়িদা তার পাঁচমাসের গর্ভপাতের ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হলো।

আমি তাঁদের এই মানবিক ঐশ্বর্যের প্রতি কোন্ ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো! তাঁদের অযাচিত সহায়তা আমার পরিবারে ও আমার জীবনে এক অদ্ভুত কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রতিবেশীর প্রতি আমার আগ্রহকে তাঁরা এক নতুন মানবিক আবেগে ভরে দিয়েছেন। আজ তাঁরা কেউই নেই কিন্তু এক অর্থে তাঁরাও আমার শিক্ষক!

মানুষের সমাজে কিসের প্রয়োজন সবচাইতে বেশি; ঐশ্বর্যের? মনষ্যত্বের পরিচয় কিসে সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে; ধনাঢ্যতায়, পাণ্ডিত্যে, না বীর্যবত্তায়? আমারতো মনে হয়, মানুষ মানুষকে সবচেয়ে বেশি দর্শনীয় আকর্ষণীয় করে যা দিতে পারে, তা হলো এই স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধার পরশ! এই পরশেই মনুষ্যত্বের লোহা সোনায় পরিণত হয়। হাজী সাহেব ও হাফেজ সাহেবের আচরণের মধ্যে সেই পরশেরই সাক্ষাত আমি পেয়েছিলাম। পরে জেনেছি, রাজনৈতিক পর্যায়ে তাঁরা উভয়েই ছিলেন আওয়ামী লীগের সদস্য। কিন্তু তাঁদের আচরণ সেই শাশ্বত মানবিক গুণে পরিপূর্ণ, যার স্পর্শ না পেলে রাজনীতি ও সাহিত্য সংস্কৃতি কোনোটাই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে না।

যাক সে কথা। তাঁদের সহায়তায় সায়িদা তার ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলেও শারীরিকভাবে খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলো। তাই প্রিনেটাল কেয়ারের জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে হোলি ফ্যামিলী হাসপাতালের আউট ডোরে নিয়ে গেলাম। সেখানে এ ব্যাপারে খুব ভালো একটা ব্যবস্থা ছিলো। তাদের খাতায় নাম লিখিয়ে সায়িদা মাসে অন্ততঃ একবার সেখানে গিয়েছে এবং তাদের নির্দেশে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র খেয়েছে। মাও দেখলাম সায়িদার প্রতি খুবই স্নেহ প্রবণ হয়ে উঠেছেন। তাকে কোনো কাজেই লাগতে দেন না। সুতরাং তার শরীর অল্প দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠলো।

এ সময়ে আমি অনুবাদের আরও একটি কাজ করে ফেললাম। ভাষাতত্ত্বের উপর লেখা একটি ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ 'আইন আদালতে ভাষা' নামে তখনকার বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। এমনিভাবে বাংলা একাডেমীর প্রথম দিকে আমার আত্মপ্রকাশের মৌলিক কোনো উদ্যোগ আমি গ্রহণ করতে পারিনি। যখন সুযোগ দেখা দিতে পারতো, তখনও এই অনুবাদই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে।

এমনি ভুলিয়ে রাখার ব্যাপারে আমার প্রথম সন্তানের সম্ভাবনাও কম উত্তেজক ছিলো না! কারণ এর আগে আরও তিনবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, তার উত্তেজনা এমন দর্শনীয়ভাবে দেখা দেয়নি; সর্বোপরি এমন আকর্ষণীয়ভাবে প্রয়োজনীয়ও হয়ে উঠেনি। সুতরাং আমরা সবাই সেই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছিলাম, যখন আমাদের সকলের আশা একটি সন্তানরূপে বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে।

এলো সেই মুহূর্ত! তিষট্টি সালের এগারোই এপ্রিল বিকালেই আমি রিকসা করে সায়িদাকে নিয়ে হোলি ফ্যামিলী হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আগে থেকেই

হাসপাতালের কেয়ারে থাকায় ভর্তি করাতে কোনো অসুবিধাই হলো না। কিন্তু নার্সদের বলা সত্ত্বেও আমি বাসায় আসতে পারলাম না! অথচ সায়িদার কাছেও আমাকে যেতে দেয়া হলো না। আমি বারান্দাতেই বসে রইলাম। হোলি ফ্যামিলীতে ঐ দিন ছিলো গুড ফ্রাইডের অনুষ্ঠান। আমি বসে বসে গীর্জায় সেই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক দেখে সময় কাটিয়ে দিলাম। মনের কোণে দুশ্চিন্তার একটা কালো রেখা ঘোরা-ফেরা করলেও শুভ শুক্রবারের মোমের আলোতে তা অনেকখানি হালকা বলে মনে হলো। সেই সাথে একটি অদ্ভুত উত্তেজনা আমাকে জাগিয়ে রাখলো।

রাত তিনটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আমার প্রথম পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো।

দ্বিতীয় তরঙ্গ ॥

একটি মানব শিশু-বালক কিশোরের জীবনে পারিবারিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা এবং তার প্রভাব ও অভাব নিয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ইতিপূর্বে আমি কিছু কথা বলবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শিশুও কীভাবে একটি পরিবারকে নতুন উত্তেজনায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারে, তা আমার প্রথম পুত্রের জন্মের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম। পিতা হিসেবে সে রাতে হোলি ফ্যামিলী হাসপাতালের বারান্দায় বসে থেকে আমি যে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা অনুভব করেছি, তাওতো এই আগত প্রায় শিশুই আমার মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো। মাতার অনুভূতির সাথে পিতার এ অনুভূতির হয়তো পার্থক্য আছে; তবু কী এক অনাবিল স্নেহের আকর্ষণই না সে রাতে পিতার দু'চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো!

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর যথা সময়ে একজন নার্স এসে আমাকে সংবাদটি দিলো। কিন্তু না সন্তান না প্রসূতি কাউকেই সেই মুহূর্তে দেখার সম্ভাবনা ছিলো না। কারণ তাদেরকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে এই গভীর রাতে প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং ভোরের আলো ফুটে বেরুতেই আমিও হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক খানি রাস্তা হেঁটে এসে একটি রিকসা পেলাম এবং সূর্য উঠার আগেই বাসায় পৌঁছে গেলাম। আমার মা আর আম্মা দু'জনেই এখন উঠে গেছেন। এই ভোর বেলার সুসংবাদ তাঁদেরকে আনন্দিত করে তুললো!

নাশতা খেয়ে বেরুতে বেরুতে নয়টা বেজে গেলো। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছে খুব সহজে দেখার সুযোগ পেলাম না। কারণ তখন দেখার সময় নয়। মা ও আম্মা দু'জনেই সাথে গেছেন, সুতরাং ব্যাপারটির গুরুত্ব আমি ডিউটি অফিসারকে বুঝাতে পারলাম। শেষ পর্যন্ত বারান্দা থেকে দেখার অনুমতি মিললো। প্রথমেই সন্তান দেখতে গেলাম। প্রসূতির নম্বর দেয়ার পর ডিউটি নার্স একটি দোলনা থেকে কাপড়ে জড়ানো আমার পুত্রকে নিয়ে এলো। জানালার পাশে এনে মুখটি দেখালো। দিব্বি ঘুমিয়ে আছে। মা সাথে করে সামান্য মধু নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নার্স তা মুখে দেবার অনুমতি দিলো না। কারণ বাইরের কোনো কিছুই এখন দেয়া যাবে না। আম্মা ঠাট্টা করে বললেন, 'মুখে মধু না দিলে যে কথা মিষ্টি হবে না।'

নার্সটি এ কথা শুনে হাসলো, বললো, 'দিলেও মিষ্টি হবে না। যে জোরে কাঁদে, তা শুনেই বুঝা যায়, খুব এক গুয়ে হবে, সবাইকে জ্বালাবে!'

দেখে কিন্তু তা মনে হয় না, খুব ভালো মানুষের বাচ্চার মতোই ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেই ঘুমও দেখা গেলো না। ঘুম ভেঙে যাবে বলে নার্সটি তাড়াতাড়ি দোলনায় নিয়ে শুইয়ে দিলো। সায়িদাকেও আমরা বারান্দা থেকেই দেখলাম। ঘুমিয়ে

আছে। বিকালে হয়তো কাছে যাওয়া যাবে। তাই অপেক্ষা না করে আমরা বাসায় ফিরে গেলাম। দুপুরেই কিছু মিষ্টি কিনে হাজী সাহেব ও হাফেজ সাহেবের বাসায় পাঠিয়ে দিলাম।

বিকালে গিয়ে দেখি সায়িদা এখনও কিছুটা বেদনা বোধ করছে। একেতো প্রসবের সময় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো, তদুপরি সামান্য সেলাই লেগেছে। কারণ বাচ্চার ওজন হয়েছে সাড়ে সাত পাউন্ড। সেই যে মা তাকে অত্যধিক স্নেহে কোনো কাজে হাত না দেবার আরাম করে দিয়েছিলেন, তারই ফলে সে প্রসবকালে ভুগেছে এবং এখনও ভুগছে। তবু এরই মাঝে তার মুখে একটা অদ্ভুত তৃপ্তির হাঁসি। একমাত্র মায়ের মুখেই এমন হাসি দেখা যায়।

পরিদন একাডেমীতে গেলাম। আমি যাবার আগেই সেখানে সন্তানের খবর পৌঁছে গিয়েছিলো। সুতরাং অন্তরঙ্গ পরিবেশে একটা সহাস্য অভ্যর্থনাই পেলাম। তবু শহীদুল্লাহ সাহেবকে এই শুভ সংবাদটি জানাতে হলো। তিনি শুনেই নবজাতকের নাম নিয়ে পড়লেন। প্রথমেই বললেন গোলাম রাব্বানী। আমি এটি আমার বড়ো ভাইয়ের নাম বলায় তিনি এবার বললেন গোলাম ইয়াজদানী। হ্যাঁ, এটি রাখা যায়, তাই হল, এভাবেই আমার প্রথম পুত্রের ঐতিহ্যবাহী নামকরণ ঘটে গেলো। নামকরণে মাতৃভাষার অনুপস্থিতি নিয়ে ইতিপূর্বে যে ক্ষোভ আমি ব্যক্ত করেছিলাম, তা আমার মধ্যে একটি ক্ষোভ হয়েই রইলো; নিজ পুত্র কন্যার নামকরণের মাধ্যমে সেই ক্ষোভ দূর করার কোনো প্রচেষ্টাই আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। কারণ পরবর্তী নামকরণ এই ধারাই অনুসরণ করেছে।

তবু একটি ডাক নামতো দরকার। সেখানে আমি অবশ্যি মাতৃভাষাকে স্থান দিতে পারবো। আর সেই কাজটি করে দিলেন সরদার ফজলুল করিম। তিনি শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ওর ডাক নাম রাখুন 'কাজল'।

আমি বললাম, 'কাজল নামটা কিন্তু মেয়েদের জন্যও ব্যবহৃত হয়।'

তিনি বললেন, 'হয়, তবে ছেলেদের জন্যই এটি ব্যবহারযোগ্য। আমার মেয়ের নাম রেখেছি স্বাতী, ছেলের নাম জ্যোতি; কাজল সে তুলনায় খুবই সহজ।

আমি বললাম, 'আপনার ছেলে-মেয়ের নামগুলিতে বেশ একটা আলোর ঝলকানি আছে, কিন্তু কাজলের মধ্যে সেটি নেই।'

শুনে তিনি হাসলেন, বললেন 'না থাক; আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি ছেলে গোরা হবে, তাই একটু কাজল দিয়ে দিলাম, যাতে নজর না লাগে।'

আমি আর কিছু বললাম না। তাঁর কথাটার মধ্যে যে শুভ কামনার স্পর্শ আছে, তাকেই আমি গ্রহণ করলাম। কাজল ডাক নামই সাব্যস্ত হয়ে গেলো।

এই শুভকামনা কিছুটা অন্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করে বৈকি! বস্তুতঃ সরদার ফজলুল করিমের সাথে বয়সের এই ব্যবধান সত্ত্বেও এই অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিলো। তাঁর অমায়িক ব্যবহারই এটি সম্ভব করে তুলেছিলো। এ সময়ে তিনি সংস্কৃতি বিভাগে কাজ করতেন। গোলাম সাকলাইনও তখন এই বিভাগে ছিলেন।

ইতিপূর্বে আমি আমার সংশ্লিষ্ট বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের পরিচিতদের কথা বলার সুযোগ পাইনি। এ কারণেই প্রকাশনা বিভাগে কর্মরত সরদার জয়েন উদ্দিন এবং অনুবাদ বিভাগের আবু জাফর শামসুদ্দিনের কথা বলতে পারিনি জয়েন উদ্দিন, আমি যাবার আগেই একাডেমীতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর সাথেও অন্তরঙ্গতা জমে উঠেছিলো এবং তাঁর কথায় একষট্টির শেষ দিকেই আমি দশ হাজার টাকার একটি জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করি। জয়েন উদ্দিন তখন ইস্টার্ণ ফেডারেলের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। পরে তাঁর বাড়ির ভাড়াটেও আমি হয়েছিলাম। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আমার স্ত্রী হোলি ফ্যামিলী হাসপাতালে সাত আটদিন ছিলো। মনে পড়ছে, তার অবসর সময় কাটানোর জন্য আমি তাকে একাডেমী লাইব্রেরীর থেকে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' বইটি নিয়ে দিয়েছিলাম। তার শুশ্রূষারত নার্সরা সেই বই নিয়ে যেমন টানাটানি করেছে, তেমনি তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যত্ন-আত্তিও করেছে। সুতরাং স্ত্রী ও সন্তানকে আমি খুব ভালো অবস্থাতেই বাসায় নিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

ইতিমধ্যে একাডেমীতে আমি আবার আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদন কাজ আরম্ভ করেছিলাম। আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, এই সম্পাদনার কাজে শহীদুল্লাহ সাহেব আমাকে মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব ও গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করেছিলেন। এর ফলে আমার সহকর্মী দু'জনের কাজও চূড়ান্তভাবে আমাকে দেখে দিতে হয়েছে কারণ সংগৃহীত শব্দাবলীর মধ্যে অনেক শব্দই আরবি ফারসি শব্দজাত ছিলো। সেগুলির ব্যুৎপত্তি নির্দেশে আমার ভাষা জ্ঞান কাজে লেগেছে। সুতরাং আমার সহকর্মীরাও এ ব্যাপারে আমার উপর নির্ভর না করে পারেনি। এমন কি কিছু সময়ের জন্য আমার শিক্ষক অধ্যাপক আমিনুল ইসলামও আমার সহকর্মী হয়েছিলেন। তিনি কানাডার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যাপনা করতেন। এখানে ছুটিতে এসে হঠাৎ আমার সহকর্মী হয়ে দাঁড়ান। তাঁর করিৎ কর্মা চরিত্রের কথা আমার শিক্ষা জীবনেও আমি বলেছি। এবারও দেখলাম, তাঁর সেই স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। এমনকি, যে কিছুদিন ছিলেন, সেই প্রবন্ধের মতো সম্পাদনাতেও তিনি আমার সাহায্য অম্লান বদলে গ্রহণ করেছেন।

একারণেই সম্পাদনার কাজে বিভিন্ন ভাষার অভিধান আমাকে প্রতিনিয়তই ঘাঁটতে হতো। এভাবেই একদিন বিখ্যাত উর্দু অভিধান ফিরোজুললুগাতের পাতা উল্টাচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়লো, বাঙালি প্রসঙ্গে এক স্থানে লেখা আছে, 'বাঙালি আগর ইনসান হে তো প্রেত কাহোকিস্‌কু'—অর্থাৎ বাঙালী যদি মানুষ হয়, তাহলে ভূত বলবো কাকে! বিষয়টি আমাকে বেশ উত্তেজিত করে তুললো। আমি পরিচালকসহ অনেককেই ব্যাপারটা দেখালাম এবং এ নিয়ে পত্রিকায় আলোচনা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কথা বললাম। কিন্তু পরিচালক সাহেব আমাকে ধৈর্য ধরতে বললেন এবং এর প্রতিকার হবে বলে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু আমি ধৈর্য ধরলেও বিষয়টি চাপা রইলো না। পত্রিকায় এর খবর বেরিয়ে

গেলো। সুতরাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অভিধানসহ এর একটি রিপোর্ট চেয়ে বসলো এবং সেটি আমিই তৈরি করে দিয়েছিলাম। এর ফলে অভিধানটির পরবর্তী সংস্করণে এই প্রবাদ বাক্যটি আর স্থান পায়নি।

এর ফলে আমার মনের ক্ষোভ সম্পূর্ণ দূর না হলেও একাডেমীতে কর্মরত অনেকের সাথেই আমার পরিচয়ের দিগন্ত একটা নতুন মাত্রায় প্রসারিত হয়েছিলো। এভাবেই আবু জাফর শামসুদ্দিন ও সরদারদের সাথে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলো। কিন্তু এখনও রাজনীতি সম্পর্কে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। কারণ এই ঘটনার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিলো, সে তো ভাষা ও মাতৃভূমির সাথে সম্পৃক্ত। তবু এর মধ্যে এমন একটা আভাস ছিলো, যা রাজনীতি সচেতন বয়স্কদের দৃষ্টি আর্কষণ করতে সমর্থ হয়েছে। বস্তুতঃ একাডেমীর পরিবেশে এমনি আভাস ইঙ্গিত ছাড়া নিজেও অন্যতম কোনো সুস্পষ্টতার পরিচয় কখনও পাইনি।

এমনি আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সেটি সালামত উল্লাহ্‌র ঘটনা। ইনি ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কী করে জানি তাঁর মাথায় বিজ্ঞানের বিষয় এসে গোলমালের সৃষ্টি করে। এর ফলে তিনি পৃথিবীর বার্ষিক গতি বিশ্বাস করলেও আহ্নিক গতিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর ধারণা ছিলো, এই প্রায় ছাব্বিশ হাজার মাইল পরিধির গোলকটি যদি চব্বিশ ঘণ্টায় তার মেরু দণ্ডের চারদিকে একবার ঘুরে, তা হলে যে প্রচণ্ড গতিবেগের সৃষ্টি হবে, তাতে করে, সাগরের পানির কিছুতেই স্বস্থানে থাকা সম্ভব নয়। এছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তাঁর আরও কিছু বিষয়ে প্রচণ্ড মতভেদ ছিলো। আর সেগুলির জন্য তিনি বিজ্ঞানের কিছুসূত্র এবং তার সাথে কোরান হাদীস মিলিয়ে যুক্তি প্রমাণের একটা ধারা তৈরি করেছিলেন।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই একদিন তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম এবং কিছু সংখ্যক ছেলেকে এ ব্যাপারে তাকে উত্তেজিত করে আমোদ উপভোগ করার বিষয়টিও লক্ষ্য করেছিলাম। এর ফলেই বোধ হয়, সালামত উল্লাহ্‌ তাঁর এই অভিনব গবেষণার বিবরণ সংবলিত একটি পুস্তিকা বের করতে সমর্থ হয়েছিলেন! এবার তিনি সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিই আরও শোভন আকারে প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর দ্বারস্থ হলেন। একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান সাহেব পুস্তিকাসহ তাঁর আবেদনপত্রটি গ্রহণ করে আমার সাথে পরামর্শ করার কথা বললেন এবং আমার সুপারিশ পেলে তিনি যে এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবেন, এমন আশ্বাসও দিলেন। সুতরাং একদিন সালামত উল্লাহ্‌ তাঁর পুস্তিকা সহ আমার উপর এসে চড়াও হলেন। আমি ধৈর্যের সাথেই তাঁর বক্তব্য শুনলাম। কিন্তু কুরান হাদীসের প্রসঙ্গ আনতেই আমার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। আমি বললাম, 'বিষয়টি বিজ্ঞানের, আপনি বিজ্ঞান দিয়ে এর মোকাবিলা করলে ভালো করতেন, এক্ষেত্রে কোরান হাদীসকে টেনে আনা উচিত হয়নি। কারণ কোরান হাদীস বিজ্ঞান দর্শনের কোনো ব্যাপার নয়।

আমার একথা শুনে তিনি বললেন, 'আপনিতো দেখছি, কোরান হাদীস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অথচ আপনাকেই এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলা হয়েছে!'

আমি বললাম, 'আপনি কী করে বুঝলেন যে, আমি কিছুই জানি না!

'জানলে কি আর এমন মূর্খের মতো কথা বলতেন!'

'তা হলে আপনার কি মনে হয়, আমি একটা মহামূর্খ, না?'

'কোরআন হাদীসের ব্যাপারে আপনাকেতো মহা মূর্খই বলবো।'

'তা হলেতো আপনার সাথে মূর্খের ভাষাতেই কথা বলতে হয়'—এই বলে আমি পায়ের সাণ্ডেল খুলে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার ভঙ্গি দেখেই সালামত উল্লাহ্ উঠে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং বারান্দায় হৈচৈ করে লোক জমিয়ে ফেললেন। এর ফলে একাডেমীর এখানে সেখানে যেমন হাসির হুল্লোড় উঠলো, তেমনি অনেকে রাগও করলেন। কেউ কেউ আমাকে এসে বললেন যে, আমি এতোটা উত্তেজিত না হলেও পারতাম। কিন্তু আমার উত্তর ছিলো একটাই,—'মূর্খের ব্যবহারতো এমনিই হয়।'

বস্তুত এই ঘটনাটিও আমার পরিচয়ের অন্য একটি দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলো। এর ফলে যাদের আকর্ষণ অনুভব করবার ছিলো, তাঁরা ঠিকই আকর্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার দুঃখ এইখানে যে, কোনো যুক্তি দিয়েই সালামত উল্লাহ্দের মতো মূর্খদেরকে কোরান হাদীসের ব্যাপারটি বুঝানো যায়নি। এখনও তারা বিভিন্ন ব্যাপারে কোরান হাদীসকে টেনে নিয়ে গিয়ে অহেতুক অপমানের সম্মুখীন করছে। তবে সেদিনের পর সালামত উল্লাহ্কে আর একাডেমীতে দেখা যায়নি।

অবশ্যি তার খোঁজ নেবার মতো অবসরও আমার ছিলো না। কারণ আমি আবার সংসারী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। এবার বাসা বদলের ঝামেলা দেখা দিলো। তিন মাস না যেতেই সায়িদা তার সন্তানের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লো। কারণ বাসাটি দোতলা হলেও এর রুমগুলি ছোট ছোট এবং সিঁড়িটি খুবই সংকীর্ণ। এখনও তার ছেলে হামাগুড়ি দিতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে যেতে পারে। তাছাড়া এ বাসায় সবটাই প্রায় সিমেন্ট দিয়ে ঢাকা, মাটির ছোঁয়া না পেলে সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না।

এসব কথার মধ্যে যতই ছেলেমানুষীই থাক, একেবারে ফেলে দেয়ার মতো নয়। অন্যদিকে বাসাটি আমার কাছেও বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে উঠেছিলো। ধার দিয়ে, বিলিয়ে আমার যে সকল বই তখনও অবশিষ্ট ছিলো, সেগুলি বাসার দোতলায় একটি রুমের কাঠের পাটাতনের উপর রেখে দিয়েছিলাম। একদিন তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলাম প্রায় সবগুলিই উইয়ে কেটে সাবাড় করে দিয়েছে। এমনিতে বাইরে থেকে বুঝবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু পুরানো কাঠের মধ্যে ছিলো সাদা উই, তার নীরব আক্রমণ নির্বিবাদেই সর্বনাশ করে ছেড়েছে। খুবই খারাপ লাগলো, কিন্তু বইগুলি বোঝা বেঁধে নদীতে ফেলে দেয়া ছাড়া আর কিছু করার রইলো না।

সুতরাং বাসা বদলের প্রসঙ্গটি নিয়ে বিভিন্ন সহকর্মীর সাথে আলোচনা করলাম। সরদার জয়েন উদ্দিন শুনে বললেন যে, ভাড়া দেবার মতো তার নিজেরই একটি বাসা

আছে। পছন্দ হলে সেখানেই আমি যেতে পারি। একজন সহকর্মীর সাথে থাকতে পারবো, এই সম্ভাবনায় তার বাসাটি দেখে পছন্দ করে ফেললাম। কাঁঠাল বাগানে অবস্থিত এই বাসাটির দূরত্ব তুলনামূলকভাবে জগন্নাথ সাহা রোড থেকে কমই। টিনের চাল দেয়া একটি বড়ো রুম আর তারই লাগোয়া একটি টালির দোচালা; মাঝখানে বেড়া দিয়ে দিব্যি দুটি রুম করে নেয়া যায়। পানির কিছুটা অসুবিধা; তবে একটি পাতকুয়া আছে, তা থেকে ধোয়া মাজার কাজ চলে। খাবার পানি অন্যস্থান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তবে একটি টিউবওয়েল দিয়ে দেবার আশ্বাসও পেলাম। ভাড়া মাসিক একশ' টাকা।

কাজেই জগন্নাথ সাহা রোডের বাসা উঠিয়ে একদিন চলে এলাম কাঁঠাল বাগানে। আর তা করতে গিয়ে যেমন ভাড়াটের বাসা বদলের হাঙ্গামাটি বুঝতে পারলাম, তেমনি পাড়া পড়শীর সহানুভূতি-সহায়তার স্মৃতির কিছুটা পীড়নও অনুভব করলাম। প্রায় আড়াই বছরের এই ভাড়াটে জীবনে অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছিলো। বিশেষ করে বাজারের সুবিধাটি ছিলো খুবই আকর্ষণীয়। নদীর তাজা মাছ ও শাকসব্জি পাওয়া যেতো। আর এ সবের দামও তুলনামূলকভাবে সস্তাই ছিলো। তাই নতুন বাসায় আসার পথে এসব স্মৃতি ভীড় জমিয়েছে। হাজী ও হাফেজ সাহেবের কথাতো ভোলবার নয়।

কাঁঠাল বাগানে এসে প্রথম রাতেই বিপদে পড়ে গেলাম। জগন্নাথ সাহা রোডে মশা ছিলো না বলে মশারি কিনতে হয়নি। কিন্তু এখানে মশার আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে গেলাম। ভাগ্যিশ কাজলের জন্য একটি শিশু মশারি কিনেছিলাম।, তা দিয়ে কোনো প্রকারে তাকে বাঁচানো গেলো; কিন্তু আমাদের মশা তাড়িয়ে জেগেই রাত কাটাতে হলো। প্রথম ধাক্কাতেই মনটা কেমন বিগড়ে গেলো। সরদার সাহেবের কথার মধ্যে এমনি ভাড়াটে শোষক মশার প্রসঙ্গটিতো ছিলোই না, এমন কি এই রাতেও আমাদের অসুবিধার কোনো খোঁজ তিনি নিয়েছিলেন বলে মনে পড়ছে না। যাহোক, পরদিনই আমি মশারি কিনে মশার আক্রমণ ঠেকানোর ব্যবস্থা করলাম।

কিন্তু আমার অসুবিধা তাতে খুব একটা কমলো না। কারণ আমি তখন আরও একটি অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেছি। মূল ফারসি থেকে তারিখে ফিরোজ শাহীর অনুবাদ করছি। ব্যাপারটা একাডেমীর অনুবাদ বিভাগের; অনেকটা জোর করেই আমার উপরে চাপানো হয়। এ সময় আবু জাফর শামসুদ্দিন সাহেবের সাথে পরিচয়টা আরও ঘনিষ্ঠ হয়। তিনিই আমাকে বলেন যে, কাজটি আরও দু'তিন জনকে দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন; সুতরাং এখন আমি ছাড়া আর গতি নেই। কারণ ইতিপূর্বে আমি কালিলা ও দিমনা নামে যে অনুবাদটি করেছি, তার মূল একটি ফারসি গ্রন্থ এমনকি ইকবালের কাব্যানুবাদটিও ফারসি থেকে করা। কাজেই একাজ আমিই করতে পারবো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এসব অনুবাদ করতে গিয়ে আমার ফারসি ভাষা জ্ঞান পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। তবু একটা অসাধারণ গোঁ ছিলো বলেই বুঝি আমি অমানুষিক পরিশ্রম করে

এই পুরাতন ফারসি ভাষার অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। কারণ ফারসি বাংলা কোনো অভিধান তখনও ছিলো না, এখনও নেই! এর ফলে এখন থেকেই একটি ফারসি বাংলা অভিধান রচনার ইচ্ছা আমার মধ্যে জাগ্রত হয় এবং আমি এ নিয়ে কাজও আরম্ভ করে দিই। কিন্তু নানা কারণে তা আর শেষ হয়নি!

ইতিমধ্যে বেশ মজার একটা ঘটনা ঘটে। অধ্যক্ষ সাইদুর রহ্‌মানের সাথে ইতিপূর্বে আমার তেমন কোনো পরিচয় ছিলো না। দূর থেকে দেখেছি এবং অন্যের মুখে তাঁর কথা শুনেছি। এবার একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে সাক্ষাত পরিচয়ের সুযোগ হলো। তখন বাংলা একাডেমীর সেক্রেটারী ছিলেন আহমদ হোসেন, তাঁর কক্ষে একাডেমী প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের একটি শেলফ ছিলো। সেখানে সদ্য প্রকাশিত আমার কালিলা ও দিমনা অনুবাদটি শোভা পাচ্ছে। সাইদুর রহমান সাহেব সেটি হাতে নিয়ে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখলেন এবং অনুবাদকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। শেষ পর্যন্ত আমি একাডেমীর কর্মচারী জেনে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সেক্রেটারী সাহেবের কক্ষে পৌঁছতে তিনি বলে উঠলেন, 'ও, তুমি; আমি ভেবেছিলাম, বুড়ো হাবড়া কেউ হবে।!'

আমি তাঁর এ কথার উত্তর না দিয়ে হেসেই বসে পড়লাম। এবার তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

বললাম, 'ময়মনসিংহ'।

তিনি বললেন, 'নামের শেষে কোরায়শী লিখেছো কেন?'

বললাম, 'পৈত্রিক উত্তরাধিকার; আমি ব্যবহার করছি মাত্র।'

তিনি বললেন, 'তোমাদের এই ভড়ং আর গেলো না! হয়েছো তে নমঃ শূদ্র থেকে মুসলমান, কিন্তু ভাবটা এমন, যেন এইমাত্র আরব থেকে এসে নামলে!'

আমি এর উত্তরে হেসেই বললাম, 'কী করবো, না হলে যে কল্কে পাওয়া যায় না।'

কিন্তু আমি হাসলেও আহমদ হোসেন সাহেব শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ কিছু দিন আগেই সালামত উল্লাহ্‌র ঘটনাটি ঘটে গেছে। আজও এমনি মন্তব্য শুনে রেগে যাই কিনা, সে কথাই তিনি ভাবছিলেন। তাই একটা কাজের কথা বলে কৌশলে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর এই শংকা নেহাৎই অমূলক ছিলো। কারণ আজ আমি রাগিনি, রাগতে পারিনি। এর কারণ সালামত উল্লাহ্‌র ব্যাপরটির সাথে এর পার্থক্য ছিলো; এই পার্থক্য পরিবার ও সমাজের পার্থক্য। একটি পরিবারের মিথ্যা পরিচয় প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত না হলে, তাতে এমন কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু যা সমাজের, যা সার্বজনীন; তার মিথ্যা পরিচয় তুলে ধরার মধ্যে প্রতারণাটাই বড়ো হয়ে উঠে।

আমার পারিবারিক উপাধি সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আমি কথা বলেছি। সুতরাং এই উপাধি নামের একটি অংশমাত্র; এর অন্য কোনো তাৎপর্য আছে বলেও আমি মনে করি না এবং তেমন কোনো দাবীও আমার নেই। কিন্তু এই দেশে বিশেষ স্বার্থ লাভের জন্য কৌলিন্য সৃষ্টির চেষ্টা যে কম হয়েছে, তাতো বলা যাবে না। কাজেই সাইদুর রহমান

সাহেবের মন্তব্যে আমার রাগ করার কোনো কারণ ছিলো না। তাঁর 'তোমাদের' সর্বনামটির মধ্যেই এই ইঙ্গিত ছিলো।

কিন্তু সাইদুর রহমান সাহেবের মন্তব্যে রাগ না করলেও আমার স্ত্রী সায়িদার বক্তব্যে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। সে নাকি ইতিমধ্যেই আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখেছে এবং তিনি তাকে বাড়িতে যেতে বলেছেন। একথা সে এমনভাবে বলতে আরম্ভ করলো যে, আমি তার দাবী পূরণ না করে পারলাম না। আমার শ্বাশুড়ী এখন খরিচায়, তাই আমরা একদিন রেলগাড়ি যোগে ময়মনসিংহ নেমে রিকসায় শম্ভুগঞ্জ হয়ে খরিচা গিয়ে পৌছলাম। সেখান থেকে আমার শ্বাশুড়ীকে সাথে নিয়ে গরুর গাড়ি করে শম্ভুগঞ্জ, রেলগাড়িতে গৌরীপুর নেমে রিকসা করে আমুদপুর গিয়ে উপস্থিত হলাম। খবর আগেই পাঠিয়ে ছিলাম; সুতরাং দেখতে না দেখতেই বাড়ি আত্মীয়-স্বজনে জমজমাট হয়ে উঠলো। আমার দইলার ফুফু এবং কাউরাটের বোনও এসে উপস্থিত হলো। আমার দাদার জ্ঞাতি গোষ্ঠিদের মধ্যে সেই আঙ্গাউড়া বাঁশাটি থেকে আমার এক ভাতিজা এসে আমাকে একেবারে পা ছুঁয়ে সালাম করলো। আধ-বয়সী এক দশাসই জোয়ান, লম্বা জোব্বা জাব্বা পরা; দেখে শুনে মনে হলো, সে হয়তো পীর মুরিদীর ব্যবসা করে। কিন্তু তার সাথে এই প্রথম পরিচয়ে আমি আর সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। বেশ আমুদেই তিন চার দিন কেটে গেলো।

সবার মধ্যে সায়িদার চঞ্চলতাটাই ছিলো দর্শনীয়। সে সবার সাথে মিশে সবার মন জয় করে তার ছেলের জন্য দোয়া চাইলো। আমার কাছে ব্যাপারটা কিছু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হলো। কারণ শ্বশুরের ভিটায় এই প্রথম সে গিয়েছে, তাই আরও কিছুটা সংকোচ থাকলে ভালো হতো। কিন্তু তার এ প্রকার বাড়াবাড়ির কারণটা খরিচা না আসা পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। এখানে ফিরেই সে পরদিন আকিকার বায়না ধরে বসলো। কিন্তু গত এই কয়দিনে আমার হাত প্রায় খালি হয়ে গেছে। আকিকা করতে গেলে দুটি ছাগলের দরকার। আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচও আছে। আর এখনি বুঝতে পারলাম যে, সে স্বাভাবিক নয়। ঢাকায় থাকতেই তার ঘুমের পরিমাণ কমে গিয়েছিলো। রক্ত শূন্যতা থেকেই এই নিদ্রাহীনতা জন্ম নিয়েছে। এর ফলে মানসিক দিক থেকে সে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলো। আমুদপুরে অবস্থাটা অনেকাংশে স্বাভাবিক থাকলেও খরিচায় তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। সুতরাং তার রাগ থামাতে তারই পোষা একটা খাসি জবাই করতে হলো।

সন্ধ্যার পর সেই খাসি জবাই করে খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে রাতদুপুর হয়ে গেলো। এদিকে আমার ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। পরদিনই আমাকে চলে আসতে হবে। তাই রাতেই তার নিজ গোষ্ঠির ও তার মাতুল গোষ্ঠির সবাইকে ডেকে আনতে হলো। আমার নানা শ্বশুর, বড়ো ভাই এ ব্যাপারে বেশ সাহায্য করলেন। তাঁর ধারণা, এটি না করলে তার পাগলামি আরও বাড়া তো। কিন্তু পরদিন রাস্তায় তার আচরণ দেখে মনে হলো, মোটেও কমেনি। সে আমাকে বলতে আরম্ভ করলো যে, তার শ্বশুর

নাকি আমাদের সাথে সাথেই ঢাকা যাচ্ছেন। দুয়েক বার সে তাঁকে দেখেও ফেলেছে। যাহোক, কোনো প্রকারে তাকে মানিয়ে নিয়ে ঢাকায় পৌঁছলাম। কিন্তু তার মানসিক, বিভ্রান্তি কমলো না। এমন কি তার আদরের সন্তান সম্পর্কেও সে উদাসীন হয়ে উঠলো এবং জানালায় প্রায়ই তার শ্বশুরের মুখ দেখতে লাগলো।

ব্যাপারটা নিয়ে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলাম। ডাক্তারদের ধারণা এটি এ্যাকলেমশিয়ার ফল। সন্তান প্রসবের সময় সে অচেতন হয়ে গিয়েছিলো, সেটিই এমনি মানসিক বিভ্রান্তি নিয়ে এসেছে। রক্ত শূন্যতাজনিত নিদ্রাহীনতা এই অবস্থাটিকেই প্রকট করে তুলেছে। বেশ কিছু দিন ধরে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অনেকখানি আয়ত্তে আনা গেলো তাকে; কিন্তু সম্পূর্ণ সারিয়ে তুলতে সময় লাগলো বেশ। এর ফলে মায়ের উপর দিয়ে বেশ ধকল গেলো এবং আমারও অনেক সময় তার জন্য ব্যয় করতে হলো।

বস্তুতঃ এ এমন এক মেয়েলী রোগ, যার কবলে পড়ে অনেক পারিবারিক জীবনই নষ্ট হয়ে যায়। বৌয়ের পাগলামি সহ্য করে তাকে সেবা শুশ্রূষার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলার পরিবেশ যদি না থাকে, তাহলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতে রোগিনীই নির্যাতিতা হয় বেশি। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে, আমার স্ত্রী তেমন নির্যাতনের কবলে পড়েনি। তবু আমার এই ভেবে দুঃখ হয় যে, এমনি পাগলামির জন্য সে আমার হাতে যে পরিমাণ মার খেয়েছে, স্বাভাবিক অবস্থায় তার এক শতাংশও খায়নি। এর কারণও আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমার স্ত্রী হিসেবে সে তার হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠার পর এই সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন সে নির্বিবাদে মিটিয়েছে, পারত পক্ষে কোনো ত্রুটি থাকতে দেয়নি। কারণ এ সংসারতো তারই সংসার, সেই বলতে গেলে এই সংসার গড়ে তুলেছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আপাততঃ খুব সহজেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে এবং প্রায় মাস খানেক ধরে সে যেমন কথা বলেছে, যে সব আচরণ করেছে, তার কিছুই আর তার নেই। মনে হয়, এই একমাস ধরে সে যেন ঘুমিয়ে ছিলো। আবার সহজ জীবনের মধ্যে জেগে উঠেছে। এর ফলে আমিও আবার আমার সহজ জীবনের মধ্যে ফিরে যেতে পেরেছি। তারিখে ফিরোজ শাহীর অনুবাদ এখনও শেষ হয়নি। আমি এবার এটি শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। আর এটি করতে করতেই আমার মাথায় ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে একটি চিন্তা ঢুকলো। সেটি বেশ কয়েক দিন আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখলো।

আসলে ইসলামের ইতিহাস নামে বাজারে যা চালু আছে, তা আদৌ ইসলামের ইতিহাস নয়। বড়ো জোর একে মুসলমানের ইতিহাস বলা যায়। তাও এতে সাধারণ মুসলমান সমাজের কোনো স্থান নেই। এর প্রায় সবটা জুড়েই মুসলমান নরপতিদের কীর্তি কলাপ বর্ণিত হয়েছে। শুধু ইসলামের আবির্ভাব ও তার প্রচারের বর্ণনা দিয়ে এটি আরম্ভ হয়েছে বলেই এর নামকরণে ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু একটি ধর্ম মত হিসেবে ইসলামের উদ্ভব ও বিকাশের কোন ধারাবাহিক বর্ণনাই এতে নেই। সাম্রাজ্য বিস্তারে ইসলাম হয়তো একটি অনুপ্রেরক শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু

তার নিজস্ব পরিচয় প্রত্যেক যুগের কার্যকারণসহ তেমনভাবে বিশ্লেষিত হয়নি অথচ যে কোনো ধর্ম মতের উদ্ভব ও বিকাশের স্তর পরম্পরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হলে এর শক্তি ও দুর্বলতার যে পরিচয় পাওয়া যেতো, তাতে অনেক কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দূর হতে পারতো।

বস্তুতঃ এ ব্যাপারটি নিয়ে আমি যতোই ভাবলাম, ততোই এর প্রয়োজনীয়তা আমাকে উৎসাহিত করে তুললো। আমি এই ইতিহাসের একটি পরিকল্পনাও করে ফেললাম। দশ খণ্ডে বিভক্ত এই বিরাট ইতিহাসে ইসলামের অতীত ও বর্তমানকে তুলে ধরার একটি চেষ্টা ছিলো। উৎসাহের আতিশয্যে আমি লিখিত পরিকল্পনাটি একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান সাহেবকে দেখালাম। তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন যে, এটিতো বাংলা একাডেমীর নয়, বরং ইসলামিক একাডেমীর কর্তব্য কাজ। আমি যেন সেখানেই এটি পেশ করি। আমি তাই করলাম। তৎকালে ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ও *ক্রিড অব ইসলামের* লেখক জনাব আবুল হাশিম। তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী মাহমুদের সাথে আমার পরিচয় ছিলো। তার সাহায্যে আমি আমার পরিকল্পনাটি শোনাবার সুযোগ পেলাম। কারণ হাশিম সাহেব তখন বলতে গেলে অন্ধ। অন্যের সাহায্য ছাড়া চলা ফেরা পর্যন্ত করতে পারেন না। যাহোক তিনি আমাকে সময় দিলেন এবং আমি আমার বক্তব্য ও পরিকল্পনাটি তাঁকে পড়ে শুনালাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে সব শুনে বললেন, 'তোমার পরিকল্পনাটি ভালো। কিন্তু এটি বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা কেউ দেবে না। তাছাড়া ধর্মান্ধরা এর বিরোধিতা করবে। অহেতুক তোমার উপর নির্যাতন নেমে আসবে।'

আমি বললাম, 'আপনি যদি নিরুৎসাহিত করেন, তা হলেতো আশা করার আর কিছু নেই। অথচ আমি ভেবেছিলাম, আপনিই এটি বাস্তবায়িত করতে পারবেন।'

আমার কথা শুনে তিনি হাসলেন, বললেন, একাডেমীর বড়ো দুঃসময় চলছে। আমি কোনো কাজই ইচ্ছা মতো করতে পারছি না। তুমি শুনলে অবাক হবে, এক সময়ে আমিও এতোটা না হোক, এর কাছাকাছি কিছুটা ভাবতাম। কিন্তু রাজনীতিতে ঢুকে আমার সব চিন্তা শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার একটি নিবন্ধ শুনে যাও।'

মাহমুদ তাঁর নির্দেশে টেবিলের দেরাজ থেকে ইংরেজিতে লিখা একটি নিবন্ধ বের করলো এবং পাঠও করলো। এতে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কেই একটি ভিন্নতর অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ ছিলো। পড়া শেষ হলে তিনি বললেন, এটি প্রকাশ করতেই এখন আর আমি সাহস পাই না। অথচ তোমার পরিকল্পনাতো সে তুলনায় অনেক খানি বিপ্লবী।

আমি বললাম, 'তাহলে আর কী, আমি এখন বিদায় হই।'

তিনি হাত তুলে বললেন, 'না, না; বসো, বসো। এতোটা নিরাশ হবার কিছু নেই। তুমি তোমার পরিকল্পনার একটা সংক্ষিপ্ত সার আমাকে রচনা করে দাও। যাতে দুশো পৃষ্ঠার মধ্যে ছাপানো যায়, এভাবে লিখবে। যা থাকে বরাতে, আমি এটি ছাপিয়ে বের করবো।'

আমি বললাম, 'সেটি লিখতে হলেওতো বই পত্রের প্রয়োজন হবে!'

তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বুঝেছি; কিন্তু বইপত্র কেনার টাকা কোথায় পাবো। বিদেশ থেকে আনাতে হবে, সেতো অনেক টাকার ব্যাপার।'

এরপর আর কোনো কথা বলার ছিলো না। এই বয়োবৃদ্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিটির একটি নিষ্ফল সহানুভূতি অন্তরের মধ্যে বহন করে আমি চলে এলাম। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম নিয়ে চিন্তা করার সকল প্রগতিশীল পথই রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই ইসলাম আজ প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্ভরযোগ্য বাহনে পরিণত হয়েছে। সনাতন ইসলামের সাথে এই ইসলামের পার্থক্য যে কতোটা ব্যাপক, তা নিয়ে আমি এরপরেও কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। আপাততঃ ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কীয় এই ব্যাপারটি এখানেই ইতি হয়েছিলো।

এখানে আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, এই বিষয়টি নিয়ে আমি শহীদুল্লাহ সাহেবের সাথে কোনো আলোচনা করিনি। কারণ ইতিমধ্যেই তাঁর 'শেষ নবীর সন্ধানে' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরেছেন, তাতে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণাই প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং তিনি আমার এই চিন্তাকে যে উৎসাহিত করবেন না, তা প্রথম দিনের সেই ভাগ্যের আলোচনা থেকেও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। এ কারণেই তিনি নিজেও ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করেননি। তবু এই আশুতোষ মনীষীর চিন্তার সরলতা ও অকপট গুণগ্রাহিতার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিলো, যা আমার কাছে অতুলনীয় বলেই মনে হয়েছে।

একদিন একাডেমীরই কোনো কাজে তাঁর চকবাজারের বাসা পিয়ারা হাউজে গিয়েছি। প্রয়োজনীয় আলাপ শেষে হঠাৎ তিনি হাদীসের গ্রন্থ 'মিশকাত' নিয়ে এসে পড়তে আরম্ভ করলেন এবং আমাকে বললেন, দেখোতো আমার পড়াটা শুদ্ধ হয় কি না!

আমি এই বয়োবৃদ্ধ মনীষীর অসংকোচ জ্ঞান স্পৃহায় অভিভূত হয়ে গেলাম, বললাম, 'ঠিকই আছে, তবে ভুল এতো সামান্যই যে, না ধরলেও চলে।'

তিনি হেসে বললেন, 'নিজে নিজে পড়ে আর কতো শুদ্ধ হবে! এটা আমার পীর কেবলার দোয়ার বরকতেই আমি করতে পেরেছি।'

এই বলে তিনি 'মিশকাত শরীফ' বন্ধ করলেন। আমিও বুঝি বন্ধ হয়ে গেলাম। তিনি ফুরফুরার মুরীদ, এটা জানতাম। কিন্তু পীর ভক্তির এই অন্ধ আবেগ আমার জানা ছিল না। তাঁর পীর কেবলার নির্দেশে তিনি কোরান শরীফের বাংলা অনুবাদ করতেও আরম্ভ করেছিলেন। আমি তাঁর ধর্মচিন্তা নিয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি। *সাহিত্য ও ঐতিহ্য* নামে মুক্তধারা প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ সংকলনে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবু এ কথা অবশ্যি বলবো যে, এই প্রায় মধ্যযুগীয় ধর্মনিষ্ঠা সত্ত্বেও তিনি পরম সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন।

একাডেমীর দোতলায় বেশ কিছুদিন ধরে শহীদুল্লাহ সাহেবের ইমামতিতে জোহরের নামাজে জামাত হতো। সেখানে গোলাম সাকলাইনসহ একাডেমীর অনেক কর্মচারীই যোগ দিতেন। কিন্তু আমি এই জামাতে একদিনও যোগ দিইনি। অথচ আমি তখন শহীদুল্লাহ সাহেবের সাথে একই কামরায় বসতাম। কিন্তু তিনি আমার এই অনুপস্থিতির জন্য কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেননি। এ কথাতো পুনরায় বলার প্রয়োজন নেই যে, তাঁর অযাচিত স্নেহেই আমি এই একাডেমীর চাকরিটি লাভ করেছিলাম। সুতরাং আমার ধর্মনিষ্ঠা সর্ম্পকে তিনি অবশ্যি খোঁজখবর নেবার অধিকারী ছিলেন। প্রয়োজন মনে করলে তিনি আমাকে সংশোধন করার চেষ্টাও নিতে পারতেন এবং তাঁর ধর্মনিষ্ঠা আমার চাপিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কিছুই করেননি। কারণ তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চারক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাস করতেন। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। শুধু স্বধর্মী নয়, বিধর্মীদের প্রতিও তিনি এই মানবিক উদারতা পোষণ করে গেছেন।

এ সময়ে আমি তৎকালীন পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘের মুখপত্র 'পরিক্রম'-এ 'তৎসম প্রীতির দৌরাত্ম্য' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটির বিষয় ছিলো তৎকালীন বাংলা বানান সংশোধনের বিরুদ্ধে একটি সমালোচনা। বিশেষ করে আরবি শব্দের বানানও মূলানুগ করার প্রচেষ্টার সাথে শহীদুল্লাহ সাহেবও জড়িত ছিলেন। সুতরাং আমার এই বক্তব্যে ডঃ শহীদুল্লাহর প্রতিও কটাক্ষ ছিলো। কিন্তু এই গণতান্ত্রিকমনা মনীষী এ নিয়ে আমাকে কিছু বলেননি কিংবা আমার মত যে ভ্রান্ত, এ কথাও তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। এই প্রবন্ধটিও *সাহিত্য ও ঐতিহ্য* নামক পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমার সাংসারিক জীবনে আমার পৈতৃক সম্পত্তির ব্যাপারটি একটু নতুন মাত্রা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো। ইতিপূর্বে আমি মামলার মাধ্যমে পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার, তার সেহাম ও দখল ইত্যাদির ব্যাপারে কথা বলেছি। আমার ফুফাতো ভাই শমশের আলী যে লোভ করে সেই সম্পত্তির সেহামে গোলমাল করেছিলেন, সে কথাও আলোচিত হয়েছে। আমি জমি দখল নিয়ে দেয়ার সময় একথাও বলেছিলাম যে, কাওলাদারসহ গ্রামের সাধারণ মানুষের এই ভুল ভাঙতে খুব দেরী হবে না। যখন তারা জানতে পারবে যে, জমি আমাদের হাতে না এসে ধারাকান্দি চলে গেছে, তখন তাদের এই সহানুভূতি প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ফুফাতো ভাইদের জন্য বিপদের সৃষ্টি করবে। কার্যতঃ তাই হলো। জমির দখল নিয়ে দেবার পর আমার ফুফাতো ভাইরা আমার চাচাতো ভাইদের সাহায্যে সে জমির চাষাবাদ করছিলেন। কিন্তু আমার অনুপস্থিতি কিছুদিনের মধ্যেই সন্দেহের সৃষ্টি করে। এর ফলে কাওলাদাররা বাধা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে এমন কি আমার চাচাতো ভাইদেরকেও তাদের পক্ষে টেনে নিয়ে যায়। ধারাকান্দির তাদের পক্ষে বলতে গেলে কেউ নেই। সুতরাং ভিনগাঁয়ে জমির দখল রক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। একই কারণে বিক্রি করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। জমির ধান কেটে নেয়া, বেদখল করা,

এমনি সব ব্যাপারে একের পর এক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হলেও কোনো সাক্ষী পাওয়া যায়নি। ফলে একের পর এক মামলা দায়ের করায় কোনো লাভই হয়নি।

এসব খবর আমি এর তার মাধ্যমে মাঝে মাঝে শুনতাম। কিন্তু শমশের ভাই তখনো দোকানের সাথে যুক্ত থাকলেও আমাকে কিছুই বলেননি। বরং তাঁর ধারণা হয়েছিলো যে, আমিই দূরে থেকে জমি বেদখলের ব্যাপারে কাওলাদারদেরকে উৎসাহ দিচ্ছি। এর কারণ সম্ভবতঃ কাওলাদাররা গাঁয়ের সাধারণ মানুষকে এই বলে পক্ষে টেনেছিলো যে, যেহেতু আমাকে ফাঁকি দিয়ে ধারাকান্দির তারা জমি নিয়ে গেছে, তাই এই জমি ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু কার জন্য ফিরিয়ে আনতে হবে, সে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। কারণ এ ব্যাপারে আমাকে তারা কিছুই জানায়নি। অন্যদিকে আমার শ্বশুরের দোকানে থেকে শমশের ভাই মামলা করছেন, কাজেই এইসব মামলায় আমারও সায় আছে, এমন কিছু সন্দেহ করারও অবকাশ ছিলো। সে যাই হোক : তবে জমির অবস্থাটা ক্রমশঃ শমসের ভাইদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিলো।

এমনি অবস্থায় একদিন একাডেমী থেকে ফিরে এসে দেখি শমশের ভাই আমার বাসায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর আগমনের কারণ মায়ের কাছে প্রথম জানতে পারলাম। তিনি নাকি বলেছেন যে, তাঁরা আমুদপুর আর যাবেন না। কাওলাদাররা জমি দখল করে নিয়েছে ; এখন আমার যদি কিছু করার থাকে, তাহলে আমি যেন তা করি। তা না হলে এই জমি আবার কাওলাদারদের হাতেই চলে যাবে। এ সব কথা বলে মা-ও আমাকে একটা কিছু করার কথা বললেন। এতোদিনে জমিটা হাতে এসেও আবার বেহাত হয়ে যাবে, এটা কোনো ক্রমেই হতে দেয়া উচিত নয়।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত শমশের ভাইয়ের সাথে আলাপ হলো। তাঁর কথার ধরন দেখেই বুঝতে পারলাম, অবস্থা খুবই শোচনীয়। কাজেই সব কিছু ভুলে আবার আমি আমুদপুর গেলাম। শমশের ভাই আমার সাথে আমুদপুর গেলেন না। কারণ তাঁকে সেখানে কেউই সহ্য করবে না। আমার সাথে গেলেন পণ্ডিত ভাই। আমি গিয়েই একটা দরবারের ব্যবস্থা করলাম। কাওলাদারসহ গ্রামের বহুলোককেই সেই দরবারে ডাকা হলো। রাতের বেলা সেই দরবারে প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি লোকেরই সমাবেশ ঘটলো। এতে আমার কথা বলার খুবই সুবিধা হলো। আমি আমার দাদার সময় থেকে আমাদের পারিবারিক সকল ঘটনার কথাই বললাম। বিপর্যয়ের পর কীভাবে আমরা কোথায় গেলাম, কী করলাম, সে সব কথাও আমি সবিস্তারে তুলে ধরলাম। এরপর জমির মামলা, দখল ইত্যাদি নিয়েও আমি সবকিছু খুলে বললাম। সব শেষে আমি বললাম যে, ইতিমধ্যে জমির দখল-বেদখল নিয়ে যাই হয়ে থাক্না কেন, এখন ধারাকান্দির তাঁরা আমাকে জমি ফিরিয়ে দেবার জন্য রাজি হয়েছে। এখন আমি জমি ফিরিয়ে নেবো কিনা, এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানার জন্যই এই দরবার ডেকেছি; এই বলে আমি থামলাম।

আমি কথা বলতে বলতে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, সবাই অদ্ভুত এক নীরবতার মধ্যে আমার সমস্ত কথা শুনেছে। এবার তাই আমার কথার উত্তর দিতে

তাদের কিছুটা দেরী হলো। একজন কাওলাদার বললেন, 'তারা যে, জমি ফেরৎ দেবে, এ কথা তাদের মুখ থেকে শুনতে পারলে ভালো হতো। তাদের কেউ কি এখানে উপস্থিত আছে ?'

আমার পক্ষ হয়েই অন্য একজন বললেন, 'না আমার মনে হয়; তাদের নিকট থেকে কোনো প্রয়োজন নেই। তারা দিবে, এটা ধরে নিয়েই আমরা কথা বলতে পারি।'

এরপর দেখলাম অনেকেই এক সাথে কথা বলে উঠলেন এবং আমি জমি ফিরিয়ে নিলে কারো কোনো আপত্তি নেই, এই মতটাই প্রাধান্য লাভ করলো। এমন কি আমার চাচাতো ভাইদেরকেও এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো। এবার আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আপনারা অনুমতি দিয়েছেন, এ খুবই ভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি এই অনুমতির সাথে একটা শর্ত আরোপ করতে চাই। আমি জমি ফিরিয়ে নিতে রাজি আছি, কিন্তু ফৌজদারী মামলা করতে রাজি নই। জমি ফিরিয়ে নেয়ার পর যদি দখল পাওয়ার জন্য আবার মামলা করতে হয়, তাহলে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকুক, জমি ফিরিয়ে নেবার আমার কোনো দরকার নেই।

আমার এ কথা শোনার পর অনেকেই এক সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তার নির্যাস হলো এই যে, অনুমতি দেওয়ার মানেই মামলা মকদ্দমা শেষ। এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। কারণ এটা সমস্ত গাঁয়ের মত। এর বিরোধিতা করলে গাঁয়ের মানুষ সকলে মিলে সেটা দেখবে, মামলা করবার দরকার হবে না। তবে তোমার কাছে আমাদেরও একটা দাবী আছে। তোমরা এই গাঁয়ে আবার ফিরে আসবে, বাড়িতে ঘর বাঁধবে এবং যেখানেই থাকো না কেন, বছরে কিছু দিন এসে এখানে থাকবে।

তাঁদের এই সিদ্ধান্তে আমি শুধু অভিভূত হলাম না, তাঁদের দাবী পূরণের আশ্বাসও দিলাম। আমি আরও লক্ষ্য করলাম, বাবার স্মৃতি কী অদ্ভুতভাবেই না এখনও সজীব! আমার ফুফাতো ভাই পণ্ডিতের বাপ আমার সাথে এসেছিলেন, তিনি ঘরের মধ্যে বসে থেকে সব কিছু দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। গাঁয়ের দাবী মেনে নেয়া ছাড়া যে গত্যন্তর নেই, সেটা তিনি শমশের ভাইকে গিয়ে খুব ভালো করেই বুঝালেন। আমি পরদিনই আবার ঢাকায় ফিরে এলাম। কারণ এ নিয়ে তাড়াহুড়া করার কিছু ছিলো না। এটি এখন আর আমার একার ব্যাপার নয়। পুরো গাঁয়ের দাবী!